মহাকালের ঘোড়া

প্রফুল্লকুমার সিংহ

"অরণি"
৪৭, কেশব সেন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৯

MAHAKALER GHORA

মহাকালের ঘোড়া

(১৯৬১) প্রফুল্লকুমার সিংহ

প্রকাশক ও পরিবেশক :
"অরণি"
সপ্তাহ পাবলিকেশনস (প্রা.) লিঃ
৪৭, শশিভূষণ দে ষ্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ : চারু খাঁ

মুদ্রক :
সমীক্ষা প্রেস,
৪৭, শশিভূষণ দে ষ্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০০১২

উৎসর্গ

ভানু সিংহকে

ভূমিকা

একটা সময়ে কয়লাখনি নিয়ে গল্প লিখে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে একটা নতুন দিক খুলে দিয়েছিলেন। তার অনেকটাই ছিল দূর-সম্পর্কের মানুষদের দেখা। অনেকটাই মন-গড়া। তবু সাহিত্যের শূন্যস্থান ভরবার সে চেষ্টা বাংলায় চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

অনেক আগে এমিল জোলা, পরে স্টাইনবেক বা আরও কেউ কেউ কয়লাখনির মজুরদের নিয়ে সার্থক উপন্যাস লিখলেও রাণীগঞ্জ-আসানসোল-ঝরিয়ার এই বিরাট অঞ্চল মোটের ওপর আমাদের লেখকদের নজরের বাইরেই থেকে গিয়েছিল।

তিরিশের দশকের গোড়ায় মনোরঞ্জন হাজরার আত্মস্মৃতিমূলক উপন্যাসে সুতোকল শ্রমিকদের জীবন ফুটে ওঠে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বোধহয় রুশ সাহিত্যের কিছুটা ছোঁয়াচ লেগে শিল্পনগরী নিয়ে লেখার দিকে নতুন করে কারো কারো ঝোঁক যায়। অমল দাশগুপ্ত রিপোর্টাজের ধরনে চিত্তরঞ্জন নিয়ে লেখেন কারা-নগরী। ইস্পাত-নগরী নিয়ে দুটি উপন্যাস লেখেন যথাক্রমে গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য আর গুণময় মান্না।

চটশিল্প নিয়ে 'চটান্ধ' লিখেছিলেন মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়। কর্মসূত্রে তাঁর যোগ ছিল এই শিল্পের সঙ্গে।

তবে চটকল মজুর আর চটকল এলাকা নিয়ে সার্থক কথাসাহিত্য একজনই সৃষ্টি করেছেন। তিনি সমরেশ বসু। আর চা-বাগান নিয়ে কিছুটা লিখেছেন গৌরকিশোর ঘোষ।

ঝরিয়া এলাকা নিয়ে এক সময়ে বেশ কিছু গল্প লিখে পাঠকের মন জয় করেছিলেন যশোদাজীবন ভট্টাচার্য।

ইস্পাত আর খনিজ লোহার অঞ্চল নিয়ে ইদানীং লিখছেন রবীন্দ্র গুহ।

এর বাইরে বাংলা সাহিত্যে শিল্পাঞ্চল নিয়ে আরও কিছু লেখা হয়ে থাকলেও নিশ্চয় আমার তা নজর এড়িয়ে গেছে।

প্রাকৃতজনদের নিয়ে লেখা যে সহজ নয়, জোলা-র আমল থেকেই তা দেখা গেছে।

যা প্রকৃত তাকে অকপটে তুলে ধরা। বৈজ্ঞানিকের মত নির্লিপ্তভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা।

দেখার প্রসঙ্গে ক্যামেরার কথাও এসে যায়। লেখক কি তবে শুধু ক্যামেরার চোখেই দেখবে? সব কিছু নির্বিচারে ফুটিয়ে তুলবে? যা আছে সবই হবে তুল্যমূল্য?

যিনি সত্যিকার আলোকচিত্রশিল্পী, তিনি নিছক বোতাম-টেপা পুতুল নন। ক্যামেরার চোখের সঙ্গে মনশ্চক্ষু জুড়ে খোদার ওপর তাঁকে খোদকারি করতে হয়।

সত্যি বলতে কি, আমাদের ইন্দ্রিয়গুলোও কমবেশি ক্যামেরারই মতন। মন জুড়লে তবেই তারা বাছবিচার করতে পারে। নইলে তথ্যের বাঁশবনে ডোমকানার দশা পাবে।

তার মধ্যেও একটা জরুরি কথা থেকে যায়।

দেখা বা জানার ক্ষেত্রে কম হোক বেশি হোক দূরত্ব একটা থাকবেই। একেবারে লিপ্ত হয়ে থাকলে দৃষ্টি রুদ্ধ হয়। শব্দ আর গল্পেরও এমনি গণ্ডী থাকে।

আবার পাল্লার বাইরে চলে গেলেও দেখা আর জানাটা ঝাপ্‌সা হয়ে আসে।

সাহিত্যে তাই অভিজ্ঞতার এত কদর। বিশেষ করে, কথাসাহিত্যে। খুঁটিয়ে জানাতেই শেষ নয়। জগতে কিছুই বিচ্ছিন্ন একক নয়। বিশেষকে নির্বিশেষের মধ্যে বইয়ে দেবার গরজ চাই।

'দুর্বার গতিতে ছুটে চলেছে মহাকালের ঘোড়া। দেশ, কাল ও পাত্রের গণ্ডী অতিক্রম করে, যুগ যুগান্তরে, তার বিরামহীন যাত্রা। ঘোড়ার ক্ষুরের দাগে দাগে কত জন্ম-মৃত্যুর খতিয়ান। কত জাতির উত্থান ও পতন। কত সভ্যতার সৃষ্টি ও বিলুপ্তি।

'আজ যে সভ্যতার আদি শক্তি কয়লার তাপ—তার পাপপুণ্য ও

কর্মের উদ্যোগ নিয়েই সেকালের ক্রান্তি। সেই ক্রান্তিকাল অতিক্রম করে যায় প্রবল পুরুষকার। তার দর্পিত বুটের তলায় মাড়িয়ে যায় যত কিছু দুঃখ অভিমান।'

ইতিহাসের এই ধারা অদৃশ্য সুতোর মত নানা ঘটনা আর চরিত্রকে আগাগোড়া একটি মালার আকারে এই উপন্যাসে গাঁথতে পেরেছে বলেই 'মহাকালের ঘোড়া' পাঠকের হৃদয়তন্ত্রীকে সময়ের সুরে বেঁধে দেয়। মানবজীবনের রঙে-রসে ইতিহাস চোখের সামনে ধরা দেয়।

কয়লাকুঠির সাহেব ব্যারাকলউ, বরনারা কাবেরী, জমিদারবাবু আর সেইসঙ্গে অসংখ্য কুলিকামিন লোকলস্কর। লেখক কাউকেই ছাঁচে-ঢালা পুতুল বানান নি। ভালোমন্দে মেশানো সাদাকালোর নানা রংবাহারে তারা প্রত্যেকেই রক্তমাংসের জীবন্ত মানুষ।

লেখকের এই মানসিক দৃষ্টির গুণেই যেকোনো পাঠক এই উপন্যাসের টানে বাঁধা পড়বেন।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

মহাকালের ঘোড়া

সেই যখন খাদে কামিন কাজ করত অর্থাৎ যখন ব্রিটিশ রাজত্ব ছিল তখন দ্যা শেরগড় কোল কোম্পানীর ম্যানেজার ছিলেন মিঃ এফ. জি. ব্যারাকলউ। লোকে বলত বারকুলি সাহেব। যেমন ঠাঠ্-ঠমক তেমনি ধমক-চমক। শেরগড়, সালুঞ্চা, হাটনল—এই তিনখানা কলিয়ারীর তাবৎ কুলি-কামিন, বাবু-ভেইয়া ভয়ে তটস্থ। কালো ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দেই বুকে হাতুড়ি পিটত।

আর তাঁর বুকে তড়প জাগত রাগিণী বাউরিনীর হাতের চুড়ির ঠিনি ঠিনি শব্দে। সেই রমণীর চলার ছন্দে বসন্ত-বাহার না জিন্দা-বাহারের কলি ফুটত কে জানে? কিন্তু তার স্তন ও নিতম্বের গড়ন ছিল কিম্বদন্তীর নায়িকার মত। উদ্দাম ধুম-ধুমে হয়ে সে যখন সাহেবের সঙ্গে রতিক্রীড়ায় মগ্ন হত তখন জোড় খাসালের পাথর চাতালগুলোও পুলকে বাসর শয্যা বনে যেত। বনের শিয়াল, পথের কুক্কুরী, ঘাটের মড়া, বাটের গরু অবাক নয়নে তাকিয়ে থাকত। গাছের পাতায় শির শির করে বাতাস বইত। দামোদর ক্রুদ্ধ আক্রোশে পাহাড় ভাঙত। আর প্রভুভক্ত খানসামা ঢালুদাস ব্রীড়ায় অবনত চক্ষু মুদ্রিত করে ফোঁটায় ফোঁটায় মহুয়ার রস পান করাত প্রেম পাগলিনী রাগিণী বাউরিনীকে।

তারপর বারকুলি সাহেবের আকাঙ্ক্ষা যখন মিটে গেল রাগিণী তখন ফলভারে অবনতা। সাহেবের সঙ্গে ঘোড়ার পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে একদিন মাথা ঘুরে পড়েই যাচ্ছিল, সাহেবের বেল্টটা চেপে ধরে যদি বা টাল সামলায় বমিটা কিছুতেই সামাল

দিতে পারল না। পাকস্থলী মন্থন করে হড় হড় করে বেরিয়ে এল অর্ধপাচ্য গরুর মাংস, পাঁউরুটির মণ্ড এবং মহুয়ার রস।

বিচ, সোয়াইন বলে সাহেব ওকে গালমন্দ করতে পারতেন। ঘোড়ার পিঠ থেকে ফেলে দিতেও পারতেন। কিন্তু তিনি তা করলেন না। পরম স্নেহে পিঠে হাত দিয়ে বললেন—ডোণ্ঠ ওরি-মাই ডারলিং!

বাংলোতে ফিরে এসে নোংরা জামা-কাপড় ধোবীকে দিলেন ধোলাই করতে। কত মায়া হে!

এই ছিল সাহেবের চরিত্র! লোকে বলত—

ওয়াইন, উওম্যান, হর্স, হাউসী

চারে মিলে সাহেব ফ্যান্সী!

এই সুখের জন্যই তো সাত-সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে আসা। না হলে থোড়েই কেউ বঙ্গভূমির ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগতে এসেছে হে! তাদের চাই ধন দৌলত, মদ্যপান, নারী সম্ভোগ এবং প্রভুত্ব।

বারকুলি সাহেবের বাংলোকে ওরা বলে সাহেব কোঠি। ত্রিশ একর জমি নিয়ে যার বাউণ্ডারি, চারিদিকে পাঁচ ফুট খাড়াই রেলের খুঁটি পুঁতে হলেজ রসা দিয়ে ফেন্সিং। ধারে ধারে মেহেদী গাছের ঘন সবুজ কেয়ারি। বর্ষাকালে সাদা সাদা ফুল ফোটে। গন্ধে চারিদিক মহ মহ করে। ঝাঁকে ঝাঁকে মৌমাছি আসে। তারা বাসা বেঁধে থাকে নিম ডালে। বড় বড় মৌচাক। কারো ভাঙবার জো নেই। সাহেবের কড়া হুকুম।

কত রকমের গাছ গাছালি। শাল, সেগুন, মহুয়া, পিয়াল, শিশু শিরীষ, মেহগনি, আম, জাম, নিম, বট, অশ্বত্থ, লোহাজাঙ্গি। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গোলাপ, গন্ধরাজ, যুঁই, চামেলী, চাঁপা, লবঙ্গ-লতিকা, পলাশ, দেবদারু, কৃষ্ণচূড়া, মে ফ্লাওয়ার। রূপে গন্ধে মনোরম উপবন। তার সঙ্গে রকমারি মরশুমি ফুল।

সাহেবকে কে বলেছিল সরষে ফুল দেখতে খুব সুন্দর। উনি মালীকে হুকুম দিলেন এক ক্ষেত সরষে ফুল চাষ করতে। ফুল ফোটার পর উনি সেই হলুদ গালিচার পাশে বসে প্রচুর মদ্যপান করলেন।

আবার একজন গোমস্তাবাবু বলেছিলেন, পদ্মমধুর খুব কদর। পদ্মফুলের বড় সৌরভ। পদ্মপাতায় ভাত খেতে বড় ভাল লাগে।

বড় পবিত্র ফুল স্যার। শ্রীরামচন্দ্র একশো আট নীল পদ্ম দিয়ে মা দুর্গার পূজো করেছিলেন।

উনি বললেন—আই সী! লর্ড রামচন্দ্র গডেস দুর্গাকে পূজা দিয়েছিলেন? সি ইজ দ্যা ষ্ট্রেনথ অফ অলমাইটী! ও কে।

তৎক্ষণাৎ হুকুম দিলেন বাংলোর পাশে বিশ একর জমি নিয়ে একটা বিরাট পুকুর খনন করে পদ্মবীজ লাগাতে।

তখনকার সাহেবদের হুকুম মানেই কাজ। এতো আর গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় সাত ভাতারের ঘর-কন্না নয়। সাহেব মানে ভগবানের নিজের প্যাযদা—ছোটা ভগবান। ভাগ্যিস তখনো বীরসা মুণ্ডা নিজেকে ভগবান বলে ঘোষণা করেনি। না হলে কটা চামড়া, লালমুখ, নীল চোখের মানুষদের ভগবান ভাবার আইডিয়াটা চৌপট হয়ে যেত।

মৌমাছির মধু সংগ্রহের জন্য পুকুর খনন ও পদ্মবীজ বপন। এঃ! মা মনসা এত খবর জানলে কি করতে হে?

তা উনি জানুন বা না জানুন। পুকুর মানেই জলাশয়। বিবিবা-থানের পুঞ্জীভূত পাপ ও গ্লানি, খাদের কুলি কামিনদের শ্লেষ্মা, ঘাম ও রক্ত ধোবার তো একটা জলাশয় হল। সাহেব ভেবে-চিন্তে তার নাম রাখলেন বিবি বাঁধ।

সাহেব কোঠীর বাড়িখানাও বিরাট। মাঝের ঘরখানা টেনিস গ্রাউণ্ডের সমান। দু'পাশে বড় বড় বেড রুম। পিছনে গুদাম, রান্নাঘর, স্নানঘর। সামনে লম্বা বারান্দা। চুন সুরকি দিয়ে ইট গাঁথুনির দেওয়াল, মোটামোটা থাম। কাঠের বিম, বরগা ও কাঁইচি দিয়ে লাল টালির ছাউনি। দশ ফুট খাড়াই পাঁচ ফুট চওড়া দরজা। ঢাউস ঢাউস জানালা। সব সেগুন কাঠের।

মাঝের ঘরটার দেওয়ালে নানা রকমের অয়েল পেইন্টিং। শিকারী ঘোড়সওয়ার, যুদ্ধবাজ সেনানায়ক, নৃত্যপরা যুবতী, নগ্নিকা রাজকন্যা, মিথুন মগ্ন রাজা রাণী, কামার্ত পুরুষ, তুষারাবৃত পর্বত চুড়া, ভ্রাম্যমাণ মেষ পালক, নিরাবরণা অপেরা গায়িকা।

আছে গণ্ডারের চামড়ার ঢাল, খাঁটি ইস্পাতের তলোয়ার, নানারকম ছোরা ছুরি, দু'খানা বন্দুক। হাতির দাঁত, হরিণের মাথাশুদ্ধ শিং,

বাঘের চামড়া, ভেনাসের ভাস্কর মূর্তি। ক্রুশবিদ্ধ যীশুখৃষ্টের বিরাট চালচিত্র।

এই ঘরটা নিয়েই সাহেবদের গর্বের অন্ত নেই। এটাই আড্ডাখানা, পান ভোজনের আসর। প্রয়োজনে বলরুম কখনো বা কনফারেন্স রুম। অতিথি আপ্যায়ন করতে হলে এখানেই আরাম কেদারায় বসতে দেওয়া হয়। শীতের রাত্রে ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বলে। গ্রীষ্মে চলে টানা পাঙ্খা। শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা সেকালে চালু না থাকলেও গায়ে ঘাম ঝরত না

একটি সাহেবকে কেন্দ্র করে চাকর পাড়া। বাবু, চাপরাশী, আরদালী, সহিস, কচোয়ান, আয়া, মালি, বাবুর্চি, খানসামা, মুচি, মেথর, ধোবী মিলে ডজন দুই তো বটেই। তাদের আবার গোলাম, বিবি, ছানাপোনা।

যেমন ইরফান আলী কচোয়ানের সাতটা বেগম। বাউরী, মুচি কামিন যাকে যখন মনে ধরেছে অথবা সাহেবের কাছে উপহার পেয়েছে, তাকেই সাদা, নিকাহ করে বিবি বানিয়ে নিয়েছে। তাদের কেউ কেউ কলমা পড়ে মুসলমানও হয়ে গেছে। কাউকে আবার ফাদার উইলিয়াম খ্রীস্টান বানিয়ে দিয়েছেন। কেউ বা এখনো আ[illegible]বৃদ্ধ হিন্দুয়ানীকে আঁকড়ে ধরে আছে

এখন সবাই ভাববে এইসব বিবিজানদের ঠেলায় ইরফান আলী হরদম লবেজান হয়ে থাকে। তাদের কলহ ও চিৎকারে সাহেব কোঠীর বাগানে কাক চিল বসতে পায় না। মৌমাছিরা উড়ে গিয়ে অন্যত্র চাক বাঁধে।

না—না। তা নয়। ইরফান ওদেরি খাদের কাজে ফিট করে দিয়েছে। সবাই কাজ করে। আপন আপন রোজগারে সন্তান পালন করে। ইরফান তাদের সার্টিফায়েড ফাদার। তার দরুন গাঁজা ভাঙের খরচটাও ঐ বিবিজানরা দেয়। কারণ পুরুষকে পোষ্য দেওয়া নাকি তাদের ধর্ম।

সেই চাকরপাড়ার নাম বিবি-বাথান। বাথান মানে গরু চরবার ডাঙ্গা। আহা! কি ইনটেলেকচ্যুয়াল নাম হে।

সন্ধ্যার আকাশে কত রকমের বর্ণ-বিন্যাস পঞ্চকোট পাহাড়ের

গলায আগুনেব মালা দপ্‌ দপ করে জ্বলছে। লক্‌লক্‌ কবে কাঁপছে। মনে হচ্ছে সাবিবদ্ধ পলাশ ও কৃষ্ণচূড়া নেচে নেচে পাহাড় পবিক্রমা করছে। তালে তালে বাঁশী ফুঁকছে বসন্তেব বাতাস।

বাগানেব মাঝে কেযাবি কবা ঘাসেব আস্তবণ। নিমফুলেব সুগন্ধে আমোদিত। বাবকুলি সাহেব বসে আছেন দার্শনিকেব মত। হাতে মদেব গ্লাস চোখ দুটি ঢুলু ঢুলু বাগিণীব অনাবৃত কটিতে হাত বেখে বললেন—মাই ডাবলিং। ডক্টর তোমাকে একজামিন কবে বলে গেল ইউ আব প্রেগন্যান্ট। সো ইউ মাস্ট হ্যাভ'ন হ্যাজব্যাণ্ড। তোমাব একটি স্বামী চাই। টু লিগ্যালাইজ দ্য ইস্যু।

বাগিণী অত ইংবেজী বোঝে না। সে নেশাব ঘোবে চোখ পিট্‌ পিট্‌ কবে তাকাল।

সাহেব ডাকলেন ঢা—লু!

ঢালু দাস সেলাম দিল জী হুজুব।

— তোমাকে একটা চাবমিং উওম্যান প্রেজেন্ট কবলাম। ইউ উইল এনজয় হাব লাভ। ওকে তুমি ভালবাসবে। পত্নী করে বাখবে। দিস ইজ মাই অর্ডাব।

বাগিণীকে ওব দিকে এগিযে দিযে ন্যাযসঙ্গত হস্তান্তবেব কবুলতি দিযে দিলেন। খানসামা তো হাতে চাদ পেযে গেল। আব বাগিণী বাজবাণী আকাশ থেকে পডল। এক মুহূর্ত্ত আগে যাব হাতেব পাঁচটি আঙুল দিযে সোহাগেব পুলক ঝবে পড়ছিল সেই তাকে তুলে দিল একটা খানসামাব হাতে। একেবাবে মালিক থেকে নোকরেব পত্নী! মনঃক্ষুণ্ণ হবাবই কথা। দুঃখ দীর্ণ হবাব কথা। বাগিণী কোন অর্থ পায না। সে বেচাবী দুই হাটুব মাঝে মুখ বেখে গুমবে গুমবে কাঁদতে লাগল।

অনেকক্ষণ পবে সে যখন তাকাল তখন আব সাহেব সেখানে নেই। যবণী মাযা তবলা দাসী মাথায হাত দিযে বলল—কাঁদছিস্ কেন লো? সাহেব তোব গাছতলা কবে দি। ওব কাছে গযনা নিবি, শাড়ি নিবি। ছেলেপুলে হলে তার জন্যে জমি নিবি। কাঁদবি কেন? সাহেব তো আব চিবকালেব জন্য তোকে বাখবে না। তোব চিবকালেব সোযামী হবে ঢালু দাস। খুব ভালো লোক। তোকে মাথায করে বাখবে। তবলা দাসী একটু একটু কবে অনেক জ্ঞান তাব

মগজে ঠেলে দিল কত রকম উপমার রসে জারিত করে। রাগিণীর দিব্য-জ্ঞান এল। সে হাড়ে হাড়ে বুঝল—সাধ মিটে গেলে আস্তাকুঁড়ের আবর্জনা। তবু যাহোক সাহেব তার একটা গাছতলা করে দিয়েছেন এজন্যই তার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। তাছাড়া সাহেব যে ফলটি তাকে আদর করে দিয়েছেন তার তো একটা সদর বাপ চাই। তাই ঢালু দাস মহামান্য লর্ড শ্রীকৃষ্ণের আদালতে সেই সন্তানের সদর বাপ হবার হলফনামা পেশ করল। এর চেয়ে ভাল পরিণতি তার জীবনে আর কি হতে পারে?

কারণ সে স্বভাব স্বৈরিণী। তার জীবনের বড় সাধ মাছ-পোড়া দিয়ে তাড়ি খাবে। মহুয়া মাতাল হয়ে ভাদুগান করবে। মশলা দেওয়া পান চিবোবে। সে মাখবে ফুলাল সাবান। খুশবু তেল। মাথায় বাঁধবে ডাগর খোঁপা। চোখে দেবে কাজল। পাছাপাড় শাড়ি পরে হাজা ফাটা পায়ে চটি ফট্ ফট্ করে বেড়াবে। দেখে শুনে বুক টাটাবে পাড়া পড়শীর।

সেই মেয়ের আহ্লাদ কি পূরণ করতে পারে হাল ঠেঙানো বাউরী মুনিষ? পারে না। তাই বলে সেও বিয়ালা পুরুষের ঘর করে না। প্রথমে রাগ দেখিয়ে বাপের ঘর আসে। তারপর সাহেবদের কুলিকামিন সংগ্রহের আড়কাঠির সঙ্গে যোগাযোগ।

আড়কাঠি কদর বোঝে। এমন ঢল ঢল যুবতীকে খাদের কামিন নিযুক্ত করতে তার বড় বেধেছিল। তাই মারফৎ ঢালু দাস ওকে পাঠিয়ে দিয়েছিল বারকুলি সাহেবের বাংলোয়। ইনাম পেয়েছিল প্রচুর।

বিরাট বাংলো, বড় বড় ঝাড় লণ্ঠন, সুসজ্জিত স্নানঘর, ফোয়ারার জল, ফুলাল সাবান, খুসবু তেল, নতুন তোয়ালে, পুরানো আয়া তরলা দাসী—সবাই ওকে স্বাগত জানাল। আয়া ওকে ঘষে মেজে ঝকৃঝকে করে পরতে দিল ঢাকাই শাড়ি, চিকনের ব্লাউজ, কুঁচি দেওয়া শায়া। হাত ভর্তি কাঁচের চুড়ি, মাথার খোঁপায় রূপোর প্রজাপতি, পায়ে জরির কাজ করা চটি জুতো। রাগিণীর সিঁথি থেকে উঠে গেল বিয়ালা পুরুষের সোহাগ সিঁদুর।

প্রসন্ন মনে মদ খেয়ে মাতোয়ালী হল। তারপর ধর ধরভাবে ধরা দিল বারকুলি সাহেবের বলবান বাহুতে।

॥ দুই ॥

সেই বিবি বাথানে ঢালু দাসের বিবি ছলনা দাসী গলা ছেড়ে কেঁদে উঠল। সেই রাগিণীতে সঙ্গত করল তার চারটি পোলাপান। রাগিণী তখনো ঢালু দাসের ঘরে আসেনি। কারণ সাহেব বলেছেন—ওকে নাইসলি ডেকো-রেট করে পাঠাবে। সো ছাট পাবলিক তার তারিফ করে।

কিন্তু খবরেই অশ্রুবন্যা। ঢালু দাসের নার্ভাস ব্রেক ডাউন।

ধোবী গৃহিণীর নাম বঞ্চনা দাসী। সে জর্দা পান খায়। পিচ্ পিচ্ করে দাঁতের ফাঁকে পানের পিক ফেলে। রকমারি শাড়ির বাহারে সে বড় অহঙ্কারী। পরের দ্রব্য পরিধানে তার মনে সুখের সুর। সে নাকি ঐ শাড়ির গিঁট দেখেই বলে দিতে পারে প্রণয়, অভিসার, শৃঙ্গার, সম্ভোগ ও সন্তান ধারণের বিশেষ বিবরণ। তার চোখে ছলনা দাসীর কান্না আদিখ্যেতা। কারণ সেও তো একদা সাহেব সুখে সুখী ছিল।

ঝন্ ঝন্ করে বলল – আঃ মাগীর দেমাক কত! সাহেব যাকে আদর করে দিয়েছে তাকে যদি মাথায় করে না রাখিস তবে ঐ শুঁটকি চামচিকি গতর নিয়ে বাজারে ভিখ্ মেগেও খেতে পাবি না।

দপ করে আগুন জ্বলে গেল। ছলনা ও বঞ্চনার সংগ্রাম। যেন ফায়ার ড্যাম্প এক্সপ্লোসান। ঢালু দাসের পৌরুষ দানবীয় আক্রোশে ঝলসে উঠল। ছলনার অশ্রুভেজা দুটি গালে দুখানা ঘুঁটে দেবার মত করে চড় বসিয়ে বলল—বেশি ভ্যান্ ভ্যান্ করিস না। এত সাহস তুর? সাহেবের কথার অমান্যি। এই বিবি বাথানে যে এতগুলান মেয়্যা আছে কে না জানে সাহেবকে? আর কে তুর মতন কেঁদে ভাসাছে। চুপ থাক।

গর্জন এবং বর্ষণ দুটোই সমান হওয়ার দরুন ছলনার বাক্যরুদ্ধ হল।

ঢালু দাসের ঘরে বেজে উঠল ভোজের ঢোল।

চারু মুচির সারাদিনের কাজ সাহেবের জোড়া দশেক জুতো সাফ

সুঁতরো করা, পালিশ দেওয়া। কোমরের বেল্ট ও টুপির হেফাজত করা। সে ভাল তবলা বাজায়। আবার কালোয়াতি গান করে—যামিনী বিভাবরী

বাবুর্চি হাঁড়িলালের বৌয়ের নাম চিনি। সে জীবন রায়ের ঝুমুর দলের নাচুনী ছিল। বয়স পড়ে যাওয়ার দরুন আর তেমন প্যালা বা ফিরি পড়ছিল না। তাই সে হাঁড়িলালের গলায় ঝুলে পড়েছে। বয়সকালে হাঁড়িলাল ওকে মায়ের কানের সোনা চুরি করে প্যালা দিত। এত গভীর প্রণয়। সেই চিনি এখন ড্রেস পেন্ট করে মনোহারিণী। নাচে গানে বিবি বাথান মাতাল করে দিয়েছে।

এখন এল রাগিণী। সাহেবের খাস আয়া তরলা দাসী ওকে রংদার করে সাজিয়ে দিয়েছে। কানে সোনার পাশা, হাতে বাউটি, অনল-গনল চুড়ি। গলায় রূপোর বিছে, পায়ে তোড়া। খোঁপায় গোঁজা ফুল। সিঁথিতে টায়রা। এমনিতেই তো দীঘল নয়নী তাতে দিয়েছে সুর্মা। চোখ তো নয় যেন মদনের বাণ। চুমকি বসানো জরি পাড় শাড়ি পরে ঠমকে ঠমকে চলছে। বিপুল পয়োধরা বিশাল নিতম্বিনী বরনারী নাগরের ঘর থেকে সোয়ামীর ঘর করতে আসছে। তার সঙ্গে জনাদশেক সঙ্গিনী এবং বাঁশী, কাঁসি, ঢোল, করতাল।

ঢালু দাস আহ্লাদে আটখানা। ধুতির উপর আংরাখাটি পরে চুলে আলবট কেটে দোজবর পাত্রটি যেন। এক পাত্র রং চড়িয়ে চোখ তার ঢুলু ঢুলু।

চিনি নতুন রাগিনীতে ঝুমুর ধরল—

কমলিনী রাইলো
ডাঁসা আঁজির পাক ধরেছে বুকে
কেউ ছুঁয়ো না—কেউ ছুঁয়ো না তারে—

—চাড্ডুম। করে তেহাই ঠুকল চারুমুচি।

গলা ছেড়ে কেঁদে উঠল ছলনা দাসী—ওগো আমার কপালে আগুন লেগে গেল গো। সাহেব খালভরা কি সর্বনাশ করলেক গো।

পোলাপানগুলি সমানতালে সঙ্গত করল—হিঁ-হিঁ-হিঁ-

কচোয়ান ইরফান আলীর সাতটা বেগম খিলখিল করে হাসল।

মদ মাতালের মাইফেল হাসি-কান্নায় ভরে গেল।

সেই রাত্রে বিবি বাথানের বেবাক বিবিজান মদে ঘোর হয়ে নাচল,

গাইল, ছড়া কাটল, মুখে ফেনা ভাঙল, আপন আপন মনের মানুষের সঙ্গে সুখ-সম্ভোগে লিপ্ত হল। যার কোন গতি হল না সে বিরহের গান গাইল। মন পুড়ে গেল মনের আগুনে। কেউ বা চুপিসাড়ে চাপরাশী ধাওড়ায় গিয়ে ঢুকল।

বিবি বাথানে যেমন মেয়ের ভিড়, চাপরাশী ধাওড়ায় তেমনি আখাম্বা মরদের পাল। তারা সব বহাল তবিয়তে ছোলার ডাল দিয়ে চার গণ্ডা ছ গণ্ডা রুটি সাঁটে। ঢক্ ঢক করে সিদ্ধির সরবৎ খায়। সোঁ সোঁ করে গাঁজার কলকেয় টান দেয়। নেংটি খিঁচে ডনবৈঠক করে, মুগুর ভাঁজে, কুস্তি লড়ে। এরা হ্যা শেরগড় কাল কোম্পানির আর্মি ফোর্স। বাবকুলি সাহেবের পোষ্য পুত্র। আরা, বালিয়া, ছাপরা, মতিহারী থেকে আমদানি। জাতে কেউ রাজপুত, কেউ গোয়ালা। পদবী সিং এবং যাদব। কলিয়ারীতে চাপরাশীর কাজ করে। অফিস কুঠি, গুদাম, ডিপো, বাংলো পাহারা দেয়। সাহেব কোঠীর পাশে ঘর বানিয়ে থাকে। ব্যবসা করে সুদ ও দুধের

তাদের হেড রামনাগিনা মিশ্র। কনৌজ ব্রাহ্মণ। গলায় একছড়া বাছুর বাঁধা দড়ির মত মোটা পৈতে। পরণে ঠেঁটি ধুতি। গা প্রায়শ খালি। বুক ভর্তি পাকা চুলের জঙ্গল। মাথাটি ন্যাড়া। কিন্তু পায়ে আছে চারু মুচির হাতে তৈরি কাঁচা চামড়ার জুতো। চলতে চলতে মোরাম মাটির উপর মচ মচ শব্দ পরাধীন ভারতের হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনকে তীব্রতর করে তোলে।

তিনি একদিন ভাগ্য সন্ধানে এসেছিলেন। এবং এখানে তার সাক্ষাৎ পেয়ে গেছেন। একদা চাপরাশী এখন গোমস্তা বাবু। [illegible] বলে মিছির বাবা। তার দৌলতের দরিয়ায় বান ডাকছে। তিনি মদ স্পর্শ করেন না মাছ অথবা মাংস এবং মেয়েমানুষও [illegible]। সে সব নাকি মহাপাপ। তবে কচি ও নধর কিশোর পেলে আদর করে কাছে রাখেন। সঙ্গে নিয়ে শোন। পরম তৃপ্তিতে গঞ্জিকা সেবন করেন। তখন তিনি বারোগারি বাবা।

বিবি বাথানে মেয়ে খুব সস্তা। চাপরাশীরা পরদেশ এসেছে নোকরী করতে। তাদেরও তো সাধ-আহ্লাদ আছে তাই আশনাই করে এক বা একাধিক রমণীর সঙ্গে। সেসব মেয়েদের স্বামীরাও সে

তথ্য জানে। তার জন্যে কিছু মনে করে না। বরং গর্ব বোধ করে। ছল-ছুতোয় দুটো পয়সা বখশিস চায়। ধার-উধারও নেয়। এই সুবাদে মা ষষ্ঠীর অকৃপণ দয়ায় জারজ সন্তানেরাও পালে বাড়ে।

ফাদার উইলিয়াম এসে তাদের কানে যীশুখ্রীষ্টের শান্তি রস সালসা পরিবেশন করেন। তিনি সারমন দেন—জগত দ্রুত থেকে দ্রুততর গতিতে অশান্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কারণ সব ধর্মচ্যুত। কপটাচারী। হিন্দুধর্ম গোঁড়া। এই যে তোমরা কর্মের অনিবার্য গতিতে, যুগের অনিবার্য চাহিদায় স্বীয় ধর্ম ও সমাজ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ছো—আর কখনো সেখানে আশ্রয় পাবে না। তারা তোমাদিগকে ঘৃণা করবে। কিন্তু জগতের পিতা অমৃত পুরুষ যীশু তোমাদিগকে আশ্রয় দেবার জন্য দুহাত বাড়িয়ে আছেন। এসো—তাঁর কাছে অবনত মস্তকে প্রার্থনা কর। তোমার মন অপার শান্তিতে ভরে উঠবে।

জারজ সন্তানের জননী, স্বীয় কূল-মান-বিবর্জিতা রমণী উপায়ান্তর না দেখে ফাদারের কথায় যীশু ভজনা করে। সে খ্রীস্টান হয়। জাতি-কূল-মান হারিয়ে ঈশ্বরের করুণা লাভ করতে চার্চে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে। খ্রীস্টানের আবাদ বেড়ে চলে।

মিশিরজী একটি দুটি করে দেশোয়ালী ভাইদিকে নিয়ে এসে চাপরাশির কাজে ফিট করে দিয়েছেন। এখনো দিচ্ছেন। প্রতি বছরই দু'পাঁচজন আসে। এই আসার সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। আর তিনি তো নিজেই গোমস্তা। জবাব বহালির ন্যায্য হক্‌দার।

মুচি, মেথর, চণ্ডালেরা তখনো হরিজন হয় নি। মানে গান্ধীজী কর্তৃক তাদের কৌলিন্য ঘোষিত হয়নি। তারা অস্পৃশ্য অধম। ছুঁলে জাত যায়। ব্যতিক্রম শুধু তাদের কুল ললনাদিকে রমণের ক্ষেত্রে। তখন জাত যায় না।

তাদের নিয়ে এসে খাদে নামিয়ে দেওয়ার ব্যাপক রীতি তখনো চালু হয় নি। ওরা নাকি তখনো কাপড় পরতে জানত না। ট্রেনে চড়তে পারত না। লালমুখো সাহেব দেখলে ভয়ে বনে গিয়ে লুকোত।

তাই মিশিরজী গ্রাম গ্রামান্তর থেকে সাঁওতাল বাউরী কুলি কামিন নিয়ে আসতেন মাল কাটার কাজ করত। তারজন্য এলাহি ব্যবস্থা। পেয়াদা, গোমস্তা, দালাল, আড়কাঠি ও সরদাররা থাকত

শ্রমিক সংগ্রহের জন্য। পেয়াদা ও গোমস্তারা কোম্পানির মাইনে করা লোক। দালাল ও আড়কাঠি এক লপ্তেই জন প্রতি ধরতাই পেত। আর সরদাররা পেত রেজিংয়ের উপর টন প্রতি দু'পয়সা কমিশন।

বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, সাঁওতাল পরগণা ও মুঙ্গের জেলার হাটে বাটে ছড়িয়ে পড়ত তারা। অবশ্য এক একজন সরদারের এক এক অঞ্চলের শ্রমিক। সবচেয়ে বেশি কুলি-কামিন ছিল সাঁওতাল। তারপরেই বাউরী। মুচি, মেথর, কোঁড়া, ধাঙ্গড়, ডোম, চণ্ডালও আসত। আর আসত পালামৌ হাজারিবাগ থেকে মুণ্ডা উপজাতির দল।

ওরা সব মরশুমি পাখির মত আসত। চাষ ও ধানকাটার সময় মাথা ঠুকতো নিজের ঘরে যাবার জন্য। কিন্তু আসার আগেই দাদন নিয়ে বসে থাকত। তাই যতদিন না সে টাকা শোধ হত ততদিন ছাড়ান ছিল না। সরদারদেব লোক থাকত পাহারা দিতে। কোম্পানির চাপরাশি তো ছিলই। কোন সবদার কোন শ্রমিকের নামে অভিযোগ আনলেই হল। চাপরাশিরা বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ত। কার সাধ্য পালায়?

তবু কিন্তু কয়লা কুঠির ইতিহাসে মরশুমি শ্রমিকের বহতা স্রোত সারাবছরই চলত। দলে দলে আসতও যেমন চলেও যেত তেমন। সরদাররা হিমসিম খেত। কেউ বা দেনার দায়ে ডুবে যেত। কমিশন নেবে কি দাদনের দরুন যে টাকা তার জিম্মায় ছিল তাই উশুল দিতে জান কয়লা হয়ে যেত।

কুলিকামিন একসঙ্গে কাজ করত। এক টব গাড়ি ভর্তি করলে ছয় আনা পয়সা পেত। সপ্তাহের শেষে শনিবার হিসেব নিকেশ করে বেতন দেওয়া হত। চাইলেই হাওলৎ পাওয়া যেত।

একবার খাদে নামলে বেবাক অন্ধকার। তারপর তাদের আকাশে যে আলো ফুটবেই এমন গ্যারান্টি খোদাতালাও দিতে পারতেন না। কে যে কখন ছাদ পড়ে মারা যাবে, ফায়ার ড্যাম্প গ্যাসে আগুন লেগে পুড়ে মরে যাবে অথবা জলপ্লাবনে ভেসে যাবে তা একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া কেউ জানতেন না।

সেজন্য কুলিকামিন পাওয়া যেত না। তবে সাহেবীরাজ। একবার দাদন খাওয়াতে পারলে ঘাড়ে ধরে নিয়ে আসবার জন্য তো সরদার চাপরাশীর দল আছেই। আর দাদন না খেয়েই বা উপায় কী?

পেট বড় দুশমন। দেশে বারোমাস আকাল। ধান-পান আনাজ ফসল যা উৎপন্ন হয় সব জমিদারের খামারে নয় তো জোতদারের গোলায় জমা হয়। ওরা কুলিকামিন। কি কয়লাকুঠি, কি নীলকুঠি, কি চা-বাগান, কি গাঁযে ঘরের ক্ষেত-খামার সর্বত্রই একইরকম শোষণ ও যন্ত্রণাব বলি।

কয়লাকুঠিতে কাজটা বিপজ্জনক, খাদটা অন্ধকার, সমাজটা পঙ্কিল তবু যেন মন্দের ভাল। অন্যান্য শ্রমজীবীর চেয়ে রোজগার বেশি। তাই যখন পেটে ভাতের টান পড়ে তখন দালালদের কাছে দাদন নেয়। খাদে খেটে সে টাকা শোধ কবে বাড়ি ফেরে। অবশ্য যদি বেঁচে থাকে।

আবার কেউ থিতু হযে যায়। তাদেব কাছে জমিদাব, মহাজন, জোতদাবদের অত্যাচার কযলা কুঠিব সাহেবদেব চেয়েও বেশি! এখানে তো তবু দুটো পযসার রোজগাব আছে ওখানে তো বিনা রোজগারে চাবুকটাই ফাউ। মেয়ে বৌয়েব ইজ্জত নিয়ে টানাটানি তো সবখানেই আছে। সুন্দরী মেয়েদেব চাহিদা সব দেশে সব সমাজে।

সেটা ভেবে কি হবে?

তাই বিবি বাথানের মেযেরা সতীত্ব নিয়ে ভাবে না।

॥ তিন ॥

নারীদেহ ভোগ্যপণ্য। ওদের মতে এসেনসিয়াল কমোডিটি। কযলা খনি অঞ্চলে অমন কত বিবিবাথান। তাব পত্তনদারকে কেউ ছোট করে দেখত না। তাঁদেব স্ত্রীরাও সেজন্য মুখ গোমড়া করে গোঁসাঘরে যেতেন না। এটা ছিল দেশ রেওয়াজ। বরং স্টাটাস সিমবল। যাব যত রক্ষিতা তার তত বাবু হিসেবে নামডাক। পকেটে পযসা থাকলেই হল

তবে আর বারকুলি সাহেবের দোষ কী? চিনি-চামেলী-ছলনা-বঞ্চনা-রাগিনী-পদ্মিনীরা বরং গাছতলা পেযে যায়। সাহেবের কড়া হুকুম, হস্তান্তর করে দিয়েছেন বলে যে দখলীদাররা দু'দিন ফুর্তি করে মেরে ধরে তাড়িয়ে দেবে সেটি চলবে না। ইট উইল এফোর্ড হার লাভ। দস্তুর মত কড়া হুকুম।

সেই মানুষটির হৃদয়ে একটা শ্যামল-কোমল প্রেম আছে। কদম ফুলের পাঁপড়ি জাগা হিল্লোল আছে। তিনি স্ত্রীকে সপ্তাহে একটা করে চিঠি লেখেন। প্রত্যেকটি চিঠি কমপক্ষে আট দশ পাতার। আর প্রতিটি চিঠিতে দশ থেকে পনেরবার নানা বিশেষণে বিভূষিত ডারলিং শব্দ থাকে। কিস দিয়ে শুরু ও শেষ করেন। আদিরসাত্মক ক্রিয়াকর্মের বিবরণ দেন। আর সমকালীন কয়লা শিল্পে বিভিন্ন ঘটনাবলী এমন নিপুণভাবে বর্ণনা করেন যে তা জোড়া লাগালে কয়লা কুঠির অগ্রগতির প্রামাণ্য দলিল হয়ে যেতে পারে। ভদ্রলোক নিঃসন্দেহে গুণী ব্যক্তি।

ঘোড়া ছুটিয়ে কালঘাম ফেলতেন আর সংগ্রহ করতেন নানা প্রকার নুড়ি, পাথর, কয়লা ও ফসিল। একটা ফসিল সংগ্রহেব জন্য একশ মাইল ঘোড়া ছুটিয়ে যাওয়া তাঁর কাছে সাধারণ ব্যাপার। তাঁর সংগ্রহে ছিল হিটলী সাহেবের আমল থেকে হালসন পর্যন্ত ইতিহাসের খসড়া। ভূতাত্বিক দলিল, নকশা, রিপোর্ট। অজয়, দামোদর ও বরাকরের অববাহিকা অঞ্চলের নক্শা। নারায়ণ কুড়িব ফেবিঘাট থেকে ডিসের-গড়েব পীব থান পর্যন্ত তাবৎ কয়লা স্তবের খতিয়ান। সাহেবকোঠিব একটা ঘবে ছিল এই সংগ্রহশালা।

ত্য শেবগড় হল ডিসেরগড়। সম্রাট শেবশাহের আমলের শেবগড় পবগণা এখনকার আসানসোল সাব ডিভিশন। অবশ্যই কিছু অদল-বদল আছে। তবে মোটামুটি শেরগড় ও সেনপাহাড়ী পরগণা নিয়েই আসানসোল। কয়লা ও খনিজ দ্রব্যের বিশেষ কেন্দ্র। ডিসেরগড়, সাঁকতোড়িয়া, হাতিনাল, ভরতচক, পনিয়াটী, কোয়থী, বানা, ঘুসিক, নিংগা, ধাদকা, সালানপুর প্রভৃতি কয়লাস্তর দুশো বছর ধরে ভারতের আদি শক্তি কয়লার যোগান দিয়ে যাচ্ছে। এ যেন কামধেনু গাই। যত খুশি দোহন কর দুধের শেষ নেই।

রাঢ়ভূমির রুক্ষ এলাকা আসানসোল। শিল্প ও খনির রমরমা বাজার। সেই আসানসোলে আগে বাঘ বাস করত হে !

ওটা কথার কথা। আসলে তখনকার যুগে আসানসোল ছিল আসন ও শালের বন। তার সাথে পলাশ, মহুয়া, বহড়া, হরিতকী, আমলকী, লোহাজাঙ্গি, শিশু, শিরীষ, নিম ও বট। শিঁয়াকুল কাঁটার ঘন বন। ফাল্গুনে শাল-পলাশের মাতামাতি। বর্ষায় লোহা-জাঙ্গি। সে কি ফুলের সুবাস। মন মাতিয়ে দিত। বৈশাখের

সন্ধ্যায় গোবর নিকানো উঠোনে শুলেই মাথার উপর চাঁদ ও বাতাসে শাল, মহুয়া, নিমফুলের সুবাস। রাজ্যের ঘুম এসে চোখ দুটো জুড়ে দিত।

আর ছিল নিশ্ছিদ্র নীরবতা। দিগন্তব্যাপী আঁধার। তখন হুস্ হুস্ করে স্টিমইঞ্জিনও চলত না। দিগন্তের বুকে বিজলীবাতির মালাও দুলত না। জীবন ছিল দুলকি চালের। বোল ছিল ঢিমেতেতালের, মাঝে মাঝে মেঠো পথে হেঁটো ধুতি পরা বাউলের প্রাণ টনটনে গান।

শেরগড়, সালুঞ্চী, হাটনল—তিনটি কোলিয়ারীর তেরোটি ইনক্লাইন। ওরা বলে সিঁড়ি খাদ। সাত আটটি হাওয়া চালক। মাইনিং মেথডসের নাম বর্ড এণ্ড পিলার। আসলে তা ইঁদুর-গর্ত। ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত সিড়ি খাদ থেকে ডাইনে বাঁয়ে সামনে দশ ফুট খাড়াই, বারো ফুট চওড়া সুড়ঙ্গ পথ গোটা অঞ্চলটাকে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে। মাঝে মাঝে হাওয়া চালক দিয়ে বাতাস চলাচল করে। কিন্তু খাদের ভিতরটায় বাতাসের কোন গতি নেই। অবরুদ্ধ বায়ু প্রবাহে ভ্যাপসা গরম। তাই আবার হুস্ হুস্ করে স্টিম পাম্প চলে। তার লিকেজ ও এক্সস্টে সুড়ঙ্গ পথে জমে থাকে গাঢ় কুয়াশা। ডিবরী বাতির আলোতে পাঁচ ফুট দূরের মানুষ দেখা যায় না।

সুড়ঙ্গের সম্মুখ ভাগ যেখানটা নিরেট কয়লাস্তর সেখানেই গাঁইতি দিয়ে কয়লা কাটা হয়। কার বাপের সাধ্যি দু দণ্ড দাঁড়ায়। গরমে কালঘাম বের হয়। বুকে হাপর চলে। মাথার উপর অবিশ্রান্ত বর্ষণের মতো টপ্ টপ করে জল পড়ে। তারই মধ্যে গাঁইতি চালায় সাঁওতাল মালকাটা। তাদের পেশী ফুলে ফুলে ওঠে। মুখ থেকে শব্দ বের হয়। চাপ চাপ কয়লা খসে পড়ে।

কামিনগুলো ঝোড়ায় ভর্তি করে কয়লা বয়। ঘামের গজ-গজানিতে কারো গায়ে কাপড় থাকে না। মালকাটাদের পরণে থাকে নেংটি। কামিনদের তিন হাত লম্বা ফ্যানাড়ী। কোমরে পাক দিয়ে পরে। বাদবাকি উদোম। মাথায় ঝোড়া নিয়ে ধুম-ধুম করে চলে। টব গাড়ি বোঝাই করে। সারি দিয়ে যখন চলে তখন মনে হয় ভূত কিংবা প্রেত, প্রেতিনী। ওরা ইঁদুরের মত সারাদিন

কয়লা বয়। ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে পড়লে গোলাইয়ে বসে গামছা ঘুরিয়ে বাতাস নেয়।

সালুঞ্চীর সিঁড়িমুখে দাঁড়িয়ে থাকেন হাবু সাহেব। তামাটে রং। সোজা শিরদাঁড়া। মোটা মোটা শিরা। শক্ত সমর্থ বাঁধন। বয়স প্রায় পঞ্চাশ। খাকি হাফকামিজ হাফপ্যাণ্টের ভিতর গুঁজে নিয়ে কোমরে বেল্ট বাঁধে। হাঁটু তক্ খাকি মোজা। পায়ে ক্যাম্বিশের জুতো। বুকপকেটে নোট বই ও পেন্সিল।

বারকুলি সাহেবের পেয়ারের লোক। বহু পাপের কারিগর। চলতা পূরজা আদমী। সালুঞ্চী খাদের ইনচার্জ। লেখাপড়া জানেন। অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ, ডিক্সনারী ঘেঁটে দারুণ দারুণ সব ইংরেজী শব্দ মুখস্থ করেছেন। কুলি-কামিনকে ইংরেজী ও হিন্দীতে গালাগাল দেন। বাংলা ভাষার গালমন্দতে নাকি তেমন তাগদ নেই। কুলি-কামিনদের মোটা চামড়া। বাংলা গালটাকে তারা ঝাল-মিষ্টির মত মনে করে।

সাহেবদের লম্বা সেলাম করে গুড মর্নিং বলেন। চিঠি-পত্রের শেষে ইয়োর ভেরি ওবিডিয়েন্ট সারভেন্ট স্যার লিখে দস্তখৎ করেন। এমন একটা গুণী ব্যক্তিকে বাবু বললে তার মর্যাদা ছোট করা হয়। সেজন্য বারকুলি সাহেব বলেন—হাবু সাহেব।

তিনি এখন সালুঞ্চী খাদের গুমটি ঘরে রাগে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছেন। বাইরে ভীষণ ঝড় ও শিলাবৃষ্টি হচ্ছে। সাকুল্যে সতেরোটি মালকাটা রাতপালিতে হাজরি লিখিয়েছে। তাই তার এত রাগ। চাপরাশীদের তুলোধুনো করে ছেড়েছেন। দুজন চাপরাশী ঐ ঝড়-বৃষ্টি মাথায় করে হাবু সাহেবের লাঠি নিয়ে ধাওড়ায় ধাওড়ায় খবর দিতে গেছে।

কুলি ধাওড়ায় হাবু সাহেবের লাঠি ঘোরানোর অর্থ অবিলম্বে সরদার সহ যেন সব কুলি-কামিন কাজে হাজির হয়।

জনকয়েক কুলি-কামিন নিয়ে রাসমণি হাজির হল আধঘণ্টা পর। হাবু সাহেব ওকে সম্বোধন করলেন ফাকিন হোর বলে। তারপর যা-যা বললেন তাতে রাসমণির চোদ্দগুষ্টির শ্রাদ্ধ হল।

রাসমণি রাগ করল না। মিষ্টি হেসে বলল—তুই ক্ষেপছিস ক্যেনে সাহেব? ঝড় জল থামতে দে আমার কুম্ভু কুলি-কামিন নাগা করবেক নাই

এ্যই চাপরাশী —শ্যালা, বেইমান, নিমকহারাম। আমার বাত্তি নিএে ধাওড়ায় যা। সব শ্যালাকে ধরে আন।

চাপরাশী ছুটল বাতি নিয়ে। এটা আলটিমেটাম। এরপর চাপরাশী যাবে টুপি নিয়ে। ব্যস সেকেণ্ড আলটিমেটাম। এরপর কার বাপের সাধ্যি যে হাজিরা ঘরে এসে হাজির না হয়। ঐ টুপি কবরেব উপর চড়িয়ে দিলে সেই কঙ্কাল নাকি হাঁটতে হাঁটতে খাদে গিয়ে কয়লা কাটবে। এত তার ক্ষমতা !

এর কারণ কি ? কামাই তো মানুষের হর হামেশাই হতে পারে। রোজদিন কি কাজ করতে পাবে ?

কিন্তু সে কথা শুনলে সাহেবদের চলে না। ওদের লোক চাই, হাজিরা চাই, রেজিং চাই। সাহেবের লাঠি, বাতি, টুপির ধাওড়া পরিক্রমা মানে অনড়, অটল আদেশ। এর অমান্য চলে না। তাহলে চাবুকের চোটে পিঠের ছাল ছুলে যাবে। গাঁঠে গাঁঠে লাঠির ঘায়ে হাড় কন্ কন বেদনা ধরবে। পাওনা থোওনা বাজেয়াপ্ত হবে। মেয়ে বৌ কেড়ে নিয়ে নিলাম করে দেওয়া হবে।

এসবের হিসেব তিনি নোটবুকে লিখে রাখেন। সপ্তাহে কোন ধাওড়ায় কতবাব লাঠি, বাতি, টুপি গেছে। যার ধাওড়ায যতবার যাবে সেই ধাওড়ার সরদারের তত বেইজ্জত।

রাসমণি হিসেব দিল—সায়েব ! দিনপালিতে আমার তিন কুড়ি কুলিকামিন কাজে গেইছিল। বাত পালিতে সালুঞ্চি খাদে এককুড়ি পাঁচজনের মধ্যে পনেরজন এসেছে। বাকিগুলান এসে যাবেক। শেরগড়খাদে গেইছে এককুড়ি ছজন। হাটনলে ছু' কম এককুড়ি। এ কত হল গ্যাখ হিসাব করে।

উনি ঝন্ ঝন্ করে বললেন —আমাকে হিসাব শিখাস না রাসমণি। আটকুড়ি কুলি কামিন আছে তুর। তিন তিনটা ধাওড়া। আর কাজের বেলায় কোনদিন পাঁচকুড়ি কোনদিন ছ'কুড়ি। বাকি লোকগুলো কি করছে ? তুর বিটিদের পেটে ছ্যেলা আজ্ঞাছে ?

—অমন কথা বলিস না সায়েব। আমার পেটের ছ্যেলারা তুর কি ছুষ করলেক ? যা বলবি আমাকেই বল।

—এ্যাঃ শালী গ্যাকা। সব কথা বারকুলি সাহেবকে বলে দিব।

—হেই সায়েব। তুর পায়ে পড়ি। অমন কাজটি করিস না। আমি অখনি যেছি বেবাক কুলি-কামিন তুর কাছে হাজির করছি।

হাবু সাহেব আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু আর এক মুরগা তখন ঝট্‌পট্ করে ফাঁদে এসে পড়ল। সে কোঁড়া পাড়ার মাধু কোঁড়া। কোল, ভিল, কোঁড়া নিয়ে শতখানেক কুলি-কামিনের সরদার। তিনটি খাদেই কাজ করে। হাবু সাহেব ওকে নিয়ে পড়লেন।

ততক্ষণে মুণ্ডাদের সরদার চৈতু মুণ্ডাও এসে হাজির। ওর লোকজন কম। সাকুল্যে গোটা তিরিশেক। সালুঞ্চী খাদেই কাজ করে।

নবা বাউরী টালোয়ান সরদার। মদ খেয়ে লট্‌পট্ করে জোড় হাতে দাঁড়াল। হাবু সাহেব ওর পিঠে লাঠি বসিয়ে বললেন—শ্যালা, নবাবকা বাচ্চা! কোন হারেমে দারু খাচ্ছিলেন? এতেই হবে নাকি আরো কড়া দাওয়াই দিতে হবে।

নবা বলল—হুজুর। আমার টালোয়ান। তৈয়ার। কিন্তুক ঝড়্জলে গাড়ি ঝাড়াই করবেক কি করে?

—ওরে শ্যালা—লাটের বাঁট। তোর টালোয়ানদের চামড়া তো নয় —যেন মাখন।

—এত ডাগর ডাগর পাথর পড়ছিল হুজুর।

—এমনি করে। হাবু সাহেবের লাঠিটা ঠায় করে ওর মাথায় পড়ল।

সেটা উনবিংশ শতাব্দীর শেষ অধ্যায়। সিপাহী বিদ্রোহ হয়ে গেছে। সাঁওতালদের হুলমাল (বিদ্রোহ) থেমে গেছে। তারা দামিনী-কো-এলাকা থেকে ছড়িয়ে পড়েছে। অনেকেই বাসা বেঁধেছে কোলিয়ারি অঞ্চলে। সাহেব কোম্পানিরা তাদের বসত করে দিয়েছেন। ধারে পাশে মদের দোকান খুলে দিয়েছেন। নতুন হাটের পত্তন করেছেন। পুরাতন হাটগুলি আরো জম জমাট করতে টিনের চালা বানিয়ে দিয়েছেন।

শিল্প বিপ্লবের ঢেউ এসে লেগেছে। নতুন নতুন কয়লা কুঠি চালু হচ্ছে। রাণীগঞ্জ, সীতারামপুর, আসানসোল দিয়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের ট্রেন চলছে। বড় বড় কোলিয়ারিগুলিতে সাইডিং লাইন পাতা হচ্ছে। ওয়াগনে কয়লা ডেসপ্যাচ হচ্ছে শেরশাহের আমলের গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড মেরামত হচ্ছে। নতুন করে গাছ লাগান হচ্ছে।

কোথাও কোথাও বিজলী বাতি জ্বলছে। অনেক কোম্পানি নিজস্ব পাওয়ার হাউস বসাচ্ছেন বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য। ষ্টিম ইঞ্জিনে ডুলি চলছে, হলেজ চলছে, পাম্প চলছে।

মানে বেশ একটা সাজ সাজ রব। কয়লার চাহিদা বাড়ছে। দর উঠছে। কোল রাশ ক্রমশ অধিকার করে নিচ্ছে শান্ত সুন্দর গ্রামগুলি। ধূলি ধোঁয়া ও আবিলতায় ছেয়ে যাচ্ছে মানুষের জীবন।

॥ চার ॥

ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত সাহেব বাংলো, বাবু কোয়ার্টার, চাপরাশী পাড়া কুলি ধাওড়া, সাঁওতাল পল্লী। সব ছড়ানো ছিটানো। কারো সঙ্গে কারো মিল নেই। যোগাযোগও নেই। আপন আপন গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ।

চৈতু মুণ্ডা, মুণ্ডা কুলি-কামিনদের সরদার: তাদের জন্য একটা ধাওড়া। নাম মুণ্ডা ধাওড়া। ভূমির উপর ত্রিভুজ রচনা করে এক-একটি খড়ের ঘর। লম্বায় দশফুট চওড়ায় সাত ফুট। গুঁড়ি মেরে ঢুকতে হয়। তার মধ্যেই তাদের ঘর গৃহস্থালীর সাজ-সরঞ্জাম।

চাপরাশীদের ডেরা ডাণ্ডা ভিন্ন প্রকৃতির। লম্বা ঘর। মাঝে পার্টিশন। এক এক ঘরে অনেকজন একসঙ্গে থাকে। তাদের ঘরের সামনেই চালা। গরু মোষের খাটাল। গোবরের দুর্গন্ধ। খড় ও খইলের জাবনা, পচা মাছি ভনভনে্ পাৎনা। চাকরির সঙ্গে দুধের কারবার।

কোঁড়া, ধাঙ্গড়, বাউরী, মুচিদের ধাওড়ায় মাটির দেওয়াল। খড়ের ছাউনি। ঘরের সামনে উনুন। ছাইগাদা। শামুক-গুগ্‌লির খুলি। উদোম্-আদুল গু-গোবর, লালা, কফ মাখা ছেলেমেয়েদের নিত্য কান্না, কলহ ও বিবাদের আসর।

সে তুলনায় সাঁওতালরা অনেক পরিচ্ছন্ন। কোলিয়ারি থেকে মাইল খানেক দূরে তিনটি পল্লী—সিদাবাড়ি, ছাতাবড়া, মৌল পাহাড়ি। ওদেরও ঘর দুয়ারে মাটির দেওয়াল, খড়ের ছাউনি।

শালপাতার ছবি। যেমন শিলাস্তরে ফসিল। ঝকঝকে তক্‌তকে উঠোন। গাঁদাফুলের গন্ধ। খামারে অজস্র ফুলগাছ।

তিনটি পাড়াতে তিনটি বোঙার থান। রাস্তার ধারে উঁচু করে তবে সারিবদ্ধ। গোবর, খড়িমাটি দিয়ে নিকানো দেওয়ালে নিমপাতা, বাঁধা মাটির ঢিবির উপর একটা খুঁটি পোঁতা। সিঁদুর দিয়ে লেপা।

তার মধ্যে সিদাবাড়ি সবচেয়ে বড়। এখানেই থাকে রাসমণি। একশো ষাটজন সাঁওতাল কুলি-কামিনের সরদারনী। তার এখন চলতির সময়। দিনে একহাঁড়া মদের খরচ। হরদম লোকজনের আনাগোনা। বাবু, গোমস্তা, চাপরাশী, কুলি-কামিন হামেশা তার ঘরে আসে। তামাক খায়, মদ খায়। আমোদ আহ্লাদ করে।

তার বাপ লুলুবড়কা ছিল সিধু-কানুর সৈনিক। একটা পা বাঁকা। লাফ দিয়ে দিয়ে চলত। তাতেই তার তেজ কত। গোরা পল্টনদের সঙ্গে তীর ধনুক নিয়ে লড়াই করতে গিয়েছিল সেই হুলমালের বছর। তীরের নিশানা ছিল নিখুঁত। বাঁকা পায়ের হাঁটুতে ভর দিয়ে এক তীরে ফেলে দিতে পারত বাঘ, ভালুক, মানুষ।

সাঁইথিয়ার লড়াইয়ে ময়ুরাক্ষীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল গোরা পল্টনের গুলি খেয়ে। জ্ঞান ও অজ্ঞানের মাঝামাঝি একটা অবস্থায় ভাসতে ভাসতে একসময় পায়ের নীচে মাটি খুঁজে পেয়েছিল! জামতাড়া সিদাবাড়িতে তার ঘর। কতদূর রাস্তা, কোন পথে যাবে, কি করে যাবে তাও জানে না। কতদিন লেগে গেল সেই পথটুকু পেরুতে! অবশেষে যখন সিদাবাড়িতে পৌঁছল তখন সেখানে শুধু ছাই। ঘরবাড়ি পুড়ে ছারখার। গোটা গ্রাম খাঁ-খাঁ করছে। গাছের কাঁচা ডালগুলো পর্যন্ত আগুনের তাপে ঝলসে গেছে। জনপ্রাণী নেই। মায় একটা কুকুর পর্যন্ত ডেকে উঠল না। চারিদিক থেকে বাতাসে ভেসে আসছে হাহাকার। ইতস্তত দু-চারটে কঙ্কাল। চাপ চাপ অন্ধকার। ভয়ে গা ছম ছম করে।

তবু সেখানে দাঁড়াবার জো নেই। পুলিস মিলিটারীর ঘোড়া দৌড়চ্ছে খট খট করে। সাঁওতাল দেখলেই হল। ধরে নিয়ে গিয়ে আগাপাস্তালা ধোলাই করে দুমকা জেলে পুরে দিচ্ছে।

লুলুবড়কার বুকের কান্না বুকেই শুকিয়ে গেল। নিজের বৌ ছেলেমেয়েরা যে কে কোথায় তার কোন হদিশ পেল না।

ওর বৌ চুণি মিঝান বিশ বছরের এক সাঁওতালী যুবতী দু'বছরের একটি ছেলে ও তিনমাসের একটি মেয়েকে নিয়ে আরো জনকয়েক মাঝি মিঝানের সঙ্গে মিহিজাম, কল্যাণেশ্বরী, বরাকর, ডিসেরগড় হয়ে পঞ্চকোট পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছিল। ওরা আলহগল ভেঙ্গে রাত্রে পথ চলত। কদাচ গাড়ির রাস্তায় যেত না। ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ পেলে কালো শরীর কালো অন্ধকারের বুকে লুকিয়ে ফেলত। পাছে বাচ্চা-কাচ্চার কান্নায় লোকে বুঝতে পারে সেজন্য তাদের মুখে কাপড় বেঁধে দিত। খেত বনের কচু, গাছের পাতা, বনকুল, সিঁয়াকুল। দিনের বেলায় বনে জঙ্গলে লুকিয়ে থাকত। এই ভাবে পাঞ্চেতে এসে পাথর চালের আড়ালে ডালপালা দিয়ে ঘর বাঁধল। জন দশ-বারো মেয়ে পুরুষ তাদের ছেলেপুলেদিকে নিয়ে অতি সঙ্গোপনে বাস করতে লাগল।

হুলমাল থেমে গেল শীতকালে। সাঁওতালরা লোকালয়ে আসতে পেল। তারা তখন ঘরবাড়ি আত্মীয়-স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন। কে কোথায় মরে হারিয়ে গেছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই; কত যে রোগে ভুগে, অনাহারে মরেছে তারও হিসেব নেই। যারা বেঁচে আছে তারাও মৃতপ্রায়। কত লোক গুলি খেয়ে গহলে খঁবড়ে বেড়াচ্ছে। কত রোগ-ব্যাধির শিকার হয়েছে। ধন-সম্পদ ছাগল, গরু, ভেড়া, জমি-জায়গা, ঘরবাড়ি সব তো তছনছ। বছরখানেক কেউ পেট ভরে খেতে পর্যন্ত পায় নি। সে যে কি অসীম দুঃখ যন্ত্রণা তার পরিমাপ নেই।

লুলুবড়কা পাগলের মত খুঁজতে খুঁজতে একবছর পর ডিসের-গড়ের ঘাটে এসে পৌঁছাল। প্রায় মরতে বসেছে এখন। একে জন্ম থেকে বাঁকা পা। তায় আবার অন্য পা-টিতে চোট খেয়ে পঙ্গু হয়ে পড়েছিল। লাঠিতে ভর দিয়ে হাঁটত। শিকড়-বাকড় বেঁটে ঘষে লাগিয়ে ঘা-টা একবার শুকিয়েছিল। আবাব তা তড়পে উঠেছে। এখন সেটা বিষাক্ত ঘা। কোন রকমে ডিসেরগড়ের ঘাটে এসে মুখ থুবড়ে পড়েছে। তার মনে তখন একটিই কামনা—হে মারাং বোঙা, দামোদরের কিনারে যখন নিঞে এসেছিস তখন যেমন ঈ-খানেই মরি।

একদল সাঁওতাল মেয়ে ডিসেরগড়ের হাটে শালপাতা, নিমদাঁতন বিক্রি করতে যাচ্ছিল। নদীর ঘাটে নৌকা থেকে নেমে আপন আপন বোঝা তুলছিল। লুলুবড়কা বলল—তুরা কুথাকার? কুন গাঁয়ে ঘর?

একজন বলল আমাদের কি গাঁ ঘর আছে যে তুকে বলব? দুই পাঁচুতা পাহাড়ে থাকি। শালপাতা, নিমদাঁতন বিচে পেট চালাই। তুঁই কুথা থিকে এসেছিস তাই বল।

ও বলল—এমি জামতাড়ার কাছে সিদাবাড়ির লুলুবড়কা। হুল-মালের লেগে আমার ছ্যেলা হারাঞে গেইছে। তুরা কেউ জানিস?

সেই মিঝানটি বলল সিদাবাড়ির জনকতক দুই পাহাড়ে থাকে। উয়ারাও আমাদের মতন শালপাতা, নিমদাঁতন নিঞে হাটে আসে। তুই ত চলতে লারবি। ঈ-খেনেই থাক। যদি হাটে চলে গেইছে ত আমরা যেঞে বলছি গা। যদি না গেইছে তবে পেছুতে আসবেক। সিদা-বাড়ির কাহুকে না কাহুকে জরুর পাবি।

লুলুবড়কার বৌ চুণি মিঝান। ভোরবেলাতেই হাটে এসেছিল। ঐ হাটুরে মেয়েগুলির কাছে খবর পেল সিদাবাড়ির লুলুবড়কা ডিসেরগড়ের ঘাটে পড়ে আছে।

ওর বুকটা ধড়াস করে উঠল। সওদা বেসাতি নিজের দলের এক-জনকে বুঝিয়ে দিয়ে ছুটতে ছুটতে এল। ঘাটের কাছে বড় বড় পাথর চাতাল। তাতে পিঠ দিয়ে বসে হাঁ করে তাকিয়ে আছে লুলুবড়কা। চুণি ব্যাকুল কণ্ঠে ডাক দিল—মা-ঝি-

—আয়! তুর লেগে জীবনটি আছে। ভাল আছিস ত?

—মাঝি—ঈ তুর কি দশা মাঝি?

চুণি মিঝানের আর্ত জিজ্ঞাসা দিগন্তের বুক থেকে প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে এল। দূরে পঞ্চকোট পাহাড়ের মাথায় পেঁজা তুলোর মত মেঘের রাশি বিদীর্ণ হয়ে একটা মস্ত বড় জিজ্ঞাসার চিহ্নের মত বিদ্যুৎ চমকাল। মেঘ ডাকল গুড়গুড় শব্দে। সেই মন্দ্রিত মেঘের ধ্বনিতে সাঁওতাল বিদ্রোহের ব্যর্থ হাহাকার দিক্-দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ল।

লুলুবড়কা গভীর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল—বেঁচে আছি তুকে দেখব বলে। গিদরা পিদরা (ছেলেপুলে) গুলান আছে ত?

—মাঝি—কেঁদে ফেলল চুণি। পাথর চাতালে উবু হয়ে বসল। ওর মাথার চুলগুলো মুখে এসে পড়ল। মুখটা বিকৃত হয়ে গেল।

—কানছিস্ ক্যেনে? বললি নাই ছ্যেলাপুলাগুলানের কথা?

—কি বলব মাঝি? কপাল ভেঙে গেইছে। ঠায় ঠায় করে কপাল ঠুকে ডুকরে কেঁদে উঠল। খেয়াঘাটে কত লোক আসাযাওয়া করছে। কেউ ওদের দিকে তাকিয়ে দেখল না। কেউ খবর নিল না কেন এই বুকফাটা কান্না।

লুলুবড়কার ভিতরটা হু-হু করে উঠল। বন্দুক, গুলি, গোরা পল্টন, রক্ত, মৃতদেহ. ময়ূরাক্ষীর বন্যা, বিষাক্ত ঘায়ের যন্ত্রণা, অনাহার, মরণদশা —এতসবেও যার চোখ দিয়ে দু-ফোঁটা জল পড়েনি তার বুক ফেটে কান্না বেরিয়ে এল।

হাত বাড়িয়ে চুণির মুখের চুলগুলো সরিয়ে দিয়ে বলল—বল কি হঞেছে বল? আমি থির থাকতে লারছি।

চুণি নিজেকে সামলে নিয়ে বলল—ব্যাটাটি মরে গেইছে মাঝি।

—আঁ! কেমন একটা অস্ফুট গোঙানির মত শব্দ করল ও। চোখের কোণে যে দু ফোঁটা জল জমেছিল তা হাতের চাটু দিয়ে মুছে বলল—মরে গেল। আমার হপন ব্যাটা মরে গেল। কি করে মল? খেতে পাই নাই? না খেঞেই মরে গেল?

—না-না। আমি আঁৎ কলজা শুকাঞে উয়ার মুখে ভাত দিঞে-ছিলম। কিন্তুক কপাল—দুখ ভিখ করে সারাদিনের খাটালিতে এলে গেইছিলম মাঝি। রেতেরবেলায় ঘুমাছিলম। ছুটুটি বুকের দুধ চুষছিল। বেটাটি তফাতে সরে গেইছিল। তখন হুড়ালে তুলে নিঞে পালাল। ছ্যেলাটি বড় চেঁচাঞেছিল। আমিও চেঁচালাম। মাঝিগুলান উঠল। জগু হুড়ালটিকে তেড়ে নিঞে গেল। কিন্তুক কি হবেক মাঝি? কেউ ঘুরাতে লেলেক। হুড়ালের পেটকেই ছ্যেলাটি আমার চলে গেল।

চুণি মিঝানের বুক-ভাসা কান্নায় লুলুবড়কা ভেসে গেল। কপালে করাঘাত করে বলল—হে মারাং বোঙা! ঈ কি করলি হে?

দীর্ঘ সংগ্রাম, রোগব্যাধি, আঘাত, সংঘাত, দারিদ্র্য, অনাহার, শোক-দুঃখের বিশাল পারাবার পার হয়ে স্বামী-স্ত্রীর সেই মিলন ডিসেরগড় ঘাটের বালুকণাগুলিকেও অশ্রুপ্লাবিত করে তুলল। শুধু

কান্না আর কান্না। পঙ্গু স্বামীকে তুলে নিয়ে যাবার জন্য চুণি মিঝানের অমানুষিক পরিশ্রম।

মহাকালের ঘোড়া টগবগ করে ছুটে যাচ্ছে জি টি রোডের উপর দিয়ে। তার পিছনে লাল ধুলোর মেঘ। সামনে আঁকাবাঁকা বোল্ডার ওঠা পথ। মাঝে মাঝে গাছগালায় ঘেরা ছোট ছোট গ্রাম। বনজঙ্গল, ধানের মাঠ, পোড়া ভিটে, কয়লার গাদা, সিঁড়ি খাদের মুখ, চাণক খাদের হেড গিয়ার. ইঁটের চিমনি, ঝুপড়ি ঘর, আগুনের ধোঁয়া, ঘোড়ার আস্তাবল, কালো কালো কুলি-কামিন।

ছোটনাগপুর মালভূমির প্রান্তসীমায় রাঢ় বাংলার লাল মাটির উপর নতুন সভ্যতার ভিত্তি স্থাপিত হচ্ছে মাতা ধরিত্রীর গর্ভাশয় বিদীর্ণ করে। নতুন মধুচক্রের সন্ধানে ছুটে আসছে নতুন মানুষ। পুরাতনকে অতীতের গর্ভে ঠেলে দিয়ে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে নতুন সমাজ. শিল্প বিপ্লবের দামামা বাজছে নগরে বন্দরে, ভুঁইফোড় জনপদে, গ্রামে-গঞ্জে, কয়লাকুঠি, কল-কারখানায়। কালো কালো কয়লা পুড়িয়ে প্রতিনিয়ত উৎপন্ন করছে লক্ষ লক্ষ অশ্বশক্তির বাষ্প।

মাঝরাত পার হয়ে গেল। আকাশের চাঁদ ডুবে গেল। চরাচর অন্ধকারে ছেয়ে গেল। চুণির বুক ছম ছম করছে। হুড়ালের ভয়ে রক্ত জল হয়ে যাচ্ছে। ঘায়ের তাড়সে লুলুবড়কার জ্বর এসে গেছে। পাহাড়ের ঢালে এসে এলিয়ে পড়েছে।

চুণি মাথা ঠুকছে—হে মারাং বোঙা সিন্‌চাঁদা, এতদিন পরে মরদকে যখন কাছে এনে দিলি তখন এমন দশা করলি ক্যেনে ?

জগু মাঝি এল জনকয়েক সাঁওতাল ছোকরা ও একটা খাটিয়া নিয়ে। লুলুবড়কাকে তুলে নিয়ে গেল। শেষ হল লুলুবড়কা ও চুণি মিঝানের জীবনের এক দারুণ সংগ্রামের অধ্যায়।

ওদের জানবুড়া শিকড়-বাকড় বেঁটে ঘষে লাগিয়ে বিষাক্ত ঘা সারিয়ে তুলল। তারপর বিশ-বাইশ বছর যাবৎ জীবন কাটাল পাহাড়ের কাঠ কেটে, শালপাতা ও নিমদাঁতন বিক্রি করে। চাষের সময় জনমজুরের কাজ পেত। ছাগল ভেড়া পুষত। বনকাটাইয়ের

সময় পেট পুরে খেতে পেত। তারই মধ্যে বংশবৃদ্ধি। ছেলেমেয়েরা বড় হল। তাদেরই একজন রাসমণি মিঝান।

যে ছিল তিনমাসের শিশু, মায়ের বুক লেপটে থাকত সেই হল ভরা যুবতী। এখন তারও বুকে লেপটে থাকে অমনি একটি মেয়ে। কিন্তু কি পাপ শিল্প বিপ্লবের! তারও সংসার ছারখার হয়ে গেল। স্বপ্নের কুঁড়ি ফুটতে না ফুটতেই হারিয়ে গেল সভ্যতার অভিশাপে।

॥ পাঁচ ॥

আজকের তুর্দান্ত ঘোড়সওয়ার, শ্রমিকের রক্ত হিম করা ম্যানেজার বারকুলি সাহেব তখন ছিলেন বিলকুল নাদান ছোকরা। টগবগে তাজা ঘোড়ার মত চালচলন। বাংলা হিন্দি কিছুই বোঝেন না। কোম্পানিও তাকে সময় দিলে না। সালুঞ্চী ডেভলপমেণ্টের কাজ দিয়ে দিল। মাথা গুঁজবার ঠাঁই নেই। তাঁবুর ভিতর বসবাস। সঙ্গী বলতে বোরিং মাস্টার আবতুল হালিম। সার্ভেয়ার সত্যবাবু ডাক পেলে আসেন। না হলে শেরগড় কলিয়ারিতে কাজ করেন। বাকি সব বোরিং ক্রিউ।

আবতুল ভাল মাংস রান্না করতে জানত। বাবুর্চির কাজে অতি দক্ষ। আবার তার চেয়েও বেশি দক্ষতা মাটি ও মেয়ে চেনায়। ও যে কি করে জানত এই মেয়েটিকে টোপ দিলেই গিলবে তা ওই জানে। আবার মাটি, পাথর যা কিছু বোরিংয়ে উঠত তাই দেখে বলে দিত এটা খুরুব পাথর, এটা বালি পাথর, এটা শেল, এটা ফায়ার ক্লে, এইটা কয়লা। বোরিংয়ে কয়লা লাগবার তু-এক-দিন আগেই বলে দিত—সাহেব! ইয়ার পরেই কয়লা পাবেন।

সেই আবতুল হালিম তার সার্ভেণ্ট কাম গার্জেন।

মিঃ মুর তখন শেরগড় কোল কোম্পানির চিফ মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার। মিঃ ব্যারাকলউকে সালুঞ্চীতে পোষ্টিং করার পর একবার দেখতে এসেছিলেন। সঙ্গে জমিনদারী ডিপার্টমেণ্টের হেড। সত্যবাবু নকশা

নিয়ে হাজির। ডঃ ফক্সের রিপোর্ট মোতাবেক বোরিং করাচ্ছেন কয়লা স্তরের বিবরণ জানবার জন্য।

মিঃ মুর বললেন—কয়লাস্তর নিশ্চয় পাবেন। কিন্তু কোথায় চাণক, কোথায় ইনক্লাইন হবে তা স্থির করার জন্যই বোরিং করতে হবে। সত্যবাবু আপনি নকশার উপর ঠিকঠাক দাগ করে রাখবেন বোরিং নম্বর দিয়ে। মিঃ ব্যারাকলউ আপনি বোরিংয়ে কয়লাস্তর পাবার পরই ইনক্লাইন কাটাইয়ের কাজ শুরু করে দেবেন। জমি-জায়গার যা প্রয়োজন হবে তা জমিনদারী ডিপার্টমেণ্টে জানাবেন।

ওঁরা তো বলে গেলেন। মিঃ বারাকলউয়ের দিন কাটে তো রাত কাটে না। চারিদিকে রুখু ডাঙ্গা। বর্ষা নেমেছে দিন কয়েক আগে। তাই মাঠঘাটের শ্রী ফিরেছে। সবুজ ঘাসে ছেয়ে গেছে।

ওঁর তাঁবুটা বেশ বড়সড়। তার থেকে খানিক দূরে আবদুল হালিমের তাঁবু। ও থাকে জনকয়েক ক্রিউ নিয়ে। বাকি লোকরা গ্রাম থেকে আসে মজুরের কাজ করতে।

ভোর না হতেই আবদুলের ব্যস্ততা। লোকজন ডেকে কাজে লাগিয়ে দেওয়া। বোরিং স্যাম্পেলগুলি যত্ন করে রাখা ও হেড অফিসে পাঠান। ওখানে একজন জিওলজিস্ট আছেন। তিনি রোজ একবার করে আসেন। বোরিংয়ের নমুনা দেখেন, রিপোর্ট লেখেন, আবার কোথায় বোরিং করতে হবে তার স্থান নির্দেশ করেন। সত্যবাবু সেইমত মাপজোক করে নকশা তৈরি করেন।

এর মধ্যে মিঃ ব্যারাকলউ নিজের কোন কাজ খুঁজে পান না। মনে করেন তিনিই একজন ম্যানেজার উইদাউট কলিয়ারি। বড় বিরক্ত হন।

গাছতলায় বসে বোরিং দেখেন।

ওঁকে দেখে বোরিং মজদুরদের তৎপরতা বেড়ে যায়। আবদুল হামিদ ছড়া কাটে—টপ্ টপা টপ্ ঝিঙার বীচ।

মজদুররা বলে হেঁইও!

ঝিঙা গেল বাপের বাড়ি

—হেঁইও!

পরে গেল ঢাকাই শাড়ি।

- হেঁইও !

ঢাকাই শাড়ি পরে ঝিঙা।

—হেঁইও !

করতে গেল নোতুন স্যাঙা।

—হেঁইও !

ছড়ার তালে তালে বোবিং রড ওঠা নামা করে। সাহেবের দেখতে খুব ভাল লাগে। ছড়ার সুরে মজা পান। আবদুল হালিমকে জিজ্ঞাসা করেন—হু ইজ ঝিঙা মিঃ হালিম ?

আবদুল সাহেবদের কাছে কাজ করে চুল পাকাল। সেও থোড়া বহুত ইংরেজি বোঝে। বলল—ঝিঙা-এ উওম্যান স্যার। যুবতী লেডি।

—মাই গড ! যুবতী লেডির নামে ছড়া কাটছ ? তার মানে তোমার লোকদিকে যুবতীর লোভ দেখিয়ে ইনস্‌পায়ার করতে চাইছ তো ?

—ইয়েস স্যার।

—বাঃ বাঃ ভেরী গুড !

আবদুল হালিম ওইটুকুতেই গলে গেল। সেইদিন আকাশ ভাঙা ঝড়জলের বেলা ডুবু-ডুবু সন্ধ্যায় এক বোতল মহুয়া, একবাটি ভেড়ার মাংস ও একটি যুবতী লেডিকে ওঁর তাঁবুতে ঢুকিয়ে দিয়ে বলল—এনজয় স্যার।

বারকুলি সাহেব সেই প্রথম ভারতীয় রমণীতে উপগত হলেন। পরবর্তী অধ্যায়ে যা না হলে তাঁর নেশা জমত না তাই প্রথম রজনীতে মনে হয়েছিল ন্যক্কারজনক। মোষ্ট সিলি ম্যাটারস্‌। অথচ রিজেক্ট করতেও পারেন নি। জৈবিক প্রয়োজনে প্রেম ও পরিণয়ের অলিখিত শর্তের উপর সংশোধনী আরোপ করে নিজের মনকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। সেই যে বিবাহ বাসরে শপথ গ্রহণ করেছিলেন—আমরা পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকব—তা এই যৌন ক্রিয়ার দ্বারা লঙ্ঘিত হল কি না এ নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছিল। পরে অবশ্য সে ধারণা চলে যায়। এখন আর পাঁচটা সাহেবের মত তিনিও ব্যাখ্যা করেন—নারীদেহ ভোগ্যপণ্য, মাছ, মাংস, মদের মতই এসেনসিয়াল কমোডিটি।

সেটা ১৮৮০ সালের কথা।

কারডিক মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কোর্স শেষ করে ডন কাষ্টারের একটা কলিয়ারিতে হাতে কলমে কাজ শিখছেন। খুব চৌকস ছোকরা। রেসে, ক্লাবে, সুইমিং পুলে, ক্রিকেট প্যাভিলিয়নে ও মঞ্চের উজ্জ্বল তারকা। কত গার্ল ফ্রেণ্ড ডেট পাবার জন্য হন্যে। অথচ ওঁর স্বপ্নের জগৎ আচ্ছন্ন করে রেখেছে মিস্ ইসাবেলা ব্রাউন। ওর বাবা বিরাট বড়লোক। দেশ বিদেশে নানা রকম বাণিজ্য। অথচ ছেলে নেই।

একদিন মিঃ ব্যারাকলউ ওদের কাউন্টি ক্রিকেট ম্যাচে সেঞ্চুরী করে সহস্র করতালিতে অভিনন্দিত হলেন। প্যাভিলিয়নে ফিরতে না ফিরতেই ইসাবেলা ছুটে এসে কিস্ করলেন। মিঃ ব্যারাকলউ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলেন। নিজেকে ধন্য মনে করলেন।

তারপর ইসাবেলা ওঁকে তাঁর বাবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। ব্রাউন পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটল। এখন মিঃ জন পিটার নামে একজন ভারতের একটা কোল কোম্পানিতে চীফ মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। ব্রাউন পরিবারের বন্ধু। ছুটি কাটাতে দেশে এসেছেন।

উনি অফার দিলেন—মাই বয়। ভবিষ্যৎ যদি তৈরী করতে চাও তবে ভারতবর্ষে চল। ওখানে প্রচুর কয়লা। কোম্পানিরা তোমাকে রাজার হালে রাখবে। যে বেতন ও সুখ সুবিধা পাবে তা এখানে স্বপ্নেও ভাবতে পারবে না। দশ বছরের মধ্যে আমার মত চীফ হয়ে উঠবে। তুমি যদি সেরকম এলেমদার হও পয়সা কড়ি রোজগার করতে পার এমনকি কলিয়ারির মালিক পর্যন্ত হয়ে যেতে পার।

নিঃসন্দেহে লোভনীয় অফার। নোকর থেকে মালিক হবার সম্ভাবনা কোন্ উচ্চাকাঙ্খী পুরুষ ছেড়ে দিতে পারে? কথাটা বললেন ইসাবেলাকে। উনি বললেন তাঁর বাবাকে।

মিঃ ব্রাউন ব্যবসাদার মানুষ। তাঁর হবু জামাই যদি ভারতবর্ষে গিয়ে বাণিজ্যবিস্তার করতে পারে মন্দ কী? আর কে না জানে ভারতে যাঁরা গেছেন তাঁরা দু'হাতে ধন-সম্পদ উপার্জন করে দেশে ফিরেছেন। কাজেই এতবড় লোভের হাতছানি ছাড়তে রাজি নন।

বললেন—ইয়েস মাই বয়। ভারতে যাও। তবে শুধু চাকরি করার

জন্য নয়। ওখানে গিয়ে নিজস্ব কলিয়ারি করবে। আমি ফাইন্যান্স দেব। কিন্তু ইসাবেলাকে বিয়ে করে যাও।

বিয়ে হয়ে গেল। মাস ছয়েক যাবৎ হনিমুন করে ছ্যা শেরগড় কোল কোম্পানির সঙ্গে পাঁচ বছর চাকরি করার এগ্রিমেণ্ট দিয়ে তাদের খরচেই ভারতবর্ষে এলেন।

জাহাজে বিদায় দিতে এসে মিসেস ব্যারাকলউয়ের সে কি কান্না! বললেন—আমাদের ফার্ষ্ট চাইল্ডের দিব্যি রইল তুমি যদি অন্য কোন মেয়েকে বিয়ে কর তবে সুইসাইড করব।

ওঃ কি সাংঘাতিক দিব্যি! উনি তখন অন্তঃসত্ত্বা! এমন দিব্যি দিলেন যে মিঃ ব্যারাকলউ হাতে পায়ে বন্দী হয়ে গেলেন।

তারপর থেকে তিনি তাঁর স্ত্রীর প্রতি বিশ্বস্ত। অন্য কোন মেয়েকে ভালোবাসেন নি। বিয়ে তো নয়ই। তবে একটা বিবি বাথান সৃষ্টি করে ফেলেছেন। এরা তো সব পুনর্বাসিতা রমণী। তাছাড়া কত যে ক্যাজুয়েল মেম্বার তার সংখ্যা নেই।

সে তো তাঁর দশ বছর চাকরির ফসল। কিন্তু সেই প্রথম রজনীর রমণীটি ছিল যত উত্তেজিত তত ভালগার।

তখন বর্ষাকাল। সকাল থেকে টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি হচ্ছে। দামোদর নদে গুড় গুড় করে বান ডাকছে। যেন দূরে কোথাও পাথর ভাঙছে। দিনটা ছিল হাসিখুশির। বোরিংয়ে পঞ্চাশ ফুট নিচে কয়লা পাওয়া গেছে। আরদালি মারফৎ সেই খবর হেড অফিসে পাঠিয়ে দিয়ে মদের বোতল খুলে দিয়েছেন।

বিকেলে দারুণ বৃষ্টি। আকাশ কাঁপিয়ে মেঘ ডাকল। কড় কড় করে বাজ পড়ল। তাঁবুর মেঝেতে দু'ইঞ্চি জল জমে গেল! একটা ক্যাম্পখাটের উপর বসে গরুর হাড় চুষতে চুষতে মদ খাচ্ছিলেন।

আবদুল হালিম ঢুকল একটা সাঁওতাল মেয়েকে নিয়ে। ভিজে একসা। পরনে হাঁটুর নিচে পর্যন্ত ঝুল একটা ফ্যানাড়ি আর বুকে গামছা। মাথা ও চুল বেয়ে জল গড়াচ্ছে। সারা গায়ে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম ও জল। ভরন্ত বয়স। ঝিমিয়ে পড়া চাউনি। লম্বা গড়ন। আবলুস কাঠের মত কাল রঙ। যেমন চিকন তেমনি পিছল।

আবদুল হালিম পরিচয় করিয়ে দিল—রাসমণি। সাঁওতাল ট্রাইবেল উওম্যান। ভেরি চারমিং।

অবশ্যই! বন্য সৌন্দর্যের নিউ ভ্যারাইটিজ। মিঃ ব্যারাকলউ অভিভূত বিস্ময়ে তাকিয়ে আছেন ওর অর্দ্ধনগ্ন শরীরটার দিকে।

বললেন- এযে ভিজে গেছে মিঃ হালিম। শুকনো তোয়ালে দিয়ে মুছে দাও এক গ্লাস ব্রাণ্ডি খাওয়াও। মেক হার ওয়ার্ম।

আবদুল বলল—ও আপসে গরম হয়ে যাবে সায়েব।

একটা শুকনো তোয়ালে ও এক বোতল ব্রাণ্ডি বের করে ওর হাতে দিয়ে বলল—রাসমণি সাহেব খুব ভাল লোক। ওর কাছে লজ্জা সরম করিস না। দেখলি তো কত মায়া। তুই ভিজে গেছিস বলে তোয়ালে দিয়ে মুছিয়ে দিতে বলল। ব্রাণ্ডি দিতে বলল। নে গা মোছ। এই ব্রাণ্ডি রইল।

আবদুল চলে গেল। রাসমণি খুব সন্তর্পণে সাহেবের দিকে পিছন করে তোয়ালে দিয়ে গা মুছছিল। সাহেব ওকে যত দেখছিলেন তত উত্তেজিত হয়ে পড়ছিলেন। সহসা টান মেরে খুলে দিলেন পরনের বুকের গামছা। রাসমণি ভয়ে সিঁটিয়ে গেল; তারপর হঠাৎ আঁ-আ করে চিৎকার করতে করতে তাঁবুর মেঝেতে অজ্ঞান হয়ে পড়ল। সাহেব তো অবাক।

ভয় তো সব মেয়ে পায়। কিন্তু এমন তো করে না কেউ। এ কি হিষ্টিরিয়ার পেসেণ্ট নাকি? আবদুল এ কি চিড়িয়া নিয়ে এল? মেঝেতে দু'ইঞ্চি জল। পায়ে পায়ে কাদা হচ্ছে। তবু উনি তাকে তুলে কাঠের তক্তায় শুইয়ে দিলেন। ডাক দিলেন—আবদুল।

রাসমণির জ্ঞান ফিরতেই ভয়ে লজ্জায় কুঁকড়ে গেল। বুকের কাছে হাঁটু ভাঁজ করে বসে তাঁবুর কোণার দিকে আঙ্গুল বাড়িয়ে আবার চিৎকার করে উঠল।

আবদুল এসে পড়েছে। ও সেইদিকে তাকিয়ে বলল—হুজুর! টাইগার!

—হোয়াট! এক লহমায় নেশা ছুটে গেল মিঃ ব্যারাকলউয়ের। বন্দুক হাতে নিয়ে টিপ করলেন। ডিবরী বাতির ঝাপসা আলোতে দুটো চোখ জ্বলতে দেখলেন। ট্রিগার টিপে দিলেন। জন্তুটা মরণ

যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল। লাঠি-সোঁটা নিয়ে বোরিং মজতুররা ছুটে এল। তাঁবুর কোণা থেকে মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতর জন্তুটাকে টেনে বের করল।

আবতুল বলল - হুজুর—এর নাম হুড়াল। হাফ-টাইগার। জলে ভিজে কাহিল হয়ে পড়েছিল। আপনার তাঁবুতে শেল্টার নিতে এসেছিল।

সাহেব বললেন ছা পুওর এ্যানিমেল! ওকে মারা তো ঠিক হল না।

আবতুল বলল—না হুজুর! ঠিক করেছেন। এ ব্যাটা ডেনজারাস এ্যানিমেল। গা শুকোলেই চনমনে হয়ে উঠত। আপনারাও তখন ঘুমিয়ে পড়তেন। সেই সুযোগে গলার শিরা কামড়ে শেষ করে দিত। না কিরে রাসমণি? তুই তো বুনো মেয়ে। বনের জন্তর রীতচরিত্র ভাল জানিস।

আশ্চর্য রমণীর লজ্জা! গুলি, বারুদ, আর্তনাদ, মৃত্যুর রুদ্ধশ্বাস দৃশ্যের এক চরিত্র হওয়া সত্বেও কখন টেনে নিয়েছে সেই ছেড়ে ফেলা কাদা লটপটে ফ্যানাড়িটা। বুক ঢেকেছে তোয়ালে দিয়ে। সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে। চোখে ফুটে উঠেছে আক্রোশ।

স্পষ্ট গলায় বলল—হঁ ত। এই হুড়ালেই ত আমার বড়ভাইকে মায়ের কোল থেকে নিঞে পালিঞেছে। চিবাঞে খেঞেছে। সাহেব বেশ করেছে। এক গুলিতে শেষ করে দিঞেছে।

আবতুল বলল—ওঃ। তাথেই তুই হুড়াল দেখে ডরাঞে ছিলি?

—হঁ ত।

এ সেই আদি পাপ। শিল্প বিপ্লবের অভিশাপ। যার কলুষ হাতের স্পর্শে সাঁওতালদের শান্ত ও নিরবচ্ছিন্ন জীবনযাত্রা জটিল হয়ে উঠল। একদিন যে জাতির হুঙ্কারে বৃটিশ রাজশক্তির ভিত্তি নড়ে উঠেছিল তারাই তাদের দাসদাসী বনে গেল। যে সাঁওতাল রমণীকে ধর্ষণ করার দায়ে তিন পাহাড়ির সাহেব ঠিকাদারের জীবন বরবাদ হয়ে গিয়েছিল তাদেরই মেয়ে রাসমণি ব্যারাকলউ সাহেবের তাঁবুতে স্বেচ্ছায় দেহদান করতে এসেছে।

সে ভুলে গেছে তার পিতৃপুরুষদের সংগ্রামী ঐতিহ্যের কথা। তার পিতামাতার জীবন যন্ত্রণার কথা। অনাহারে, অনিদ্রায় এবং চূড়ান্ত

অনিশ্চয়তার মধ্যেও তার মা কোনদিন যা ভাবতে পারেনি তাই করে বসল রাসমণি।

কিন্তু একটা হুড়াল যে নাকি আজ থেকে ছাব্বিশ বছর আগে তার মায়ের কোল থেকে ভাইকে ছিনিয়ে নিয়েছিল তার বিবরণ মায়ের কাছে শুনতে শুনতে এমন হয়ে গিয়েছিল যে অভিসারিকার বাসর শয্যাতেও জ্যান্ত হুড়াল দেখে জ্ঞান হারাল।

বারকুলি সাহেব জিন্দাবাদ। এক গুলিতেই খতম করে দিল। সেই সঙ্গে ভেঙে দিল রাসমণির জীবনের লজ্জা ভয় ও সংস্কারের খোলসটা।

॥ ছয় ॥

পঞ্চাশ ফুট মাটির নিচে বারো ফুট কয়লা স্তর। ডিসেরগড় সিম। উঁচু মানের কয়লা। বারকুলি সাহেব আহ্লাদে আটখানা। বোরিং মাস্টার আবদুল আরো এককাঠি সরেস। সে তিনদিন ধরে শুধু মদ খেল আর আলিফ লায়লার গান ও শায়র করল। একজন বোরিং মজদুরের কাঁধে ভর দিয়ে সাহেবের কাছে এল।

আভূমি সেলাম করে মিশিতে ধোওয়া কালো দাঁত বের করে আর্জি পেশ করল—হুজুর বখশিস!

সাহেবও তখন টপ ভুজঙ্গ। ঝনাৎ করে রূপোর টাকা ফেলে দিলেন। বোরিং মাস্টার আবার শুঁড়িখানায় মদ কিনতে গেল।

বোরিং সাকসেসফুল। পর পর দুটো বোরিংয়ের একই ফলাফল। বোরিং ক্যাম্পে খুশির হাওয়া। মানুষ কাজে সফল হলে যে কি পরিমাণ আনন্দ পায় বারকুলি সাহেব তার প্রমাণ। তিনি নেচে বেড়াচ্ছেন। বহু কর্মের হোতা ও উদ্গাতা জীবনের প্রথম সাফল্যে আত্মহারা। রাসমণির মত একটা আদিবাসী মেয়েকেও সহস্র চুম্বনে ভরে দিলেন; বললেন ডারলিং! আমি তোকে এমন হিরোইন বানিয়ে দেব যে তোর চহট দেখে লোকের বুক টাটাবে।

তা একদিন সত্য হয়েছিল।

সাহেবদের বিস্তর জল্পনা-কল্পনা। দেদার প্ল্যান প্রোগ্রাম। ঘন ঘন

বৈঠক। মিঃ মুর পর পর দু-দিন ঘুরে গেলেন। মিঃ ব্যারাকলউ পুরো প্ল্যান তৈরি করলেন। পাশাপাশি দুটি সিঁড়ি খাদ হবে। দুটিতেই স্টিম হলেজ দিয়ে টবগাড়ি টানা হবে। ঘোড়ায় টানা টবগাড়ির দিন শেষ করে দেবেন।

এবার লোক চাই। শক্ত সমর্থ কুলি কামিন। মাটি কাটতে হবে, পাথর কাটতে হবে। তবে তো কয়লা। আগে তো সিঁড়ির খাদ কাটাই। রাম নগিনা মিশ্র তখন গোমস্তা। শেরগড় কলিয়ারিতে থাকেন। হাবুবাবু ইনচারজ। তখনও উনি সাহেব হননি। রামনগিনাও হেড-গোমস্তা হয়নি। তাদের যা কিছু প্রমোশন বারকুলি সাহেবের দেওয়া।

কুলি-কামিন সংগ্রহের তোড়জোড় চলছে। সেই সময় একদিন বারকুলি সাহেব রাসমণিকে বললেন— তোর বাপকে আমার কাছে নিয়ে আয়। আমি ওকে সর্দার বানিয়ে দেব।

রাসমণি তখন আট আনা দরের তালাকুড়ি। সাহেবের হাতে যখন থেকে পড়েছে. তখন থেকে হাটে-বাজারে সওদা বেসাতি ছেড়েছে। সে কি বুঝবে শ-রূপেযার সরদারের মর্ম ?

যেন আকাশ থেকে পড়ল। তেমনি করে চোখ ছানাবড়া করে বলল—

—বাব্বাঃ! আমরা গরীব লোক। সরদারীর কি জানি ?

—তোর বাপকে নিয়ে আয়। সব বুঝিয়ে দেব।

রাসমণির মনে একটা গভীর দুঃখ ছিল। মাহামাঝি ওর বিয়ালা পুরুষ। তার ঔরসে একটি মেয়ে আছে। তবু বিনাদোষে তাকে তাড়িয়ে দিয়ে অন্য মেয়ে নিয়ে ঘরকন্না করছে। একই গাঁয়ে থাকে। প্রায়দিন দেখা হয়। বুক ফেটে চৌচির হয়। মাহা তাকে টিটকিরি দেয়। সেই রাগেই সে তালাকুড়ি! সেজেগুজে নিমদাঁতন বিক্রি করতে আসে। বাবু ভেইয়া ডাক দিলেই সাড়া দেয়। আবদুল হালিম সেসব জেনে শুনেই সাহেবের কাছে নিয়ে এসেছিল।

ঈ বাশ! লুলুবড়কা কি করে ভুলল তার জীবনে সংগ্রামের কথা? তার চোখের সামনে হাজার হাজার সাঁওতাল গুলি খেয়ে মরেছে। সে নিজেও গুলি খেয়েছে। মরেনি এই ঢের।

কত কালো কালো লাশ অজয়, ময়ূরাক্ষী ও দামোদরের জলে ভেসে গেছে। দাউ দাউ করে ঘর-বাড়ি জ্বলেছে। যুবতীরা ধর্ষিতা হয়েছে। গৃহহারা, ছন্নছাড়া যুবকরা কুকুর বিড়ালের মত পথে-ঘাটে, বনে-জঙ্গলে বেঘোরে মারা গেছে।

এতসব স্মৃতি ছাব্বিশ বছরের মধ্যে মুছে গেল? কালের গতি কি কুটিল! মহাকাল কত বলবান! তার রথের ঘোড়া দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলে গুহামানবের যুগ থেকে শিল্প বিপ্লবের যুগ পর্যন্ত। স্মৃতি হয় ইতিহাস।

লুলুবড়কাদের আরণ্যক জীবন-প্রবাহের গতিমুখ বদলে গেল। একদা বিদ্রোহী শোষকশ্রেণীর প্রতিভূর কাছে এসে দাঁড়াল করজোড়ে। প্রার্থী হয়ে। তিনি ছুঁড়ে দিলেন মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ছাপ দেওয়া রূপোর টাকা। ঝনাৎ করে পড়ল মাটিতে। পরাজিত বিদ্রোহী ব্যগ্র হাতে তুলে নিল। কালো মানুষ কয়লা কুঠির কালো যবনিকায় গাঁইতি হাতে দাঁড়াল স্থির চিত্রের মত। সে হল খাদের মালকাটা।

দুশো বছর যাবৎ তাদের একই বিন্দুতে অবস্থান। সেই হিটলী সাহেবের আমলে যা শুরু হয়েছিল, ব্যারাকলউ সাহেবরা যাদের ব্যাপকভাবে কাজে লাগিয়েছিল, সেই ট্র্যাডিশন বয়ে চলল স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ব কয়লা কুঠির যুগ পর্যন্ত।

তারপর থেকে লুলুবড়কাকে দেখতে পাওয়া যায় মোটা লাঠি হাতে লাফ দিয়ে দিয়ে জামতাড়া, সিদাবাড়ি, সারট, সরবা নালা, হাটপালজুড়ি, জামা, দুমকা, পাকুড়িয়ার হাটে-বাটে, পথে-ঘাটে, গ্রামে-গ্রামে পরিক্রমা করে সাঁওতাল-কুলি-কামিন সংগ্রহ করতে। একটা পা জন্ম থেকে বাঁকা, অন্য পা গুলিতে জখম। লাঠি ছাড়া এক পা চলতে পারে না। সঙ্গে থাকে চুণি মিঝান। চিরকালের দুখমরা। সেই যে একদিন ডিসের-গড়েব ঘাটে আধমরা স্বামীকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল তারপর তার ছায়া অনুগামিনী। একদিনের জন্যও একা ছেড়ে দেয় না।

জামতাড়া সিদাবাড়ির সাঁওতালগুলো যারা পাহাড়ে জঙ্গলে বসবাস করছিল তাদের নিয়ে এসে জড় করল। ব্যারাকলউ সাহেব তাদের বসবাসের জন্য জমি দিলেন। সত্যবাবু নিজে এসে চেন দিয়ে মাপ করে দিলেন ঘর বানাবার জায়গা। গুদামবাবু আনিয়ে দিলেন

কাঠ, বাঁশ, খড়, দড়ি। খাজাঞ্চিবাবু ঘর পিছু সাড়ে তিন টাকা মজুরী গুণে দিলেন। সব খরচ কোম্পানির।

সাঁওতালরা বিপুল উৎসাহে ঘর তৈরী করল। দেখতে দেখতে একটা গ্রাম। পিতৃ পুরুষের বাস্তুভিটার নামে নাম দিল সিদাবাড়ি। এমনি করেই পত্তন হল ছাতাবড়া মৌল পাহাড়ী সাঁওতাল পল্লী। লুলুবড়কা তিনখানা গ্রামের মারাং হড়।

তার ঘরে প্রাচুর্যের ঢেউ। সাহেবের বখশিস, সর্দারীর কমিশন, রাসমণির স্বেদ ও রক্তের বিনিময়ে তার খাবারের থালা শুয়োরের মাংসে পূর্ণ হয়ে গেল। দুখমরা চুণির গায়েও চেক্‌নাই খুলল।

ব্যারাকলউ সাহেব ভীষণ ব্যস্ত। একদা যিনি ম্যানেজার উইদাউট কলিয়ারি বলে আক্ষেপ করতেন তার চারিদিকে কর্মোদ্যোগ। শেরগড় কলিয়ারির রমরমার পাশেই সালুঞ্চী কলিয়ারীর নতুন পত্তন।

ইনক্লাইন কাটাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে ষ্টীম হলেজ বসানর জন্য ফাউণ্ডেশন কাটাই। এক মানুষ গর্তের ভিত থেকে ইটের গাঁথুনি চুণ সুরকি মসলা। বিলেত থেকে রুবি কোম্পানির ষ্টীম ইঞ্জিন এসেছে। তার বসানোর তোড়জোড় চলছে। বয়লার খাড়া হয়েছে। কত কী কাজ!

সেই সঙ্গে তৈরি হচ্ছে বাবুদের কোয়ার্টার। ইটের দেওয়াল। টিন টালির ছাউনি। কুলি ধাওড়ার জন্য কাঠ, বাঁশ, খড় দিয়েই খালাস। সাহেবদের জন্য বাংলো। আপাততঃ নিজের জন্য তো একটা চাই-ই। এত পোড়া ইটের সংগ্রহ দুঃসাধ্য। যা আছে তা দিয়ে মেসিন বসান হবে। অতঃপর কাঁচা ইটের গাঁথনী হক।

তাই হল। বনের শাল গাছ কেটে বিম, বর্গা, কাঁইচি। টালির ছাউনি। বাংলোর পাশে আস্তাবল। সারভেণ্টস কোয়ার্টার্স।

সাহেব তাঁবু ছেড়ে উঠে এলেন নতুন কোঠীতে। আবদুল হালিম চলে গেল নতুন কয়লা স্তরের সন্ধানে হাটনলে বোরিং করতে। কয়লা পাওয়া গেলে সেখানেও একটা কলিয়ারি হবে।

হলও তাই। হাটনলে কয়লা পাওয়া গেল এবং সেখানেও শুরু হল নতুন কর্মযজ্ঞ। তারও দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন মিঃ ব্যারাকলউ। দেখতে দেখতে পাঁচটা বছর পার হয়ে গেল। ছ-মাসের ছুটি কাটাতে গেলেন হোমে। সুইট হোম ছেড়ে আসতে বড় কষ্ট। কিন্তু

ততদিনে পেয়ে গেছেন ভারতের কাঁচা বাজারের কাঁচা পণ্যের আস্বাদন। কাঁচা টাকা, কাঁচা মেয়ে আর প্রভুত্বের মোহে আবার পাঁচ বছর এগ্রিমেণ্ট করলেন। এবার এসে উঠলেন শেরগড় কলিয়ারির বড় বাংলোয়। যার বাউণ্ডারির পরিমাণ ত্রিশ একর। সারভেণ্টস কোয়ার্টারস ঘিরে বিবি বাথান। আগে সেখানে ছিলেন মিঃ হ্যামিলটন। তিনি প্রমোশন পেয়ে হয়েছেন ডেপুটি চীফ মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার। আরও বড় বাংলোতে চলে গেলেন। দ্য শেরগড় কোল কোম্পানি ক্রমশঃ বিস্তার করে চলেছে তাদের বাণিজ্য। এদিকে শেরগড়, পূর্বে পনিয়াটী, বরাকর নদীর পশ্চিমে লায়েকডিহি সব দিকেই এগিয়ে চলেছে। শুরু হচ্ছে একের পর এক নতুন কলিয়ারি।

সাহেব ছাড়া রাসমণি তখন দিল নিয়ে দিল্লাগী ছেড়ে নতুন করে প্রেমে পড়েছে তার চেয়ে নয় বছরের ছোট বুধনা মাঝির সঙ্গে। সে এসেছিল লুলুবড়কার সর্দারীতে মালকাটার কাজ করতে। সতেরো বছর বয়স। থাকত লুলুবড়কার ঘরে। বছর দুয়েকের মধ্যে আপনার লোক হয়ে গিয়েছিল।

শাল কোঁড়ার মত বাড়ন্ত গড়ন। চিকন পিছল গায়ে ঘাম চিক চিক করত। দেখে দেখে রাসমণির ঘোর লাগত। কি করে প্রেম নিবেদন করবে এই ভাবনায় বুক গুড় গুড় করত। তারপর এক গহীন রাতে হাতে ধরে সঙ্গম শেখাল তাকে। আঠার বছরের তরুণের সঙ্গে সাতাশ বছরের যুবতীর প্রগাঢ় প্রণয় দিনে রাতে জোড় খাসালের পাথর চাতালে মর্মরিত হয়ে বেড়াত। সন্ধ্যাকালে ধেনো মদ খেয়ে মাতাল হত। সাঁওতাল পাড়ায় মাদল, লাগরা বাজত।

মা বাপের শোক সামলে উঠেছে রাসমণি। তার লোকজন আরো বেড়েছে। শেরগড়, শালুঞ্চি, হাটনলে তিনটি কলিয়ারিতেই কুলি-কামিন কাজ করছে। একা সব দেখতে পারে না বলে জগুকে রেখেছে খবরদারি করতে। সে এখন হাড়াম (বুড়ো) হয়ে গেছে। নিজের বলতে কেউ নেই। রাসমণিকে ভালবাসে মেয়ের মতই। বুক দিয়ে আগলে রাখে।

একদা যেমন রেখেছিল তার মাকে। লুলুবড়কা গিয়েছিল লড়াই

করতে। গাঁয়ের উপর ছুটেছিল মিলিটারির ঘোড়া। যত সাঁওতাল যুবতীকে প্রকাশ্যে ধর্ষণ করেছিল। তখন সে চুণি মিঝানকে রক্ষা করেছিল গহীন বনে লুকিয়ে রেখে। একটি একটি করে এমন কয়েকটি মেয়েরই ইজ্জত বাঁচিয়ে ছিল ও। এত তার ইমান! এত তার ধর্মজ্ঞান।

॥ সাত ॥

১৮৯০ সাল। বৃটিশ পার্লামেণ্টে প্রশ্ন উঠেছে—ভারতবর্ষে কয়লা-কুঠির নামে কসাইখানা চলছে।

তাই হার হাইনেস মহারাণীর বিশেষ প্রতিনিধি হয়ে ভারতবর্ষের কয়লাখনি অঞ্চল সরেজমিনে তদন্ত করতে এসেছেন মিঃ জেমস্ গ্রাণ্ডি। মিঃ ব্যারাকলউ তাঁর পূর্ব পরিচিত সেজন্য তাঁর বাংলোতে উঠেছেন। অবশ্য তাঁর জন্য সরকারি অতিথিশালার বিপুল আড়ম্বর প্রস্তুত হয়ে আছে। তবু দু' একদিন পুরনো বন্ধুর সাহচর্যলাভ। আবার কি?

শেরগড় কোল কোম্পানির ইউরোপীয়ান ক্লাবে মিঃ গ্রাণ্ডিকে বিপুল অভ্যর্থনা জানানো হয়ে গেছে। সেই ভোজসভায় উপস্থিত ছিলেন দেশী ও বিদেশী কোম্পানিগুলির মালিক, ম্যানেজার, চীফ মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার, ইঞ্জিনিয়ার, স্থানীয় জমিদার, পুলিশের বড়কর্তা প্রমুখ নামী-দামী ব্যক্তিবর্গ। সকলে স্বাস্থ্য পান করে পরিতৃপ্ত হয়েছিলেন।

তারপর মিঃ গ্রাণ্ডির সঙ্গে মিঃ ব্যারাকলউ ঘোড়া ছুটিয়ে বেড়াতেন রাণীগঞ্জ থেকে বরাকর পর্যন্ত দামোদর নদের অববাহিকা বরাবর।

দামোদর অনার্য নদ। অনার্য সাঁওতালদের কাছে অতি পবিত্র। আমাদের যেমন মা গঙ্গা, তেমনি। তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে বরাকর নদ। মায়ের থান দেবী কল্যাণেশ্বরীর পাশ দিয়ে দক্ষিণমুখী আঁকা-বাঁকা স্রোত। পঞ্চকোট পাহাড়ের কোল ঘেঁষে পূর্বমুখী দামোদরের সঙ্গে দেওলির কাছে এসে মিশে গেছে। তাদের যৌথ

দাপটে শেরগড় পরগণা কম্পমান। দামোদরের বানভাসি কিংবদন্তীর বিবরণ। লফরদাস গান রচনা করে হাটেবাটে গেয়ে বেড়াতেন। ভিক্ষা করতেন বন্যার্তদের সাহায্যের জন্য।

তেমনি আরেক সর্বনাশা নদ অজয়। বানভাসিতে সেও কম যায় না। সাঁওতাল পরগণা থেকে বীরভূম বর্ধমানের দু'ধার পর্যন্ত ভেঙেচুরে একশা।

দামোদর, বরাকর, অজয়, ময়ূরাক্ষী, কংসাবতী ছোটনাগপুর মালভূমির ছোটবড় পর্বতমালা ভেঙে বাংলার মাটিতে এসে গা মেলে দেয়। সমতলভূমিতে পড়ে তীব্র স্রোত মন্দা হয়। বানের জল ফুলতে থাকে।

বর্ধমান জেলার পশ্চিম অংশটিতে দু'পাশে দুই নদ—অজয় ও দামোদর। পশ্চিম সীমারেখায় বরাকর নদ। মাঝ বরাবর জি. টি. রোড ও ইস্টার্ণ রেলওয়ের মেন লাইন অজয় ও দামোদরের সঙ্গে মোটামুটি সমান্তরাল রেখায় বর্ডার পার হয়ে বিহারে পড়েছে।

এর সবখানেই রত্নভাণ্ডার। মোরাম, গ্রাভেল, চীপ স্টোন, ফায়ার ক্লে ও কয়লার স্তরীভূত শিলায় ধরিত্রী গর্ভবতী। সেই গণ্ডোয়ানা পদ্ধতিতে যার সঞ্চার আধুনিক পদ্ধতিতে তারই অস্ত্রোপচার।

আর ধন্য সেই সর্বনাশা অনার্য দামোদর। বিহার থেকে বাংলা পর্যন্ত তার অববাহিকা জুড়ে কয়লার স্তর। কবে কোন প্রাগৈতিহাসিক যুগে রাশি রাশি উদ্ভিদ জড় হয়েছিল। থরে থরে সজ্জিত হয়ে শিলীভূত হয়েছিল। ঘনীভূত হযেছিল তাপশক্তি উৎপাদনের জন্য প্রচুর দাহ্য পদার্থ। প্রচণ্ড তার দাহিকা শক্তি। আজকের যন্ত্রসভ্যতার জীবন-দায়িনী। দামোদর সাবাস তোকে।

একদিন বুকভরে সঞ্চয় করেছিলে কালো পাথরের স্তর। আজ ধরিত্রীর গর্ভ বিদীর্ণ করে সেই কয়লা উত্তোলনের পর তোমারই বালি দিয়ে ভরাট করা হচ্ছে সেই শূন্যস্থান। আবার তোমারই জলে উৎপন্ন হচ্ছে বিদ্যুৎ। তোমারই বালি. তোমারই বিদ্যুৎ, তোমারই কয়লা। মুনাফা লোটে ইংরেজ বেনিয়া। প্রাণ দেয় আদিবাসী কুলিকামিন।

চমৎকার! কে তোমাকে বলে সর্বনাশা? তুমি আশীর্বাদ।

মিঃ ব্যারাকলউ এসব নিয়ে চর্চা করতেন যথেষ্ট আন্তরিকতা দিয়ে। তাঁর প্রিয়তমা পত্নী ইসাবেলাকে যেসব চিঠিপত্র লিখেছিলেন তার বিবরণ জোড়া লাগালেই ভারতীয় কয়লাখনির ইতিহাস হয়ে যায়।

একটা চিঠিতে উনি লিখেছেন—ডিসেরগড়ের ঘাটে একাই বসে আছি। জুলাই মাস টিপ টিপ করে বৃষ্টি হচ্ছে। আকাশজোড়া মেঘ। পঞ্চকোট পাহাড়ের মাথায় পুঞ্জ পুঞ্জ সাদাকালো মেঘ হাতির মত দল বেঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দামোদরে ছু'কানায় বান বইছে। গুম্‌গুম্ করে পাহাড় ভাঙার শব্দ হচ্ছে। ফেরীঘাটে নৌকা বাঁধা আছে। মাঝিদের আশঙ্কা বান আরো বাড়বে। এমনিতেই ছুরন্ত ঘোড়ার বেগে বান ছুটছে। তা যদি আরো বাড়ে তবেই তো নৌকাডুবি। কাজ নেই বাবা!

এই নদী পথেই নৌকা বোঝাই কয়লা চালান হত কলকতায়। মিঃ জোনসের প্ল্যান। নারায়ণকুড়িতে ফেরীঘাট বানিয়ে নৌকায় কয়লা বোঝাই হত। বেশ বড় বড় নৌকা। ২০—৩০ টন মাল চড়তো! বর্ষায় দামোদরের জলে ভাসিয়ে দিত। মাঝি মাল্লারা চাল চিঁড়ে বেঁধে রওনা হত। স্রোতের মুখে যাওয়া। তবু মাসাধিককাল লেগে যেত। বড় বান এলে তো ছু'চারটে নৌকা ডুবেই যেত। তবু দামুলিয়া, চিনাকুড়ি সব ঘাট থেকেই নৌকা চলত হুগলীর মহীসভা ঘাট পর্যন্ত। সেখান থেকে উলুবেড়িয়া ক্যানাল দিয়ে কলকাতা।

তা এক আধ বছরের ব্যাপার নয়। সেই ১৭৭৪ সালে হিটলী সাহেবের আমল থেকে ১৮৬০ সাল পর্যন্ত। রেল ইঞ্জিন চালু হল তবে তো রেলপথে কয়লা চালান। আর জি টি রোডে গরু গাড়ি ছাড়া কিছু চলে না। ছুর্গাপুর ফরিদপুর ঘন জঙ্গল। ঠ্যাঙ্গাড়ে, ভাগ্নেদের উপদ্রব। গরুর গাড়ি চলে মিছিল করে—ক্যাঁচোর ক্যাঁচ মিউজিক দিতে দিতে। সারা দিন রাত্রেও পথ শেষ হয় না। কখনো বা পড়ে বাঘ ভালুকের পাল্লায়।

ইণ্ডিয়ার প্রিমিট্রিভ মাইনিং? ওহ্, ছ্যাটস এ হরর!

বন জঙ্গল বাঘ ভালুক সাপখোপ তো ছিলই। সে সবের মোকাবিলা করতে হাতে বন্দুক নিয়ে ঘুরতে হয়। কিন্তু জ্বর জ্বালা? কোন বন্দুক দিয়ে আটকাবে? কালাজ্বর, প্লীহাজ্বর, ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া ওঁৎ পেতে বসে থাকত। পেলেই খপ্ করে ধরে ফেলত।

একবার ধরলে আর ছাড়ান নেই। ওষুধপত্র কোথায়? ডাক্তার তো ছিল না। দেশী বদ্যি, কবিরাজ ভরসা। তেঁতো পাঁচন গিলতে গিলতে দফা কাবার।

হিটলী সাহেব কিছু ব্রিটিশ মাইনার এনেছিলেন। তাদের কেউ কেউ ফাইলেরিয়ার রোগী বনে গেল। পায়ের গোছ দুটি ছাল ছাড়ানো ওলের মত রং নিয়ে কলা গাছের গুঁড়ির মত মোটা। চামড়া ফেটে রক্ত বেরোয়। বৃহৎ অণ্ডকোষ পেণ্ডুলামের মত দোল খায়। আবার বাত শিরার তড়কা জ্বর যখন জোড়ের বানের মত শন্ শন্ করে আসে তখন সাহেবদের চোখে ত্রিভুবন অন্ধকার। পালাবার পথ পায় না।

এ চিঠি ব্যারাকলউ সাহেবের ভারতবর্ষে আসার প্রথম কয়েক বছর পর লেখা। তারপর আরো কত চিঠি লিখেছেন। এখন আবার মিঃ গ্রাণ্ডিকে পেয়ে তার কাছে ভারতীয় কয়লাখনির ইতিহাস ভূগোলের পাঠ দিচ্ছেন।

জ্যৈষ্ঠ মাস। খর রৌদ্র। ধোঁয়াসাচ্ছন্ন দিগন্ত। চোখ দিয়ে তাকানো যায় না। কেমন রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্ করে। আঁধি লাগে। পানমোহরা ডহরের ধারে ধারে তাল বীথি। পাশ দিয়ে বয়ে গেছে চঞ্চলা জোড়। বালি কাঁকর ভর্তি ক্ষীণ স্রোতোরেখা। বড় বড় পাথর চাতাল। উর্বর জমির আল বরাবর তাল গাছ। একটি তালপাতার ছাউনি করা কুঁড়েঘর। জনকয়েক উদোম আদুল মানুষ। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মাটির ভাঁড়। তালপাতার দোনা। ওরা সব তালরস পানে মশগুল।

হঠাৎ পিলে চমকে গেল। যে যেদিকে পারে দৌড়। পড়ি কি মরি দৌড়ে কেউবা নেশার ঘোরে উল্টে পড়ল। ঝালুমশহর থর থর করে কেঁপে উঠল। যেন বাত শিরার জ্বর।

ঘোড়ার লাগাম টেনে দাঁড়িয়ে পড়লেন মিঃ ব্যারাকলউ ও মিঃ গ্রাণ্ডি। ভারতীয় কয়লাখনির কসাইখানা তদন্ত করতে মহারানীর অনুজ্ঞাপত্র যাঁর পকেটে তিনি অবলীলায় ঘোড়া ছুটিয়ে তাড়ি বাগানে এসে উঠেছেন।

লাল ধুলোর ডহর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছেন লালমুখো সাহেব। আর কি কারো ধড়ে প্রাণ থাকে ? পলায়ন একমাত্র উপায়।

মিঃ গ্রাণ্ডি জিজ্ঞাসা করলেন—ওরা দৌড়চ্ছে কেন ?

মিঃ ব্যারাকলউ নেটিভদের আতঙ্ক সম্পর্কে জানেন। বললেন ওরা সব নেশা করেছিল। আমাদিকে দেখে ভয়ে পালাল।

—নেশা কি নেশা ? মানে উনি তালরসের প্রসিদ্ধ নেশা সম্পর্কে কিছুই জানেন না। কিন্তু বারকুলি সাহেব পুরোপুরি ওয়াকিবহাল। গ্রীষ্মের প্রভাতে ব্রেকফাস্টের সঙ্গে ফেনায়িত তালরস বড়ই মাদকতাময়। তাই তো তিনি পছন্দ করেন ভারতের আদি বস্তুগুলি। খাঁটি তালরস, খাঁটি মহুয়া এবং আদিম কন্যা।

ঘোড়া থেকে নামতে নামতে বললেন—নেমে পড়ো। লেট আস হ্যাভ এ টেস্ট। আশা করি ভাল লাগবে।

সাহেবদিকে নামতে দেখে ঝালুমশহরের প্রাণ উড়ে গেল। ওর চোখের সামনেটা বেবাক ফাঁকা। এমন ধূ-ধূ প্রান্তর জীবনে কখনো দেখে নি। চোখ দুটো বুঝি ছিঁড়ে যায়। কাঁপুনী যা চলেছে তাতে বুঝি এই পড়েছে কি এড়াস। (খতম)

মিঃ ব্যারাকলউ ওর পিঠে হাত দিয়ে বললেন-ডোণ্ট ডরো ম্যান। তোমার জেনুইন লিকার খেতে চাই। নিয়ে এসো।

বলতে বলতে বসে পড়লেন তালগাছের ছায়ায়। শ্যামল-কোমল ঘাসের উপর। জায়গাটা হাত পা ধোয়ার জল ও হিউম্যান বডির খাঁটি ইউরিয়া সারে উর্বর। তাই কচি কচি দুর্বাঘাসের সঙ্গে ভুঁই কদমের চারা গজিয়েছে। গোল গোল ফুলও ফুটেছে।

ঝালু বলতে যাচ্ছিল ওখানে বোস না সাহেব। কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বেরুলো না।

মিঃ ব্যারকলউ ওকে বুঝিয়ে বললেন—তোমার লিকার নিয়ে এসো। আমরা পান করবো।

ঝালুমশহরের ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। মনে মনে বলল ও সায়েব তাই বলো। তাড়াতাড়ি এগিয়ে দিল তাঁড়ির ভাঁড়, তালপাতার দোনা। কুঁড়ে থেকে নিয়ে এল শালপাতায় মোড়া ছোলা সেদ্ধ, কাঁচা পেঁয়াজ ধানী লঙ্কা। সাহেবরা মউজ করে খেতে শুরু করলেন।

চঞ্চলা জোড়ের গর্ভে থাক থাক কয়লাস্তর। পানমোহরা ডহর ধারে বুয়ান গাছের ঝোপ। তালগাছের সারি। ঠাঁই ঠাঁই দু'একটি পলাশ। জোড়ের পাথর চাতালে চিকণ পিচ্ছিলতা। কোণাকুণি জোড় পার হয়ে পাড়ের মাটিতে ঢাকা পড়ে গেছে।

কোন কিছুই নজর এড়ায় না ব্যারাকলউ সাহেবের। বিশেষ করে মাটি, পাথর, গাছপালা। ওই চিকন পাথর চাতালটি কি ফল্ট প্লেন? মাটি হচ্ছে ধরিত্রীর ত্বক। ঢাকা দিয়ে রেখেছে কত রহস্যময় শিলাস্তর। কে জানে এই তাড়ি বাগানের নীচেই কয়লাস্তর আছে কিনা? এক বিশাল গ্রস্ত উপত্যকা। জোড়ের ঐ চিকন পাথরটা যা'র চ্যুতি।

ভারতীয় শিলাস্তরের গঠনইতো ভঙ্গুর। নানা ফাটল; চ্যুতি ও গ্রস্ত উপত্যকায় বিভক্ত। কবে সেই কয়লাস্তর গঠনের সময় ধরিত্রীর তাপ, চাপ ও রাসায়নিক ক্রিয়ায় যা ছিল পলিমাটির মত নরম তখন এক ডায়াসট্রফিক আর্থ মুভমেণ্ট অর্থাৎ ভয়ঙ্কর ভূকম্পনে তা ছড়িয়ে পড়েছিল ভঙ্গুর শিলাস্তরের মত। তারই শাখা-প্রশাখা যে এই পানমোহরার ডহরে, চঞ্চলা জোড়ের গর্ভে জমা হয়নি তা কে বলতে পারে?

ফেনায়িত তালরসের মাদকতার মধ্যেও এমন ভাবনা যিনি ভাবতে পারেন তিনি মিঃ ব্যারাকলউ।

মিঃ গ্রাণ্ডি তখন মাতাল। বহুত মউজ। বহুত খুশবু খোয়াব। মাথার উপর চড়া রোদ, ধূ ধূ প্রান্তর - সব তখন মনোরম।

মিঃ ব্যারাকলউ তখন বললেন মিঃ গ্রাণ্ডি তুমি তো ইণ্ডিয়ার নেটিভ উওম্যান দেখ নি? ওরা দারুণ চারমিং।

মিঃ গ্রাণ্ডি ইচ্ছা প্রকাশ করলেন—আমি কি এনজয় করতে পারি?

—হোয়াই নট? বাংলোতে ফিরে চল। বিবি-বাঁধের সুইমিং পুলে নেটিভ গার্লদের সঙ্গে জল ক্রীড়ার আয়োজন করব।

—ওহ্ নাইস! মার্ভেলাস প্রোগ্রাম। মিঃ গ্র্যাণ্ডি আনন্দে আত্মহারা।

দুজনে চার-পাঁচ ভাঁড় তাড়ি সাবাড় করে গরম মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছেন। সাদা চামড়া লাল হয়ে গেছে। গল্‌গল্ করে ঘাম ঝরছে। জামা-প্যাণ্ট খুলতে খুলতে আণ্ডার ওয়ারে ঠেকেছে। ভিতর থেকে একটা

আনন্দের স্রোত কুল-কুল করে উঠে আসছে। বুকে উথাল-পাথাল ঢেউ। এই তো সেই তুরীয়ানন্দ।

এখন তাদের অর্থের প্রতি মোহ নেই. নারীদেহের প্রতি লালসা নেই, কাজের দিকে হুঁস নেই, ভূত্বকের গর্ভগৃহ অনুসন্ধান নেই, মান-সম্মানের প্রশ্ন নেই, রোদের চড়া আঁচ নেই, পেচ্ছাবের কড়া ঝাঁঝ নেই। দুনিয়ার সবই মনোরম। সবই মধুময়। দিল এখন দরিয়ার মতো প্রশস্ত। দুই সাহেবে পালা করে ঝনাৎ ঝনাৎ শব্দে সিকি, আধুলি, টাকা বখশিস দিলেন—তাড়িওলা ঝালুমশহরকে। ওর জীবন সার্থক হয়ে উঠল।

॥ আট ॥

আরো একজন অশ্বারোহী এসে থামলেন দুই মাতোয়ারা সাহেবের সামনে। এসে বললেন—গুড মর্ণিং সাহেব। এ কি করেছেন? তাল-রস খাবার যদি ইচ্ছা হয়েছিল তবে আমাকে বলেন নি কেন? আমার নাচমহলে সব ব্যবস্থা করে দিতাম।

—ওহ্ মিঃ রায়! গুড মর্ণিং! ইউ আর ওয়াণ্ডারফুল। কিন্তু এইরকম প্লেজার কি নাচমহলে হত?

—এর চেয়ে বেশি হত।

ইনি মিঃ রাধাগোবিন্দ রায়। পানমোহরার জমিদার।

জমিদার শব্দের মধ্যে যে ইমেজটা মনের মধ্যে উঁকি দেয় সেই জরিপাড় কুঁচি দেওয়া শান্তিপুরী ধুতি, সিল্কের পাঞ্জাবী, মুক্তো বসানো সোনার বোতাম, আলবেট কাটা চুল, সরু গোঁফ, পানের রসে রাঙা ঠোঁট, মণি, মুক্তা, পাথর বসানো ঝলমলে আংটি পরা আঙুলে বাঈজীর বাজু ধরে সোহাগ করার যে প্রতিমূর্তি তা কিন্তু ওর মধ্যে নেই।

পুরোপুরি সাহেবী পোশাক। কথাবার্তায় চৌখশ। গড় গড় করে ইংরেজী বলেন। লালমুখো সাহেবের দিকে অবলীলায় হাত বাড়িয়ে দেন করমর্দনের জন্য। ঘোড়ার উপর সওয়ার হন। কাঁধে ঝোলে বন্দুক।

তাঁর বাবা রাজা রামমোহনের আমলে ইয়ং বেঙ্গল গ্রুপের সদস্য

ছিলেন। সেজন্য তাঁকেও ইংরেজী বিত্তা শিখিয়েছিলেন ডেভিড হেয়ার সাহেবের স্কুলে। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর যখন টেগোর এণ্ড কোম্পানির মালিক হন তখন তাঁর বাবার সঙ্গে খুব দহরম মহরম ছিল।

মিঃ রাধাগোবিন্দ রায়ও কম যান না। কলকাতায় থেকে লেখাপড়া তো শিখেইছিলেন আবার পানমোহরা থেকে কলকাতার স্টার থিয়েটারে গিরিশচন্দ্র ঘোষের চৈতন্যলীলা দেখতে যেতেন। বেশ কিছুদিন কলকাতা থেকে গিরিশবাবু, বিনোদিনী দাসী ও রসরাজ অমৃতলাল বসুর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। বিনোদিনীর মা নাকি ওঁকে নেক নজরে দেখতেন। তবে মেয়েটি তো অন্য ধাতুতে গড়া আর দুর্মুখ রায়ের মত প্রবল প্রতাপান্বিত প্রতিদ্বন্দ্বী। কাজেই বেশী সুবিধে করতে পারেন নি।

তারপর দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছিলেন লর্ড রামকৃষ্ণের চরণামৃত পান করতে। কিন্তু সে ঠাকুর এক নজরেই মানুষ চিনতেন। তাই তেমন আশীর্বাদ পান নি। ভালই হয়েছে উনি তাই মনে করেন। লর্ড রামকৃষ্ণের শুভদৃষ্টি যার উপর একবার পড়েছে তাকে আর পার্থিব ভোগের পসরা ভোগ করতে হয়নি।

কিন্তু এখনো বিত্তাসাগরমশাই মিহিজামে এলেই তিনি দেখা সাক্ষাৎ করতে যান। তবে কদাপি বিধবা বিবাহ আন্দোলনে সামিল হননি।

উনি ছিলেন সাহেব-অন্ত প্রাণ। সাহেব দেখলেই প্রাণ টনটন করত। সাহেবদের সঙ্গে দু গ্লাস হুইস্কি খেলেই নিজেকে ধন্য মনে করতেন। কোন মেম সাহেবের কোমর ধরে নাচতে পেলে নিজেকে কৃতার্থ মনে করতেন (কে জানে উদোম আদুল মেম সাহেব পেলে চেটেই খেয়ে দিতেন কি না!)।

সেই প্রাণের টানে ছুটে এসেছেন। যেই শুনেছেন বারকুলি সাহেব চঞ্চলা জোড়ের ধারে তালবাগানে তাড়ি খেয়ে লুটোপুটি খাচ্ছেন অমনি বেরিয়ে পড়েছেন।

মিঃ ব্যারাকলউ পরিচয় করিয়ে দিলেন, মিঃ রায় জমিনদার অফ পানমোহরা। মিঃ জেমস গ্রাণ্ডি দ্য অনারেবল মেম্বার অফ দ্যা কাউন্সিল অব হার হাইনেস অফ কুইন ভিকটোরিয়া।

—ওহ্! ভেরী গ্ল্যাড টু সী ইউ স্যার গ্রাণ্ডি!

মিঃ রায় মিঃ গ্রাণ্ডির সঙ্গে করমর্দন করলেন।

মিঃ ব্যারাকলউ বললেন—মিঃ রায়! আপনি তো দেশী জমিনদার কয়লা কুঠির সব খবর রাখেন। বলুন তো আমরা কি কোলিয়ারিতে কসাইখানা খুলেছি? মানে মিঃ গ্রাণ্ডি সেই ব্যাপারটার সরেজমিনে তদারক করতে এসেছেন হার ম্যাজেস্টির আদেশ নিয়ে। কিন্তু আপনি সত্যি কথা বলুন—আমরা কি শ্রমিকদের খাদে ঢুকিয়ে চাল চাপা দিয়ে মেরে দিই।

মিঃ রায় কথার মানে ধরে নিলেন। স্বচ্ছন্দভাবে বললেন—নো স্যার। অল ফলস্।

—ইয়েস! অল ফলস্। সোল্লাসে চিৎকার করে উঠলেন মিঃ ব্যারাকলউ।

মিঃ রায় তাঁর লোকজনকে ঘোড়ার গাড়ি আনতে বলে এসেছিলেন। তারা গাড়ি নিয়ে হাজির। সাহেবদের পা টলটল করছে। জামা-প্যান্ট ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। কোচোয়ান সেসব কুড়িয়ে ঘোড়াগাড়িতে রাখল। সাহেবরা ধরাধরি করে গাড়িতে উঠলেন। তখন তাদের অদ্ভুত ড্রেস। খালি গা। পরণে আণ্ডারওয়ার। কিন্তু কোমরে চওড়া বেল্টের খোপে পিস্তল। মাথায় হেলমেট পায়ে বুটজুতো।

মিঃ ব্যারাকলউ গাড়ি থেকে বললেন—আওয়ার হর্স?

মিঃ রায় বললেন—সহিস নিয়ে যাচ্ছে। আপনারা চলুন।

ঢুলকি চালে গাড়ি চলল হ্যাচাক হ্যাচাক করে। আলগহল ভেঙে পানমোহরার ডহর দিয়ে সাতঘরিয়া গ্রাম বাঁয়ে রেখে, চঞ্চলা জোড় পার হয়ে।

তূরীয়ানন্দে বিভোর সাহেবরা তখন আপন মনেই হেসে সারা।

জমিদারবাবুর নাচমহল। দামোদরের ধারে বিরাট বাড়ি। পাঁচিল ঘেরা কম্পাউণ্ড। সাজান বাগান। শীতল জলের পুষ্করিণী। রূপবতী কন্যারা সব হাসে, গান করে, পান খায়, মস্করা করে, তাস, পাশা, কড়ি খেলে, নাচে ও নাচায়। ওদের কাজই হচ্ছে অতিথিদের মনোরঞ্জন করা।

কত রকমের অতিথি আসেন। রাজা, জমিদার, রাজপুত্র, উচ্চপদস্থ

রাজকর্মচারী, ব্রিটিশ ডোমিনিয়নের শাসককুল, মালিক, ম্যানেজার ও চীফ মাইনিং ইঞ্জিনীয়ার যাঁর দ্বারা কিছু কাজ হতে পারে, যার কাছেই কিছু মালকড়ি আমদানি হতে পারে তাকেই নিয়ে আসেন নাচমহলে। একটা রাত থাকলেই মগজ বিলকুল সাফ হয়ে যায়।

উনি ঘোড়া থেকে নেমেই হাঁক-ডাক শুরু করে দিলেন—কইরে! চন্দনা, অঞ্জনা, কাবেরী, মধুস্মিতা!

এক ঝাঁক ফুলের মত যুবতী বেরিয়ে এল সাবলীল নৃত্যছন্দে।

উনি বললেন—যা তোরা তাড়াতাড়ি। সাজগোজ করে সরবৎ নিয়ে তৈরী থাক। দু'জন সাহেব আসছেন। ভাল করে তোয়াজ করবি। সে কি আর বলতে? ওরা সব খোঁপা বাঁধতে বসে গেল।

সাহেবরা ঘোড়াগাড়ি থেকে নেমে আরাম কেদারায় গা এলিয়ে দিলেন। মাইল তিনেক রাস্তা হ্যাচাং হ্যাচাং করে আসার দরুন নেশার তুরীয় ভাবটা কেটে গেছে। কেমন একটা অবসাদের ঝিমুনি আসছে। চাকররা টানা পাখা চালাচ্ছে।

মেয়েরা সব এসে পড়ল সুবাসিত সরবৎ নিয়ে। আর মেয়ে দেখে ওদেরও মন চাঙ্গা হয়ে উঠল।

মিঃ রায় বললেন—ওরা আপনাদের মনোরঞ্জনের জন্যই।

সাহেবরা খুব খুশি। মিঃ গ্রাণ্ডি বললেন—ইণ্ডিয়ানদের আতিথেয়তা অতি চমৎকার

পেস্তা বাদাম, কিসমিস দিয়ে হাল্কা সিদ্ধির সরবৎ। খেতে খেতে মন উড়ে গেল আসমানে। নাচমহলের নাচুনীরা তখন এক একটি পরী। কি তাদের রূপের বাহার। যৌবনের যাদুকরী মাদকতা।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল। দীঘির পাড়ে বড় বড় ছায়া নামল। সাহেবরা জলক্রীড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। যুবতীরা তাদের দীঘির পাড়ে নিয়ে এল। সেখানে আর কারও প্রবেশাধিকার নেই। মান সম্ভ্রম, লজ্জা, শরম তুলে রাখার সংরক্ষিত এলাকা।

দীঘির পাড়ে ল্যাদা আমের গাছ। শাখা প্রশাখা এগিয়ে গেছে জল অবধি। ওরা তর তর করে ওঠে আর জলে ঝাঁপ দেয়। সাহেবরা খুব মজা পেয়ে গেলেন।

গোধূলির অস্তরাগ প্রতিবিম্বিত হচ্ছে পুকুরের জলে। তির তিরে

ঢেউ ভেঙে দিচ্ছে নানাবর্ণের বিন্যাস। নতুন রঙে রাঙিয়ে দিচ্ছে জলের উপরিতল। গাছের ছায়া গাঢ থেকে গাঢ়তর হচ্ছে।

ওদের খেলা তখন দারুণ জমে উঠেছে। মেয়েদের গা থেকে খুলে গেছে লজ্জার আবরণ। খল্ খল্ কল্ কল্ হাসিতে লুটোপুটি খাচ্ছে। সাহেবদের কাঁধে চড়ে ডিগবাজী দিচ্ছে। বাহুবেষ্টনে হাঁস ফাঁস করছে। আবিল কামনার ঢেউ আছাড় পিছাড় খাচ্ছে। গোধূলির অস্তরাগে ঝিলমিল করছে জল। রতিরঙ্গের কত বিভঙ্গ প্রতিফলিত হচ্ছে সেই আরশিতে।

• আবদার, টুসকি, ফচ্‌কেমি, ফাজলেমি, হাসি মস্করা, নাচগান, শৃঙ্গার ও রতিরঙ্গে মেয়েরা সেদিন প্রাণ ঢেলে দিয়েছিল। সাহেবরা যখন ফিরে যাবার জন্য প্রস্তুত তখনও সুর কাটে নি। মনটা আকাশে পাখা মেলে উড়ছে।

মিঃ রায় জিজ্ঞাসা করলেন—আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থায় খুশি হয়েছেন?

মিঃ গ্রাণ্ডি জবাব দিলেন--ওহ্! ফাইন! এমন প্লেজার আমি জীবনে কখনো পাইনি। আপনি জানেন কি করে আনন্দ দিতে হয়?

মিঃ ব্যারাকলউ যোগ করলেন—একজাক্টলি সো! বলুন মিঃ রায় আপনার জন্য কি করতে পারি?

এই প্রশ্নটির জন্যই মিঃ রায়ের এত তোয়াজ তদবির। তবু মনের কথা চেপে রেখে বললেন—আপনারা মাঝে মাঝে আসবেন। আমোদ আহ্লাদ করবেন তাতেই ধন্য হব।

—সে তো আসবোই। আপনার নাচ গার্লদের কথা কখনো ভুলবো না। আমরা খুব বাধিত। আপনার জন্য কি করতে হবে বলুন।

—প্রজাদের খাজনায় জমিদারীর এত খরচ খরচা চলে না সাহেব। যদি কিছু রোজগার পাতির ব্যবস্থা করে দিতে পারেন তো ভালো হয়।

—সিওর। কি করবেন? রেজিং কন্‌ট্রাক্ট নেবেন?

—সেটা কি রকম?

—এই ধরুন কোলিয়ারি আমাদের কোম্পানির। যন্ত্রপাতি, ম্যানেজার, সুপারভাইজার সব আমাদের। আপনি কুলিকামিন এনে

রেজিং করাবেন। কোম্পানি প্রতিটন কয়লা তোলার দরদাম ঠিক করে দেবেন।

—তাতে আর কটা টাকা হবে ?

—অনেক টাকা। আপনার পুরো জমিদারীতে যা খাজনা আদায় হয় একটা কোলিয়ারি থেকে তারচেয়ে বেশি রোজগার হবে।

—আচ্ছা। তাই হবে। আমার বড় ছেলে চম্পক কলকাতায় পড়ে। এ বৎসর পড়া শেষ করে আসবে। ওর জন্যে একটা কিছু করে দিতে হবে।

—দ্যাটস রাইট ! অ্যাজ ফাদার আপনার তো কিছু ডিউটি আছে। আমার বিশ্বাস আপনার ছেলে যদি ঠিকমত চেষ্টা করে তবে আরো বড় কিছু করতে পারবে। আই মিন কোলিয়ারির মালিক হয়ে যেতে পারে।

—মে গড্ ব্লেস ইউ মিঃ ব্যারাকলউ।

মিঃ রায়ের সঙ্গে করমর্দন করে ওঁরা ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হলেন।

মিঃ রাধাগোবিন্দ রায়ের পূর্বপুরুষগণ লর্ড কর্ণওয়ালিশের আমল থেকে জমিদার। জমির ধান, পুকুরের মাছ, প্রজাদের খাজনা, বিভিন্ন ব্যবসা বাণিজ্য—এইসব উপার্জনেই নাচমহল রাখেন। তাঁদের নিজেদেরই বিশ ত্রিশ হাজার বিঘা সম্পত্তির তল স্বত্ব, উপর স্বত্ব। পানমাহরা, সাতঘরিয়া, দেওলটা, চিনসুরা, চাঁপাপুর, ছালট, ছ'ঘড়া প্রভৃতি সাতটি মৌজায় প্রায় পঞ্চাশ ষাটটি গ্রাম। সব গ্রামেই নিজস্ব চাষজমি ও কাছারী বাড়ি আছে। নায়েব গোমস্তা মিলিয়ে পনেরোজন বাবু। পঞ্চাশজন বরকন্দাজ। পানমাহরায় বিরাট অট্টালিকা। মেয়েদের গায়ে সোনা আছে সেরের ওজনে। ভরিতে কূল পায় না। এত ধনসম্পত্তি।

কিন্তু কখনো কয়লাশিল্পের দিকে নজর দেন নি। একবার চোখ ফুটিয়ে দিয়েছিলেন প্রিন্স ট্যাগোর। তারপর অনেকদিন কেটে গেছে। তাঁর মালিকানাও বে-হাত হয়ে গেছে। তবু একটা উদাহরণ।

মিঃ রায় বুঝেছিলেন বাণিজ্যে বসতেঃ লক্ষ্মী। আর হাতের কাছে যখন কয়লা রয়েছে তখন সপ্তডিঙা মধুকর স্বপ্নের জগতেই থাক। যে কয়লা পুড়িয়ে বাষ্প হয়, রেল ইঞ্জিন চলে, হলেজ চলে, পাম্প দিয়ে জল

নিষ্কাশন হয় তার ক্ষমতা কম নয়। স্টিভেনশন সাহেবকে ধন্যবাদ। তিনি লিঙ্কমোশান প্রয়োগ করেছিলেন বলেই স্টীম ইঞ্জিনের জান্তব ক্ষমতায় শিল্প জগতে বিপ্লব এসে গেছে।

তেমনি আরেক সাহেব মিঃ ওয়াট। আকাশের বিদ্যুৎ যে তারের কুণ্ডলীতে চলাচল করে শক্তির রূপান্তর ঘটায় তা আগে কেউ জানতো না। আজ সেই বিদ্যুৎ যেন এক শক্তিমান যাদুকর।

॥ নয় ॥

একটা সুড়ঙ্গের মধ্যে একপাল কামিন মুখ চুণ করে বসেছিল। তাদের কারো হাঁটু কনুই ছুলে রক্ত বেরুচ্ছে। কারো নাক দিয়ে রক্ত ঝরছে। কারো শাড়ি পুড়েছে। কারো ফ্যানাড়ী। কারো বা মুখ ঝলসে চুল পুড়েছে। কারো গায়ে ফোস্কা উঠেছে। ভয়ে মুখ বিবর্ণ। ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। কেউবা পেচ্ছাব পায়খানায় কাপড়-চোপড় নোংরা করে বসে আছে।

তথাপি একজন সরদার ধমক দিচ্ছে—কি হবেক কি? এইটি খাদ বটে। অমন দু-চারজন হরদম মরছে-হারাচ্ছে। তাই বলে খাদের কাজ বন্ধ হবেক নাকি? তুরা কি মনে করেছিস? পালাঞে বাঁচবি? বারকুলি সাহেব যদি জানতে পারে এখনি চাপরাশী দিঞে চাবকাঞে পিঠের ছাল তুলে দিবেক। খবরদার কেউ খাদ থেকে পালাবি না।

ওর কোন কথা মেয়েদের কানে যাচ্ছে না। ওদের চোখে এখন নীল আলোর নাচানাচি। গোটা সুড়ঙ্গ জুড়ে আগুনের হররা।

ঘণ্টাখানেক আগেই দুর্ঘটনাটা ঘটে গেছে। দু' পালি কাজ। সকাল ছটা থেকে সন্ধ্যা ছটা। আর সন্ধ্যা ছটা থেকে সকাল ছটা। ১২ ঘণ্টা করে পালি। শেরগড় কোলিয়ারির ৮ নম্বর খাদে ১২ নম্বর পশ্চিম সুড়ঙ্গের রাতপালির লোকজন উঠে গেছে। দিন পালির কুলি-কামিন কাজে এসেছে।

যে সব কুলি গাঁইতি দিয়ে কয়লা কাটে তাদের বলে মালকাটা ওরা যে কয়লা কাটে তা কামিনরা ঝোড়ায় করে বয়ে এনে টব গাড়িতে

বোঝাই করে। টব গাড়ির লাইন থাকে অনেক দূরে প্রায় চার পাঁচশ ফুট। অতটা পথ মাথায় করে বোঝা বইতে হয়। সেজন্য এক একটি মাল কাটার সঙ্গে দু'তিনটি কামিন থাকে। এক গাড়ি ভর্তি করলে ছয় আনা। ওরা সব ঠিকাদারের কুলি কামিন। প্রায়শ বাপ ব্যাটা মেয়ে বৌ নিয়ে দল বাঁধে। এক এক সুড়ঙ্গে এক এক পরিবার। অবশ্য এই ছোট দল বাঁধার মধ্যে এক পরিবারের লোক কম পড়লে অন্য কুলি কামিনও নেওয়া হয়। সেসব সরদাররাই ঠিক করে দেয়। আবার থাকে দলছুট কুলি কামিনের দল। তারা সব এদল সে দল থেকে বাদ পড়ে, একা পড়ে যায়। সরদাররা তাদের জনকয়েককে একত্র করে দল বেঁধে দেয়। তেমনি একটা কামিনের দল সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে যেখানে কয়লা কাটা হয় সেখানে যাচ্ছিল। ওদের দলের দুটো মালকাটা তখন ঝামা ইঁট দিয়ে ঘষে ঘষে গাঁইতির ডগায় শান দিচ্ছিল।

সেটা তো ডিবরী বাতির যুগ। আগে আগে বাতি জ্বালিয়ে ঢ্যাঙ্গি যাচ্ছিল ট্যাঙস্ ট্যাঙস্ করে। সাঁওতাল কামিনী স্বামী ছাড়া, তালা কুড়ি। দুটি অপোগণ্ড জারজ সন্তানের জননী। ছাতাবড়ায় কুঁড়ে বেঁধে থাকে। কাজ করে শেরগড়ে। রাসমণির সরদারিতে। হঠাৎ কি যে হল ওর হাতের ডিবরী বাতিটা দপ্ করে জ্বলে উঠল। সুড়ঙ্গেব ছাদ বরাবর একটা নীল আগুন ভাসতে ভাসতে চলে গেল এক পলকের মধ্যে। ঢ্যাঙ্গি তৎক্ষণাৎ পুড়ে ঝামা হয়ে গেল। সর্বাঙ্গ কুঁকড়ে কালো আঙার। পিছনের মেয়েগুলো যেখানে সেখানে আছাড় খেয়ে পড়ল। কেউ বা আগুনে ঝলসে গেল।

মাইনিং সরদার জন দুই কুলি দিয়ে ঢ্যাঙ্গির পোড়া লাশটা টেনে নিয়ে গেছে। বাকি কামিনগুলো ভয়ে কাঁপছে। তারা সব আহত ও ক্ষত বিক্ষত। খাদ ওদের কাছে বিভীষিকা। পোড়া ঝামা সঙ্গিনী ও নীল হলুদ আগুনের নাচ দেখেই ওদের প্রাণ উবে গেছে।

তবু পালাবার জো নেই। খাদে মাইনিং সরদার, উপরে লেবার সরদার। পালাতে গেলে চাপরাশীর লাঠি। মরণ ওদের দুদিকেই।

ঠিক সেই সময়েই শেরগড় কোলিয়ারীর অফিসে বসে ব্যারাকল্যাউ সাহেব মিঃ গ্রাণ্ডিকে বোঝাচ্ছিলেন—কি করে বলছো ভারতের

কয়লাখনিতে কসাইখানা চলছে? তাহা মিথ্যা কথা। কম করেও বিশটা কোলিয়ারী ঘুরে দেখলে তো? কোথাও কিছু পেয়েছো? হার মেজিস্টিকে কথাটা বুঝিয়ে বলবে। পার্লামেণ্টে বিরোধী পক্ষরা ছোট খাট ব্যাপার নিয়ে হৈ চৈ করে। এটা ওদের স্বভাব। সেজন্য হার মেজেস্টি বিচলিত কেন?

মিঃ গ্রাণ্ডি তখন বেঙ্গল কোল, ইকুইটেবল, বীরভূম কোল কোম্পানি, গোবিন্দ পণ্ডিত, শিবকিষ্ট দা, আপকার এণ্ড কোম্পানি, বরাকর কোল, বার্ড এণ্ড হিলজারস ইত্যাদি কোম্পানির কোলিয়ারী পরিদর্শন সেরে প্রাথমিক প্রতিবেদন তৈরী করার তোড়-জোড় করছিলেন।

মিঃ গ্রাণ্ডি বললেন ভারতের কয়লাখনি প্রথম চালু হয় ১৭৭৪ সালে। যদিও তারপর চল্লিশ বৎসর কোন কাজ হয়নি। তবু ১৮১৪ সাল থেকে তো ঠিকমতো চলছে। তাহলে সেই শুরু থেকে এই একশ পনেরো বছরে কি ডেভলপমেণ্ট হয়েছে?

—তেমন কিছু হয়নি। আসলে রেল লাইন চালু হবার আগে তো কয়লার বাজার ছিল না। শিল্প বিপ্লব না ঘটলে কয়লার কদর আসবে কোথা থেকে? তবে বলে রাখলাম একশ বছর পরে ইণ্ডিয়াতে কোল রাশ হয়ে যাবে। চাহিদা এত বাড়বে যে তা পূরণ করা দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়াবে। কারণ ততদিনে সাঁকতোড়িয়া, ডিসেরগড়, কোযেথী, পনিয়াটী সিমের কয়লা শেষ হয়ে যাবে।

—ততদিন বৃটিশ রাজত্ব থাকবে তো?

—লং লিভ দ্যা কিং!

এমন একটা সংলাপের পর একটু স্বাস্থ্য পান না করলে চলে না। কিং কি করে দীর্ঘজীবী হবেন? এইসব ব্যক্তি বর্গের শুভাকাঙ্খায় তো! বেয়ারাকে ডেকে হুকুম দিলেন—বিয়ার লে আও। হঠাৎ অর্বাচীন মূঢ় হেড গোমস্তা রাম নগিনা মিশ্র হন্তদন্ত হয়ে অফিসে ঢুকে বললেন—হুজুর! খতরা হো গইল।

—হোয়াট?

—বারো নম্বর পছিয়া সুঁদে গরম গ্যাস আগ্ পাকড়ে লিলো সাব। ঔর একঠো জানানা পুড়িয়ে মরিয়ে গেলো।

—মাই গড। তোমরা কি করলে?

—ক্যা করব সাব? মুর্দা উঠাকর সালুঞ্চী ছ'নম্বর চানক পর গিরায়ে দিলাম।

—কেন? ওখানে ফেললে কেন?

—ক্যা করব সাব? উ জানানার কোই আপনা আদমী নাই। মাঝি লোগ বলিয়ে দিলো উ জাতের বাহার আছে। হামরা উঁয়ার লাশ জ্বালাতে লিয়ে যাবো না।

—মাই গড! সাঁওতালদেরও মৃতদেহ সৎকারে এত কুসংস্কার।

মিঃ গ্রাণ্ডি বললেন—একসিডেন্ট? ফায়ার ড্যাম্প গ্যাসে আগুন। মানে মিনি এক্সপ্লোসান বলুন। ভেরী ডেনজারাস। ব্যাপারটা দেখা উচিত। কি বল মিঃ ব্যারাকলউ?

মিঃ ব্যারাকলউ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন—আরে ওসব কি দেখবে? আমাদের জমিনদার ফ্রেণ্ড মিঃ রায় দেশী মহুয়ার ফার্স্ট ক্লাস লিকার পাঠিয়েছে উইথ টু নেটিভ গার্লস। ফুললি ডেভলপ্‌ড। ওয়াইলড বিউটি। বাংলোতে চল। লেট আস এনজয়।

উনি এখন মিঃ গ্রাণ্ডির কাছে একসিডেন্টের ব্যাপারটা লুকোতে চান। কোন রকমে ধামাচাপা দিয়ে ওকে অন্যদিকে মনোযোগী করা। দেশী মহুয়া এবং দেশী মেয়েদেব সেক্সে ভাসিয়ে দেওয়া।

কিন্তু ভবি ভুলবার নয়। মিঃ গ্রাণ্ডি আদিরসে যতই প্রলুব্ধ হন ডিউটি বস্তুটাকে নস্যাৎ করে দিতে পারেন না। এটা ওদের জাতির বিবেক। তা না হলে ভাবতে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে পারতো না। সুলতান মামুদ, বখতিয়ার খিল্‌জী, মহম্মদ ঘোরী, ভাস্কর পণ্ডিত আব কতটুকু ধনরত্ন লুণ্ঠন করতে পেবেছেন? ওঁরা তো রাজারাণী, বাদশা বেগমদের অস্থাবর ধনদৌলত নিয়েই মহা খুশি। কিন্তু ব্রিটিশ রাজশক্তি লুণ্ঠন করছে মানুষের ঘাম, কলিজার খুন, মগজের বুদ্ধি, ফুসফুসের হাওয়া, ধরিত্রীর গুপ্ত ধনভাণ্ডার। তার আবার গালভরা নাম—শিল্প বিপ্লব।

মিঃ গ্রাণ্ডি বললেন—ধন্যবাদ মিঃ ব্যারাকলউ! ইণ্ডিয়ান সেকস এণ্ড লিকার দুটোই আমার ভাল লেগেছে। কিন্তু এলাম একসিডেন্টের ব্যাপারে তদন্ত করতে আর একটাও দেখতে পেলাম না। ফরচুনেটলি

হাতের কাছে যখন একটা দুর্ঘটনা ঘটেই গেছে তখন সেটা দেখে আসি।

মিঃ ব্যারাকলউ হাত কামড়াচ্ছেন। যত রাগ গিয়ে পড়ল হেড গোমস্তার উপর। ফাকিন, ননসেন্স পুলিসের কাছে চোরের খবর দিতে এলে। ব্লাডি, বাস্টার্ড, সান অফ বীচ। খাদানমে খবর করো। হামলোগ যাতা হ্যায়।

তখনকার মাইনিং অপারেশন ছিল র‍্যাট হোল মেথডসের। মোর হোল মোর কোল ফরমূলা। পোষাকী নাম বর্ড এণ্ড পিলার। নিয়মমাফিক দাবার ছকের মত সুড়ঙ্গ কাটা হত স্তম্ভ রেখে। বিশ ত্রিশ ফুট লম্বা-চওড়া স্তম্ভ। বার-চোদ্দ ফুট চওড়া সুড়ঙ্গ। বাস্তবে কিন্তু সুড়ঙ্গটাই চওড়া হয়ে যেত বিশ ত্রিশ ফুট। ফলে ছাদ ধ্বসে পড়ত। লোক মরত। খাদ বন্ধ হত।

বায়ু চলাচলের কোন বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা ছিল না। মাঝে মাঝে দু' একটা হাওয়া চানক খোঁড়া হত বায়ু নিষ্কাশনের জন্য। অথচ মাটির নীচে প্রতি সত্তর ফুট গভীরতায় এক ডিগ্রী ফারেনহাইট তাপমাত্রা বাড়ত। স্তরীভূত শিলায় অক্সিডেসন হত। মানুষ ও ঘোড়ার শ্বাস প্রশ্বাস। স্টিম পাম্প চলার দরুন বাষ্প উদগীরণ। সবই তাপমাত্রা বাড়িয়ে তোলার কারণ। বায়ু স্রোতের কোন গতিবেগ থাকতো না। সব মিলিয়ে সে এক শ্বাসরোধকারী অবস্থা।

মালকাটারা কয়লা কাটতে কাটতে মনে করত এই বুঝি দম ফেটে মরে যাবে। কত কুলি কামিন সেই গরমে অজ্ঞান হয়ে যেত। হিটস্ট্রোক হয়ে মারা যাবার ঘটনাও আছে।

তারপর যদি সেখানে ফায়ার ড্যাম্প গ্যাস বেরিয়ে যায় তবে তো কথাই নেই। এরই নাম গরম গ্যাস অথবা মার্শগ্যাস। বায়ুর অর্ধেক ভারী। ছাদ বরাবর স্তরীভূত হয়ে বিচরণ করে। কয়লাস্তরের ফোরে ফোরে থাকে। জন্ম সেই আদিকালে যখন কয়লার উৎপত্তি। কোন কোন উদ্ভিদের ছাল বাকল, পাতা পচে সৃষ্টি হয়। সুড়ঙ্গ পথে কয়লা কাটা হলেই নিরেট কয়লাস্তর থেকে বেরিয়ে সুড়ঙ্গের ফাঁকা জায়গায় স্থান করে নেয়। কোথাও ধীরে ধীরে বের হয়। কোথাও

বা সাপের মত গর্জন করতে করতে। সেগুলোকে বলে ব্লোয়ার। আবার কখনো প্রচণ্ড শক্তিতে ভূমিকম্পের মত খাদ কাঁপিয়ে, পিলার ধ্বসিয়ে বেরিয়ে আসে। তাকে বলে আউট বার্ষ্ট। তার কবলে পড়লে আর প্রাণে বেঁচে কাজ নেই।

বারো নম্বরে একটি ব্লোয়ার বেরিয়েছিল। সাপের মত গর্জন করতে করতে গ্যাস বেরিয়ে ঘণ্টা খানেকের মধ্যে সুড়ঙ্গটা অধিকার করে নিয়েছিল। হতভাগী ট্যাঙ্গি তার কি জানে? সে ডিবরী বাতি নিয়ে ভিতরে ঢুকেছিল। আগুনের ছোঁয়া মাত্র গ্যাসও দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। তারপর তা আপনা থেকেই নিভে গেল।

হতে পারত একটা ব্যাপক বিস্ফোরণ। হল না। কারণ বায়ু চলাচল এতই অবরুদ্ধ যে আগুনটা বিস্তার লাভ করার মত অক্সিজেন পায় নি। আর কে না জানে দাহ্য পদার্থ, অক্সিজেন ও আগুনের ফুলকি ছাড়া আগুন ধরতে পারে না। এই তিনটি চাই-ই। দাহ্য পদার্থ সেখানে প্রচুর ছিল। যদি কয়লা গুঁড়োর সংস্রবে আসতে পেত আর খাদের বাতাসে অক্সিজেন থাকত তবে সেইদিনই হয়ে যেত এক প্রলয়ঙ্করী বিস্ফোরণ। হল না—তা ঈশ্বরের অনুগ্রহ।

সর্বকালে সর্বদেশে এই ফায়ার ড্যাম্প গ্যাস এক জ্বলন্ত সমস্যা। বিষধরী সাপের চেয়েও ভয়ঙ্করী। সাপের ছোবলে তো একজনের প্রাণ যায়। ফায়ার ড্যাম্পের ছোবলে যে কত মানুষের প্রাণ যায় তার হিসেব নেই। পৃথিবীর ইতিহাসে কত বিস্ফোরণ, কত ধ্বংস, কত মৃত্যু। এক-একটা বিস্ফোরণ এক-একটা খাদকে ছারখার করে দিয়ে যায়। অশ্রু নদীর ধারা বয়।

যুগে যুগে এই সমস্যার মোকাবিলা করতে মাইনিং ইঞ্জিনিয়াররা নাজেহাল। কুলোর বাতাস দিয়ে বিদেয় করা ছাড়া জো নেই। অর্থাৎ খাদের বায়ু প্রবাহের গতিবেগ ও পরিমাণ এমন রাখতে হবে যেন গ্যাস নিরেট কয়লাস্তর থেকে বেরুতে বেরুতেই বাতাসে গলে বিপদ সীমার নীচে চলে যায়।

আর আদি যুগে ফায়ার ড্যাম্প গ্যাসকে পুড়িয়ে দেওয়া হত। মানে ঐ ট্যাঙ্গির মতই অপারেশন আর কি? তবে কিছুটা সাবধান হয়ে। সে কাজ যারা করত তাদের বলা হত ফায়ারম্যান।

কোথাও গ্যাস হলে ভিজে কম্বল গায়ে মুড়ি দিয়ে লাঠির ডগায় আগুনের শীষ বেঁধে মেঝের উপর গড়িয়ে গড়িয়ে সেই গ্যাসে আগুন ধরানো হত। এটা জানা কথা যে গ্যাসটা থাকবে ছাদের নীচ বরাবর। মেঝেটা নিরাপদ। তাই কি হয়? আগুন নিয়ে খেলা। কখন যে কাকে পুড়িয়ে ঝামা বানিয়ে দেবে কে বলতে পারে? সাধ করে মরণ আর কাকে বলে? এ পদ্ধতি বন্ধ হয়ে গেল।

॥ দশ ॥

সিঁড়ি খাদের মুখ দিয়ে নেমে এগিয়ে যাচ্ছেন ওঁরা। খট খট বুটের শব্দে কুলি-কামিনদের বুকের রক্ত হিম হয়ে যাচ্ছে। বারো নম্বর গোলাইয়ে পেয়ে গেলেন সেই মাইনিং সরদারটিকে। কাঁথিতে যোগান দিয়ে ওর পেটের উপর লাঠির ডগাটি চেপে দাঁত কিড়মিড় করে বললেন—শ্যালো, তুমকো কিস্ লিয়ে রাখা? টু ফাক্ দ্যা কামিনস্। কাহে নেহি দেখা যো সুঁদমে গরম গ্যাস হ্যায়?

এক লাঠিতেই চৈতন্য হয়ে গেছে ওর। এতক্ষণ কামিনদের ধমক দিচ্ছিল। এবার বাঘের মুখে পড়ে কেঁউ কেঁউ করতে লাগল।

—আমরা কুনু দোষ নাই সাহেব। কামিনগুলান মস্ত ঢ্যাঁটা। আমাকে না বলেই সুঁদে ঢুকেছিল। এই দেখুন একঘণ্টা ধরে বুঝাছি তবু কাজ করছে নাই। বলছে ডর লাগছে।

ক্যা ডর হ্যায়? বুলাও হামার পাশ।

হুকুম পেয়েই সে কামিনগুলোকে ছাগলের মত তেড়ে নিয়ে এল। ওদের দশা তখন বুচড় খানার ছাগলের মতই।

একসিডেন্টকে যাঁরা ফরচুনেট বলে বর্ণনা করেন তাঁদের চোখে কামিনের আবরু কি? তবু তো তারা সব বুড়ো হাবড়া, তাল ত্যাপড়া। জনদুই অল্প বয়সী পাছাভারী মেয়ে ছিল যাদের গামছা ফ্যানাড়ীর আবরণটুকুও লাঠি দিয়ে সরিয়ে টর্চের ফোকাস দিলেন। হতভাগীরা মরমে মরে গেল। নীল আগুনের নাচ দেখে যাদের ভয়ে বুক গুড়-গুড় করছে সাহেবদের চোখ যেন তাদের কাছে তীরের

ফলা। হাঁটু মুড়ে উপড় হয়ে পড়ল। ডান পা-বাঁ পা হু'পায়ের ছুটি বুটশুদ্ধ লাথি ঝেড়ে ব্যারাকলউ সাহেব গর্জন করে উঠলেন—হাঁটো হিঁয়াসে। গো আউট।

ওঁরা এসে দাঁড়ালেন সে সুঁদটার মুখে। ইতঃস্তত করছেন ঢুকবেন কিনা? ভিতর থেকে ব্লোয়ারের হিস হিস শব্দ ভেসে আসছে। সামনে কুয়াশার মত বায়ুস্তর। নাকে একটা কটু গন্ধ লাগছে। পোড়া গন্ধ।

মিঃ ব্যারাকলউয়ের হাবু সাহেবকে মনে পড়ল। মাইনিং সরদারকে জিজ্ঞাসা করলেন—হাবু সাহেব কোথায়?

—উনি ছেলের অন্নপ্রাশনের জন্য একদিন ছুটি নিয়েছেন হুজুর।

—ব্ল্যাডি ফাকিন্। হরেক সাল সাদী আর বালবাচ্চার প্যায়দা। তোমাকে আমি বাবু থেকে সাহেব বানালাম কি বাচ্চা প্যায়দা করার জন্য? শুয়াবকা বাচ্চা—তোমাকে আমি স্যাক্ করবো।

হাবু সাহেবের প্রতি বিষোদ্গার করে সুড়ঙ্গ পথে ঢুকতে যাবেন মিঃ গ্রাণ্ডি বললেন আর ভিতরে যাওযা ঠিক হবে না। কারবন মনোক্সাইড (খুনী গ্যাস) প্যায়দা হতে পারে।

মাইনিং সরদার বাহাদুরী নেবার জন্য বলল—হুজুর। আমি গিয়ে দেখে আসবো?

—নো। এ সুঁদটা বন্ধ করে দাও।

ব্যস। বন্ধ হয়ে গেল। আবার যে কবে খুলবে তা লর্ড যীশাস-ক্রাইষ্টও জানেন না। গ্যাস তাড়াবার একমাত্র উপায় বাতাস। তার বড়ই অভাব। প্রাকৃতিক নিয়মে যেটুকু বাতাস আসে তাতে মানুষ-জনের শ্বাসপ্রশ্বাস চলাই দায়। আবার গ্যাস তাড়ানো। ওসব হবার নয়।

মিঃ গ্রাণ্ডি বললেন—খাদ তো তোমার অনেকদূর এগিয়ে গেছে। বাতাস নেই বললেই চলে। একটা হাওয়া চানক খুঁড়ছো না কেন?

—হ্যাঁ। প্ল্যান করেছি। চানক কাটাইয়ের লোক পাচ্ছি না। দেখি বেশি হাজরি দিয়ে যদি পাওয়া যায়।

—কেন তোমরা ফ্যান বসাবার কথা ভাবছো না? একটা হাওয়া চানক করে যদি এক্সহষ্ট ফ্যান বসাতে পারো তবে বায়ু চলাচলের সমস্যা সমাধান করতে পারবে।

—হ্যাঁ। সেকথাও ভেবে দেখেছি। একটা ফ্যানের ডিজাইনও করেছি। কিন্তু আমাদের ইঞ্জিনিয়ার মিঃ নটন তো আসলে কামার-মিস্ত্রী। ওঁর মিসেস বস্তুত একটি গণিকা। মিঃ হ্যামিলটনের সঙ্গে অবৈধ-সম্পর্ক। সেই সুবাদে বিলেতের ব্ল্যাকস্মিথ ভারতে এসে ইঞ্জিনিয়ার হয়ে গেলেন। প্ল্যান সেকসান বোঝেই না। এবার আমাকেই দাঁড়িয়ে থেকে করাতে হবে।

ফিরতি পথে হাঁটতে হাঁটতে এমন তরো আলোচনা হচ্ছিল।

মিঃ গ্রাণ্ডি বললেন—কিন্তু ডেডবডিটা দেখা হল না তো।

—আরে ওটা দেখে কি করবে? ব্ল্যাক উওম্যান আগুনে পুড়ে ঝামা হয়ে গেছে। হোয়াট মোর?

—তাহলেও আমার দেখা কর্তব্য। চল না সালুঞ্চী খাদের ছয় নম্বর চানকে ফেলেছে বলল সে।

—আজ পাঁচ সাত বছর যাবৎ ও খাদটা বন্ধ। ঢোকার কোন রাস্তা নেই। সিঁড়ি মুখটা ধসে গেছে। চানক দিয়ে নামতে পারবে না। যতসব বিষাক্ত সাপের আড্ডা।

—চল না? দেখি গিয়ে। যদি ঢুকতে পারি সেও তো একটা এডভেঞ্চার। এইসময় সরদারটি বলে উঠলো—ছ-নম্বরে যদি যাবেন সাহেব তবে বন্দুক নিয়ে যাবেন।

—কেন? কেন? মিঃ গ্রাণ্ডি কৌতুহলী হয়ে উঠলেন।

—ওখানে শিয়াল থাকে। হুড়াল থাকে। নেকড়ে বাঘ।

—মাই গড! খাদের মধ্যে ফক্স, টাইগার ভেরী ইন্টারেষ্টিং।

মিঃ ব্যারাকলউ বললেন—নো নো। উলফ্।

—তবে তো দেখতেই হবে। হাণ্ট করতে হবে। ওহ্! নাইস। একটা ফক্স কিংবা টাইগার যদি মারতে পারি তবে বিলেতে চামড়া নিয়ে যাবো। আমার মিসেস ভীষণ খুশি হবে।

রাগে ব্যারাকলউ সাহেবের মাথার রক্ত চড়ে গেল। বুড়বক সরদারটির পাছায় ভারী বুটের একটা ফ্রি কিক্ ঝেড়ে বললেন উল্লু কা বাচ্চা—আমাদের কথার মাঝে তোর কথা বলার দরকার কি?

ছ' নম্বর চানকের রহস্য তো ওঁর জানতে বাকি নেই।

ব্লাডি নেটিভগুলো এখনো সহবৎ শিখল না। এবার মিঃ গ্রাণ্ডিকে কি করে নিরস্ত করবেন? ওঁর মাথায় যে এডভেনচারের নেশা।

ছয় নম্বর চানকের মুখে কচি-কচি পাতা ফেলে একটা বটগাছ বহালতবিয়তে বেড়ে চলেছে। চানকের গায়ে শিকড়ের জাল। ইটের দেওয়াল ধসে গেছে। কাছে দাঁড়াতেই বিশ্রী পচা দুর্গন্ধে পাকস্থলী মোচড় দিয়ে উঠল মিঃ গ্রাণ্ডির।

বললেন—মাই গড! এত দুর্গন্ধ কেন?

—গরু-বাছুর পড়ে মরে গেছে বোধহয়।

—এখানে দড়ি ধরে নামা যাবে না?

—প্রায় একশ ফুট গর্ত। দৈবাৎ দড়ি পিছলে গেলে নির্ঘাৎ মৃত্যু।

—চল তাহলে সিঁড়িমুখ দিয়েই নামার চেষ্টা করি গে।

কাঁধে বন্দুক, হাতে টর্চ নিয়ে সিঁড়িমুখে এলেন। একটা ধস নেমে মুখটা বন্ধ করে দিয়েছে। উপর থেকে পাথর ঝুলে আছে। যে কোন মুহূর্তে ধসে পড়তে পারে। এখানেও গাছের শিকড়। বট ও শিশুগাছের চারা গা জড়াজড়ি করে লকলকে পাতায় ভরে আছে। গুটি কয়েক শিঁয়াকুলের লতানো ডাল সিঁড়িমুখে ঝুলছে।

কিন্তু মাংসাশী জীবজন্তুও কম সিয়ান নয়। ধস ও দেওয়ালের মাঝে যে একটুখানি ত্রিভুজাকৃতি পরিসর তার মধ্য দিয়েই চলাচলের পথ করে নিয়েছে। মিঃ গ্রাণ্ডি বললেন—ঐ পথ দিয়েই ঢুকবো।

ভদ্রলোকের ভয়-ডর বলে কিছু নেই। ব্যারাকলউ সাহেব এতভাবে নিরস্ত করার চেষ্টা করলেন কিন্তু কিছুই শুনলেন না। হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়লেন। অগত্যা ব্যারাকলউ সাহেবও তার সঙ্গী হলেন। ফুট বিশেক যাওয়ার পর প্রশস্ত সুড়ঙ্গ পথ। এদিক সেদিক ছুঁচো চামচিকের ছুটোছুটি। বিশ্রী দুর্গন্ধ। মাথার উপর ঝুলন্ত পাথর। মাকড়সা জাল বুনেছে। পায়ের পাতায় জল ছপ্-ছপ করছে। ঢালু পথ। প্রতি মুহূর্তে পিছলে পড়ার আশঙ্কা। খুব সাবধানে এগুচ্ছেন। একটা বাঁক ফিরতেই দেখলেন দু'জোড়া নীলকান্তমণি দপ দপ্ করে জ্বলছে। মিঃ গ্রাণ্ডির চোখ দুটোও দপ্ করে জ্বলে উঠলো। জিজ্ঞাসা করলেন—কিসের চোখ?

—সম্ভবত ফক্স।

আর একটু এগিয়ে বন্দুক বাগিয়ে ধরলেন তখন ওরা সরে পড়ল। দুর্গন্ধ তীব্র হয়ে উঠল। নাকে রুমাল চাপা দিয়েও রক্ষা নেই। ভীষণ গুমোট। সামনে পুঞ্জীভূত কালো ধোঁয়া। জামা প্যান্ট ঘামে ভিজে সপ্ সপ্ করছে। চোখ জ্বালা করছে। মাঝে মাঝে কাঠ খুঁটোর সঙ্গে ধাক্কা লেগে যাচ্ছে। তখন চাল পড় পড় অবস্থা। ভয়ে গা ছম্ ছম্ করছে।

এতক্ষণ ভয়ডর ছিল না। কিন্তু ঐ দুর্গন্ধটা যত বাড়ছে তত যেন শ্মশানের বিভীষিকা ওদের পেয়ে বসছে। দুটো শেয়াল খ্যাক্ খ্যাক্ করে উঠল। শব্দ লক্ষ্য করে বন্দুক তাক্ করলেন। দেদীপ্যমান নীল চোখ সরে গেল। শিয়াল দুটো যেন ওদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে। মিঃ গ্রাণ্ডি বন্দুক তাক করে ফায়ার করলেন। গুড়ুম শব্দ গুম গুম প্রতিধ্বনিতে সুড়ঙ্গ পথ কাঁপিয়ে তুলল। গুটি কয়েক কাঠের খুঁটো খুলে পড়ল। চালের পাথর খানিকটা ধসে পড়ল।

অনেকক্ষণ পর ধোঁয়াটা একটু ফিকে হল। আরো দু'তিনশো ফুট এগিয়ে এক ভয়ঙ্কর দৃশ্যের সামনে দাঁড়িয়ে দুজনেই চমকে উঠলেন।

রাশিকৃত কঙ্কাল! ছিন্ন ভিন্ন মৃতদেহ!

মিঃ গ্রাণ্ডি চিৎকার করে উঠলেন—মাই গড! সো মেনি ডেড বডিজ। ওহ্ হরিবল্?

সে এক বিভীষিকা! গাছপালার ফাঁক দিয়ে চানকের মেঝেতে সূর্যের আলো পড়েছে। এদিক সেদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে হাত, পা, মাথা ধড়ের রাশিকৃত হাড়। কোন কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গে পচা মাংস লেগে আছে। একটা কাঁচা, একটা পোড়া মৃতদেহ। তারমধ্যে পোড়াটা তো আজকেরই দুর্ঘটনায় মারা গেছে। কিন্তু কাঁচাটি কোথা থেকে এল?

সম্ভবত মার্ডার কেস। কেউ হত্যা করে ফেলে দিয়ে গেছে।

মিঃ গ্রাণ্ডি বললেন—বুচারির চরম নিদর্শন দেখলাম মিঃ ব্যারাকলউ! এটাকে কসাইখানা ছাড়া কি বলা যেতে পারে? ব্রিটিশ পার্লামেন্টে কেন প্রশ্ন উঠবে না? আমরা সুসভ্য ইংরেজ জাতি। মানুষ মারতে হলেও তার একটা কারণ খাড়া করতে হবে। হত্যাকাণ্ডেরও একটা

সফিসটিকেট ম্যানার্স চাই। এত ক্রুড, এত বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ড কয়লা কুঠিতেই চলতে পারে। মিঃ ব্যারাকলউ—ইউ আর ক্রিমিন্যাল। এ ব্রুটাল মার্ডারার।

মিঃ ব্যারাকলউ কোন কৈফিয়ৎ খুঁজে পেলেন না।

খবর ছড়িয়ে পড়ল শেরগড়, সাসুঞ্চী, হাটনল, সিদাবাড়ী, ছাতাবড়া, মৌল পাহাড়ীতে। লেবার সরদার, মাইনিং সরদার, খাজাঞ্চীবাবু, গুদামবাবু, লোডিংবাবু, গোমস্তা সবাই সাহেব অন্ত প্রাণ। সাহেব হাসলে হাসেন, সাহেব কাঁদলে কাঁদেন।

তাই এখন ওদের কান্নার সময়। সাহেব তাঁর বন্ধুর কাছে বড় বেইজ্জত হয়ে গেছেন। এটা বড়ই দুসংবাদ। না জানি সাহেবেব সে রাগ কার উপরে পড়বে ? কে তাকে ঠাণ্ডা করতে পারবে ?

॥ বেগার ॥

সেদিন হাবু সাহেবের ঘরে ছিল ভোজের আয়োজন। দু' দুটি ছেলের অন্নপ্রাশন। একটি তাঁর বড় ছেলের প্রথম সন্তান। অন্যটি তাঁর চতুর্থ পক্ষের স্ত্রীর প্রথম সন্তান। সেজন্য কোলিয়ারির বাবু, সবদারদের নিমন্ত্রণ অবশ্যই ছিল। সাহেবের জন্যও ডালি পাঠিয়ে দিয়েছেন।

রান্নাবান্না চলছে। নিজে হাফ প্যাণ্ট ছেড়ে ধুতি পরে খালি গায়ে মোড়ার ওপর বসে পৈতেতে মাঞ্জা দিতে দিতে মাংস তৈরির ফরমাস দিচ্ছিলেন। হঠাৎ এক টাট্টু ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে গোমস্তাবাবু হাজিব।

হাবু সাহেব চমকে গেলেন। মিছিরবাবু নিরামিষ খান। ভোজ-বাড়িতে পাতা পাড়েন না। তিনি নিজে যখন এসে পড়েছেন তখন ব্যাপার গুরুতর।

বৈঠকখানা ঘরে চৌকির উপর বসতে দিয়ে বললেন, ওরে কে আছিস ? মিছিরবাবুর জন্যে মিষ্টি নিয়ে আয়। ঠাণ্ডা সরবৎ।

উনি বললেন, হাঁ হাঁ—এতো জলদির কোই বাৎ নেই।

—কি ব্যাপার বলুন তো ?

—বহুত আফৎ। ক্যা কহি, খাদান পর বড়ি শিখায়েৎ হো গইল।

এত্তা এত্তা মূর্দা হাবিস হো গইল ওকরা কোই শিখায়েৎ নহী। লেকিন এক রণ্ডী আওরৎ হমলোগকো ফাঁসা দেওলবাড়ে।

–আরে পরিষ্কার করে বলুন।

—ক্যা কহব? ছাতবড়া কা ঢ্যাঙ্গি। রোঁয়াকো তো জানকার বাটে। ওকরা মরদ ছোড় দেওলবাড়ে। খানে বিনা মরতাড়ে। রাসমণি আপনা ধাওড়াসে নিকাল দেলছে। বড়ি নাজুক স্থিতি. তো হম খুদ রাসমণিকো বোলকব ছাতাবড়া ধাওড়া পর রহনেকো বন্দবস কর দিয়াথা। হামরো এক আদমী ওকরা সাথ ফাঁস গইল। দো বাচ্চা ভইল। তো উ রাণ্ডীয়া আজ বিহান গরম গ্যাসমে আগ লাগকর মর গইল।

এটা হাবু সাহেবের কাছে কোন খবর নয়। বললেন, তাতে কি হয়েছে? ডেড-বডিটা ছ'নম্বর চানকে ফেলা করিয়ে দিন।

—আরে হুজুর। ওহি তো ফের বাটে। মূর্দা তো চানকপর গিরা দিয়াথা। লেকিন বারকুলি সাহাব, আউর ওকরা দোস্ত গেরানডি সাহেব সিঁড়িয়া হো কর হোনে ঘুস-গইল। এত্তা এত্তা মূর্দা দেখ কর বড়া বিগড় গইল। কহতাড়ে হেনে ক্যা বুচড়খানা চালু বাটে?

এই সেরেছে! গ্রাণ্ডি সাহেব ওখানে গিয়েছিলেন! তবেই তো লোটিয়া গোল। সবারই খাটিয়া খাড়া করে ছাড়বে। উনি তো যা-তা লোক নন। খোদ ইংলণ্ডেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ইন্সপেক্টার। প্রধানমন্ত্রী গ্লাডস্টোনের বিশেষ আস্থাভাজন ব্যক্তি। বড়লাট লর্ড রিপন ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে ভোজসভায় আপ্যায়িত করেন। তিনি যদি শিয়াল, হুড়ালে ছেঁড়াছেঁড়ি স্তূপীকৃত শবরাশি দেখেন তবে তো ব্যাপারটা বৃটিশ পার্লামেন্ট পর্যন্ত গড়িয়ে যাবে।

এ হে হে! এ যে বিষম সঙ্কট হে! আমি একটা দিন ছিলাম না এরই মধ্যে এত কাণ্ড। তোমরা আমাকে আগে খবর দিলে না। বাজটা যেন ওর মাথাতেই পড়ল এমনিভাবে উঠে দাঁড়ালেন। দু-মিনিটের মধ্যে হাঁটুতক খাঁকি মোজা ও জুতো পরে হাফপ্যাণ্টের বোতাম লাগাতে লাগাতে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসলেন।

সাহেবকোঠীর বড় ঘরটায় দুজন সাহেব নিঃশব্দে হুইস্কি খাচ্ছেন

যেন তাঁরা কেউ কাউকে চেনেন না। কোন নির্জন বারে বসে নিরালা প্রহর যাপন করছেন। দুজনেরই মুখ গম্ভীর। দুজনেই বাক্যহারা।

তরলা দাসী এসে বলল - সাহেব। আপনাদের লাঞ্চ দিতে বলব?

মিঃ ব্যারাকলউ নিজের চেয়ার ছেড়ে উঠে এলেন। মিঃ গ্রাণ্ডিকে অনুনয়ের সুরে বললেন—প্লিজ মিঃ গ্রাণ্ডি! লর্ড যীশাস ক্রাইস্টের দিব্যি রইল। দয়া করে লাঞ্চ খেয়ে নিন।

—ইয়েস। মিঃ গ্রাণ্ডির সংক্ষিপ্ত উত্তর।

নিঃশব্দেই লাঞ্চ খাওয়া হল। মিঃ গ্রাণ্ডি বললেন—আমার মনে হয় এখানে থাকা আমার উচিত হবে না। আমি গেস্ট হাউসে চলে যাচ্ছি।

—আমার উপর রাগ করে যাচ্ছেন তো?

—নো নো।

তারপর একটু থেমে আক্ষেপের সুরে বললেন—তুমি আমার পুরনো বন্ধু। তোমার কাছে সর্বতোভাবে সাহায্য পাব এই আশা করেছিলাম। কিন্তু তুমিই আমাকে ধাপ্পা দিয়ে রেখেছিলে। এটাই দুঃখ। আমি কি এখানে মদ খেতে আর নেটিভ মেয়ে এনজয় করতে এসেছি? আমাকে তুমি হার মেজেস্টির কাছে ছোট করে দিতে চেয়েছিলে? আমি একটা মিশন নিয়ে এসেছি। এর সঙ্গে হার মেজেস্টির মান সম্মান জড়িত। অথচ তোমার মনটা ইণ্ডিয়ানদের মতই হয়ে গেছে। একথা যদি তোমার ইসাবেলাকে বলি তবে কি উনি তোমাকে ভালবাসতে পারবেন?

মিঃ ব্যারাকলউ ভীষণ বিচলিত হয়ে মিঃ গ্রাণ্ডির হাত ধরে বললেন—প্লিজ মিঃ গ্রাণ্ডি! এতকথা ইসাবেলাকে বোল না। আমিও একটা মিশন নিয়ে ইণ্ডিয়াতে এসেছিলাম! কিন্তু সেক্স, লিকার আর কোম্পানির ডিউটি নিয়ে এত মেতে উঠেছি যে সেকথা স্মরণে নেই। আমি এবার নিজেকে শুধরে নেব মিঃ গ্রাণ্ডি।

—আমি তোমার শুভ কামনা করি। মিঃ গ্রাণ্ডি চলে গেলেন।

মিঃ ব্যারাকলউয়ের চোখে জগত সংসার বিস্বাদ হয়ে উঠল। এমন তীব্র ভর্ৎসনা জীবনে কেউ কখনো করে নি ওকে। বটেই তো! মৃত্যুর

বিভীষিকা নিয়ে কয়লা কুঠির কাজ। তাই বলে কি কোন সংশোধন নেই? নিশ্চয় আছে। কিন্তু সেই একান্ত প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থার কথা কে বা ভাবে? মানুষের জীবন-মৃত্যুর প্রশ্নটাই ভীষণভাবে অবহেলিত।

সেই তপ্ত খোলার উপর খইয়ের ধানের মত উড়ে এসে পড়লেন হাবু সাহেব। সেলাম করতে ত্বর নেই। সাহেব বাঘের মত গর্জন করে উঠলেন—ইউ ব্লাডি ফাকিন হাবু। ইউ আর ওয়ার্থলেশ।

- ইয়েস স্যার। হাবু সাহেব তৎক্ষণাৎ সেলাম দিলেন।

—তুম কুত্তাকা বাচ্চা।

—হাঁ হুজুর। আবার সেলাম।

—আমি তোমাকে ছোটা সাহেব বানালাম আর তুমি আমাকে অপমান করালে?

—ওহ্! ব্লাডি ফাকিন্ গোমস্তা। ওকে আমি স্যুট্ করব। আমার সঙ্গে অবিলম্বে দেখা করতে বল।

—হাঁ স্যার।

—বাট আমি তোমাকে স্যাক্ করব। তোমার চাকরি নট করে ছাড়ব। ব্লাডি ফুল কি মনে করেছ ব্যারাকলউ সাহেব তার অপমান হজম করে নেবে?

—আমি সাত হাত নাক খৎ দিচ্ছি স্যার।

—নো। অত অল্প শাস্তিতে তোমার হবে না।

—বিউটিফুল উওম্যান উপহার এনে দেব স্যার। জেনুইন ভারজিন গার্ল। ফেয়ার কমপ্লেকসন। ফুল্‌লি ডেভলপড।

—ননসেন্স। তুমি আমাকে বোকা পেয়েছ। ইণ্ডিয়াতে সাকিং চাইল্ডদের বিয়ে হয়। ফুল্‌লি ডেভলপড ভারজিন গার্ল পাবে কোথায়?

—আমার সন্ধানে আছে স্যার। এ হিন্দু উইডো। মায়ের দুধ খাবার বয়সে বিয়ে হয়েছিল। সাত বছর বয়সে স্বামী মারা গেছে।

—তুমি একটি আসল খচ্চর।

—ইয়েস স্যার।

—আমার চেয়েও কুটিল শয়তান।

—আপনার সার্টিফিকেট পেয়ে আমি খুব বাধিত হলাম স্যার।

—গো আউট।

· আমার চাকরি ?

—তোমার উপহারের উপর নির্ভর করছে। তাই কিছুটা সময় দিলাম।

—ধন্যবাদ স্যার। কিন্তু আমি যদি পনেরো মিনিট আগেও খবর পেতাম তবে সব সাফ সুতরো করে এমন বানিয়ে দিতাম যে মিঃ গ্রাণ্ডি বুঝতেও পারতেন না যে এখানে মুর্দা ফেলা হয়।

—তা অবশ্য ঠিক। তুমি থাকলে এত কাণ্ড হত না। যাও। গোমস্তাকে আমার কাছে পাঠাও।

ডাক পেয়ে মিছিরের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। হে রাম! হে বজরঙ্গবলী! কিরূপা প্রভু! এ যে সব চৌপট হতে বসল।

নাই নাই করে দু'হাজার টাকা সুদে খাটছে। মাসে টাকা প্রতি দু'আনা সুদ আদায় হয়। পঁচিশটা গাই মোষ। ঢালাও দুধের কারবার। বেনামীতে তিনশো কুলি কামিনের সরদারী চলছে। কমপক্ষে পঞ্চাশ জন দেশোয়ালী ভাই ভাতিজা আছে। তারা সব চাপরাশী, পিওন, আরদালীর কাজ করে। দাঙ্গা, ফৌজদারী, চুরি, ডাকাতি, খুন খারাবীর জন্য ভাড়া খাটে।

কিন্তু সবই ঝুলে আছে একটি সুতোয়। বারকুলি সাহেব যদি বিগড়ে যায় তাহলেই লোটিয়া গোল। যে লোটা কম্বল নিয়ে দেশ থেকে এসেছেন তাই নিয়েই পালাতে হবে। সাহেবদের টুপিতে টুপিতে পাক্কা মোহাব্বৎ। যদি চাকরি নট করে ধাওড়া খালি করার হুকুম দেয় তবে আর একটিও সুদের কড়ি আদায় হবে না। আসলটাই বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে। গাই মোষগুলো তার দেশোয়ালী ভাইরাই পাচার করে দেবে। মানে তার আরামখানার তক্ত তাউসের খুরা বাজু সবই ঐ বারকুলি সাহেব।

ভয়ে প্রাণ উড়ে গেল। কিন্তু এদিকে যে লগ্ন বয়ে যায়। যেন মহাষ্টমীর ক্ষণ বয়ে যাচ্ছে। সে একটি নিরীহ ছাগশিশু। হঠাৎ মনে পড়ে গেল সেই ব্যাটা মাইনিং সরদারকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারলে সাহেবের রাগের মুখে তাকেই ঠেলে দেবেন।

লোক পাঠালেন তাকে ডাকতে। তাই কি আর থাকে? একবার লাথি, একবার লাঠি খেয়েই দিব্য চৈতন্য হয়ে গেছে। এখন সে দামোদরের পারে রুখু শুখু কাঁকর মাটির পথে হোঁচট খেতে খেতে দৌড়চ্ছে। প্রাণের মায়া কঠিন মায়া।

সে খবর শুনে মিছির বাবুর খোপড়ী আউট। মাথায় যেটুকু ঘিলু ছিল তা নাক মুখ দিয়ে গড়াতে শুরু করল। সে কি হাপুস নয়নে কান্না। চাপরাশী ধাওড়ায় শোকের ছায়া নেমে এল। বিরাট বিরাট পালোয়ানরা বুক চাপড়ে কাঁদতে কাঁদতে মহাবীর হনুমানজীর কাছে প্রার্থনা করল—হে পরভু কিরপা করো। মিছির বাবাকো উদ্ধার করো।

ততক্ষণে আবার এক দূত এসে হাজির। সে খানসামা ঢালু দাস। যাকে ছুঁলে ডুব দিতে হয়। তারই দু'হাত ধরে কেঁদে ভাসিয়ে দিলেন।

তারপর সাহেবের কাছে গিয়ে আরেক নাটক।

বুদ্ধু ভাম বুক চাপড়াতে চাপড়াতে বললেন—হুজুর হামকো গোলি কর দিজিযে। হাম পাপী হ্যায়। হামারা পাপ আপকা এই শ্যান দেওতাকো খিলাপ কর দিয়া। আপ, হামকো গোলি কব দিজিয়ে। হাম হাসতে হাসতে, রোতে রোতে দেওতাকো পায়ের পর গিরকে আপনা পাপকো প্রায়শ্চিত্ মানায়েঙ্গে।

ব্যারাকলউ সাহেব ওব কেবিকেচাব দেখে রাগে ফেটে পড়লেন। সবুট একটা লাথি ওর ঘাম চকচকে লোমশ বুকে মেরে বললেন—ব্ল্যাডি বাস্টার্ড। ওল্ড ডোভিল, নিকা। যাও। ইয়োর সারভিস ফিনিশ। ধাওড়া খালি করো।

পদাঘাত কোন ব্যাপার নয। চাকরি খতমটাই বজ্রাঘাত। পরম নিষ্ঠাবান নিরামিষাশী ব্রাহ্মণ ম্লেচ্ছ সাহেবের চরণামৃত বুক থেকে মুছে নিযে জিভে ঠেকিয়ে বললেন—ও-হো হো ভগবান শ্রীরামচন্দ্রজীকো গোড় লাগকর ইয়ে ছাতি পবিত্র হো গয়া। আর হামকো কোই ডর নহী। পরভুজী কিরপা কর গোড়কা গর্দ্দা পিলা দিয়া।

—কানিং জ্যাকেল! আমার কাছে তামাশা। ফরণ হট যাও। টু-মরো ইয়োব ধাওড়া উইল বার্ণ টু রেজ।

দপ্ দপ করে চলে গেলেন।

॥ বারো ॥

এগারো বারো বছরের একটি সাঁওতাল মেয়ে। খালি গা। পরণে ক্যানাড়ী। কোমরে ঘুন্‌সি কড়ি। গলায় পুঁতির মালা। ঝাঁকড়া চুল। ডাগর দুটি চোখ। ধান-মাঠের আল বরাবর একাই হেঁটে আসছে। তার কাঁধে এক বোঝা পাকুড় পাতা। পিঠের দিকে ঝুলে আছে। দুটি নধর খাসী পর্যায়ক্রমে লাফ দিয়ে ওর কাঁধে ঝোলানো পাকুড় পাতা চিবুচ্ছে।

ওর নাম সুমি। রাসমণির বড় মেয়ে। ওকে কোলে নিয়েই সে স্বামীর ঘর ছেড়েছিল। তারপর জীবনের স্রোতটাই উল্টোদিকে বয়ে গেল। তা ওর জীবনের আশীর্বাদ না অভিশাপ তাই বোঝে না।

তবে সুমি বড় আদরের মেয়ে। মায়ের বুকজোড়া স্নেহের সবটাই ছিল ওর অন্য দুটি বোন এল অনেক পরে। তাদের হাসি-কান্না তারও হাসি-কান্না। বড় ভালবাসে।

ঘরের উঠোনে পা দিতেই দেখল তার মা হন্‌হন্‌ করে বেরিয়ে যাচ্ছে। পাকুড় পাতার বোঝাটি ফেলে দিয়েই মা-মা করে পিছনে দৌড়াল। রাসমণি একটু বিরক্ত হল। বলল আমি একটি কাজে যেছি। তুঁই ক্যোনে পেছু পেছু আসছিস ?

—আমি তুর সঁথে যাব। মেয়ে আবদার ধরল।

—বড় বিপদ বিটি। এই সময়ে পেছুতে আসিস না।

—না। আমি যাবই।

রাসমণি বাক্যব্যয় করল না হন্‌হন্‌ করে চলতেই লাগল।

ছাতাবড়ার কুলি মাথায় একটি মহুল গাছ। জন কয়েক মাঝি মিঝান। গোল হয়ে বসে জটলা করছে। রাসমণিকে দেখে বড় বিব্রত হল। এ ওর মুখের দিখে তাকাল।

রাসমণি ঝন্‌ঝন্‌ করে বলল, তুরা মানুষ না কুকুর ?

কেউ জবাব দিল না।

ও আবার বলল, ঢ্যাঙ্গির লাশটা ক্যোনে নিঞে এলি নাই ?

অনেকক্ষণ চুপচাপ। ও আবার একই কথা বলল।

ওর কথার জমকে মাঝিরা তখন রীতিমত ভয় পেয়ে গেছে। সবাই তাকাল মাহামাঝির দিকে। সেই দৃষ্টি অনুসরণ করে রাসমণি বুঝল এ পরামর্শ কার।

বলল—কি হলরে মাহা! চুপ করে রইলি ক্যেনে?

এই মাহা একদা ওর বিয়ালা পুরুষ ছিল। এখন তারই সরদারীতে মাল কাটার কাজ করে। সে বলল, কি করে লাশ আনব? উ ম্যেয়াটি যে জেতের বাহার হঞে গেইছিল। জানিস ত উ এক চপরাশীর সাঁথে লটর-পটর করত।

রাসমণির মুখটা রাগে গস্ গস্ করে উঠল। এই অপরাধে যদি ঢ্যাঙ্গির মৃতদেহের সৎকার না হয় তাহলে ও যখন মরবে তখন তো জাত কুটুম মড়া ফেলতে আসবে না। কাজেই ওর মুখে ঝামা ঘষে দিতেই হবে।

বলল—ওঃ। তাথেই। আর তুর বুন যে মুছলমানের সঁথে বিরাঞে গেইছিল তাতে কুনু দুষ হয় নাই?

—উ ত কুটুমজনকে ভোজ দিঞে ফের জেতে উঠেছিল।

—ঢ্যাঙ্গিও উঠত। তুদের মনে যদি এই ছিল তবে বলতে পারতিস। উ তুদেদিকে ভোজ দিত। একবাটি মদে যদি জেতের উঠানামা হয় তবে সেটি করতে আর ক'টাকা খরচ।

—সে ত হয় নাই।

—তাই বলে ঘরের মড়া মুদ্দাফরাসে খাদে ফেলে দিবেক। কুচুক্ কুড়া খালভরা জনমভোর লোকের মন্দটিই দেখলি। ভাল ত কারু করতে লেরেছিস। একটি তালাকুড়ি মরে গেল। তার উপরে শোধ লিলি। ক্যেনে? উ তুকে সুয়াগ দেই নাই বলে।

রাসমণির মুখের রাশ আলগা হয়ে গেল। যা খুশি গালমন্দ করে ঢ্যাঙ্গির ঝুপড়িতে এল। ঘরে তো নেই কিছু। সের খানিক চাল। এক ঝুড়ি কঁচড়া বীচি। সের দুই শুকনো মহুল। দুটো টিনের থালা বাটি। ময়লা নোংরা কয়েকটি কানি ছেঁড়া। এই নিয়েই ছিল তার দুখের সংসার। একটি বুড়ি এল। তার কোলে মাস দুয়েকের একটি ছেলে। আর একটি ছেলে এই সবে টলটলে পায়ে হাঁটছে।

বুড়ি কাঁদতে কাঁদতে বলল—এই ছুটিকে নিঞে আমি কি করব? কি খাওয়াব? তুই সরদারণী- -ইয়াদের দুখটি ত বুঝবি।

রাসমণি ছেলেদুটির দিকে তাকাল। বুকটা মুচড়ে উঠল। এরা ঢ্যাঙ্গির ছেলে। বাপ নেই। বাপের কোন পরিচয়ও নেই। কি আতান্তর? ছোটটিকে হাত বাড়িয়ে কোলে নিল। নিজের বুকের কাপড় খুলে দুধের বোঁটা মুখে দিল। ছেলেটি চুক্ চুক্ করে টানতে লাগল।

রাসমণির বুকভরা দুধ। ছোট মেয়েটির বয়স একবছর। এখনো মায়ের দুধ খায়। আজ তার উপরে ভাগ বসাল ঢ্যাঙ্গির ছেলে। সুমি সেইদিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে।

রাসমণি বলল—হায়রে হপন! মায়ের দুধ খাওয়ার শখ তুর মিটে গেল। আঁটকুড়ির বিটি সেই যদি মরবি তবে ক্যেনে এই সোনার চাঁদ ছ্যেলাদিকে বিইয়াঞেছিলি?

বুড়িটা ডুকরে কেঁদে উঠল। সুমি বলল—ইয়াকে আমাদের ঘরকে নিঞে চল মা দেখছিস ত মা মরা ছ্যেলা না খেঞে মরে যাবেক।

রাসমণি গভীর স্নেহে সুমির দিকে তাকাল। বলল—রাখতে পারবি?

—হুঁ ত। ক্যেনে লারব? আমার বুন দুটির সাঁথে একটি ভাইও থাকবেক।

—নিঞে চল তবে।

বিবি বাথানের মাঝে একটি তেঁতুল গাছ। ডালপালা বিস্তার করে তার ছায়াটিও বড় মনোরম। ভোর থেকে রাত্রি পর্যন্ত সব সময়ে গুলজার হয়ে থাকে তার তলাটি।

কিছুকাল আগে পর্যন্ত সেই গাছের ডালে ডালে ঝুলে থাকত রাতচরা পাখী। দিনের বেলায় কানা। রাত্রিকালে শিকারী। সারারাত ধরে ঝটাপটি। দুষ্টু ছেলেদের ঢিল খেয়ে খেয়ে সাবাড় হয়ে গেছে।

বিবি বাথানের দৈনন্দিন এবং সাংস্কৃতিক জীবনে এর অবদান বড় কম নয়। রাখাল ছেলেদের ডাংগুলি খেলা থেকে বুড়োদের তাস-পাশা সবই চলে। মেয়েদের গুলতানি ও ফচ্কে ছেলেদের নষ্টামিও বাদ যায় না।

সেইখানে একটি ছুটি করে লোক জমে গেল। মেয়েরাও আছে। খাদের একসিডেন্ট ও পরবর্তী ঘটনাবলীর বিবরণ নিয়ে ঘোরতর আলোচনা।

ইরফান আলির বেগম মিলনী বাউরিণী সেই কামিন দলে ছিল। তারও গা জ্বলেছে চুল পুড়েছে। সে বলল—কি বলব বুন আগুনটি যখন দপ করে জ্বলে উঠল তখনি আমি পড়ে গেলম। কাছাড় খেতে খেতে দেখলম ঢ্যাঙ্গি কুঁখুড়ে গেল। তখন উ এমন চেঁচাঞেছিল যে শুনলে পেটের ছ্যেলা মরে যাবেক।

চামেলী বলল—আমার বুকটি এখনো টিপিক্ টিপিক করছে। ঈ-বাবারে! আর লয় বাবা। আমি আর খাদকে খাটতে যাব নাই। সে সরদারে এসে ঠেঙাক্ আর বিড়াক্। বরং ভিখ মেগে ছ্যেলা পিলাকে খাওয়াব।

হঁ ত। আমরা জীবন হাতে নিঞে যদি বা ঘুরে এলাম ত সাহেব খালভরারা আমাদের কাপড় খুলে দিঞে ফ্যা ফ্যা করে হাসলেক।

—উয়ারা মানুষ লয়রে। দত্যি দানো।

ঢালুদাসের প্রবেশ। লম্বা ঢ্যাঙ্গা শরীর। মুখ বিকৃত করে যখন কেরিকেচার করে তখন হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যায়। তার আজকার লবজ বারকুলি সাহেবের অ্যাকশন এবং হাবু সাহেব ও মিছির গোমস্তার খাবি খাওয়ার কিস্সা।

অশ্লীল ভাষা ও অঙ্গভঙ্গি করে হাবু সাহেবের প্রবেশ ও প্রস্থান নিয়ে প্রথম নকশায় আসর জমিয়ে দিল।

দ্বিতীয় নকশা মিছির গোমস্তার পতন ও চরণামৃত পান। সেই সঙ্গে সংলাপ পরভূ রামচন্দ্রজীকো গোড়কা গর্দা পী লিয়া।

হে হে করে সবাই হেসে উঠল। যে গোমস্তা তাদের সুদের দায়ে তেড়ে নিয়ে বেড়ায়, একদিন কাজ কামাই করলে ঘরে এসে লাঠি নাচায়, তার দুর্দশা এখন সকলের কাছে মজার খোরাক। ওরা সব হেসে হেসে গড়িয়ে পড়ল।

রাত্রি গভীর। এক হাতে মদের গ্লাস, অন্য হাতে কলম নিয়ে মিঃ ব্যারাকলউ তার প্রিয়তমা পত্নীকে চিঠি লিখছেন—মাই সুইট ডারলিং, "আজ মিঃ গ্রাণ্ডির কাছে বড় অপদস্থ হয়েছি। উনি হোমে

ফিরে গিয়ে হয়তো তোমাকে এসব কথা বলবেন। তখন তুমি মনে করবে আমরা সব বুচড়খানার মালিক ম্যানেজার।

বস্তুতঃ মানুষের নিরাপত্তার জন্য আমরা কিছুই করিনি। শুধু কয়লা কাটো আর রেজিং করো এই ধুয়া তুলে মানুষ মারার ফাঁদ পেতেছি। তার জন্য আমি একা কিই বা করতে পারি? মিঃ গ্রাণ্ডি যদি হার ম্যাজেস্টির অনুমতি নিয়ে কোন আইন-কানুন প্রবর্তন করতে পারেন তাই দেখুন।

কিন্তু আমি কি করলাম? প্রায় দশটা বছর ইণ্ডিয়াতে কাটালাম। আগামী ডিসেম্বরে এগ্রিমেন্টের মেয়াদ শেষ হবে। তখন আবার পাঁচ বছরের জন্য এগ্রিমেন্ট করবো কিনা ভাবছি। কারণ জীবনে তোমাকে দূর থেকে ভালোবাসার চিঠি লেখা ছাড়া কিইবা পেলাম? বল — কটা দিন তোমাকে কাছে পেয়েছি? গত দশ বছরে আমি তুবাব ছুটি কাটাতে গেছি তুমিও বার-তুই বেড়াতে এসেছ। এতে কি মন ভরে?

অথচ যে মিশনটা ছিল অর্থাৎ ভারতে কয়লা কুঠির নিজস্ব মালিকানা গড়ে তুলব সে কাজটা ভুলেই গেছি। কিন্তু না। এবার আমি খুব সিরিয়াস। আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে আমরা নিজেদের কোল কোম্পানি করবই।”

এই প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করার পর মিস্টার ব্যারাকলউ হাল্কা বোধ করলেন। সারাদিন মনটা ভারী হয়ে আছে। কাগজ-কলম গুটিয়ে এক চুমুকে হুইস্কীর গ্লাসটা শেষ করে উঠে পড়লেন।

তখন প্রসব-যন্ত্রণায় ছটফট করছে রাগিনী বাউরিনী। অবশেষে ভোর রাত্রের দিকে সে একটি সাদা ফুটফুটে ছেলে প্রসব করল। তার এক-মাথা সোনালী চুল। নীল চোখ। ভূমিষ্ঠ হতে না হতেই কেঁদে পাড়া মাৎ করল।

রজনী দাই বলল: হুঁ। সাহেবের ব্যাটাই বটে। কুনু ভেজাল নাই।

এরই নাম মনসারামডশ.।

॥ তেরো ॥

গ্রামের নাম দেওলটা। মৌজা—সাতঘরিয়া। পরগণা—শেরগড়। জমিদার—রাধাগোবিন্দ রায়। মোট ধানজমির পরিমাণ—চার হাজার সাতাশ একর। বছরে খাজনা আদায়—ছ' হাজার দুশো টাকা। তার-জন্য একটা কাছারীবাড়ি। নায়েব কার্তিক বোস ও গোমস্তা গণেশ ঘোষ বছরে দু-কিস্তিতে সে খাজনা আদায় করেন।

কাছারীবাড়ির লাগোয়া খামার বাড়ি। জমিদারের খাস জমিতে চাষ হয় ধান, গম, আলু, কলাই, শাকসব্জী। দু'জন পেয়াদা মোতায়েন থাকে চাষের ফসল তুলে জমিদার বাড়িতে পৌঁছে দিতে এবং প্রজাদের গলায় গামছা দিয়ে কর আদায় করতে।

কয়েক ঘর ভাল চাষীও আছে। তাদের উৎপন্ন ফসল গরুরগাড়িতে করে হাটে-বাটে বিক্রি হয়। কয়েকটা বড় বড় পুকুর আছে। চুনোপুঁটি থেকে রুই কাৎলা মাছ আছে। চাষ জমিতে সেচের জল মজুত রাখতে মাঝে মাঝে পঙ্কোদ্ধার হয়। মাটি পাথর কেটে গর্ত বাড়ানো হয়। সম্প্রতি একটি কুয়ো কাটাই হচ্ছে ঐ চাষীদেরই।

কিন্তু গোল বেঁধেছে জমিদারের সেলামী নিয়ে। পেয়াদা এসে হম্বি তম্বি করছে। কুলিকামিনরা কাজ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে পড়েছে। বয়োঃ-জ্যেষ্ঠ সুদাম মাজি অনুনয় করছেন—আট আনা লাও বাপ। আমরা গরিব লোক ইয়ার বেশি কুথায় পাব?

জমিদারের রেট এক টাকা। আদায়কারীর আমলাসেলামী দু-পয়সা। তখনকার ব্যাপারই ছিল আলাদা। ঘরের বৌ ছেলে বিয়োলে জমিদারের কাছারীতে একটি সিধা পাঁচটি পয়সা পৌঁছে দিয়ে আসতে হত জন্ম কর হিসেবে। গরুবাঁধা গোঁজ গাড়তে হলে একটি তামার পয়সা দক্ষিণা। পুকুর, ইঁদারা বা জলাশয় খননের আগে অনুমতি গ্রহণের জন্য একটাকা সেলামী। কর কিসে নেই? বিয়ে, পৈতে, জন্ম, মৃত্যু, উৎসব, আনন্দ, দায় বিপদ, ঘর দুয়ার, পথঘাট, জমিজমা মায় শালপাতা, নিমকাঠি সংগ্রহের জন্য কর ধার্য হত। জমিদারী সেরেস্তার শোষণপ্রণালী যে জানে না সে এখনো মায়ের গর্ভে আছে।

গোমুখ্যু সুদাম মাজি অত আইন জানবে কী করে? ষোল সের চাল বিকলে একটি টাকা হয়। তা দিতে কলিজার রক্ত শুকিয়ে যাবে না তো কী? তার তখন বুক টন্ টন্ করছে।

হঠাৎ ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দে পিলে চমকে গেল। নিমেষে কে যে কোথায় সট্‌কে পড়ল কে জানে? পেয়াদা বেচারা একা ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে তখন।

ঘোড়া থেকে নামলেন মিঃ ব্যারাকলউ। পেযাদা লম্বা সেলাম দিয়ে বলল—হুজুর আমার কোন দোষ নাই।

—ননসেন্স!

ইণ্ডিয়ার নেটিভদের এই একদোষ। চাষাভূষো, গরিবগুরবো সব একরকম। সাহেব দেখলেই কাছাখুলে দৌড়। অল ফুলস! আরে—আমি কি বাঘ না ভালুক যে হালুম করে খেয়ে দেব?

পেয়াদা জোড়হাত করে বলল—হুজুর!

—কুলিকামিনরা কোথায় গেল? ওদের ডাকো। কোন ভয় নেই। আমি ওদের বখশিস দেব। কাজ আছে।

পেয়াদা হন্তদন্ত হয়ে এ ঘর সে ঘর লোক ডেকে বেড়াতে লাগল।

দামোদরের অববাহিকা আপাত রুক্ষ ভূমি। ধান সিঁড়ি ক্ষেত। মাঝে মাঝে ভাঙা। মোরাম, পাথর কিংবা ঘুসিক চুনের নুড়িতে ছেয়ে থাকে। ঠাঁই ঠাঁই গ্রাম। গাছগাছালিতে ভরা। জমিদারের দখলভুক্ত তলস্বত্ব। উপর স্বত্বে খাস খতিয়ানভুক্ত জমি, ডাঙা, বন। বাকি সব প্রজা বিলি। প্রজারা সব রায়ত স্থিতিবান। দু-চারজন ব্রাহ্মণ, রাজপুতের খাটোয়ালি বা মধ্যস্বত্ব মোকররী।

মিঃ ব্যারাকলউ এখন জমিদারী সেরেস্তার এসব খুঁটিনাটি তথ্যও জেনে গেছেন। কিন্তু উনি জানতে চান আরো কিছু বেশি। মাটির অভ্যন্তরের বিশাল ধনাগারের সন্ধান।

ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে বনবাদাড়, ডাঙা ডহর চষে বেড়ান তারই খোঁজে। চঞ্চলা জোড়ের ধারে পাথর দেখেন মনোযোগ দিয়ে। পুকুরে মাটি কাটা হয়েছে তাও দেখতে বাকি রাখেন না। এদিকে আসতে আসতে নজরে পড়েছিল কুয়ো কাটার লোকজন। তাই এসেছেন।

কুলিকামিনরা ভয়ে ভয়ে এসে অনেকটা তফাতে দাঁড়াল।

উনি বললেন—তোমরা আমাকে চেন?

—হুঁ সাহেব।

—তবে ছুটে পালালে কেন? আমি কি তোমাদের ক্ষতি করেছি?

ওরা নিরুত্তর। উনি বললেন—আমি এই কুয়োর নীচে পাথরটা দেখবার জন্য নামব। তোমরা দড়ি ধরে নামাতে পারবে? বখশিস দেব।

—হুঁ সাযেব।

এক প্রান্তে আংটায পা দিয়ে উনি দড়ি ধবে ঝুলে পড়লেন। কুলি-কামিনরা প্রাণপণে টেনে ধরল। বাব্বাঃ সাহেবের ওজন বটে! একটু একটু কবে দ' লাল দিল। সাহেব নীচে নামলেন। পাথর দেখতে দেখতে মন খু 'য়ে উঠল।

উপর থেকে পাঁচ ফুট মাটিব পব এক ফুট মোরাম, তিন ফুট নরম ফায়ার ক্লে, সাড়ে তিনফুট শক্ত ফায়াব ক্লে, সাড়ে তিনফুট নরম বালি পাথর তারপর কালো শেল পাথর। আর কাটা হয নি। কিন্তু স্তরীভূত শিলার যে বিন্যাস উনি দেখলেন তা গণ্ডোয়ানা ডিপোজিশন ছাড়া আব কিছু নয়। আর তিন চার ফুট নীচের পাথর কাটলেই পাওয়া যাবে কয়লার স্তর। যার জন্য ছুটে বেড়াচ্ছেন।

উপরে উঠে কুলিকামিনদের আটআনা বখশিস দিলেন। সাহেবের মেজাজ খুশ দেখে সুদাম মাজি হাতজোড় করে নিবেদন করল—হুজুর। জমিদারের পেয়াদা একটাকা সেলামী চাইছে। আমি গরিব মানুষ কোথায় পাব? বৌ বিটিরা পুকুবের জল বইতে বইতে হয়রান হঞে যায় তাথেই কুযো কাটছি।

সাহেব বললেন, চাষা! তুমি কি বুঝবে তোমাব মাটির নীচে কি আছে? একদিন হয়তো এই মাটির জন্যেই ভিটেমাটি উচ্ছন্ন হবে নতুবা অঢেল পয়সা কামাবে। এখন এই গুপ্ত ধনাগার পাহারা দিতে এই নাও একটাকা বখশিস।

ঘোড়ার ক্ষুরে ধুলো উড়িয়ে চলে গেলেন।

দামোদর অনার্য নদ। আসানসোল শিল্পভূমি।

যে মহাজন আসানসোল পত্তন করেছিলেন তাঁকে হাজার সেলাম। আজকের দিনে কোথাও একটা নতুন টাউনশিপ হলে বিশেষজ্ঞরা বসে

যান মাস্টার প্ল্যান করতে। তার জন্য কত জল্পনা-কল্পনা, কত তথ্য সংগ্রহ। লাখ কথা ব্যয় করে এ্যাসেম্বলীতে বিল উত্থাপন।

তখন তো এত ব্যাপার ছিল না। তবু আসানসোল পত্তনের পিছনে চিন্তা-ভাবনা বড় কম নয়। তা নাহলে ঠিক এই জায়গাটিকেই বেছে নেওয়া হল কেন? যার পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর তিনদিকেই নামী-দামী কয়লাস্তরে ছোট বড় কোলিয়ারি অথচ আসানসোল ব্যারেন মেজার। আয়রণ স্টোন শেল দিয়ে তৈরি স্তরীভূত শিলার পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তরে বড় বড় চ্যুতি কয়লাস্তরগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। পূর্বে উষা গ্রাম পর্যন্ত ঘুসিক কালিপাহাড়ী কয়লাস্তর। পশ্চিমে গোপালপুর পর্যন্ত ডিসেরগড় কয়লাস্তর। উত্তরে কা, সাতপখুরিয়া কয়লাস্তর। কয়লা কেন্দ্রিক শহর আসানসোল দাঁড়িয়ে আছে, শাখা-প্রশাখা বিস্তার করছে কুমাবী ভূমির উপর।

উত্তরে জোড়। পূর্ব প্রবাহিনী। আঁকাবাঁকা স্রোত। আসান-সোলের পয়ঃপ্রণালী। জি টি রোড ও জোড়ের অবস্থান প্রায় সমান্তরাল। মধ্যখানে ধূ-ধূ ডাঙা। ধানবন। আপকার সাহেব তৈরি করিয়েছিলেন বাগানবাড়ি। স্বনামধন্য পুরুষ। চরণপুর, রঘুনাথ-বাটীতে বিরাট কোল-প্রোপার্টির মালিক।

বাগানবাড়ি তখনকার পয়সাওলা লোকের ফ্যাসান, প্যাশন ও স্ট্যাটাস সিমবল। রাধাগোবিন্দ রায় একজন পেটি জমিনদার যদি পানমোহরাতে নাচমহল, বাগানবাড়ি করতে পারেন তবে আপকার সাহেব করবেন না কেন?

প্রায় সব মালিক, সব জমিদারের বাগানবাড়ি থাকত' তা ছিল প্রমোদ ভবন। নামী-দামী অতিথি আপ্যায়নের নিকুঞ্জবন। নিজেদের মৌজ ঔর খোয়াবের গুলবাগিচা। সাক্ষাৎ নরক। পবিত্র কাউর কামাখ্যা। রোমাঞ্চকর যোনিপীঠ। অশ্রু, রক্ত, ঘাম ও শুক্রের প্রদাহী প্রস্রবণ। সভ্যতার কলঙ্ক।

এইসব স্থানে কত নারীর যে সতীত্ব গেছে, কত মানুষের রক্ত রয়ে গেছে তার হিসেব নিকেশ নেই। আবার কত লক্ষ টাকার যে কারবার হয়ে গেছে তারও রেকর্ড নেই। বলতে গেলে বড় বড় লোকের নামী দামী মস্তিষ্ক শ্যাম্পেন, শেরী, ককটেলের ফেনায়িত তরঙ্গে,

মদিরেক্ষণা বরনারীর অনঙ্গ বিভঙ্গে বিভোর হয়ে দারুণ দারুণ সব প্ল্যান প্রোগ্রাম প্রসব করেছে। যা নাকি স্বাভাবিক অবস্থায় কোন কারণেই হওয়া সম্ভব নয়।

যেমন এখন মিঃ ব্যারাকলউ পানমোহরার নাচমহলে বসে শ্যাম্পেনের গ্লাসে চুমুক দিচ্ছেন। তাঁর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। পাঙ্খাওলা হরদম পাঙ্খা টানছে। একটি পীনোন্নত পয়োধরা যুবতী তার পানপাত্র ভর্তি করে দিয়ে অপাঙ্গে তাকিয়ে আছে।

মিঃ রায় জড়িত কণ্ঠে বললেন, এই মেয়েটির নাম চন্দনা। মানে এ সুইট সিংগিং বার্ড। আপনার নিশ্চয় পছন্দ হয়েছে ?

—ওহ্! নিশ্চয়।

—ও আজ আপনাকে প্রাণ ঢেলে সেবা করবে।

—ধন্যবাদ মিঃ রায়।

একটু বিরতি। মিঃ রায় বললেন, আমার সম্বন্ধে ভেবেছেন কি ?

—নিশ্চয়, আপনার জন্য একটা পরিকল্পনার খসড়া তৈরী করে ফেলেছি। এখন উভয়পক্ষের মধ্যে আলোচনা করে ঠিক করতে হবে।

উনি একটু নড়ে চড়ে বসলেন। বললেন, একটু পরিষ্কার করে বলুন সাহেব।

—আপনার বড় ছেলে কোথায় ?

—এইতো দিনকয়েক আগে কলকাতা থেকে ফিরেছে। তারপর শ্বশুরবাড়ি গেছে। ওর শ্বশুরমশাই নিতে এসেছিলেন।

—শ্বশুরবাড়ি ? মানে বিয়ে হয়ে গেছে। বললেন না, পড়তে গেছে। মানে সে তো ছাত্র।

—হ্যাঁ। ছোটতেই বিয়ে হয়েছে। বৌমার বয়স কম। এই তো সেদিন দ্বিরাগমন ফুলশয্যা হল।

—মাই গড! যাক্‌গে ওসব কথা। ওকে আরো কিছু শিখতে হবে। মানে কোলিয়ারির কাজ।

সে তো আপনি আছেন। যেমন শেখাবেন তেমনি শিখবে।

—আচ্ছা, আচ্ছা। আপাতত আমাদের সালুঙ্কী কোলিয়ারির একটা খাদ আপনাকে রেজিং কনট্রাক্ট দিয়ে দেব। নাগাদ ডিসেম্বর আমাদের কোম্পানিতে, কিছু অদল-বদল হবে। সম্ভবত মিঃ হ্যামিলটন

চীফ মাইনিং ইঞ্জিনীয়ার হবেন। ওকে ম্যানেজ করার কোন অস্মুবিধে নেই। আমি ব্যবস্থা করে দেব।

—ধন্যবাদ সাহেব।

—আপনার ছেলেকে সেখানেই হাতে খড়ি দিয়ে দেব। কাজও শিখবে। ঠিকাদারীও করবে। কিন্তু এখানে থামলেই চলবে না। আরো উপরে উঠতে হবে। আই মীন মালিক হতে হবে।

মিঃ রাযের চোখত্নটো চক্‌চক্ করে উঠল। বললেন,—এই চন্দনা, সায়েবের গ্লাসটা ভর্তি করে দে।

—ধন্যবাদ।

—কিন্তু সে যে অনেক টাকার ব্যাপার।

—কোম চিন্তা নেই। আমার ওয়াইফকে বলব। ওর কোম্পানি টাকা ফাইন্যান্স করবে। ছোটখাট তু' একশ টন রেজিংয়ের খাদ আমার পছন্দ নয়। চানক খাদ হবে। ডুলি বসবে। স্টিম ইঞ্জিন চলবে। ফ্যান দিয়ে বাতাস যাবে। পাম্প দিয়ে জল মারা হবে। দিনে এক হাজার টন রেজিং। নতুন রেলওয়ে সাইডিং, নতুন অফিস, নতুন বাংলো। লাখ টাকার লগ্নী। আপনার আণ্ডার গ্রাউণ্ড রাইট আমাদের কোম্পানীকে ৯৯৯ বছরের জন্য লীজ দেবেন। আপনার ছেলে হবে পার্টনার। রাজী আছেন?

—নিশ্চয়।

—আপনার পানমোহরা, সাতঘরিয়া, দেওলটা, দামর আমি আলোকমালায় সজ্জিত করে দেব। নিজস্ব পাওয়ার হাউস বসিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করব। বাট ইট ইজ টপ সিক্রেট। কেউ যেন না জানে।

নিশ্চয়ই।

॥ চোদ্দ ॥

জাতকে জাত বৈরী কুলের রাঁড়
ফাগুনের আগুন বৈরী ফসলের বৈরী ষাঁড়।
এসব ডাক পুরুষের কথা হে।

তাই বুঝি হাবু সাহেবের ক্রমবর্ধমান বিত্ত ও প্রতিপত্তি দেখে চোখ টাটাচ্ছিল জমিদার রাধাগোবিন্দ রায়ের। ইতিমধ্যে উভয়ের মধ্যে কিছু সংঘর্ষও হয়ে গেছে। বিশেষ করে একটা পুকুর নিয়ে। যদিও পুকুরটা হাবু সাহেবের গুষ্টির। তবে তিনি চাইছিলেন সেটাকে খাস-খতিয়ানভুক্ত করে দখল নিতে। সে কাজে অগ্রণী ভূমিকা ছিল জমিদারের গোমস্তা গণেশ ঘোষের। কিন্তু হাবু সাহেব ওকে মাছ ধরতে না দিয়ে জাল উঠিয়ে দিয়েছিলেন। দাঙ্গা ফৌজদারীর আশঙ্কা ছিল কিন্তু হয়নি। কারণ জমিদারের পেয়াদা সুদাম মাজির কাছে যত ভয়ঙ্কর হাবু সাহেবের কাছে তত বংশবদ। ওরা চাকরি করতে এসেছে। কাজেই যেখানে দু পয়সা পাবার সম্ভাবনা সেখানে তারা নিপুণ অভিনেতা। আর আইনের দিকে দিয়েও জমিদারের স্বত্বটা ছিল দুর্বল। রাগটা তখন থেকেই প্রবলতর হয়ে উঠছিল।

তারপর একটি জিয়ল মাছের দিকে দুজনেই তাক করে বসে আছেন। সেই মাছটি হল মদন সরকারের অভাগিনী ভগিনী অহল্যা। সাত বছর বয়সে বিধবা। চাঁপা ফুলের মত গায়ের রং। এখন সে পূর্ণ যুবতী। শিশির ধোওয়া ফুলের মত টস্‌টসে মুখ।

বৈধব্যের দারুণ পীড়ন, অনাহার, উপবাস, লাথি, ঝাঁটা, গঞ্জনাতেও তার গালে টোল খায় নি। ভাই ভাজের চোখের বালি।

মদন সরকার পানমোহরার জমিদারের এক নম্বর চাটুকার। তার কাজই বাবু মাছ ধরতে গেলে তাঁর ছিপটি বয়ে নিয়ে যাওয়া, আঘাটায় চার করা, মাথার উপর ছাতা ধরে চুপ করে বসে থাকা। বঁড়শীতে মাছ লাগলে জলে নেমে ডাঙায় তোলা। তারপর আঁশপিত্তির জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকা।

এই চিড়িয়া যে নাচমহলের বুলবুলিকে চালের কণা, গমের দানা, ফলের শাঁস খাইয়ে তাউত করে রাখবে সেকথা বলাই বাহুল্য। সেটাই ছিল তার আসল কাজ।

রমণী মনোরঞ্জনের বিশেষ শিক্ষায় শিক্ষিত মদন সরকার নাচমহলের কেয়ারটেকার কাম চাটুকার কাম রিক্রুটার। তার হেফাজতে বুলবুলিরা বেশ সুখেই আছে। সারাদিন পান ভোজন শয়ন এবং নিশিভোর তক্ বক্‌বকম্। মদন তখন মদনমোহন। চুলে আলবেট কেটে, ধুতির কোঁচাটি আংরাখার পকেটে গুঁজে, ঢুলু ঢুলু চোখে তাদের পা থেকে ঘুঙুর খুলে দেয়, গা থেকে শেরওয়ানি। বুকে পিঠে হাত বুলিয়ে সোহাগ করে। মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে দেয় মান অভিমানের পালা। মুখের কাছে এগিয়ে দেয় জর্দা পান-তামাক।

সেই কারিগর অহল্যার বোঝা বইবে কী করে? নিজেরই তুবার বিয়ে। বৌরা অতি উর্বরা। একপাল বাচ্চা-কাচ্চার হবদম কান্নাকাটি। তুই সতীনের ঝগড়া-ঝাঁটি। ঘরে তিষ্ঠানো দায়। এতগুলি প্রাণীর মুখে কোথা থেকে ভাত জোগায়? জমিদার বেতন দেয় মাসে পাঁচ টাকা। এঁটোকাঁটা ফাউ।

তার বাপ হরিশ সরকার ছিল আরো তালেবর।

মরণ কাল শিয়রে এলে বলেছিলেন,—বাপ! তোদের জন্য তো কিছু রাখতে পারিনি। তবে একটা বুদ্ধি দিয়ে যাচ্ছি। পারিস তো এটা ভাঙিয়ে রোজগার করিস।

মরবার সময় মানুষ হরিনাম করে। আর উনি দিলেন পয়সা রোজগারের বীজমন্ত্র। বললেন, ভূষণ গোপ বড়লোক। আবার আকাট মুখ্যু। তার কাছে বন্ধক আছে বসতবাটি আর পাঁচ বিঘে ধান-জমি। পয়সা দিয়ে ছাড়াবার কোন উপায় করতে পারিনি। এবার তোরা যদি ঠিকমত খেলিয়ে তুলতে পারিস তবে হয়তো সে ব্যাটা ফেঁসে যাবে।

মদন বলল: কি করতে হবে বাবা?

—আমি মরে গেলে তোরা সব মড়াকান্না জুড়ে দিস্ না। গোয়াল ঘরে কিছু ঠেস্ দিয়ে লাশটা দাঁড় করিয়ে দিবি। তারপর ওকে গিয়ে বলবি গাইটা বিক্রি করব। অর্ধেক তোমার দেনার দরুণ নিও। অর্ধেক

আমাদের দিও। ও ব্যাটা এ টোপ গিলবেই। সঙ্গে করে নিয়ে আসবি গোয়াল ঘরে। ওকে ধাক্কা দিয়ে আমার গায়ে ফেলে দিবি। মড়া হরিশের সঙ্গে জীয়ন্ত ভূষণ গোয়ালের কাদায় লটপট করবে। তোরা তখন হাঁ হাঁ করে উঠবি—আমার বাবাকে মেরে দিলেক গো···

হরিশ সরকারের কীর্তিমান পুত্র মদন সরকার বাপের প্ল্যান নিয়ে বিস্তর ভাবনাচিন্তার পর সত্যি সত্যিই একদিন তার বাপের মৃতদেহ নিয়ে একটা জুতসই প্রহসন ফেঁদে দিল।

ভূষণ গোপ মার্ডার কেসের আসামী। ভয়ে দিশেহারা।

চারিদিকে লোকজন, গোলমাল, মড়াকান্না, নিন্দা, ধিক্কার, উপরোধের মধ্যে মার্ডার কেসের আসামী ভূষণ গোপ থরহরি কম্পমান। অবশেষে সালিশ, বিচার, সোলেনামা। ধার-দেনার ফারখৎ লিখে মুচলেকা দেওয়া—তবে অব্যাহতি।

ভূষণ গোপের ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। ধন্য খাতক তুমি! তোমার ক্ষুরে ক্ষুরে দণ্ডবৎ। আদায় উশুলে বাজবন্দা। প্রাণ নিয়ে পালাতে পারলে বাঁচি। কি নরকযন্ত্রণা হে!

সেই বাপের ব্যাটা মদন সরকারের ঠক্ ফেরেব্বাজ খ্যাতি এতদূর পৌঁছেছিল যে লোকে তার সংশ্রব এড়িয়ে চলত। সেজন্য গ্রামে প্রায় একঘরে হয়ে গিয়েছিল। তাতে কি? জমিদার ওকে পেয়ার করেন। মানে এমনি সব বিবেকহীন, মনুষ্যত্বহীন, পাপী না হলে পাপের কারবার করবে কি করে?

হাবু সাহেব তার চেয়েও এককাঠি সরেস। তিনি জানতেন জমিদারের নজর আছে অহল্যার উপর! অজগরের কুটিল আবেষ্টনে তাকে জড়িয়ে একদিন-না-একদিন নাচ-মহলে তুলবেন।

মদন দরিদ্র। মাটির ঘর, খড়ের ছাউনী, নড়বড়ে কপাট। আঁচিল পাঁচিল কখনো ছিল না। দারিদ্র্য তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে চিহ্নিত। চরিত্রটিও ধোয়া তুলসী পাতা।

যে মানুষ পাপের মৃতদেহ নিয়ে বাণিজ্য করতে পারে সে যে বোনের দেহটাও বিকিয়ে দিতে পারে এই ধারণা স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্তের মত ধরে নিয়ে চিতাবাঘের ক্ষিপ্রতায় আক্রমণ করলেন মদন সরকারকে।

ভাদ্র মাসে ভাহু পরব। বিবি বাথান গরম। মাটির তৈরি ভাহু-মণিরা ছুতোর ঘরে রং কাজল মেখে মনোমোহিনী মূর্তিতে বিবিবাথানে হাজির। সাত-সন্ধ্যায় ঝিঙে ফুল ফোটে। মৃহু সুগন্ধের টানে প্রজাপতি বসে। বিবিজানরা খোপায় গুঁজে। দল বেঁধে বসে ভাহু গান করে—

কয়লা কুঠির কালো ভাহু রংটি যেমন আলকাতরা।

ডিপুর উপর দাড়াঞে আছে সায়েব খালভরা।

এ তাদের নিজের জীবনের কথা। ওরা কাজ করে কয়লা গাদায়। ছেঁড়া খোঁড়া শাড়ি। ময়লা মলিন গামছা ফ্যানাড়ী। নীচু হয়ে ঝোড়া তোলে। বুকের কাপড় ঢিলে হয়। ঝলসে ওঠে গা-ভরা যৌবন। ডিপোতে দাঁড়িয়ে সাহেব তা আড়চোখে দেখে। সেই দৃশ্য ওরা তুলে রাখে ভাহুগানে।

এমন কত প্রাত্যহিকতার, স্বপ্ন সাধের, ঘটনা-দুর্ঘটনার কথামালা সাজিয়ে ভাহুগানের আসর। ছন্দ মিলের কড়াকড়ি নেই। আছে শুধু ঢেউ দেওয়া সুর। পুরুষ বাজনদাররা ঢোলক, মাদল বাজিয়ে কাদা করে দেয়।

ঢ্যাঙ্গি মরে যাওয়ার পর গান বেঁধেছিল—

ভাহু গেল কয়লা খাদানে রইল ছ্যেলা বিবি বাথানে

খাদের গ্যাসে আগুন লেগে মরল সেখানে।

এমন একটা শোকবহ ঘটনার বিবরণ। অথচ বাজনাদার চারু মুচির তেহাই ঠুকবার বাহার ছাখ। চাডুম! বলে তিন পাক ঘুরে নিল।

এ-ই তাদের আমোদ প্রমোদ।

ভোরে উঠে পড়ি কি মরি করে হাজিরা দেয়। একথালা পান্তাভাত খায়। একথালা বেঁধে নেয়। ডাল তরকারি জুটলে ভাল না হলে নুন লঙ্কা পেঁয়াজ। মাথায় বেতের মোড়া তার ভিতর জামবাটিতে বাঁধা ভাত। ছেঁড়া কাপড় গুটিয়ে গুটিয়ে সুতো দিয়ে বাঁধা বিড়ে হাতে একটি মগবাতি।

মুরলী দাস তেলবাবু। হাজিরা লিখিয়ে তার কাছে দাঁড়ালেই হল। মেপে দেবে হু' দশান কেরোসিন তেল।

ধীরে ধীরে নেমে যাবে পাতালপুরীর পথে। কালোশীষ্ উগ্‌রে হলুদ শিখাটি গহীন আঁধারে জল-জল করে। মানুষের বল-বুদ্ধি ভরসা সব ঐ বাতি। নিভে গেলেই বেবাক আঁধার। তখন হামাগুড়ি দিয়ে হাতড়ে বেড়ালেও পথ খুঁজে পাওয়া দায়।

খাদের আনাচে কানাচে গরম গ্যাস। যুগ-যুগান্তব্যাপী বসবাস করছে শিলাস্তরের ফোরে ফোরে। ডাইক, চ্যুতি অথবা ভঙ্গুর শিলাস্তর তো ওদের রামরাজত্ব। অবশেষে খাদের সুড়ঙ্গ পথে মুক্তি।

পরিমাপটা যদি সাড়ে পাঁচ থেকে সাড়ে তের শতাংশ হয়। তাতে একটু আগুন পড়ে তবে তো দুনিয়া মাৎ। বিস্ফোরণ অনিবার্য। তাতে যদি যুক্ত হয় কয়লা গুঁড়ো তাহলে গোটা খাদ ঝাড়ু মেরে বিদ্যুৎগতিতে বয়ে যাবে বিস্ফোরণ। চানক মুখে নীল আলোর বিশাল ঝলক। শব্দ যেন কয়েকশো টন ডিনামাইট। বড় বড় লোহার গারডার, চানকের হেড গিয়ার পর্যন্ত তালত্যাপড়া। মহারুদ্রেব তাণ্ডবলীলা আর কাকে বলে ?

খোলা বাতির বিপত্তি দেখে ডেভী ও কেনী সাহেব ফ্লেম সেফটি ল্যাম্প আবিষ্কার করলেন ১৮৭৬ সালে। ওঁরা পরীক্ষা করে দেখলেন এক বর্গ ইঞ্চি তারের জালে যদি ৭৮৪টা ছিদ্র থাকে তবে তার মধ্য দিয়ে আগুনের শিখা পার হতে পারবে না। এই নীতির উপর ভিত্তি করে তাঁরা বাতি তৈরি করলেন। তার দ্বারা গ্যাস পরীক্ষা করা যেত তবে আলো এত কম যে কাজ করতে ভীষণ অসুবিধা। অনেকে নিস্‌ট্যাগ্‌মাস রোগে আক্রান্ত হত। যাতে চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ ও মণি চঞ্চল হয়ে উঠত। তখন আর কে এত কথা বোঝে ?

সে বাতিও ভারতে আসে নি তখন। ডিবরী বাতি সম্বল, তারপর জ্বলল কারবাইড গ্যাসের বাতি। খরচ কিছু কম। কিন্তু কি দুর্গন্ধ ! পেটের ভাত গলা দিয়ে উঠে আসত। তা হোক মালিকদের তো মুনাফা হত।

সে যুগে মানুষের জীবনের কোন দাম ছিল না। সেই সাঁওতালদের হুলমালের আগে তিনটে সাঁওতাল মেয়েকে সাহেব ঠিকাদাররা ধরে নিয়ে গিয়ে বলাৎকার করেছিল। সিধু কানু বারহেট মহকুমার ভগ্নাডিহি থেকে তিন পাহাড়ী অর্থাৎ যেখানে পাহাড় কেটে রেল

লাইন বসাবার কাজ চলছিল সেইখানে হেঁটে গিয়ে সাহেবদের লাশ ফেলে দিয়ে তাদের উদ্ধার করেছিল।

কিন্তু কয়লা কুঠিতে মেয়ে ধরে নিয়ে যাওয়া তো রোজের ঘটনা। কটা সাহেবের লাশ পড়ছে? মেয়েরাই বরং ভাবে গদগদ।

"আমি অমুক সায়েবের তমুক। গুটেক খিচির খিচির করবি তো সায়েবকে বলে তুর বাপের নাম ভুলাঞে দিব।"

এ উক্তি তার বিয়ালা পুরুষকে। যার ছেলেই পেটে ধরুক সদর বাপ এই মানুষটি। সেও তারজন্য এমন কিছু মনের বিকারে থাকতো না। চুন, তামাক, তালরস ও মহুয়ার খরচ আদায় করে নিত। বিবিবাথানে বেড়ে চলত জারজ প্রজন্মের চাষ-আবাদ।

॥ পনেরো ॥

এহ বাহ্য! প্রকৃতি বিচিত্র রূপিনী! পৃথিবীটা এক বিরাট চুম্বক। অবলীলায় টেনে রাখে তাবৎ বস্তুপুঞ্জকে। যার নাম মাধ্যাকর্ষণ। কেন্দ্রাতিগ সঙ্কোচনশীল ও দিগন্ত প্রসারী প্রসারণশীল শক্তির বিন্যাসে ভূত্বকের ভারসাম্য। খনি গর্ভের সুড়ঙ্গ পথ সেই ভারসাম্যকে ব্যাহত করে। সীমা অতিক্রম করলে অনিবার্য পরিণতি ধ্বংস।

অহল্যা পাষাণী।

যৌবনের তাবৎ তাড়নাকে গলা টিপে অন্তরের মধ্যে একটি অহঙ্কার লালন করত—তা তার সতীধর্ম। প্রলোভন তার কাছে কম আসে নি। ভাই ভাজের গঞ্জনাও কম সহ্য করেনি। তবু জীবনপণ করে আঁকড়ে ধরে রেখেছিল তার সতীত্বকে। প্রতিনিয়ত কামনা করত—হে ঠাকুর, তোমার পায়ে প্রণাম না করে আমি জলগ্রহণ করি না। তার জন্য আমাকে একটি বর দাও। যেন সতীত্ব যাবার আগে আমার মৃত্যু হয়।

গরিবদের প্রার্থনা পূরণের ঠিকা ঠাকুর আর কবে নিয়েছেন? তিনি যদি প্রসন্ন হন তবে সে গরিব থাকবে কেন? অহল্যা পাষাণেই মাথা ঠোকে।

ঘর অন্ধকার। মেঝেটা ঠাণ্ডা। জানালার ফাঁক দিয়ে এক ফালি আলো পড়েছে ঠিক যেন অন্ধকার যবনিকার হলুদ বর্ণের রেখা। মুখের ভিতর এক-ডেলা কাগজ গোঁজা। হাত দুটো পিছমোড়া দিয়ে বাঁধা।

পা দুটিকেও জোড় করে বাঁধা। নড়বার-চড়বার জো নেই। একদিকে কাৎ হয়ে মড়ার মত পড়ে আছে।

কিন্তু তার কান সজাগ। সে বুঝতে পেরেছিল দুজন লোক তাকে ঘর থেকে তুলে এনেছে। ঘুমিয়েছিল। গায়ে হাত পড়তেই ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। কিন্তু টুঁ শব্দ করতে পারেনি। দারুণ ক্ষিপ্রহাতে বাঁধা-ছাঁদা করেছিল ওরা। চোখে কিছু দেখতে পায়নি। শুধু বুঝেছিল তার সতীত্বের এন্তেকাল এসে গেছে। ঐ জানোয়ারগুলো তাকে চিবিয়ে খাবে।

লোক দুটো যখন তাকে ঠাণ্ডা মেঝেতে ফেলে দিয়ে দরজায় তালা দিয়ে চলে গেল তখন ওর মনে হল ওরা সব লুঠেরা। তাকে লুঠ করে নিয়ে এসেছে। ভোগ করবে অন্যজন। এই বুঝি সে এল।

কিভাবে তার মোকাবিলা করবে ভাবনাতেই অনেকক্ষণ কেটে গেল। প্রাণের সবটুকু উজাড় করে ঈশ্বরকে ডাকল। ঈশ্বর প্রসন্ন হলেন।

ব্যারাকলউ সাহেব মদে বেহুঁশ হয়ে ঘুমোচ্ছিলেন। তাকে জাগাবার সাহস হয়নি কারো। ঘুমিয়ে উঠতেও অনেক বেলা হল। ঢালু দাস ও তরলা দাসী তটস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে। প্রাতঃকৃত্যাদির পর উনি বেশ আয়েস করে বসেছেন। ঢালু বলল—হুজুর! নতুন চিড়িয়া ফেঁসে গেছে।

—কোথায়?

—ঠাণ্ডা ঘরে।

—দেখতে কেমন?

—বহুত বিউটিফুল হ্যায় সাব।

—কিরে তরলা? সত্যি নাকি?

—হ্যাঁ সায়েব। আপনার বাংলায় এতদিন আছি এমন রূপবতী কাউকে দেখিনি। কি বলব সায়েব—যেন মা লক্ষ্মী।

—হাই! ঢালু—সরাব লে আও।

কোন এক গুরুতর কাজ করতে হলে সরাব না হলে চলে না। ব্রেকফাস্টের আয়োজন তৈরিই ছিল। তার আর তর সইল না। খালি পেটে আধ গ্লোভল র' হুইস্কি গলায় ঢেলে উঠে দাঁড়ালেন। গলা থেকে পেট পর্যন্ত চন্‌-চন্‌ করে উঠল। মাথায় ঘোর ঘোর ভাব।

উনি এগিয়ে চললেন। পিছনে ঢালু দাস ও তরলা দাসী। সন্তর্পণে তালা খুলে দিল ঢালু যেন ভিতরে কোন বাঘ ভালুক আছে। ছাড়া পেলেই হালুম করে তার ঘাড়ে ধরবে এসে।

ব্যারাকলউ সাহেব টলছিলেন। এক হাত চৌকাঠে ভর দিয়ে অন্য হাতে ফট্ করে দরজা খুলে দিলেন। তারপর সেইখানেই থ' হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। চোখ দুটো স্থির। কান ভোঁ ভোঁ করছে।

একি ভয়ঙ্কর দৃশ্য।

তপ্ত যৌবনা এক নারীমূর্তি গলায় থান কাপড়ের ফাঁস পরে বিম থেকে ঝুলছে। মুখটা বিকৃত। চিবুক পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে জিভ। চোখ দুটো ঠিকরে গেছে। কষ বেয়ে নেমে এসেছে রক্তের ধারা।

কত মৃত্যুর প্রত্যক্ষদর্শী একজন জবরদস্ত সাহেব ভয়ে শিউরে উঠলেন। মুখ থেকে ফসকে বেরুলো—মাই গড! দিস ইজ চ্যাস্টিটি!

তার পরেই চিৎকার করে উঠলেন—হাস্ আপ! হাস্ আপ! ব্লাডি ফাকিন হাস্ আপ!

ঢালু দাস কাঁপা কাঁপা হাতে বঁটি দিয়ে পাকানো কাপড়টা কেটে মৃতদেহ নামাল। মেঝের উপর শুইয়ে দিয়ে কাপড় ঢাকা দিল।

সাহেব তার পাশে হাঁটু মুড়ে বসলেন। নিজের বুকে ক্রশ আঁকলেন। প্রার্থনার ভঙ্গিতে বললেন—মাই লর্ড· যীশাস ক্রাইস্ট! আমি এই পাপের অংশীদার নই। কিন্তু যে নারী সতীত্বের জন্য জীবন পণ করতে পারে তার গায়ে হাত দেবার সাহস আমার নেই।

এবার সমস্যা কি করে এই মৃতদেহ নিকেশ করা যায়? সাহেব ভীষণ চিন্তিত। কঠিন কণ্ঠে আয়া আর খানসামাকে বললেন—কাক পক্ষীও যেন একথা না জানতে পারে। তাহলে তোমাদের দুজনকে আমি গুলি করে মারব।

তোমাদের অপবিত্র হাতে এই পরম সতীর মৃতদেহ স্পর্শ কোর না। মিছির গোমস্তাকে আমার কাছে ডেকে দাও। হিন্দু ব্রাহ্মণ দিয়ে ওকে দাহ করতে হবে। হিন্দু ধর্মমতে ওর পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম সারতে হবে। মনে রেখ আমি এই সতীর আত্মাকে শ্রদ্ধা করি।

ডাক পেয়েই ছুটে এলেন রামনাগিনা মিশ্র। বড় মনদুঃখে দিন

কাটছিল ওর। নাওয়া-খাওয়ায় রুচি ছিল না। চোখে ঘুম ছিল না। অহরহ একটা ভাবনা, সর্বনাশ হয়ে গেল।

কিন্তু দুনিয়াতে যতদিন পাপ থাকবে, পাপী থাকবে ততদিন পর্যন্ত পাপের সঙ্গীও থাকবে। এমন বিশ্বস্ত পাপের সঙ্গী খুঁজলেই কি পাওয়া যায়? মিছিরবাবু নিজেই জানতেন না কিসের জন্য তার এত কদর! ব্যারাকলউ সাহেবও জানতেন না। আজ শিখলেন।

সাহেব বললেন—মিছিরবাবু! আপনি আমার প্রতি কতটা বিশ্বস্ত?

—প্রভু রামচন্দ্রজীর প্রতি হনুমানজী যতটা!

—আজ আপনাকে যে কাজ দেব তা নিষ্ঠাভবে পালন করবেন। তার গোপনীয়তা এমনভাবে রক্ষা করবেন যেন জিভ কেটে দিলেও কথা না বের হয়। আপনার প্রভুজীর নামে আমার কাছে শপথ করুন।

—প্রভু রামচন্দ্রজীর কিরিয়া। ঈ বাৎ যদি বলি তো হামাব বাৎচিৎ বন্ধ হোইয়ে যাবে।

—আসুন।

চরম অস্থিরতায় সারাদিন মদ খেলেন। ঘুরে ঘুরে একটাই প্রশ্ন বদহজমের ঢেউয়ের মত উঠতে লাগল—হোয়াট ইজ চ্যাসটিটি?

একটা মেয়ে সতীত্ব খোয়াবার ভয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে মরে গেল! তাহলে সতীত্ব বস্তুটা কী? নষ্ট হয়ে গেলে কি ক্ষতি হয়? তাহলে যে এত মেয়ে কত সহজেই না দেহ বিক্রি করে জীবনধারণ করছে তাদের সে ক্ষতি হচ্ছে না কেন?

অথবা এইসব সতীনারীরা কি কোন অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারিণী? তবে রাজা রামমোহন সতীদাহ প্রথা নিবারণের জন্য এত আন্দোলন করলেন কেন? ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহের জন্য আন্দোলন করছেন কেন? তিল তণ্ডুল আহার, থানবস্ত্র পরিধান, অনাহার উপবাস, লাঞ্ছনা ও অপমান নিয়ে জীবনপাত তো এক নিষ্ঠুর প্রায়শ্চিত্তের বিধান। তবু কেন বিদ্যাসাগর মশাইয়ের বিধবা বিবাহের আন্দোলন সার্থক হল না? অবশেষে কলকাতা থেকে দূরে মিহিজামে বসবাস করতে হল।

কে ভ্রান্ত? পাষাণী অহল্যা না বিদ্যাসাগর?

হিন্দুয়িজম এবং ইণ্ডিয়ার লোকজনকে এখনো চিনতে পারলেন না। বিশেষ এই নারী জাতটাকে।

অথচ এমন তো কথা ছিল না। হাবু সাহেব তাঁকে বলেছিলেন— খুব চড়া দাম দিতে হয়েছে। প্রায় পাঁচশো টাকা। না হলে মদন সরকার রাজি হচ্ছিল না। স্বয়ং জমিদার যার অন্যতম ক্রেতা হতে চান তার দাম কি কম হলে চলে?

তবে কি হাবু সাহেব মিথ্যা কথা বলেছে? টাকা দিয়ে কিনলে জবরদস্তি আনবার কি প্রয়োজন ছিল। অথবা মেয়েটি টাকাকড়ির কথা জানে না। তা অবশ্য হতে পারে।

সারাদিন যাবৎ মনের মধ্যে দমফাটা গুমোট। বোতলের পর বোতল মদ খেয়ে চলেছেন। তবু নেশা হচ্ছে না। আকাশটা তেমনি আছে। একটুও রঙ বদলায়নি। সূর্য পাটে বসেছে। দামোদরের বুকে ছড়িয়ে পড়েছে রঙের মেলা। ঢেউ ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে। পঞ্চকোট পাহাড়ের মস্ত বড় ছায়া ক্রমশ দীর্ঘতর হতে হতে গোটাটাই কালো আঁধারে ছেয়ে দিল।

সন্ধ্যা থেকে চাপরাশী ধাওড়ায় ঢোলকরতাল বেজে উঠেছে। পালোয়ানরা বিপুল উৎসাহে রামধুন গাইছে। এতদিন তাদের হেড গোমস্তার ভাগ্য বিপর্যয়ে উৎসব আনন্দ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আজ তিনি কাজে যোগ দিয়েছেন বলেই এত রামনামের বহর।

গোমস্তাবাবু নিজে সে আসরে উপস্থিত ছিলেন না। সাহেবের হুকুমে তামিল করতে একাই মড়া বয়েছেন। চিতা সাজিয়েছেন। মড়া পুড়িয়ে ঝিল ধুয়ে গভীর রাতে বাড়ি ফিরেছেন।

ব্যারাকলউ সাহেব তখনো জেগে। এতক্ষণে উনি চিঠি লিখতে বসেছেন সব নিস্তব্ধ। টানা পাখা চালানোর একটা শব্দ উঠছে। সাহেব খস্ খস্ করে লিখে চলেছেন পাতার পর পাতা। আর কোন-দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। পৃথিবীতে যেন দিবারাত্রি বলে কোন কথা নেই।

তরলা বসে বসে ঢুলছে। সারাদিনের ধকলে শরীর বড়ই ক্লান্ত। মড়াটা যতক্ষণ ঘরে ভরা ছিল ততক্ষণ বুক ধড়াস ধড়াস করছিল। পুড়ে শেষ হয়ে যাবার পর মনটা হালকা হল।

সাহেব আবার নতুন বোতল খুলেছেন। তরলা আর থাকতে পারল

না। ওঁর হাত চেপে ধরে বলল—না সাহেব আর খেয়ো না। আমার মাথার দিব্যি রইল।

—হোয়াট? তুই একটা আয়া। তোর এত সাহস যে আমার হাত ধরিস? দেখেছিস থাপ্পড়।

—মারো সাহেব। কিন্তু মদ যদি খেয়েছ তবে আমিও অহল্যার মত গলায় দড়ি দেব।

—মাই গড। আমি মদ খেলাম তো তোর কী?

—আমি তোমার ভাল চাই সাহেব।

—ভাল চাস?

—হ্যাঁ সাহেব।

—তবে আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দে। আমি যেন ঘুমের রাজ্যে চলে যেতে পারি। আমার চোখের সামনে যেন ঐ ভীষণ সতী না আসতে পারে। ওকে আমি বড় ভয় করি।

—এসো সাহেব।

ওকে ধরে বিছানায় শুইয়ে দিল। জামা-প্যাণ্ট-জুতো খুলে দিল। মাথার কাছে বসে বাতাস করতে লাগল।

মিঃ ব্যারাকলউ বললেন—আঃ! হাউ সুইট! তরলা তোরা ইণ্ডিয়ান মেয়েরা কি ধাতুতে গড়া বলতে পারিস?

—তুমি ঘুমোও সাহেব।

তরলা পরিণত যুবতী। গত তিন বছর যাবৎ আয়া। এসেছিল আর পাঁচটা মেয়ে যেমন সতীত্ব খুইয়ে পসারিনী হয় তেমনিভাবেই। তবে ওর মধ্যে কয়েকটা বিশেষত্ব ছিল। ও জানত পরিপাটি করে মেয়ে সাজাতে। নতুন মেয়ে এলে তাকে মনের মত তৈরি করে সাহেবের কাছে নিবেদন করত। তখন তার মুখে ঈর্ষাপরায়ণতার ছাপ ফুটত না। এই বিরল গুণটির জন্যই সে ব্যারাকলউ সাহেবের খাস কামরার আয়া। কোম্পানি থেকে বেতন পায়। হেসে খেলে দিন কাটায়। কিন্তু ঠিক সময়ে ঠিক জায়গাটিতে হাজির হয়।

সাহেবের উপর তার মায়া জন্মে গেছে।

॥ ষোল ॥

টাট্টু ঘোষ নাচমহলের চাকর। আসল নাম তারক। আঠারো বিশ বছর বয়স। শরীরটা যেন পাথর। রংটাও কালো। ঘাম চক্‌চকে গায়ে মাটিতে ডিগবাজী খায়। গরুর মত খাটে। সব সময়ে হাসি খুশি প্রাণচঞ্চল। একটু যেন ন্যাকা বোকা। মেয়েদের হাতে চড় খেয়েও ফ্যা ফ্যা করে হাসে। অবলীলায় বনে যায় টাট্টু ঘোড়া। পিঠের উপর সওয়ার হয় চন্দনা, অঞ্জনা, কাবেরী কিংবা মধুমিতা। ওরা ওর সঙ্গে কানামাছি খেলে। খিল্ খিল্ করে হাসে। মস্করা করে। অশ্লীল ছড়া কাটে।

তারক বগল বাজিয়ে হাপু গান করে। পেটের উপর আঙুল দিয়ে তবলা বাজায়। গাল ফুলিয়ে আওয়াজ দেয়। গলা ছেড়ে গান গায়—

ছুট্টু মুটু বেগুন গাছ কত যতন করব
বড় বউকে শুধায় ত্যাখ কাকে স্যাঙ্গা করব···

মেয়েরা সব খিল্ খিল্ করে হাসে। তারক দোল দেয় লবঙ্গ-লতিকার দোলনায়। বাগানের বড় শিরীষ গাছটায় উঠেছিল তার লতা। ফুলে ফুলে ছয়লাপ। সুগন্ধে চারিদিক ম-ম। আর কি কেউ ঘরে থাকে?

সন্ধ্যে হলেই খোঁপায় বেলকুঁড়ি গেঁথে, চোখে সুর্মা টেনে, মন-মোহিনী শাড়ি গয়না পরে দোলনায় দোল খায়। নাগর এলে তো কথাই নেই। তখন একেবারে সখীভাব।

এইসব নিয়েই বারাঙ্গনাদের বারোমাস্যা।

এদের প্রত্যেকেরই স্থান নায়িকার ভূমিকায়। কিন্তু মহাকালের ঘোড়া এমন শত সহস্র নায়িকার বুক মাড়িয়ে অনায়াসে চলে যায়। কে তার হিসেব রাখে? সবারই সব সুখের, সব দুঃখের খতিয়ান মিলিয়ে যায় মাটির তলায়।

কাবেরীর কবরীতে রক্তকরবীর মালা। টানা চোখদুটি সাবেক

কালের প্রতিমার মত। তারা দুটি টল টল করে। নাকটা একটু চাপা। পানের রসে ঠোঁট দুটি টুকটুকে লাল। হাসিতে, অশ্রুতে, বিস্ময়ে বা ভাবনায় জিভটা বেরিয়ে পড়ে। ঠোঁটের আগায় লক্‌লক্‌ করে।

তার যখন আট বছর বয়স তখন দেশে আকাল চলছিল। ওর বাপ পেটের দায়ে বিনি পয়সায় বর্তমান জমিদার রাধাগোবিন্দ রায়ের বাবাকে দিয়ে গিয়েছিল। তার মনে একটাই আশা খেয়ে পরে যদি বেঁচে থাকে তবে আবার কোনদিন এসে নিয়ে যাবে। কিন্তু সে সৌভাগ্য তার হয়নি। জীবনে বেঁচে থাকার জন্য যাকে রেখে গিয়েছিল সে বেঁচে আছে কিন্তু সে চলে গেছে। তার স্ত্রীও চলে গেছে।

আট বছরের ফুটফুটে সুন্দর অনাথিনী বালিকা সে অতীত ভুলে গেছে। এখন তার চরিত্র পাত্রাধার তৈলের মত। যখন যে পাত্রে থাকে সেই আকার নেয়। কথাটা তার প্রশিক্ষিকা মাউসীর।

রাধাগোবিন্দ বাবুর পিতৃবিয়োগ হল। উত্তরাধিকার সূত্রে সব সম্পত্তির মালিকানা বর্তাল তাঁর হাতে। কাবেরীর তখন তের বছর বয়স। বাপের সম্পত্তি ভোগ দখলের নিমিত্তে উৎসব অনুষ্ঠান করেই তিনি কাবেরীর নথমোচন করলেন। উনি হলেন কাবেরীর পতি।

সে বেচারী প্রগাঢ় বিশ্বাসে পত্নীভাব পালন করেছিল। তাঁর নিমিত্তে সিঁদুর পরত। নোয়া শাঁখা পরত। শিব ঠাকুরের মাথায় জল ঢালত। অতিথি আপ্যায়ন করতে বললে কেঁদে ভাসিয়ে দিত।

মাউসীর প্রশিক্ষণে ত্রুটি আছে এবম্বিধ ভর্ৎসনায় উত্যক্ত হয়ে কাবেরীর মগজ ধোলাই করল সে।

—ওলো ছুঁড়ি ওসব আদিখ্যেতা করিস না। যেদিন যার কাছে যাবি সেই তোর পতি। অন্য সময়ে পবিত্র কুমারী।

অতঃপর কাম শাস্ত্রের ফলিত দর্শন তার মগজে চারিয়ে গিয়েছিল শুধু মাউসীর কথায় নয় নিজের অভিজ্ঞতাতেও। চাক ভাঙা মধু দিয়ে মন মজাত রসিকের। তারাও তার কদর দিত।

মাস কয়েক পরের কথা।

প্রথম আষাঢ়ের বৃষ্টিতে মাটিতে সোঁদা গন্ধ উঠছিল। গায়ে জ্বালা ধরে। গ্রীষ্মের উত্তাপ শীতল বাতাসে উড়ে যাচ্ছিল। সদাই রঙ্গিনী রমণীরা নেচে নেচে গান করে বেড়াচ্ছিল বাগানে। সন্ধ্যার

আঁধার ঘন হয়ে নেমেছিল। তারক এখন টাট্টু ঘোড়া। কাবেরী তার সওয়ার।

টাট্টু চলছে দুল্‌কি চালে। গাছপালা, লতাপাতা, ঝোপঝাড় পার হয়ে যাচ্ছে। দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে চন্দনা, অঞ্জনাদের কলকাকলি। হঠাৎ টাট্টু হয়ে গেল সোজা। কাবেরী ওর গলাধরে পিঠের উপর ঝুলে পড়ল। টাট্টু ছুটল কদম চালে। কাবেরী খল্ খল্ করে হেসে উঠল।

—আরে! আরে! করছিস কি? পড়ে যাব যে। এঃ মা কতদূর এসে গেলাম। আরে এ যে দামোদরের কিনার রে। থাম থাম।

টাট্টু থামল চঞ্চলা জোড়ের মোহনায়। বৃষ্টির জলে ধুয়ে গেছে ঢালু পাড়। মাঝখানে বয়ে যাচ্ছে লাল জলের স্রোত। দামোদরে মিশে গেছে। বালির উপর চাপড়া ঘাস। যেন তৃণশয্যা।

আস্তে আস্তে হাঁটু মুড়ে বসে কাবেরীকে নামাল। নতুন ঘাসের উপর বসিয়ে ওর পা দুটি ধরে উন্মাদের মত মাথা ঝাঁকাতে লাগল।

টাট্টুর বুকে জোড়ের বান। বাত শিরার জ্বরের মত শন্ শন্ করে জ্বর উঠছে গায়ে। হাসিখুশি রঙ্গ তামাশার গণ্ডী পার হয়ে গেছে।

কাবেরীর বুঝতে আর কিছুই বাকি নেই। মুখের হাসি মিলিয়ে গেল।

বলল—একি ব্যাপার রে তোর? চল ফিরে চল।

—আমার একটি কথা শুন।

—কি কথা?

—আমি তোমাকে খুব ভালবাসি।

—ওঃ বুঝেছি।

—কি?

—তোর বদ মতলব।

—বিশ্বাস কর—এত ভালবাসা জীবনে তুমি কারু কাছে পাবে না।

কাবেরীর ভিতরটা গুলগুল করে উঠল। একমুহূর্ত হতভম্ব। তারপর বলল—ওরে তুই চাকর। কথা বলছিস যেন রাজপুত্তুর। এত সাহস কোথায় পেলি? একথা বাবু যদি জানতে পারে তবে বে-ঘোরে প্রাণ হারাবি।

—তুমি যদি না বল তাহলে বাবু জানবে কী করে?

—পাপের কথা ঢাকা থাকে না রে।

—এইটি পাপ হল? বাবুর ব্যবসা জমাতে তোমরা যে দেহের বেসাতি কর সেটা পাপ নয়? পাপ হল ভালবাসা?

কাবেরীর ফুসফুসে যেন কেউ পিন ফুটিয়ে দিল। তেমনি যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করে বলল—টাট্টু তুই চলে যা। বুঝতে পারছিস না এ-কি জীবন মরণ খেলা। কেন বে-ঘোরে প্রাণ দিবি?

—জীবন পণ রইল। তোমার ভালবাসা পেলে জীবনটা দিয়ে দেব।

—মনে থাকবে?

—হ্যাঁ।

—চল এখন ফিরে যাই। না হলে ওরা খোঁজাখুঁজি শুরু করবে। তোকে আমি ভালবাসা দেব। সাচ্চা ইমানের ভালবাসা।

প্রেমিক মনের আশ্চর্য লগন ঘটন। নিশুতি রাতে পুকুরে স্নান করে। ঘষে ঘষে ঘাম ধোয়। হেঁটো ধুতির উপর ফতুয়াটি চড়িয়ে প্রিয়া মিলনে যায়।

খড়ি মাটি দিয়ে নিকানো দেওয়ালে রকমারি আলপনা। চৌকাঠে সিঁদুর দিয়ে আঁকা স্বস্তিক চিহ্ন। নকশা কাটা খুঁটি ও পাড় দেওয়া বারান্দা। রামধনুর মত বাঁকানো পাড়ে ময়ুয়ের প্রতিকৃতি।

রাধাগোবিন্দ রায়ের বাপের আমলে তৈরি। মেয়েদের উনি খুব আদর করেই রাখতেন। পাকা বাড়ির সাজসরঞ্জাম পাওয়া দুষ্কর ছিল। তাই নাচুনীদের থাকবার জন্য বাগানের মাঝে কুটীর। একটার সঙ্গে আরেকটার সংশ্রব নেই। নিরালা নিঝুম কুটিরে শিহরিত প্রণয়গুঞ্জন।

তারক সেই বেহেস্তের দুয়ারে দুরু দুরু বুকে দাঁড়িয়ে আছে। তখন আকাশে একফালি চাঁদ। গাছের পাতায়, ঘাসের ডগায়, আবেশ জড়ানো শিহরণ। সেজবাতির আলো কপাটের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে ভূমিতলে এঁকে দিয়েছে লম্বা সরল রেখা।

বারাঙ্গনার বাসর শয্যা। কারুকার্য করা পালঙ্কের শিয়রে হংস মিথুনের দৃশ্য। মাথার উপর ঝালর দেওয়া চাঁদোয়া। দেওয়ালে টাঙানো দেব-দেবীর সারিবদ্ধ পট। বিভিন্ন মিথুন মূর্তি।

নথমোচনের উৎসবে জমিদার তাঁর নিজের খরচে সাজিয়ে

দিয়েছেন ঘর। শাড়ী, গহনা ও ফুলের সাজে মুড়ে দিয়েছিলেন নায়িকাকে। তখন সে ভেবেছিল—আমার কত ভাগ্য!

তারপর?

সেই বাসর, সেই সাজসজ্জা সব রইল ঠিকঠাক। বদল হয়ে চলল নায়ক। মাউসী তাকে বুঝিয়ে দিল—ও সব বিয়ে-বিয়ে খেলা রে। তুই বারাঙ্গনা। প্রতি রাত্রেই কনে সাজবি। প্রতি রাত্রেই বিয়ে হবে। উজার করে ভালবাসা দিবি। সকাল হলেই ভুলে যাবি।

তার বাসরে ধূপের গন্ধ। কপালে চন্দনের ফোঁটা। গলায় ফুলের মালা। হলেও বা সে চাকর। তবু তার দেহের ঘামে ইজ্জতের স্বাদ আছে। ভালোবাসার গন্ধ আছে। গরিবের ঘরের মেয়ে সে। বড় লোকের বাগানে মরশুমী ফুল। কাল যখন পাঁপড়ি খসে যাবে তখন আর কোন ভ্রমর গুঞ্জন করতে আসবে না।

অথচ গরিব চাকর তাকে মাথায় করে রাখবে। জীবনপণ ভালোবাসা দেবে। আবার কী চাই? বড়লোকের গুলবাগিচার চেয়ে গরিবের কুঁড়ে ঘর অনেক ভালো।

হাবু সাহেবের টাকাটা মদন সরকারের গলায় বঁড়শীর মত ফুটে গেছে। পাড়াপড়শীর কানাকানি সোচ্চার হয়ে উঠেছে। মদন লুকিয়ে বেড়াচ্ছে। সে আর কটা দিন নাচ মহলের চারপাশী পিয়ারীলাল তাকে ধরে এনে হাজির করেছে জমিদারবাবুর সামনে।

উনি ছড়ি হাতে বসে আছেন নাচ-মহলের বড় হলঘরে। হাত পা বাঁধা মদন দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে। যেন বলির পাঁঠা। নাচুনী থেকে রাঁধুনী চাকর পর্যন্ত সবাই তটস্থ। মায় গোমস্তা গণেশ ঘোষ।

উনি হুঙ্কার ছাড়লেন—বল্, অহল্যাকে কোথায় পাচার করেছিস?

– হুজুর! আমি জানি না। নিশুতি রাতে ঘর ছেড়ে পালিয়েছে।

—চোপ। শালা,—ও পালাবার মেয়ে?

—আজ্ঞে বিশ্বাস করুন।

– না। বিশ্বাস করি না। বল্—

—আজ্ঞে—

সপাং করে বসে গেল চাবুক। এক, দুই, তিন। আর্তনাদ। কান্না। না। মদন সরকার কবুল করল না।

আবার চাবুক চলল। চামড়া ফেটে রক্ত বেরুল। আর্তনাদ করতে করতে অজ্ঞান হয়ে পড়ল। কেউ ওর মুখে একফোঁটা জল দিল না। রক্তাক্ত দেহে পড়ে রইল মেঝের ওপর।

বাবু গজরাতে লাগলেন—শালা বেইমান নিমকহারাম—আমার সঙ্গে চালাকি! বেশি টাকার লোভে নিজের বোনকে বিক্রি করে দিলি। তাই যদি করবি তবে আমাকে বললি না কেন? আমি কি টাকা দিতাম না? ফোকটে চাইছিলাম। এই যে চারটে মেয়ে আছে কার কি অভাব রেখেছি? রাজরানীর মত আছে সব। তোর বোনটাও তেমনি থাকত। নষ্টই যখন করলি তখন যার তার হাতে দিলি কেন?

একটা মেয়ে একগ্লাস মদ ধরিয়ে দিল ওর হাতে। উনি এক চুমুকে শেষ করে বললেন—আরেক গ্লাস দে।

পর পর চার-পাঁচ গ্লাস মদ খেলেন সরবৎ খাওয়ার মত করে।

বললেন—পিয়ারীলাল। এ ব্যাটা মট্‌কা মেরে পড়ে আছে। দে গায়ে মদ ঢেলে। না-না। লঙ্কা গুঁড়ো নিয়ে আয়। আচ্ছাসে ঘষে দে। পাপের সাজা। বেইমানির সাজা।

পিয়ারীলাল বলল—হুজুর এতো করার কি আছে? একদম সাফ করিয়ে দিই।

গণেশবাবু বললেন -তাতে কি লাভ? ও ব্যাটা তো মরে খালাস পাবে। ছানাপোনা নিয়ে ওর বৌ-দুটো আঠান্তরে পড়বে। তখন সেই বাবুর দুয়ারেই তো ভাত মাগতে আসবে। তার চেয়ে ব্যাটাকে জীবন্ত রেখে দগ্ধাও। তবে তো বুঝবে হুজুরের সঙ্গে নিমকহারামীর কি শাস্তি?

—ঠিক। নিয়ে যাও। যতদিন না কবুল করে ততদিন চালাও চাবুক। ঘষে দাও লঙ্কার গুঁড়ো।

সেই মদন সরকারকে সাতদিন পর জীবন্মৃত অবস্থায় এক মধ্য-ডাঙায় ফেলে দিয়ে গেল পিয়ারীলাল। চারিদিকে রটিয়ে দিল—কোথায় চুরি করতে গিয়ে আড়ং ধোলাই খেয়ে এসেছে।

ব্যস! জমিদারের হাত সাফ।

॥ সতেরো ॥

ডিসেম্বর মাসে শেরগড় কোল কোম্পানিতে ব্যাপক পরিবর্তন।

মিঃ মূরের পর সি এম ই হয়েছিলেন মিঃ লংম্যান। তাঁর চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার পর হোমে যাচ্ছেন। তাই মিঃ হ্যামিণ্টন হলেন সি এম ই।

শেরগড় ও পনিয়াটা দু' অঞ্চলে দুজন ডেপুটি সি এম ই নিযুক্ত হলেন। তার মধ্যে মিঃ ব্যারাকলউ আরো পাঁচ বছরের চুক্তি করে শেরগড় অঞ্চলের দায়িত্ব পেলেন।

শেরগড়, সালুঞ্চী ও হাটনল তিনটি কোলিয়ারিতে তিনজন আলাদা ম্যানেজার দেওয়া হল। শেরগড়ে মিঃ শেফার্ড। অভিজ্ঞ ব্যক্তি। সালুঞ্চীতে মিঃ ট্রুম্যান ও হাটনলে মিঃ ডিক্‌সন। দুজনেই আনকোরা নতুন। সদ্য বিলেত থেকে এসেছেন।

বাংলোগুলিরও অদল বদল হচ্ছে। মিঃ শেফার্ড আসবেন লাল বাংলোয়। সাহেব কোঠাতে মিঃ ব্যারাকলউ থেকে যাবেন। মিঃ ট্রুম্যান পেয়েছেন সালুঞ্চীর সেই কাঁচা ইটের তৈরি বাংলোটা। মিঃ ডিক্‌সন উঠেছেন হাটনলের বাংলোয়। আর মিঃ নর্টনের জন্য তৈরি হয়েছে নতুন সালুঞ্চী বাংলো। মিঃ ট্রুম্যানের পাশাপাশি।

প্রমোশনের ব্যাপারে মিঃ নর্টনের আঙুল ফুলে কলাগাছ। একদা ব্ল্যাক্‌সমিথ শেরগড়ে এসেছিলেন ইঞ্জিনিয়ার হয়ে। পাঁচ বছরের মধ্যে শেরগড়, সালুঞ্চী ও হাটনলের গ্রুপ ইঞ্জিনিয়ার। সবই তাঁর মিসেসের এলেম জোরে। মিঃ হ্যামিণ্টন সি এম ই হয়েছেন এখন তো তার পোয়াবারো হবেই।

কয়লার চাহিদা বাড়ছে। দর উঠছে। কুলিকামিনরাও ক্রমশঃ খাতস্থ হয়ে উঠছে। দূর দূর থেকে এসে জুটছে। নতুন স্নাইডিং লাইন বসেছে সীতারামপুর থেকে। কয়লা ডেসপ্যাচের কোন অসুবিধে নেই।

তাই তাদের কোম্পানি সব কোলিয়ারিতেই সম্প্রসারণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। কোথাও নতুন ইনক্লাইন খোলা হচ্ছে। কোথাও

চানক কাটাই হচ্ছে। কোথাও বা ইঞ্জিন বসছে। আবার ঠিকাদার নিযুক্ত করার কথাও ভাবা হচ্ছে।

একদা ব্যারাকলউ সাহেব যখন সালুঞ্চীর ম্যানেজার ছিলেন তখনই খোলা হয়েছিল এক ও দু' নম্বর ইনক্লাইন। তাঁর আমলেই ছ' নম্বর ইনক্লাইন ও হাওয়া চানক খোলা হয়েছিল। যেটা এখন মুর্দা ডাম্প। এখন কাজ চলছে সাত ও আট নম্বর ইনক্লাইনে। এখানে কয়লাটা ভালো। খাদটাও অনেকদূর এগিয়ে গেছে। তাই নয় ও দশ নম্বর ইনক্লাইন কাটাই চলছে।

তখনকার ব্যাপারই ছিল এই রকম। এক মাইল দৈর্ঘ্যের মধ্যে দশ খানা ইনক্লাইন। বারো চোদ্দখানা হাওয়া চানক। অবশ্য নানা প্রতি-কূলতার জন্যই মাইনিং ইঞ্জিনিয়াররা ব্যাপক পরিসর নিয়ে প্ল্যান করতে পারতেন না বিশেষ করে পরিবহণ, জল নিকাশ ও বায়ু চলাচল।

পরিবহণের একমাত্র উপায় ইনক্লাইনের উপর বসানো স্টিম হলেজ দিয়ে টানা টবগাড়ি। সোজা ডিপে লাইন নেমে যেত। ডাইনে বাঁয়ে শাখা লাইন হত। ভিতর থেকে ঠেলে নিয়ে আসত টবগাড়ি। তাদের বলে টালোয়ান। হলেজ ডিপের গোলাইয়ে সার দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখত। হলেজ রসায় লুস দিয়ে জুড়ে গাড়ি টানাতো। সেজন্য তাকে বলত লুস চলা। হড় হড় হড় হড় শব্দে রাস্তাঘাট কাঁপিয়ে, লোকজনের বুকে ত্রাসের সঞ্চার করে ছুটে যেত টবগাড়ির সারি।

সেই বোঝাই গাড়িগুলি ইনক্লাইন মুখের ডিপোতে টালোয়ান দিয়ে ঝাড়াই হত। তারপর খালিগাড়ি লোড হত। প্রত্যেক পালিতে একজন করে মুনশী থাকতো গাড়ি সাপ্লাই ও কোন মালকাটা কতগাড়ি ভরাল তার হিসেব রাখতে।

সালুঞ্চী ছ' নম্বর পচা খাদ। সেজন্যই পরিত্যক্ত।

চালটা বড় খারাপ। ফুট দেড়েক পুরু একটা সেল পাথরের স্তর যখন তখন কাউকে কোন জানান না দিয়েই ধসে পড়ে। লোকও মারে। পনের ফুট বাই বিশ ফুট পিলার দাঁড়িয়ে আছে। চালে তিনফুট নিরেট কয়লাস্তর। কয়লাটাও ভালো। সেদিন মিঃ ব্যরাকলউ ঐ খাদে নেমে মৃতের পাহাড় দেখে যেমন চমকে গিয়েছিলেন তেমনি তার লোভও ধরে

গিয়েছিল। তাই উনি ভাবছেন পিলার কাটিং করে কয়লাটা তুলে নিলে কেমন হয়?

কাজটা বিপজ্জনক তবে অসম্ভব নয়। এক থেকে চার নম্বর পর্যন্ত চাঁদনী (পিলার কাটিং) তিনিই করিয়েছিলেন। খুব বেগ পেতে হয়েছিল, তবে সফল হয়েছিলেন। আর একটা চান্স নিলে কেমন হয়?

মনে পড়ে গেল জমিদার বাবুর কথা।

মাই গড! এই খাদটাই তো ঠিকা দেওয়া যায়। লোকজন মরে তো ওরই মরুক। কোম্পানির মুনাফা ঠিক থাক।

সাহেবদের টুপিতে টুপিতে পাক্কা মোহাব্বৎ ঠিকা দেবার কথা শুনেই মিঃ হ্যামিল্টন চোখের কোণে হাসলেন বললেন নিন মিঃ ব্যারাকলউ! আর এক পেগ হুইস্কী নিন।

—থ্যাঙ্ক ইউ!

মিঃ হ্যামিল্টন বললেন—কিভাবে ঠিকাটা দিতে চাইছেন? মানে কি শর্তে? আমাদের কোম্পানির সরকারি পরিচালনায় যে খরচ পড়ে তাতে কি উনি রাজী হবেন? তাব বেশি দিতে হলে তো বোর্ড অফ ডাইরেক্টর্স অ্যাপ্রুভ করবে না।

—তা জানি। তার মধ্যেই হবে।

—কি করে?

—আমরা কোম্পানির যে খরচ করি তা কি উনি করবেন? লেবারকে ফাঁকি দিয়ে তো পয়সা কামাবেন। এসব নেটিভ জমিনদারকে ভালো করে চিনি। ওঁর নাচমহল দেখেছেন তো? কেমন সব হাইলী ডেকোরেটেড উওম্যান। লোকটা ঐ ফাঁদ এড়ে পয়সা কামায়।

—তাতে আমাদের কী?

—আমরা কি ঘোড়ার ঘাস কাটব নাকি?

—ও-হো-হো—দুজনেই অট্টহাসিতে ভেঙে পড়লেন?

মিঃ ব্যারাকলউ বললেন—পুরুষ মানুষরা মেয়ের পিছনে পয়সা খরচ করতে করতে ফতুর হয়ে যায়। আর দিস্ জেন্টেলম্যান সেই মেয়ের সেক্স বিক্রি করে পয়সা কামায়। খাদের রেজিং কন্ট্রাক্ট পেলে আরো যে কি করবেন গড নোজ।

—দ্যাটস রাইট। প্রসীভ। অফকোর্স উই শুড নট রিমেন ড্রাই। ইয়া।

নাচমহলের নিরালা নিকুঞ্জে মিঃ ব্যারাকলউয়ের সঙ্গে মিঃ রায়ের আলাপ-আলোচনা।

মিঃ ব্যারাকলউ বললেন—হ্যাঁ, ভালো করে বুঝে নিন মিঃ রায়। আপনি মালাকাটাদের পেমেণ্ট দেবেন পার টন ছয় আনা। টালোয়ান, হাজরিবালা, বাবু, চাপরাশী সব মিলিয়ে ছয় আনা। আর একটা মোটা খরচ আছে স্টোরস এণ্ড টিম্বার। তা আনা চারেক পড়বে। সব মিলিয়ে এক টাকা খরচ। ওপর ওলার খরচ আই মীন আমার এবং মিঃ হ্যামিল্টনের জন্য চার আনা। মিঃ ট্রুম্যান ইয়ং ম্যান, ব্যাচিলার। ওর খরচ খরচা তেমন কিছু নেই। তাহলেও সেক্স এণ্ড লিকারটা না দিলে সে কি করে অত কাজ করবে?

মিঃ রায় বললেন—তা তো বটেই। কিন্তু আমি কি পাবো?

—ধরুন কোম্পানি যদি আপনাকে টন প্রতি দু টাকা রেজিং কস্ট দেয় অবশ্য মোলাই করলে আরো দু' আনা বাড়তে পারে তবে আশা করি আপনার বে-পড়তা হবে না। আপনার ছেলেকে নিয়ে আসুন একদিন মিঃ হ্যামিল্টনের অফিসে। পাকা চুক্তি করিয়ে দেব।

—সে তো হল। কিন্তু আপনার ছ' নম্বর খাদটার মুখটাই ধসে গেছে। হলেজ, বয়লার, টব লাইন কিছুই নেই। পিলার কাটিংয়ের ভীষণ বিপদ। এতসব কি আমার ছেলে সামলাতে পারবে?

—মাইগড! আমি একমাসের মধ্যে হলেজ, বয়লার, টব লাইন, পাম্প বসিয়ে, ইনক্লাইন মুখ সাফ করে সাপোর্ট দিয়ে রেডি করে দেব। আপনি তৈরি খাদ পাবেন। পিলার কাটিংকে ভয় কি? আমাদের ম্যানেজার থাকবে। সেই ব্যবস্থা করবে। আরে মশাই, মুনাফা তো পিলার কাটিংয়ে। শুধু সুড়ঙ্গ চালিয়ে কি মুনাফা হয়? আপনি কোন দ্বিধা রাখবেন না। সব দায়িত্ব আমার। আপনার ছেলেকে গড়েপিটে মানুষ করে দেবো। শুধু নিজের গরজে। কারণ ওকে নিয়ে বৃহত্তর কাজে নামতে হবে। মিঃ রায় খুব খুশি। বললেন—তাহলে মেয়েদের ডাকি। একটু আমোদ-আহ্লাদ করা যাক নাকি বলেন?

—সিওর! সিওর!

নাচ চলছে। তাকে নাচ না বলে প্রেত নৃত্যই বলা যেতে পারে। কারণ তা নিতান্তই দুই নগ্নিকার অঙ্গশোভার প্রদর্শন। দুই মাতালের বাহবা ধ্বনি।

ল রাগিনী তা বুঝতে পারে নি।
ভোর হয়ে গেল। সাহেব তো
তাকে হাবু সাহেবের কথা বলবে
বলার পাঁয়তাড়া ভাঁজতে ভাঁজতে

মো'চ্ছ। ওর দুধের একটি বোঁটা
হলে মনসারাম। দৃশ্যটা দেখেই
কম ব্যাভার? যে তার চোখের
াচ্ছে?
ছেলে কাঁদলে তারও বুক টাটায়।
চ্ছিল তখন সে বলল—খুব হঞেছে।
া লিঞে বে-সামাল।
আসবেক।
তবড় মরদের মহড়া নিঞে ঘুরে
হল। দাও আমাকে দাও।
প।

ন। ভোরবেলাতেই ঘোড়া ছুটিয়ে
ারে—কথা হল?
ায়েব কি আর কথা বলে বাবু?
নাই।

মার মরদ রইছে। ছ্যেলা কেঁদে

নে দুটো টাকা। আমার জন্যে

কাটা। বেঁকে না বসলে টাকা

াম চম্পক কুমার। বাইশ বছর বয়স।
চার ইংরেজী স্কুলে পড়ে। কথাবার্তায়
। প্রকাণ্ড।
সঙ্গে নিয়ে ঢুকলেন মিঃ ব্যারাকলউ।
শহরার জমিদার মিঃ আর জি রায়ের

মিঃ রায়। চওড়া হাত বাড়িয়ে

না দেখে খুব খুশি। সাহেবদের

হয়ে গেল। মিঃ রায় বললেন

া ফাঁদটা দেবেন না। একটা
ইনক্লাইনটাও
লউয়ের দিকে। উনি বললেন
মাদের তো নয় দশ নম্বর প্রায়

ব বোয়াল হাবু। ওর ব্যবস্থা?
লেন।
সানন্দে রাজী।

য় দিলেন। পরস্পরের হাত

ক চম্পককুমার রায়ের নামে
ালিয়ারির রেজিং কনট্রাক্ট চালু

দার মিঃ ট্রুম্যান, ছোটসাহেব

হাবু, গোমস্তা, হাজরিবাবু, মাইনিং সরদার, লেবার সরদার প্রভৃতির সঙ্গে চম্পককুমারের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল।

কাগজপত্র তৈরি হয়ে ফাইন্যাল অ্যাপ্রুভালের জন্য বিলেত চলে গেছে। ফিরে আসতে মাস দুয়েক লাগবে। তার জন্য কাজ বন্ধ হবে না। ডাইরেক্টররা যদি অ্যাপ্রুভ না করেন তবে ঠিকাদারের সব পেমেন্ট দিয়ে বিদায় করবেন। চুক্তির শর্তই তাই। সাবজেক্ট টু দি অ্যাপ্রুভাল অফ বোর্ড অফ ডাইরেক্টার্স।

হাবু সাহেবের মাথায় হাত। ভিতরে ভিতরে এত কাণ্ড হয়ে গেছে। সে যে এত দিনের পুরনো ছোট সাহেব—তাহলে তার কি হবে? তাকে কি পয়লা নম্বরের দুষমন রাধাগোবিন্দ রায়ের অধীনে কাজ করতে হবে?

কথাটা ইনিয়ে-বিনিয়ে ব্যারাকলউ সাহেবকে বলাতে উনি বললেন—

—আমি তোমাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি হাবু?

—আমাকে অন্য কোন খাদে বদলি করে দিন স্যার।

—তা কি করে হয়? সব খাদেই ছোট সাহেব আছে। তারা তোমার চেয়েও ওবিডিয়েন্ট এবং নির্ভরশীল। তুমি বরং মিঃ রায়ের তোয়াজ কর।

- স্যার। ঐ মক্ষিচোষ জমিদারের মন জুগিয়ে কি করে কাজ করব?

—কেন ওর নাচমহলে গিয়ে মেয়েদের সেবা কর।

—স্যার।

—ব্লাডি ফাকিন! শয়তান মাগীচোর। ইয়োর সারভিস ইজ নো লংগার রিকোয়ার্ড। গেট আউট!

॥ আঠারো ॥

কালো ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে চম্পক কুমার কোলিয়ারি আসেন। কুলিকামিন, বাবু, চাপরাশী সবাই সেলাম দেয়। তাতে উনি খুব খুশি হন।

সেদিন সকালে সালুঞ্চী সাত নম্বর ইনক্লাইন মুখের গুমটি ঘরে ওঁর জন্য অপেক্ষা করে বসে আছেন মিছিরবাবু। বাইরে দাঁড়িয়ে বৈতু মুণ্ডা, রাসমণি, সোনারাম প্রভৃতি লেবার সরদারেরা।

চম্পকবাবু এলেন। তার পিছনে পিয়ারীলাল। এতগুলি মহাজনের যখন একত্র সমাবেশ তখন ব্যাপারটা গুরুতরই হবে।

সাত ও আট নম্বর কোম্পানির চালু খাদ। যেমন অবস্থায় ছিল তেমনি আছে। সেই কুলিকামিন, বাবু ভেইয়া, যন্ত্রপাতি। শুধু মাথার উপরে বসেছেন চম্পককুমার। এবার থেকে তিনিই তাদের বেতন দেবেন।

ওদিকে পাঁচ-ছয় নম্বর নতুন করে চালু করতে হবে। ব্যারাকলউ সাহেব যেসব কাজের দায়িত্ব নিয়েছিলেন তার কাজ শুরু করে দিয়েছেন। সিঁড়ি মুখের ধস সাফ করে কাঠ খুঁটো দিয়ে সাপোর্টের কাজ চলছে।

বয়লার, স্টিম হলেজ বসানোর তোড়জোড় চলছে।

কিন্তু খাদ চালু হলেই লেবার কোথায়? সেজন্যই সরদারদের ডেকে পাঠিয়েছেন।

আলোচনা করে স্থির হল রাসমণি হাটনল খাদের মালকাটা কুলি-কামিন নিয়ে এসে সালুঞ্চীতে দেবে। কারণ ওদের সিদাবাড়ি ধাওড়া থেকে হাটনল অনেকদূর। তাছাড়া একশ টাকা আগাম নিয়ে ও চলে যাবে নতুন কুলিকামিন আনতে। টাকাও দেওয়া হয়ে গেল। রাসমণি মিছির গোমস্তার সূক্ষ্ম চালটা ধরতে পারল না। নগদ একশ টাকা পেয়েই ভাবে গদগদ। ও যে হাটনল খাদ থেকে আউট হয়ে গেল এবং মিছির গোমস্তার সরদার সেখানে কায়েম হবার সুযোগ পেয়ে গেল তা ও কি করে জানবে?

তারপর বৈতু মুণ্ডা পঞ্চাশ ও সোনারাম পঞ্চাশ টাকা পেল কুলি-কামিন আনবার জন্য। আপাতত তেলবাবু মুরলী দাস কাজকর্ম দেখা-শোনা করবেন। চম্পকবাবুর গোমস্তা হবে পিয়ারীলাল। মিছির গোমস্তা কোম্পানির লোক, তাকে বারবার টানাটানি কেন?

বিলি ব্যবস্থা শেষ। সবাই আপন আপন পথ ধরল। রয়ে গেলেন চম্পক কুমার ও পিয়ারীলাল।

পিয়ারীলাল বলল—হুজুর। আমি তো তাজ্জব বনিয়ে ছিলাম।

—কেন?

—হাপনার এতো নাদান উমেরে এতো বুদ্ধি কোথায় পেলেন?

—বুদ্ধির আবার কি দেখলে?

—আরে বাপ। হাপনি যো কাম আধা ঘণ্টায় কোরিয়ে দিলেন ও কাম হাপনার গোমস্তা, নায়েব দশ দিনে করতো। হরেক রোজ এক বাহানা। হরেক বাৎপর পয়সা খিঁচবার ধান্দা। ই-সব সরদার কিৎনা খুশ হোইয়ে গেলো।

কৈতববাদিতায় রাজা-মহারাজারা গলে গু হয়ে যায়, এ তো কালকার নাদান ছোঁক্‌রা চম্পককুমার। খুশি হয়ে ঘাড় নাড়তে লাগলেন।

পিয়ারীলাল আবার ধুয়া ধরল—লেকিন হুজুর, সাহেব লোগের আদৎ দুসরা। আপকা দুসরা। উ লোগ হুপড় দপড় কোরে বেড়ায়। ডিপু পর খাড়া হোইয়ে দারু পিয়ে। পেঁড়কা ছাঁও পর গামছা বিছাকে কামিন লে-কর খারাপ কাম কোরে। উ লোগকো ইজ্জত নাই। লেকিন আপকা ইজ্জতের দুসরা কিম্মত। হাপনি এক বরিয়ার জমিন-দারের লেড়কা আছেন।

চম্পক কুমার হেসে ফেললেন। বললেন, আরে তুমি আসল কথাটা বল। এত লম্বা ভণিতার কি দরকার?

—হ্যাঁ, হুজুর তো হরেক বাৎ জানেন না। হাঁ—আমি বলতেছিলাম উ উপর তরফ ফাঁকা ডাঙ্গা পর একটো ছোটাসা মোকান বানায়ে লিতে হোবে। নেহিতো হাপনি কোথায় বোসবেন? আরাম কোরবেন? থোরা দারু দাওয়াই পিয়ে মৌজ কোরবেন?

কথাটা চম্পককুমারের খুব মনে লাগল। বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ। এটা ঠিক কথা। ঘরটা কিসের হবে?

—কোই ভারী বাৎ নেহি। মিট্টিকা দিয়ার ঔর ফুস্‌কা ছাউনী। সো হামি বানায়ে দিবো। হুজুর, শিরিফ হুকুম করিয়ে দিন।

—ঠিক আছে.—ঠিক আছে। বানাও একটা ঘর।

কি করে মনিব পটাতে হয় সে বিদ্যাটা পিয়ারীলাল খুব জানে। নাহলে কি এমনিই চাপরাশী থেকে গোমস্তায় প্রমোশন হল।

মিঃ নর্টন ও মিঃ ট্রুম্যান এসেছিলেন পাঁচ নম্বর হলেজ বসাবার

ব্যবস্থা করতে। ফিরতি পথে সাত নম্বরটা দেখবার জন্য দাঁড়ালেন। কালো ঘোড়া দেখেই বুঝলেন কে এসেছেন?

মিঃ ট্রুম্যান হাত বাড়িয়েই গুমটি ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন।

—হ্যাল্লো প্রিন্স। আপনি দেখছি খুব মনোযোগ দিয়ে কাজ করছেন।

সকলে হা হা করে হাসলেন।

কিছুক্ষণ খাদের খবরাখবব নিয়ে আলাপ আলোচনা। তাবপর মিঃ ট্রুম্যান বললেন, আসুন প্রিন্স, আজকার দিনটা সেলিব্রেট করা যাক।

চম্পক কুমার হাসলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ আগেই পিয়ারীলাল তার ইজ্জতের কথাটা খেয়াল করিয়ে দিয়েছে। সাহেবরা নাকি ডিপোতে দাঁড়িয়ে দারু খায়, সেটা নাকি ওর ইজ্জতের খিলাপ।

– কেন এখানেই?

—মাই গড! এই নোংরার মধ্যে।

—সো হোয়াট? মাইনিংম্যানরা সাফা জায়গা পাবে কোথায়?

পিয়ারীলাল বলল: হুজুরের অত আদৎ নেই তো। তাই থোড়া সরম লাগছে।

মিঃ নর্টন বললেন—অল রাইট! আমার বাংলোয় চলুন।

যে কথা সে কাজ। তিনটি ঘোড়া খট্‌খট্‌ করে চলে গেল।

মিসেস নর্টন ওদের ভালোভাবেই অভ্যর্থনা করলেন। প্রিন্স বলে তার একটা আলাদা খাতির। নিজের হাতে মদ ঢেলে দিলেন ওঁর গ্লাসে। চম্পককুমার বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন মিসেস নর্টনের দেহের বাঁকে বাঁকে যৌবনের লীলাচঞ্চল ঢেউ। এ রমণী যে কোনদিন বালিকা ছিলেন এবং কখনো যে বৃদ্ধা হবেন তার কোন লক্ষণই নেই।

মিসেস নর্টন ওর সপ্রশংস দৃষ্টিতে মনে মনে পুলকিত হলেন। ঠাট্টা করে বললেন—ইউ নটি বয়। অমন করে তাকিয়ে কি দেখছ?

চম্পক লজ্জা পেলেন। সাহেবরা হেসে উঠলেন।

মিসেস নর্টন বললেন—শুনেছি তোমাদের একটা নাচ মহল আছে। সেখানে রূপ ও যৌবনের বিরাট প্রদর্শনী। আমাদের মিস্টার একদিন নাচ দেখতে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। ফিরে এসে খুব প্রশংসা করেছিলেন।

মিঃ ট্রুম্যান বললেন—নাচ-গার্লরা হয়তো ওঁকে যাত্ব করেছিল।

হা হা হা! সকলেই হেসে উঠলেন। নেশাটা ক্রমশ জমছে। এই তো হাসির সময়।

মিঃ ট্রুম্যান বললেন—সত্যিই ওরা স্থন্দর। নাচে, গানে, সেক্সে, আন্ প্যারালাল।

মিঃ নর্টন বললেন—ওহো! আপনি তাহলে ওদের খপ্পরে ডুবেছেন?

—ওহ্ নো নো। আমি মিঃ ব্যারাকলউএর সঙ্গে বার ছুই গিয়েছিলাম। বাট প্রিন্স আপনাকে তো ওখানে একবারও দেখলাম না।

চম্পক হাসলেন। বললেন—ওটা আমার ফাদারের সোল প্রপার্টি। আমার প্রবেশ নিষেধ।

—কেন? কেন? একসঙ্গে তিনজনের মুখে একই প্রশ্ন।

চম্পক বললেন—আমার ফাদার চান না যে আমি ওখানে গিয়ে নষ্ট হই।

মিঃ নর্টন বললেন—আপনার ফাদার তো দেখছি ফাদার উইলিয়ামের চেয়েও কট্টর নীতিবাগীশ!

হা হা হা। আবার হাসির হুল্লোড়।

ভর ছুপুরে ঘণ্টা দেড়েক সময় বেশ কাটল ওদের। চম্পকবাবু চলে গেলেন।

মিঃ নর্টন বললেন—মিঃ ট্রুম্যান এই অসময়ে আর কি জন্য বাংলোয় ফিরবেন? এখানেই লাঞ্চটা সেরে নিন।

—ওহ্ ধন্যবাদ।

টিউলিপের এখন টিন এজ। মায়ের মতই স্থন্দরী। মিঃ নর্টনের খুব আদরের মেয়ে। লাঞ্চ বা ডিনারে ও না থাকলে ওঁর সেদিন খাওয়াতে কোন স্ফূর্তি লাগে না। মিস্টার ট্রুম্যানের সঙ্গে সামান্য আলাপ আছে। খেতে খেতে ছজনের কথাবার্তা আরো স্বচ্ছন্দ হল। ইণ্ডিয়ার ক্লাইমেট, দামোদরের বন্যা, পঞ্চকোট পাহাড়ে মেঘের খেলা এবং আগুনের মালা নিয়ে প্রকৃতি প্রেমিকার মত বিউটিফুল, মার্ভেলাস, হরর ইত্যাদি শব্দের তারিফ নানাভাবে উচ্চারিত হল।

বিকেলবেলায় জমিদারবাবু এসেছিলেন সালুঞ্চীর অফিসে। মিঃ

ট্রুম্যানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। দুপুরে বেশ ন্যায্য মাত্রায় হেলথ টনিক পড়ার দরুন ওর মনটা খুব ফুরফুরে ছিল। মিঃ রায়কে বললেন—হ্যাল্লো মিঃ রায়! আপনার কাজকর্ম তো ভালোই চালু হয়ে গেছে।

—হ্যাঁ মিঃ ট্রুম্যান। আমি খুব বাধিত।

—এবার আমাকে বাধিত করা আপনার ডিউটি।

সিওর। মিঃ ব্যারাকলউ-এর সঙ্গে সেজন্য একটা জেণ্টলম্যান'স্ এগ্রিমেণ্ট হয়েছে। তাই আপনার আমোদ-প্রমোদের কিছু ব্যবস্থা করার অনুমতি দিন দয়া করে আজ সন্ধ্যায় নাচমহলে আসুন।

—নিশ্চয়। নিশ্চয়। স্বচ্ছন্দে।

সেই সন্ধ্যায় মিঃ ট্রুম্যানের সঙ্গে চন্দনার আলাপ হল। বেশ ভাল লাগল মেয়েটিকে। ওর রূপের মধ্যে একটা স্নিগ্ধতা আছে। হাসিটি বড় চমৎকার। খুব সরল। একটু যেন বোকা। মানে শিয়ান খিলাড়ী নয়।

ভাষা একটা মস্তবড় ব্যবধান। তবে মিঃ ট্রুম্যান ভারতে আসার পর তার প্রফেশনের জন্যই বাংলা হিন্দি কিছু কিছু বলতে ও বুঝতে চেষ্টা করছেন! চন্দনা বাংলা ছাড়া কিছুই জানে না। লেখাপড়া ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় ভাগ পর্যন্ত। তাতে বড়জোর মাস্টারের কহত মত গানের স্বরলিপি লিখতে পারে।

সাহেব সুবোদের প্রায়ই আনাগোনা হয় বলে ইয়েস, নো, কাম, গো, গিভ, টেক—এইসব দু-চারটে প্রচলিত শব্দ জানে। সে তো বলতে বলতে, শুনতে শুনতে বোরিং মাস্টার আবদুল হালিমও ইংরেজী ঝাড়ত। তাই দিয়ে কি প্রণয়গুঞ্জন হয়?

প্রণয়ের আবার ভাষা কী? অষ্টাঙ্গব্যাপী দৃশ্য ও শব্দের ঝঙ্কার। একবার আবিষ্ট হয়ে পড়লেই হল। তারপর শুধু শিহরণ।

সব চলছে ঠিকঠাক। একা হাবু সাহেবের মনে সুখ নেই। তাঁর চাকরিতে জবাব দিলেন ব্যারাকলউ সাহেব! এটা তাঁর হিসেবের বাইরে। হয়তো রাগের বশে হয়ে গেছে। তাঁর বাংলোতে গিয়ে একদিন সেলাম জানালেই হয়ে যাবে।

কিন্তু তাঁর জন্য বাংলোর গেটও বন্ধ। তাই খিড়কি দরজায় গিয়ে তরলাকে ডাকলেন। ওঁকে দেখেই তো তরলার ভুরু কুঁচকে গেছে।

অহল্যার মৃত্যুর কারণ সেই। সাহেব কখনো বলাৎকার করতে চান না। মেয়ে খুশি হয়ে আসবে। টাকা শাড়ি পেয়ে ডগমগ করবে তাতেই ওর আনন্দ। জবরদস্তি পছন্দ করেন না। তাহলে হাবু সাহেব এমন মেয়ে আনল কেন?

হাবু সাহেব সাত ঝুড়ি নিজের দুঃখ বর্ণনা করে সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের কথা বললেন।

তরলা বলল ঈ বাবাঃ। সাহেবের সঙ্গে দেখা করবেন তো আমাকে কি বলছেন? বাংলোর গেট যদি চাপরাশীরা না খুলছে তবে অফিসে গিয়ে দেখা করবেন।

—অফিসে খুব ভিড়। সাহেব রেগে গেলে পাঁচ কানে কথা চলে যাবে। তুই বাংলোতে দেখা করার ব্যবস্থা করে দে। তোকে একটা টাকা দেব।

তরলার ভীষণ রাগ হয়ে গেল। ঝন্‌ঝন্ করে বলল—আমার কাছে টাকা নাচিয়ো না বাবু। তুমার পাপের টাকা আমি ছুঁই না।

—ওঃ তুহ বড় সতী!

—আপনার মতো মানুষ সমাজে আছে বলেই তো আমাদের মতো হতভাগিনী মেয়েদের সতীত্ব কানাকড়িতে বিকিয়ে আছে।

—ওঃ। সাহেবের গরমে তুর মাটিতে পা পড়ছে নাই। ঠিক আছে। আমিও হাবু সাহেব। দিন একবার পাবই।

রেগে-মেগে চলে গেলেন উনি।

॥ উনিশ ॥

স্বপ্ন দিয়ে গড়া এক আদর্শ কোলিয়ারির নক্শা করেছিলেন মিঃ ব্যারাকলউ। দুশো ফুটের ব্যবধানে পাশাপাশি দু'খানি চানক। প্রত্যেকটির আঠারো ফুট ডায়ামিটার। দুশো ফুট গর্ত। ডবল ডুলি চলবে। প্রতিটি ডুলিতে দুটি টব। একটি ডুলি নামবে অন্যটি উঠবে। পালিতে চারশো টন করে আটশো টন রেজিং হবে। ল্যাঙ্কাশায়ার বয়লার দিয়ে বিরাট স্টিম ইঞ্জিনে ডুলি চলবে।

অফিসের বারান্দায় দাঁড়ালে যেন চানক, হেড গিয়ার, ডিপো, সাইডিং সব এক নজরে দেখতে পাওয়া যায়। তার অফিসের পিছনে হবে গুদাম। পাশে বড়বাবুর অফিস। তার পাশে জেনারেল অফিস। সামনে লন, বাগান।

আধমাইল দূরে সারিবদ্ধ তিনখানা বাংলো হবে। একটা সাহেব কোঠার চেয়ে বড়। সেটাতে উনি থাকবেন। আরো দুটি বাংলোর একটিতে ম্যানেজার অন্যটিতে ইঞ্জিনীয়ার। মোরাম বিছানো রাস্তার দুপাশে গাছ।

সারিবদ্ধভাবে বাবু কোয়ার্টার হবে। লেবারদের জন্য ঝুপড়ি ঘর রাখবেন না। ছোট ছোট খেলার ঘর দিয়ে ধাওড়া করে দেবেন। বেশ সারিবদ্ধ। সাজানো গোছানো। মাঝে একটা খেলার মাঠ থাকবে। একটা বড় পুকুর কাটাবেন। খাদের পাম্প থেকে সে পুকুরে জল আসবে। যাতে সারাবছর জলে টইটম্বুর হয়ে থাকে। উনি সবাইকে ওয়াটার, কোয়ার্টার, অয়েল, ও ফুয়েল ফ্রি দেবেন। একটা হাইজিনিক কণ্ডিশন চাই।

খাদের ভিতরেও ঐ ইঁদুর গর্ত রাখবেন না। ঠিক নিয়মমত সুড়ঙ্গ ও স্তম্ভ থাকবে। বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা হবে ফ্যান দিয়ে! মিঃ গ্রাণ্ডি যে বলেছেন কসাইখানা। তার প্রতিবাদ এভাবেই করবেন। কোলিয়ারি চালু হলে ওকে বিলেত থেকে ডেকে এনে দেখাবেন। বিজলী বাতির আলোতে তাঁকে ডিনার খাওযাবেন। সেজন্য নিজের পাওয়ার হাউস বসাবেন।

নকশা তৈরি হয়ে যাবার পর মিঃ রায়কে একদিন ডেকে নিয়ে এলেন বাংলোতে। বললেন—দেখুন মিঃ রায আমার প্ল্যান দেখুন।

মিঃ রায় ঘোড়ার ডিম বোঝেন! ব্যাপারটা বৃহৎ। তাই অনুমান করে বললেন—কিন্তু এত টাকা কোথা পাবেন সাহেব?

সেজন্য ভাববেন না। আমার ওয়াইফ সব টাকা বিনিয়োগ করবে। আমার আছে টেকনিক্যাল নো হাউ, আপনার আছে তলস্বত্ব ও উপর স্বত্ব। আমি আপনাকে গ্যারান্টি দিচ্ছি পাঁচ বছরের মধ্যে প্রত্যেক অংশীদারকে বছরে এক লাখ টাকা করে মুনাফা দেব।

সেকথা ওঁর বিশ্বাস হল না। বললেন আপনি আশমানে ফানুস

ওড়াচ্ছেন সাহেব। নেশার মাত্রাটা বেশি হয়ে গেছে। মিঃ ব্যারাকলউ রেগে গেলেন। বললেন, ঠিক আছে আপনি আজই আমার সঙ্গে চুক্তি করুন। বিশ হাজার টাকা নগদ এডভান্স দিচ্ছি। পাঁচবছর বাদ বছরে এক লাখ টাকা করে রয়্যালটি নেবেন। সাতঘরিয়া ও পান-মোহরা মৌজার তলস্বত্ব আমাকে ৯৯৯ বছরের জন্য লীজ দেবেন। বাট এ কথা যেন কেউ জানতে না পারে। এমন কি আপনার ছেলেও।

মিঃ রায় তবু বিশ্বাস করতে পারছেন না। বললেন, সাহেব! আপনি এসব নেশার ঘোরে বলছেন, নাকি সত্যি কথা?

—মাইগড। এমন একখানা মডেল কোলিয়ারির নকশা তৈরির ক্ষমতা গোটা ভারতবর্ষে পাঁচ-সাতটির বেশি মাইনিং ইঞ্জিনীয়ারের নেই। আজ ছয়মাস যাবৎ ভাবনা চিন্তা করে তৈরি করেছি। সে কি নেশা করে দিল্লাগী?

—বিশ হাজার টাকা নগদে দেবেন?

—হ্যাঁ।

—বেশ। আমি আপনাকে প্রপার্টি দেব। টাকা কখন পেমেণ্ট হবে?

—নগদ পেমেণ্ট, হার্ড ক্যাশ!

আচ্ছা! আমি এক সপ্তাহের মধ্যে কাগজপত্র তৈরি করে দিচ্ছি।

— থ্যাঙ্ক ইউ মিঃ রায়।

একটা মস্ত বড় ব্যাপারের নিষ্পত্তি হয়ে যাওয়ার জন্য মিঃ ব্যারাকলউয়ের মেজাজ খুশ। সামনে তরলাকে দেখে ওকেই প্রেম নিবেদন করে ফেললেন।

বললেন– তরলা তোর বয়স কত?

—কত আর? চব্বিশ পঁচিশ বছর হবে।

—ওহ! তবে তো ফুল ব্লুম অফ ইউথ। মানে পূর্ণ-প্রস্ফুটিত যৌবন।

তরলার অভিমানে আঘাত লাগল। তবে কি সাহেব ওকে বুড়ি মনে করে? বলল—আমাকে আর দরকার কী সাহেব? রাগিনীকেই ডাকুন।

সাহেব বাংলা কথার অত মারপ্যাঁচ বোঝেন না। বললেন,

রাগিনী! মাই গড্। ওর কথা তো ভুলেই গিয়েছিলাম। ওর নাকি ছেলে হয়েছে?

—সে তো অনেকদিন সায়েব। দামাল ছেলে এখন। ঢালু দাস ঐ বলে কতবার বখশিস নিয়ে গেল।

—হ্যাঁ। তা তো বটে। আচ্ছা ওকে একদিন ডেকে পাঠাবি তো!

লে হালুয়া। অভিমান করে একটা কথা বলতে গেল তার ফল এই হল। কটা দিন বেশ সুখেই কাটছিল। সাহেবের বাইরের মতি কমেছিল। আবার রাগিনী যদি আসে তবেই তো মাতাল করে দিয়ে যাবে। হায় রাম! একেই বলে তেড়ে কেঁকলাস গায়ে নেওয়া।

মুখ ভারী করে চলে গেল। ঢালু দাস আড়ি পেতে সব শুনছিল। জিজ্ঞাসা করল—সাহেব কি বলছিল রে?

—তোমার রাগিনী বিবিকে প্রেম জানিয়েছে গো?

—সত্যি। ঢালু দাস যেন হাতে চাঁদ পেল।

এই এক ভেড়ুয়া পুরুষ। মেয়েরা গায়ের ঘাম ঝরিয়ে, শরীর বিকিয়ে টাকা রোজগার করে আনবে ও জমা করে খাবে। এমন বেহায়া কটা আছে?

তরলা মুখ ঝাপটা দিল—আঃ বেহায়া খালভরা। তোর মতে পুরুষের মরণ হয় না কেন?

ঢালু দাস মুখ কাঁচুমাচু করে বলল- তুই রাগছিস কেন মাইরী' আমার যদি দুটো টাকা রোজগার হয় তবে বাদ সাধছিস কেন?

—মরগে যা। তরলা আর দাঁড়াল না।

মনসারাম তখন দামাল ছেলে। খল্‌বল্ করে হাসে। হাতে পায়ে ভর দিয়ে এ ঘর-ও ঘর করে। রাগিনীরও পুরনো জেল্লা ফিরে আসে। যৌবনের ভারে সে ধর ধর।

কিন্তু ঘরে তার কাঁটকী সতীন। হরদম ট্যাঁক ট্যাঁক্ করে—তুই ত বড় সাধের ছ্যেলার মা। কে বসে খেতে দিবেক শুনি· সোয়ামীর যে কত রোজগার তা জানতে কারু বাকি নেই। দিন গেলে দু' বোতল মদের খরচ কে জোগাবেক?

রাগিনী ঘরে আসার পর ছলনার কদর কমে গিয়েছিল। ঢালু

দাস বিবি বাথানের আরো পাঁচটা মেয়ের সঙ্গে তাকেও সালুঙ্কী খাদে খাটতে পাঠিয়ে দিয়েছিল। তাতেই তার হাড় কালি। খাদের খাটুনি বড়ই কষ্টের। রাগিনী বসে খাবে, সোয়ামীর সুখে ডগমগ করবে আর সে খাদে ঝোড়া বইবে এটা ওর বুকের শেল। বড় মন গুমরে আছে।

ঢালু দাসের মাসিক বেতন পাঁচ টাকা। কোম্পানির কাছে পায। সাহেবের উচ্ছিষ্ট ভোজনে পেট চলে। ওর পক্ষে একটা স্ত্রীকেই খেতে দেওয়া দায়। তাতে আবার দুটো স্ত্রী। এতগুলি ছানাপোনা।

সেজন্য ঢালু দাস ভাবে না। পরের ঘরে খাওয়া, অনুমতি দখল স্ত্রীর কাছে শোওয়া এই নিয়ে তার জীবন। ভাবনা-চিন্তার জটিল ব্যাপারে থাকে না। যে ছেলে বিইয়েছে সেই খেতে দেবে, এইটাই বিবিবাথানের রেওয়াজ। ছলনা যেমন খাদে খেটে তার ছেলেদের খাওয়ায় তেমনি রাগিনীকেও নিজের রোজগারে সন্তান পালন করতে হবে। ঢালু দাস তার সার্টিফায়েড ফাদার।

সন্তানকে ঘিরে পিতামাতার স্বপ্ন-টপ্নের ব্যাপারগুলি তাদের মধ্যে নেই। জৈবিক তাড়নায় সন্তানের জন্ম। প্রকৃতির প্রেক্ষাপটে তাদের বাড়বাড়ন্ত। কাজেই মনসারাম ধূলো কাদায়, গু-গোবরে গড়িয়ে মানুষ হবে। এটাই ভবিতব্য।

এই সময়েই একদিন হাবু সাহেব এলেন রাগিনীকে দিয়ে ব্যারাকলউ সাহেবের কাছে তার চাকরি ফিরে পাবার উমেদারী করাবার জন্য। ঢালু দাসের তো একঢিলে দু পাখী মারার সুবর্ণ সুযোগ এসে গেল। প্যাঁচ কষতে লাগল হাবু সাহেবের সঙ্গে— ঘরের বৌকে ইজ্জত বিকোতে পাঠাতে হবেক বাবু। সে কি আর দু' পাঁচ টাকায় হয়। কম করে দশটা টাকা দাও।

হাবু সাহেব গাঁইগুঁই করে রাজি হলেন।

এদিকে সাহেবের ডাক পেয়ে তো রাগিনীর দিল তড়পে উঠল। বুকের ভিতর মাদলের বোল। সাহেব ওকে খুব আদর করলেন। রাগিনীর চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল। অভিমান ভরে বলল— তুমি আমাকে এমন করে ফেলে দিলে?

—না না। ফেলব কেন? তুই ঘাবড়াস্ না। তোর ছেলেকে আমি সাহেবদের স্কুলে পড়িয়ে সাহেব বানিয়ে দেব।

॥ কুড়ি ॥

সালুঞ্চী সাত নম্বর সিঁড়ি মুখের পাঁচশো গজ উত্তরে দু'কুটুরী খড়ের ঘর ও বারান্দা তৈরী করিয়েছেন চম্পককুমার। ঘরের সামনেই একটি ছাতিম ও একটি নিম গাছ গায়ে গায়ে লেগে আছে। গ্রীষ্মের দুপুরে মনোরম ছায়া ও সন্ধ্যায় ফুলের সুগন্ধ।

চম্পককুমার সেই বারান্দায় বসে কোলিয়ারির ঠিকাদারী চালান। ছাতিম গাছের শিকড়ে বাঁধা থাকে তার কালো ঘোড়া। লোকজন, কুলি কামিন, ইয়ার দোস্ত, সাহেব সুবো হরদম আসেন। দিনমানে বড়ই ব্যস্ততা। খাদে, ডিপোতে, অফিসে ছুটোছুটিও করতে হয়।

এতটা ধকল কাটাবার জন্যই না এই নিরালা কুঞ্জ। পিয়ারীলাল সেখানে মজুত রাখে টাটকা মদ, কাঁচা মেয়েমানুষ। হাতে আছে কাঁচা টাকা। মাঝে মাঝে নিমন্ত্রিত হন মিঃ নর্টন, মিঃ ট্রুম্যান। আমোদ প্রমোদ একা ঠিক জমে না।

নির্লজ্জ, বেহায়া মদন সরকার আবার এসে জুটেছে। পিয়ারীলালের পিছনে চোরের মত দাঁড়িয়েছে। শরীর কঙ্কাল সার। মুখে কাঁচাপাকা দাড়ি। মাথায় অর্ধেক চুল উঠে গেছে। অর্ধেকগুলো দাঁত ভেঙে গেছে।

চম্পককুমারের তখন ঘোলাটে আবেশ। বললেন—এ কোন ঘাটের মড়া নিয়ে এলে হে পিয়ারীলাল।

—ভুখল মরতাড়ে বাবু। লেকিন হ্যাঁ—বহুত কামকা আদমী। আপনার পিতাজী বহুৎ পসন্দ করতেন।

ওর নামটা আগে বলবে তো।

—জী হাঁ। উয়ার নাম মদন সরকার।

—এ-হে-হে! এ তো একটা চোর হে। চুরির দায়ে বাবা ওকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তুমি আবার ওকে আমার কাছে নিয়ে এসেছ।

—জী হাঁ ঈ-চোর হ্যায়। লেকিন মেয়াচোর। আপনার পিতাজীর বহুত সেবা করিয়েছিল। লেকিন একবার একটি খুবসুরৎ

আওরত মদনকে ধোঁকা দিয়ে দুসরা আদমীর সাথে ভাগিয়ে গেলো। বাবুজী ঈ-বাৎ বিশোয়াস করলো নাই। লেকিন বাবুজী ইয়ার কোন কসুর নাই। আপ থোড়া কিরপা করিয়ে পায়ের পর আস্থান দিজিয়ে। ঈ কুত্তাকা মাফিক আপনার গুলাম বনিয়ে যাবে।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ বাবুজী। দুটো ভাত খাইতে দিবেন, জানানা লোগের কাপড়া ধোলাই কোরতে দিবেন, হাপনার টাট্টি সাফ কোরতে বলবেন—উ কভি না নেহী বোলে গা।

শুধু খিদমৎ খাটার জন্য একটা লোকের খোরপোষ দিতে হলে খরচে পোষাবে না। তাই বললেন—তুমি খাদের কাজ করতে পারবে মদন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কি কাজ জান?

—আজ্ঞে যে কাজ দেবেন। আমি শিখে নেব।

—লিখতে পড়তে জান?

—আজ্ঞে হ্যাঁ—বাংলায় জানি।

—ঠিক আছে। পিয়ারীলাল একে মুন্সীর কাজে দিয়ে দাও।

—জী হাঁ।

মদন সরকারের চাকরি হয়ে গেল। সে বাবুর তোয়াজেও লেগে গেল। খুব কড়া মুন্সী। মালকাটারা পুরো একগাড়ি কয়লা ভর্তি করলেও খাতায় হিসেব লেখে একটি দ। অর্থাৎ বার আনা। অর্থাৎ তিন পোয়া। স্বভাবতই মালকাটাদের গাড়ি কাটা গেলে পয়সাও কমে যায়। যেখানে এক গাড়িতে ছ'আনা পাবার কথা সেখানে পায় সাড়ে চার আনা। ওদের মধ্যে জমতে থাকে অসন্তোষ আর ঠিকাদারের সন্তোষ।

রাসমণি আসে অভিযোগ নিয়ে—ঈ বাবু অই কেমন মুন্সি নিয়ে এলি? কারু গাড়ি পুবা লিখে না। বেবাক মালকাটার হাজরি কাটা গেল। গরিব লোক কি করে কাজ করব?

মদন সরকার লম্বা হাত আছড়ে শাসানি দেয়—তুই বড় শিয়ান

হঞেছিস। গাড়িতে পুরা মাল দিবি নাই ত পুরা পয়সা পাবি কুথায়?
অ। মালিক তুকে ফোকটে পয়সা গুণবেক।

চম্পককুমার সে বিতর্ক শুনে প্রীতিলাভ করেন। রাসমণি গজ গজ করতে করতে চলে যায়। নিজের লোকজনদের বলে—তুরা আরো চার ঝোড়া করে কয়লা দিঞে গাড়িটি পুরা করে দে। না হলে ঈ-খাল-ভরারা পয়সা দিবেক নাই।

প্রতি সপ্তাহে ডিপো মাপ করতে কোম্পাসবাবু আসেন। মদন সরকার ওকে জোর তোয়াজ তদবির করে দু'চারশো টন বেশি করে মাপ লেখায়। সেইমত রেজিংয়ের হিসেব লেখে। দু নম্বরী খাতা চালু করে। একটি খাতার হিসেবে কুলিকামিনদের পয়সা পেমেণ্ট হয় অন্যটিতে কোম্পানির কাছে রেজিংয়ের বিল দিয়ে টাকা আদায় হয়। চম্পকবাবু ওর বুদ্ধি ও এলেম দেখে খুব খুশী।

রাধাগোবিন্দবাবুর কাছে মদন সরকারের বহালির সংবাদ পৌছালে তিনি চম্পক বাবুকে সে নিয়ে প্রশ্ন করতেই তার কাজের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে মুনাফার অঙ্কটা দেখিয়ে দেয়। তাতে উনিও খুশি হন।

ঠিক এই সময়ে পিয়ারীলাল পড়ে গেল বসন্ত রোগে। বেচারীর একেবারে মরণ দশা। অষ্টাঙ্গে জ্বালা। বড় বড় ফোস্কা। গলে ঘা হয়ে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। মারাত্মক সংক্রামক রোগ। কেউ তাকে এক গ্লাস জল দিতে আসে না। পাঁচদিন পর এল কাবেরী।

পিয়ারীলাল কেঁদে ভাসিয়ে দিল—তুমি আমার মা। এইযাত্রা আমাকে বাঁচাও। ঘরে আমার জরু বালবাচ্চা আছে। আমি যদি টাকা পাঠাতে না পারি তবে উপোস দিয়ে মরে যাবে। আজ আমি মরতে বসেছি কিন্তু দেখ যে মালিকের জন্য এত পাপ করেছি সে একদিন খবর নিল না। আমার জাতভাইদের দেশ থেকে নিয়ে এসে নোকরী দিয়েছি! আজ কেউ নাই।

কাবেরীর খুব মায়া হল। ও টাট্টু ঘোষকে ডেকে এনে বলল—ছাখ সেবাযত্ন ওষুধপত্রের ব্যবস্থা না করলে পিয়ারীলাল মারা যাবে।

তারপর সে নিজের হাতে ওর সেবাযত্ন করল। মা শীতলার নামে

পূজা পাঠাল। জমিদারকে খবর দিয়ে একজন কবিরাজের কাছ থেকে ওষুধ নিয়ে এল।

তবে একুশ দিনের দিন পিয়ারীলালের রোগ ছাড়ল।

তাহলেও তো পিয়ারীলালের ছুটো পয়সা আছে, 'বড়লোকের আশ্রয় আছে, কাবেরীর সেবা আছে কিন্তু যার কেউ নেই তার কি দশা? সে বছর বসন্ত রোগ এসেছিল মহামারীর মত। প্রত্যেক বছরেই আসে। শীতের শেষ থেকে বর্ষার শুরু পর্যন্ত বহু মানুষের প্রাণহানি ঘটায়। কিন্তু সে বছরের মত এত ব্যাপক আকার কখন ধারণ করে নি।

সাহেবরাও ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। যাঁরা নেটিভদের জন্ম-মৃত্যুকে ঘটনা বলেও মনে করেন না তাঁরাও অবশেষে ফাদার উইলিয়ামকে ডেকে এনেছিলেন। তিনি প্রায় মাসখানেক যাবৎ শেরগড় কলিয়ারীতে থেকে বসন্ত রোগীদের চিকিৎসা করেছিলেন। বলা বাহুল্য তাঁর চিকিৎসায় যারা ভাল হয়েছিল তারা সপরিবারে খ্রীষ্টান ধর্মও গ্রহণ করেছিল। এমন মারাত্মক রোগ নিরাময় বাবদ এইটুকু বিনিময় এমন বেশি কিছু নয়। তিনজন অ্যাপ্রেনটিস পাদরী সাহেব রোগীদের কানে কানে বীজমন্ত্র দিয়েছিলেন মা শীতলার সাধ্য নাই এ রোগ সারায়। একমাত্র প্রভু যীশুই পারেন তোমার রোগ নিরাময় করে শান্তি দিতে।

তথাপি ইণ্ডিয়ান নেটিভরা ধর্মের ব্যাপারে এত গোঁড়া যে মরে গেলেও পাদরী সাহেবদের দেওয়া ওষুধ খেতে চায় না। এটাই ওদের আফশোস। এমন কোন কুলি-ধাওড়া ছিল না যেখানকার দশ বিশজন এ রোগে না আক্রান্ত হয়েছে। অর্ধেক রোগী মারা গেছে। বাকি অর্ধেকের অনেকেই বিকলাঙ্গ হয়ে গেছে।

আসলে তখন গুটি বসন্তের কোন চিকিৎসা ছিল না। ডাঃ জেনার আবিষ্কৃত প্রতিষেধক টীকাও এদেশে এসে পৌঁছায় নি। রোগীদের মরণ-বাঁচন নির্ভর করত মা শীতলা, বাবা মহাদেব ও লর্ড যীশাস ক্রাইস্টের উপর। যার ভাগ্যে পরমায়ু থাকতো সেই বাঁচত।

সে সময়ে কুলি-কামিন অনেক মরে, পালিয়ে গেল। কোলিয়ারির রেজিং কমে গেল। সাহেবরা চিন্তিত। সরদারদের তো মাথায় হাত।

বেচারি রাসমণির ন'টা কুলি-কামিন মারা গেছে। তাদেরকে দেওয়া আগাম দাদন তো গেলই উল্টে সৎকারের খরচ থেকে শুরু করে মৃতদের বাচ্চা-কাচ্চাদের খাবার যোগান দেওয়া, তাদেরকে বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া ইত্যাদি নিয়ে ভীষণ বিব্রত। মোটা রকম দেনায় পড়ে গেল।

আবার চৈতু মুণ্ডার দুর্দশা দেখলে পাষাণেরও চোখ ফেটে জল আসবে। সে আহাম্মক সারা জীবনে যা রোজগার করেছে তা খরচ করেছে বিয়ে করতে ও বিয়ের ভোজ দিতে। যতবার দেশ গিয়েছে কুলি-কামিন আনতে ততবার একটি করে বিয়ে করে বৌ নিয়ে এসেছে। উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়। ওরা সব খাদে খাটবে ও তাকে পয়সা রোজগার করে এনে দেবে। কিন্তু কার্যত সেই মেয়েগুলি গণ্ডা গণ্ডা ছেলের জন্ম দিয়ে ঘাড়ে বসে খাচ্ছে। কেউ কেউ অন্যের ঘরণী হয়ে পলায়ন করেছে।

সে যখন নিজেই রোগে পড়ল তখন তার ছেলেমেয়েগুলিও টুপটাপ খসে পড়তে লাগল। আজ এটা মরে তো কাল সেটা মরে। শোকাতুরা জননীরা স্বামীর সেবা করবে কী, কেঁদে-কেটেই সারা করে দিল। ওর কুলি-কামিনরা সুযোগ পেয়ে রাতারাতি পালাল। চাপরাশীরাও আটকে রাখতে পারল না।

কি করে পারবে? মুণ্ডা পাড়ায় বসন্ত রোগ হয়েছে এই ভয়েই তো সারা। কেউ এ তল্লাটে আসে নি।

মিঃ ব্যারাকলউ অবস্থার দ্রুত অবনতি দেখে ফাদার উইলিয়ামকে নিয়ে এসেছিলেন বলেই কিছুটা শেষরক্ষা হয়েছে। অবশেষে চৈতু মুণ্ডাও প্রাণ ফিরে পেয়েছিল একটি চোখ হারিয়ে। ফাদার উইলিয়ামও তাকে ও তার অবশিষ্ট স্ত্রী পুত্র কন্যাদের প্রভু যীশুর পায়ে সমর্পণ করে দিয়েছেন।

বিবি বাথানও বাদ যায়নি। সেখানেও চার-পাঁচজন মরেছে। ইরফান আলীর সাত বেগমের এক বেগম খসে পড়েছে।

দেখেশুনে চম্পককুমারের মনমেজাজ খারাপ। খাদে মালকাটা নেই, টালোয়ান নেই, হাজরিবালা নেই। পিয়ারীলাল রোগ ভোগের

পর ছুটোছুটি করতে পারে না। নাচমহলেই বসে থাকে। হাবুসাহেবের টুপি লাঠিকে তো বিদায় করে দিয়েছেন। থাকলে হয়তো দু-চারটে কঙ্কাল শ্মশান থেকে উঠে আসত। এত বিষম দায়।

অগত্যা জনকয়েক চাপরাশী নিয়ে মদন সরকার ধাওড়ায় ধাওড়ায় ঘুরে বেড়ায় চম্পককুমারের লাঠি দেখিয়ে। তাতে কিছুটা ফল হয়। একটি দুটি করে দিন পালিতে জন বিশেক মালকাটা, পাঁচটা টালোয়ান হাজির হয়। উনি বিপুল উৎসাহে কাজে নামেন।

মদন সরকার চাপরাশীদের গাল পেড়ে বলে—শ্যালা ভেড়ুয়ার পাল। রোগ ব্যাধি তো চিরকেলে ব্যাপার। তাই বলে কুলিকামিনের অভাবে খাদ বন্ধ থাকবে? আজ থেকে সব ধাওড়ায় পুরা পাহারা লাগাও। কেউ যেন পালাতে না পারে। যে যেখানে আছে ধরে এনে কাজে লাগাও। না হলে তোমাদের চাকরি খতম।

এতো কড়া ব্যবস্থার কথা জানতো না হতভাগিনী শবরীয়া। দু-মাস আগে তার স্বামী মারা গেছে। একা পালাতে ভরসা হয়নি। একজন সঙ্গী খুঁজছিল। এতদিনে পেয়েছে একটি মুণ্ডা যুবকের। সে ওকে শাদি করবে বলে কথা দিয়েছে। খাদেরই মালকাটা। দুজনেই চৈতু-মুণ্ডাব লোক। ভিতরে ভিতরে সাঁট করে ভর সন্ধ্যেতে মোট পুঁটুলি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল।

চাপরাশীরা ধরে ফেলল। ছোকরাটিকে তো উত্তমমধ্যম দিয়ে খাদে নামিয়ে দিল মালকাটার কাজ করতে। শবরীয়াকে নিয়ে এল চম্পক-কুমারের নিরালা কুঞ্জে। সে বেচারী কেঁদেই আকুল। পুনঃ পুনঃ আবেদন করতে লাগল—ছেড়ে দাও বাবু। আর কখন পালাব নাই। আমার লোকটির সঙ্গে যেতে দাও। খাদেই যাব। কাজ করব।

কিন্তু জোয়ান আওরৎকে তো ছেড়ে দেবার নিয়ম নেই। তাই হাজির করল মালিকের কাছে। চম্পকবাবু খুব খুশি। মদন সরকার বাইরে বাবুর জন্য মুরগীর ঝোল রাঁধছিল।

হঠাৎ বাবু ডেকে উঠলেন—মদন—মদন।

মদন শশব্যস্ত হয়ে ঘরে ঢুকেই থ। মেয়েটি তফাতে দাঁড়িয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। বাবু ওয়াক ওয়াক বমি করছেন। ওঁকে দেখে বললেন ছিঃ ছিঃ এ কাকে নিয়ে এসেছ হে? কি ভীষণ নোংরা হে।

বস্তুত স্বামীর ঘাট কামানোর পর শবরীয়া আর স্নান করে নি। ওর গায়ে থাক থাক ময়লা। গা ভর্তি দাদ চুলকানি। দুর্গন্ধে কাছে দাঁড়ানো দায়।

ওকে হটিয়ে দিয়ে মদন বলল বাবু এসব চাপরাশীদেরই ভালো। আপনার স্থান নাচমহলে।

॥ অঙ্কুশ ॥

"পিতার পুণ্যে পুত্রের উদয় নইলে বংশের ক্ষয়"—ডাক পুরুষের কথা হে। একি ভুল হবার বটে।

রাধাগোবিন্দ রায় যেমন বাপ চম্পক কুমার তেমনি ব্যাটা। চাটুকার সেই একই ব্যক্তি যে একদা জমিদারের নাচমহলে বুলবুলিদের খিদমৎ খাটত। সেই এখন তার ব্যাটার ফার্স্ট সেক্রেটারী।

মুণ্ডা যুবতীর নোংরা শরীরের দুর্গন্ধে যে বাবুর বমি বমি আসে তার উপযুক্ত স্থান নাচমহল—এ তো লাখ কথার এক কথা। কিন্তু প্রশ্ন সেটা তার পিতার ব্যক্তিগত সম্পত্তি।

মদন যুক্তি দেয়—বাবু, বাপের বিষয় সম্পত্তির হকদার তো ছেলেই হবে। নাচমহল তো আপনাদের একপুরুষের সম্পত্তি নয়। আপনার বাবাও তার বাবার কাছ থেকে পেয়েছেন।

বটেই তো। বাবা যদি চামচোর জমিদার হয় ব্যাটা কেন রাণ্ডীখোর হবে না? জমিজমা, গয়নাগাঁটি, টাকাকাড়ি, ঘর বাড়ি, ব্যবসা বাণিজ্য, ঠিকাদারী, চুরি চামারী, মামলা মোকদ্দমা, দাঙ্গা ফৌজদারী, দেনা পাওনা সব কিছুরই যদি হকদার ব্যাটা হয় তবে বাপের রক্ষিতাগুলি তা হবে না কেন? এ তো আইনের কথা। তার মৌলিক অধিকার।

আর রমণীরা তো যৌবন ধন্যা। তাদের আবার আইডেনটিটি কি? এক একটি যৌবন। ব্যস। ওরা মা গঙ্গার জাত। পাপ তাপ লাগে না। ডুব দিলেই পবিত্র। অহো কি পবিত্র ভাবনা।

অতঃপর এক অবসন্ন গোধূলি বেলায় চম্পককুমারের কালো ঘোড়া টগবগ করে ঢুকে পড়ল নাচমহলের গেটে। চাপরাশীরা অপার বিস্ময়ে এক মূহূর্ত তাকাল। তারপর সেলাম দিল।

রাঁধুনী, চাকর, ওস্তাদ, বাজুয়ে, নাচুনীরা সবাই অবাক। কিন্তু কেউ অখুশি নয়। দেখতে দেখতে সব এসে জড় হল। হাত জোড় করল। কৈতববাদিতার বান ছুটিয়ে দিল।

পিয়ারীলালের অসুস্থ শরীর চাঙ্গা হয়ে উঠল। বহুত তারিফ করে বলল—হাঁ মরদ বানি ছোটাবাবু! ক্যা হিম্মত! ক্যা বুদ্ধি! তামাম কলোয়ারী হিলা দেলকে। টুরিম্যান সাহাবতক্ হিল গয়া।

চম্পক কুমার খুব খুশি। বললেন পিয়ারীলাল! লাগাও মাইফেল! সঙ্গে সঙ্গে সাজ সাজ রব পড়ে গেল। ওস্তাদ মন্মথ ঘোষ দলবল সহ তবলা সারেঙ্গী নিয়ে কালোয়াতী করতে বসে পড়লেন। পরীরা এলো মনোরম নৃত্য ছন্দে। তাদের হাতে রঙীন গ্লাস। দেখতে দেখতে গুলাবী খোয়াবে মশগুল হয়ে পড়লেন।

বার্তা শুনে জমিদারবাবুর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল।

তখন বর্ষাকাল। পানমোহরায় বোরিং চলছে। চঞ্চলা জোড়ে দু' কানা বান। মাঠ ঘাট জলে থই থই করছে। জোর কদমে চলছে চাষের কাজ। সেজন্য খাদে কুলি কামিন অনেক কমে গেছে। পাম্পের কাজ বেড়ে গেছে। দিনরাত হস্ হস্ করে পাম্প চলছে।

তারই মধ্যে বোরিং ক্যাম্পে বসে সাহেবদের শিকার পার্টি চলছে।

প্রথম বোরিংয়ে কয়লা পেয়েছেন সেই আনন্দে ব্যারাকলউ সাহেব আনন্দে আত্মহারা। সব ম্যানেজার, ইঞ্জিনীয়ারদের নিয়ে আমোদ করছেন। মিঃ হ্যামিলটনও এসেছেন।

এখানে একটা কথা। মিঃ ব্যারাকলউ কাউকে জানতে দেন নি যে এই বোরিং প্রোগ্রাম তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার। পানমোহরা তিনি লীজ বন্দোবস্ত নিয়েছেন। সবাই জানে এখানে শেরগড় কোল কোম্পানির নতুন কোলিয়ারি হবে। বোরিংয়ের যন্ত্রপাতি, লোকজন সব এসেছে শেরগড় কোলিয়ারি থেকে।

কথায় কথায় মিঃ হ্যামিণ্টন জিজ্ঞাসা করলেন—বোরিংয়ে তো কয়লা পেলেন। এরপর কি করবেন?

—আরো কয়েকটা বোরিং অবশ্যই করতে হবে।

—তা তো নিশ্চয়। না হলে প্ল্যান করবেন কী করে? কিন্তু আমার কথা হচ্ছে জমিদারবাবুর সঙ্গে একটা ফাইন্যাল কথা সেরে নিলেই হত। আণ্ডার গ্রাউণ্ড রাইট তো ওঁর। উনি কি কি শর্তে আমাদের কোম্পানীকে কোলিয়ারি করতে দেবেন তা পাকা করে নেওয়া উচিত হবে না কি?

মিঃ ব্যারাকলউ বললেন—আমি জমিদারের সঙ্গে ঠিক করে নেবো।

—রাইট। না হলে এতদূর অগ্রসর হবার পর উনি যদি বেশি টাকার লোভে অন্য কোম্পানীকে দিয়ে দেন তাহলে আমাদের এত খরচ বরবাদ হয়ে যাবে।

—সেটা আমি দেখবো।

সাহেবদের পার্টি শেষ হতে রাত হয়ে গেল। কেউ কেউ ভাবছিলেন মিঃ রায় হয়তো আসবেন এবং তাঁদের নাচমহলে যাবার নিমন্ত্রণ করবেন। কিন্তু উনি এলেনই না। যদিও মিঃ ব্যারাকলউ তাঁকেও নিমন্ত্রণ করেছিলেন।

উনি কি করে জানবেন যে ব্যাটাতে বাপকে বে-দখল করে দিয়েছে তাঁর সাধের ফুল বাগান থেকে? সেই দুঃখেই হাপসে গেছেন। সাহেবদের কাছে মুখ দেখাতে পারছেন না।

সন্ধ্যাকালে ঝিম্ ঝিম্ করে বৃষ্টি হচ্ছে। চারিদিকে ব্যাঙ ডাকছে। গাছের পাতা শন্ শন্ করছে। বিদ্যুৎ ঝিলিক দিচ্ছে। পোকামাকড় উড়ে এসে গায়ে বসছে। বারান্দার একটা আরাম কেদারায় বসে আকাশের পানে তাকিয়ে আছেন। মনটা নানা চিন্তায় বিভোর।

চিনি, চামেলী, ছলনা, বঞ্চনা, খেঁদি, বুঁচি, টেঁপি, রাগিনী, মালিনীরা সব দুধের ছেলে কোলে নিয়ে সাহেবের কাছে দরবার করতে এসেছে। অন্য কেউ হলে সাহেব কোঠার গেট পার হতে পারত না। দারোয়ান এবং অ্যালসেসিয়ানের যুগল আক্রমণে প্রাণকতে ঘয় পালাবার পথ পেত না।

কিন্তু ওদের জন্য সাহেবকোঠার দরজা সব সময়ে খে তোমার অফিসে সঙ্গে ওদের একটা আলাদা সম্পর্ক। বিবিজানদের

সব এক একটি বিষাদ প্রতিমা। যেন কত দুঃখের পথ হেঁটে এসেছে এমনি তাদের মুখের ছবি।

সাহেব বললেন--কি রে? তোরা সব দল বেঁধে এসেছিস? কি ব্যাপার? কিছু হয়েছে নাকি?

মেয়েরা সব নিরুত্তর। উনি ডাকলেন—ঢালু, তরলা।

ওরা এসে পড়তেই হুকুম দিলেন—বিবিবাগানের বিবিজানরা সব এসেছে। ওদের কিছু খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা কর। বোতল খুলে দে। কিরে? তোরা এখানেই খাবি? না ঘরে নিয়ে যাবি?

দলের মধ্যে চিনি ও বঞ্চনা এক আধটু বলতে পারে। বাকি কারো সাহেবের সামনে কথা বলার সাহস নেই। দল বাড়াতে আসা।

চিনি বলল—তুমি সায়েব আমাদের ছাব্‌তা। যতদিন ম্যানেজার ছিলে আমাদের কুনু দুখু ছিল নাই। কিন্তুক এখন তুমি এমন হঞে গেইছ যে আমরা কাছে আসতে লারি।

উনি ওঁর কথাটা বুঝলেন। সত্যি তাই ম্যানেজার থাকাকালীন কুলি কামিনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। এখন তা বিচ্ছিন্ন।

—তা কি করবি? মানুষ তো চিরকাল একরকম থাকে না। তা তোরা কি বলছিস বল? কোন অসুবিধা হলে তার ব্যবস্থা করব।

—সাহেব, চামচোর জমিদারের কামচোর ব্যাটা। তার হাতে আমাদের ফেলে দিলি। গতর খাটাঞে খেতে পাই না। এক টব গাড়ি কয়লা ভর্তি করলে তিনপুয়া পয়সা দেয়। এক চোর খালভরা মুন্‌শী এসেছে। তার যদি মুখের কথা শুন তবে মনে হবেক যে উয়ার হাড়-পাঁজরা ভেঙে দিই। আমাদের সাহেব অন্য খাদে বদলি করে দাও।

ব্যারাকলউ সাহেব ওদের প্রতি অত্যাচারের কিছু রিপোর্ট আগে পেয়েছিলেন তবে বিশেষ গা করেননি। এবার বিচলিত হলেন। আরদালী পাঠালেন মিঃ ট্রুম্যানকে ডাকতে। ওদের বললেন তোরা [illegible] বস। ম্যানেজার সাহেব আসুক।

কোম্পানির ন

সব এসেছে শেষ ত মেয়েরা সব তরতাজা হয়ে উঠল। এতগুলি মেয়ে

কথায় কথায় নিজেদের মধ্যে ঝগড়া কলহ নিয়েই থাকে তারা এক

কয়লা পেলেন। র পুরনো নাগরের কাছে মনের আগল খুলে দিল।

ঠিকাদারের অত্যাচার, চাপরাশীদের ব্যাভার, সতীনের ব্যবহার, সোয়ামীর অপদার্থতা ইত্যাদি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা। তাদের মধ্যে বুঁচি বলল—আমার বুড়া কম্পানের রস কত! ঠিকাদারের সঙ্গে ঢলাঢলি। আমার বুনটিকে একদিন থাল ধুবার নাম করে ডেকে নিঞে যেঞে কত রসের কথা।

কিছুদিন যাবৎ কাজের ভাবনায় মগজটা এমন ঠাসা হয়েছিল যে মিঃ ব্যারাকলউ এসবের দিকে নজর দিতে পারেন নি। এখন এই মেয়েদের অসংলগ্ন কথাবার্তা ও অভিযোগের মধ্যে কয়েকটা এমন পয়েণ্ট পেলেন যার তদন্ত একান্ত আবশ্যক।

মিঃ ট্রুম্যান এসে পড়লেন। দৃশ্য দেখে হেসে ফেললেন। মেয়েরা সব বিলকুল মাতোয়ালী। বাচ্চাগুলো গড়িয়ে বেড়াচ্ছে। হাতে, মুখে, সর্বাঙ্গে এঁটো খাবার। যত খাচ্ছে তার চেয়ে বেশি ছড়াচ্ছে। মেয়েরা সব খিল খিল করছে। হৈ হৈ করে মিস্টার ট্রুম্যানকে অভ্যর্থনা জানাল। দু' একজন অশ্লীল রসিকতা করে বসল। উনি বসতে বসতে বললেন—স্যার! একি সীন?

—সীনটা আমি ক্রিয়েট করলাম। মানে ওদের এনাফ না খাওয়ালে সত্যি কথাটা বের করতে পারবে না। এখন তুমি প্রশ্ন করে ত্থাখ কত কি জানতে পারবে? মিঃ ট্রুম্যান—আমার মনে হয় তোমার অজ্ঞাতে একটি দুষ্টচক্র দুর্নীতির চাষ-আবাদ করছে।

মিঃ ট্রুম্যান গম্ভীর হয়ে গেলেন। একটু পরে বললেন—আপনার কথাটা সত্যি বলেই মনে হচ্ছে।

মিঃ ব্যারাকলউ বললেন—তোরা সব বাড়ি যা। আমি সব দেখছি।

ওরা এখন যেতে চায় না। এই তো সবে নেশাটা জমেছে। কেউ কেউ সাহেবদের সঙ্গে রাত্রিবাসের বাসনাও ব্যক্ত করে ফেলল। সাহেবরাও মুশকিলে পড়লেন। মিঃ ট্রুম্যান বললেন—ইনচার্জ, মাইনিং গোমস্তা, মুনশী, সারভেয়ার, ঠিকাদার সবাইকে ডাকতে বলে দিই স্যার।

মিঃ ব্যারাকলউ—আজ থাক। কাল সকালে তোমার অফিসে যাবো। সবাইকে উপস্থিত করবে। আজ রাত্রিটা বিবিজানদের

এনজয় করতে দাও। বাট মনে রেখ কাল এদের কাউকে ডাকবে না। তাহলে পরে ব্যাচারিদের ওপর আরো অত্যাচার হবে।

পরদিন ডিপোর ওপর বিরাট দরবার বসে গেল। জেরায় জেরবার হয়ে গেল বৃদ্ধ সারভেয়ার ও মদন সরকার। গলা থেকে টেনে পুঁইখাড়ি বের করার মত এক একজনের পেট থেকে কথা বেরুতে লাগল।

চম্পকবাবু আশ্চর্য হয়ে গেলেন সাহেবরা কোথা থেকে এত তথ্য পেল সে কথা ভেবে। ওরা কি করে জানল মুণ্ডা মেয়ে শবরীয়ার কথা, ঝুঁচির বোনের কিস্‌সা, সারভেয়ারের মাপ, মদন সরকারের দু নম্বরী খাতা, বেমক্কা গাড়ি কেটে হাজরির পয়সা খাবার কথা।

সার্ভেয়ারবাবু তো স্বীকার করেই ফেললেন যে উনি সব সপ্তাহে মাপ-জোক করেন নি। মদনবাবু যা স্টক রিপোর্ট দিয়েছে তাই মেনে নিয়েছেন।

অনেক কিছুই হাতে-নাতে প্রমাণ হয়ে গেল। পুনরায় স্টক মাপ হল।

মিঃ ব্যারাকলউ চম্পকবাবুকে বললেন—প্রিন্স। তুমি ইয়ং ম্যান। হয় স্টাফদের এইসব কুকীর্তির কথা জান না, অথবা তুমি নিজেই অংশীদার। আমি কোন্ কথাটা বিশ্বাস করব?

পিয়ারীলাল এলেমদার আদমী। সাহেবদের কাছা-খোলা তদন্ত দেখে জমিদারবাবুকে খবর দিয়েছিল। তাই উনি এসে পড়লেন।

চম্পমকুমারকে ভর্ৎসনা করে মিস্টার ব্যারাকলউকে বললেন—এরপর আমি পাকা ব্যবস্থা করে দেব। যাতে কোন রিপোর্টের কারচুপি না হয় তাও দেখব। আমিও চাই না এভাবে আমার গুড উইল নষ্ট হয়।

রাইট। আপনাকে মনে রাখতে হবে এরপর আমাদের অনেক বড় কাজে নামতে হবে। চার আনার চুরি করে যে বিশ্বাস ভঙ্গ করে তার সঙ্গে বড় কিছু করতে সবাই ভয় পাবে।

চম্পকবাবুকে বললেন—প্রিন্স! হ্যাভ এ লেশন। আশা করি পরে এ নিয়ে আর আমাকে আসতে হবে না। ও. কে।' থ্যাঙ্ক ইউ।

উনি চলে গেলেন। অন্যরাও একে একে পথ ধরল।

বাপ ব্যাটাতে মোকাবিলা শুরু হল।

॥ বাইশ ॥

বিলেতের কামার মিস্ত্রী ইণ্ডিয়ার মিস্ত্রী সাহেব। তাঁর বিদ্যার দৌড় ছেনী, হাতুড়ি, সাঁড়াশী, লিয়াই পর্যন্ত। ল্যাঙ্কাশায়ারের বাসিন্দা। ওখানকার বয়লার খুব প্রসিদ্ধ। তেমনি এক বয়লার তৈরির কারখানায় ছিলেন কামার মিস্ত্রী।

তাতে কিন্তু মিসেস নর্টনের মন ভরত না। ওর ধারণা ছিল ইণ্ডিয়াতে যারা যায় তারা কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা রোজগার করেন। তাই এক নাইট ক্লাবে মিঃ হ্যামিলটন সাহেবের সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর সেই সুযোগটা গ্রহণ করেন।

মিঃ হ্যামিলটন ল্যাঙ্কাশায়ারের মানুষ। ছুটি কাটাতে গিয়ে মিসেস নর্টনের মোহে পড়ে যান। কাজেই তাঁর স্বামীকে ইঞ্জিনীয়ার বানিয়ে ইণ্ডিয়াতে নিয়ে আসতে পেরে আনন্দিতই হয়েছেন।

কিন্তু মিঃ ব্যারাকলউ ওঁকে বিশেষ আমল দিতেন না। সেজন্য পরস্পরের সম্পর্কটাও খুব একটা মধুর ছিল না। মিসেস নর্টন কয়েক-বার ওঁর দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিলেন।

তবু উভয়ের যৌথ দায়িত্বে একটা মাইন ফ্যান তৈরি হচ্ছিল। মিঃ ব্যারাকলউ তার ডিজাইন করেছিলেন। মিঃ নর্টনের উপর ভার পড়েছিল সেই রূপরেখা কার্যকরী করার জন্য। কিন্তু উনি ড্রয়িংয়ের প্ল্যান, ইলিভেশন পর্যন্ত বোঝেন না। কি করে করবেন।

মিঃ ব্যারাকলউ ওঁকে দাঁত খিঁচুনীও দিতেন কাজও শেখাতেন। একদিন কাজ করতে করতে সন্ধ্যা হল। মিঃ ব্যারাকলউ বললেন—একটু লিকার হলে ভাল হত।

মিঃ নর্টন বললেন—স্যার যদি কিছু মনে না করেন তাহলে আমার বাঙলোয় চলুন। দু' পেগ হুইস্কি খেয়ে যাবেন। আমি এবং আমার মিসেস খুব বাধিত হব।

সাহেবরা ওয়াইন এবং উওম্যানের নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করেন না।

কাজেই উনি মিঃ নর্টনের বাঙলাতে এলেন। তখন দুটি ফুলের মত

মেয়ে ঘোড়ায় চড়া প্র্যাকটিশ করছিল। উনি ওদের দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন—বাঃ মেয়ে দুটি ভারী সুন্দর। জাস্ট লাইক ফ্লাওয়ার।

মিঃ নর্টন বললেন—এ দুটি আমার মেয়ে স্যার।

—বাঃ। তোমার এমন সুন্দর দুটি মেয়ে আছে· দেখে আমার খুব ভালো লাগল।

মিঃ নর্টন মেয়ে দুটিকে কাছে ডাকলেন। ওরা এল। মিঃ নর্টন পরিচয় করিয়ে দিলেন—এটি বড় নাম টিউলিপ। এইটি ছোট—ড্যাফোডিল।

ওরা মিঃ ব্যারাকলউকে আংকল বলে হাতে চুমু খেল। উনি মুহূর্তের জন্য অভিভূত হয়ে পড়লেন। বললেন—মিঃ নর্টন! তোমার মেয়ে দুটিকে দেখে আমার মেয়ে দুটির কথা মনে পড়ে গেল। কতদিন ওদের দেখি নি।

টিউলিপ ও ড্যাফোডিলের পিঠ থাপড়ে আদর করলেন।

মিসেস নর্টন ওদের অভ্যর্থনা করে ড্রয়িং রুমে নিয়ে এলেন। মিঃ নর্টন খুব খুশি। ব্যারাকলউ সাহেবকে তার বাঙলোয় নিয়ে আসতে পেরেছেন এই আনন্দেই মশগুল।

মেয়ে দুটি সত্যিই অপাপবিদ্ধা। তাদের মনে দুনিয়াদারীর কোন আবিলতা এখনো বাসা বাঁধে নি। তাই মিঃ ব্যারাকলউকে আংকল বলে আপন করে নিতে এতটুকু বাধল না।

হুইস্কির বোতল খোলা হল। মিঃ এণ্ড মিসেস নর্টনের সঙ্গে দু-চার পেগ খাওয়ার পর মনের ভারটাও কেটে গেল। উনি বললেন, মিঃ নর্টন! এবার থেকে তুমি নিমন্ত্রণ না করলেও আমি আসব।

মিসেস নর্টন বললেন—আমরা খুব বাধিত হব স্যার।

—জানেন মিসেস নর্টন। আপনার মেয়ে দুটির চোখের তারায় কোন আকর্ষণী শক্তি আছে। ওরা আমাকে হোমের কথা মনে পড়িয়ে দিচ্ছে। ওরাও তো উজ্জ্বল, চঞ্চল ভঙ্গিমায় ছুটে বেড়াচ্ছে। আমার মিসেস চিঠিতে লিখেছিল বড়টি এবার টিন এজে পড়বে। টিউলিপ, ড্যাফোডিলের বুঝি টিন এজ চলছে?

—হাঁ। বড়টি সিক্সটিন, ছোটটি থারটিন।

—নাইস। ভেরী নাইস। লর্ড যীশাস ক্রাইস্ট, ওদের মনে অপার সুখ-শান্তি দিন

বাৎসল্য রসে ওর ভিতরটা দ্রবীভূত হয়ে উঠল। টিউলিপ ও ড্যাফোডিলকে দু হাতে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়ে বিদায় নিলেন।

মিসেস নর্টন ওর যাওয়ার দিকে তাকিয়ে বললেন—এই হামবাগ লোকটার এত স্নেহ উথলে উঠল কোথা থেকে ?

মিঃ নর্টন বললেন—কার মনে কি বেদনা লুকিয়ে আছে তা কে বলতে পারে ?

মনের খুশিতে মিঃ নর্টন আরো এক পেগ নিলেন। সেটা শেষ করে আবার। টিউলিপ বলল—আর নিও না ড্যাডী। আউট হয়ে যাবে।

উনি হা-হা করে হাসতে হাসতে বললেন—তাতে কি আছে ? আজ খুশির দিন। এনজয় করতে দে।

ওপরতলার কাছাকাছি আসতে পেরেছেন বলেই তার এত খুশি।

তখন গেটের মুখে জোড়া ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ। নামলেন মিঃ হ্যামিলটন ও প্রিন্স চম্পককুমার। ওঁরা একটা বোতল সঙ্গে করেই এনেছিলেন। মিসেস নর্টনের হাতে সেটা দিলেন। উনি লেভেল দেখে বললেন—বাঃ।

মিঃ হ্যামিলটন বললেন—প্রিন্সের খাতিরে এসেছি। উনি আজ একটা দারুণ প্রোপোজাল নিয়ে এসেছেন।

মিসেস নর্টন বললেন—কি রকম ?

বলছি। আগে শুরু হোক। মিঃ নর্টন বি এলার্ট।

হুইস্কি খেতে খেতে আলোচনা শুরু হল। চম্পককুমার বললেন—দেখুন পানমোহরা, সাতঘরিয়ার আণ্ডার গ্রাউণ্ড রাইট আমাদের। আমরা চাই নিজস্ব কোলিয়ারি করতে। কিন্তু এর টেক্‌নিক্যাল নো-হাউ এবং ক্যাপিটাল তো আমাদের নেই। তাই আপনাদের পার্টনার হিসেবে পেতে চাই।

মিঃ ও মিসেস নর্টন বললেন—উত্তম প্রস্তাব।

মিঃ হ্যামিলটন বললেন—মিঃ ব্যারাকলউ চাইছেন ওটাকে শেরগড় কোম্পানির নামে লীজ বন্দোবস্ত নিতে। তাতে আমাদের কি লাভ ? আমরা প্রিন্সের প্রস্তাব গ্রহণ করবো।

—মিঃ ব্যারাকলউ যদি বাধার সৃষ্টি করেন ?

মিঃ হ্যামিলটন বললেন—আপনার প্রোপার্টিকে ওর বাধা দেবার কি অধিকার আছে প্রিন্স ? তবু যদি কিছু করতে যায় আমি ব্যবস্থা নেব।

চারজনে মিলে বোতলটা শেষ করতে করতে বিস্তর আলোচনা হল। চম্পককুমার খুব খুশি। দীর্ঘক্ষণ যাবৎ এক ইউরোপীয় রমনীর সাহচর্যে ওর মনের পিপাসা বেড়ে যায়।

সাহেবদের গুডনাইট করে ঘোড়া ছুটিয়ে হাজির হল নাচমহলে। তখন বেশ রাত হয়েছে। সব খেয়েদেয়ে শোবার তোড়জোড় করছে আজ আর কেউ এল না—এই স্বস্তিতে পিয়ারীলাল বসে বসে খৈনী টিপছে। হঠাৎ ছোট মালিকের ঘোড়া এসে দাঁড়াল তার সামনে।

পিয়ারীলাল তাড়াতাড়ি উঠে ঘোড়ার রশি ধরল। উনি নামতে নামতে বললেন—পিয়ারীলাল, কাবেরীকে ডাক।

ডাক শুনেই কাবেরীর আক্কেল গুড়ুম। ছোটবাবু এ কি কথা বলেন ? সে ওর বাবার রক্ষিতা। গণিকাবৃত্তির নিয়ম অনুযায়ী যার তার কাছে দেহ দান করতে দ্বিধা নেই। তাই বলে ছেলের কাছে ?

ওর নারীসত্তা বিদ্রোহ করে উঠল। পিয়ারীলালকে বলল—তুমি ছোটবাবুকে বুঝিয়ে বলগে। আমি জীবন থাকতে ওর কাছে যেতে পারব না।

পিয়ারীলাল চলে গেল। টাট্টু ঘোষ এসে দাঁড়াল। কাবেরীর আবেগ উথলে উঠল। বলল—ছোটবাবু ডেকে পাঠিয়েছে। কিন্তু আমি যাব না। তাতে যা আছে কপালে।

পিয়ারীলাল ফিরে এসে বলল—হুজুর, উ ছোকড়ীর বহুত শরম। আপনার কাছে আসতে নারাজ।

উনি বললেন—কাবেরীর আবার শরম কি হে ?

—নেহী হুজুর। ইয়ার শরম থোড়া দুসরা তরিকার। উ তো হাপনার পিতাজীর বহুত দিল পিয়ারী ছিল। উসকা আপনা পতি সমঝ কর দুসর কই আদমীর সাথ আপনা শরম ভরমের কারবার করত না। আভি ভি বড়া মালিকের হুকুম না হোলে উ কারো কাছে যায় না।

—আরে রাখো ওসব বাৎ। আজ আমি ওকে চাই। এইটাই শেষ কথা।

পিয়ারীলাল আবার কাবেরীর কাছে গেল। অনুনয় করে বলল—তুমি একবার চল। ছোটবাবুকে আপনা মুখে যো বাৎ বলবার বলিয়ে দাও। হামি নোকর। হুকুম তামিল না করলে নোকরী থাকবে না।

কাবেরী সে কথা শুনতে শুনতে চুলের খোঁপা খুলছিল। ভিতরে ভিতরে উত্তেজিত হয়ে উঠছিল। কাঁটা, ফুল সব ফেলে একরাশ চুল পিঠের উপর মেলে দিল।

পিয়ারীলাল আবার বলল—আমার বাৎ মানো। নেহীঁ তো আভি হুকুম হোবে—পাকড়ে লিয়ে আসো। তো আমি ক্যা করব? তু হামার মা। তোর গায়ে হাত দিবো?

কাবেরী এই কথার পর পিয়ারীলালকে ফিরিয়ে দিতে পারল না। ওর পিছন পিছন এসে চম্পকবাবুর কাছে দাঁড়াল।

উনি বললেন—এই যে কাবেরী। এতো দেমাক কিসের? ডাকলে সাড়া দিস না কেন? কি মনে করেছিস কি?

কাবেরী উত্তর দিল না। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে রইল।

উনি বললেন—যা। বাসর সাজাগে যা।

কাবেরী জোড়হাত করে বলল—আমাকে তুমি ক্ষমা কর ছোটবাবু।

—কিসের ক্ষমা? মানে মানে হুকুম তামিল কর।

—পারবো না ছোটবাবু।

কি? এত স্পর্ধা তোর? আমার মুখের সামনে দাঁড়িয়ে পারব না বলিস। জুতিয়ে মুখ ভেঙে দেব।

—তা দাও ছোটবাবু।

—চুপ কর্ ছোটলোকের মেয়ে। সপাটে একটি চড় কসাল কাবেরীর গালে। ওর চোখ থেকে টস্ টস্ করে জল গড়িয়ে পড়ল। কাঁপতে কাঁপতে বলল—ছোটবাবু, আমার তেরো বছর বয়সে তোমার বাবা আমার নথমোচন করেছিল। সেই থেকে তাকে পতি বলে জানতাম। এখনো আমি তার নামেই সিঁদুর পরি। আমি তোমার মা।

—ফের সেই কথা।

কাঠগোঁয়ার চম্পককুমারের মগজ টগবগ করে ফুটতে লাগল। খপ করে কাবেরীর চুলের মুঠি ধরে বললেন—জবরদস্তি ছাড়া চলবে না দেখছি।

কাবেরী আর্তনাদ করে উঠল—তুমি যদি আমার উপর জবরদস্তি কর তবে মাতৃহরণের দায়ে পড়বে। পাপের তাড়নায় তোমার কুষ্ঠ-ব্যাধি হবে। যে হাত দিয়ে মায়ের চুলের মুঠি ধরেছ তা অবশ হয়ে যাবে।

চম্পককুমার অশ্লীল শব্দ করে বললেন—সব সরে যাও এখান থেকে।

রাঁধুনী, চাপরাশী যদি বা কেউ কাছাকাছি ছিল ভোজবাজীর মত অদৃশ্য হয়ে গেল। চম্পককুমার ভীষণ রিরংসায় ছিঁড়ে ফালা ফালা করে দিলেন ওর শাড়ি।

কাবেরী চীৎকার করে উঠল—কামুক, লম্পট। তোমাকে আমি অভিশাপ দিচ্ছি একদিন এই কামনাতে ডুবে পথের কুকুর কুকুরী যেমন মার খেয়ে মরে পড়ে থাকে। তেমনি তুমি মরবে। লোকে তোমার গায়ে থুতু ফেলবে। আঃ!

ভীষণ যন্ত্রণায় আছড়ে পড়ল কাবেরী। তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন চম্পককুমার। পিছন থেকে একটা লাঠির ঘা পড়ল তাঁরও মাথায়। উনি আর্তনাদ করে উঠলেন। ছাড়া পেল কাবেরী। পলক-মাত্রে অন্ধকারের দিকে ছুটে গেল গেল লজ্জা নিবারণ করতে।

লাঠি মেরেছিল টাট্টু ঘোষ। কাবেরীর লাঞ্ছনা ওর সহ্য হয় নি। ভুলে গিয়েছিল সে চাকর। বরং তার সাচ্চা ভালবাসার আবেগ মথিত পৌরুষ জাগ্রত হয়ে উঠেছিল। লাঠি তুলে দ্বিতীয়বার মারবার আগেই পিয়ারীলাল ছুটে এসে ধরে ফেলল। অন্যান্য চাপরাশীরা তাকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরল।

চম্পককুমারের মাথা ফেটে রক্ত বের হল। উনি উঠে বসলেন। টাট্টু ঘোষকে দেখে বললেন—শালা নোকর। তোর এত সাহস যে আমাকে লাঠি মারলি? পিয়ারীলাল আমি এখুনি এর খুন দেখতে চাই।

—জী হুজুর। ঈ সরোয়া যো পাপ কোরিয়েছে খুন ছাড়া তো দুসরা বদলা নেই। লেকিন এক রাত বাঁচায়ে রাখুন।

—কেন ?

—এক নোকরের এতো হিম্মত কি কোরে হোবে ? জরুর ইয়ার পিছে দুসরা আদমী আছে। বরিয়াসে ধোলাই কোরলে সাচ বাৎ নিকালে যাবে। নেহী তো কাল বড়া মালিকের কাছে হাজির করবো। হাঁপনি বে-ফিকির থাকুন।

সেই রাত্রেই এক ঘরে বন্দিনী হল কাবেরী। অন্য ঘরে টাট্টু ঘোষ, তার আগে চম্পককুমারের চাবুকের ঘায়ে ওর চামড়া ফেটে চৌচির হয়ে গেল।

॥ তেইশ ॥

রাত নিঝুম। চরাচর ব্যাপ্ত অন্ধকার। গাছের পাতায় শন্‌শন্‌ শব্দ। কখনো বা দামোদরের পাড় ভাঙার। বহতা জলস্রোতের এক রকম সর্বব্যাপী শব্দ লহরী যা দিনের কোলাহলে শুনতে পাওয়া যায় না।

সব ঘর অন্ধকার। সবাই ঘুমে অচৈতন্য। পিতলের প্রদীপ জ্বলছে কাবেরীর ঘরে। মেঝেতে পড়ে আছে সে। অবিরল অশ্রুধারায় মাটি ভিজে গেছে। বাইরে তালা বন্ধ। ওর বেরুবার উপায় নেই।

একটু শব্দ করে কপাটটা খুলল। ভয়ে কাবেরীর বুক ছ্যাঁৎ করে উঠল। চোখ মেলে তাকাতেই বৃদ্ধ ওস্তাদ মন্মথ ঘোষের মুখটা দেখে আশ্বস্ত হল। উনি কাছে এগিয়ে এলেন। কাবেরীর মাথায় হাত রেখে ধ্যানস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কাবেরী আস্তে আস্তে বলল—গুরুজী! আমি কি করব ?

- মনে মনে ভগবানকে স্মরণ কর।

—টাট্টুকে ওরা খুব মেরেছে ?

—হ্যাঁ।

—বাঁচবে তো ?

—এ মারে মরে যাবে না। তবে ওর পরমায়ু শেষ হয়ে এসেছে।

—আমিই ওর মৃত্যুর কারণ হব।

—হোক মৃত্যু। তবু তো পুরুষ। জীবনে অন্তত একবারও তার পৌরুষ জাগ্রত হয়েছিল। এমনি যদি সবারই হত, তবে অত্যাচারীদের জাত ভয়ে অবশ হয়ে যেত।

—টাট্টুর সঙ্গে জীবনের শেষ দেখা হবে না গুরুজী?

—দেখি চেষ্টা করে। পিয়ারীলালকে অনেক বলে-কয়ে তোকে দেখতে এলাম। ওকে আবার বলি গে—যদি দয়া হয়।

উনি চলে গেলেন বাইরে থেকে তালা বন্ধ করে। কাবেরী অধীর-ভাবে অপেক্ষা করছে। অনেকক্ষণ পর পিয়ারীলাল এল। ফিস্ ফিস্ করে বলল—আমার সঙ্গে চলিয়ে আসো।

ওর পিছন পিছন অনেকদূর হেঁটে চাপরাশী ধাওড়ার পাশে একটা কুঁড়েঘরের মধ্যে অর্ধ-চৈতন্য টাট্টু ঘোষকে পেল। গাঢ় অন্ধকার। কাবেরী একটা আলো চাইল। কেরোসিনের কুপী জ্বালিয়ে দিল পিয়ারীলাল।

টাট্টুর সারা গায়ে মোটা মোটা কালসিটে দাগ। রক্তচুইয়ে জমাট বেঁধে গেছে। মুখটা ফুলে উঠেছে। একটি গামছা গায়ে জড়িয়ে মেঝের উপর শুয়ে আছে। কাবেরী ওর কাছে বসল। পরম স্নিগ্ধ ভালবাসায় ওর গায়ে হাত বুলিয়ে দিল। অর্ধ-চৈতন্যের মাঝে এই স্নিগ্ধ প্রলেপ তার যন্ত্রণাকাতর দেহ-মনে নতুন প্রাণের সঞ্চার করল। চোখ মেলে তাকাল। একটা হাত তুলে কাবেরীর চিবুক স্পর্শ করল।

কাবেরী বলল—টাট্টু! তুই এমন করতে গেলি কেন?

—আমি সহ্য করতে পারলাম না।

—কেন পারলি না? আমি তো বারাঙ্গণা। চম্পকের অত্যাচারে আমার নতুন কি ক্ষতি হত? কিন্তু আজ যে তোর প্রাণ বিপন্ন হয়ে গেল।

—আমাদের ভালবাসার জীবনপণ কড়ার ছিল। মরে গেলাম তো কি হল? কড়ার পুরণ করে দিয়ে যাব।

দেওয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে পিয়ারীলাল সব শুনছিল। মনে মনে বলল—হে রাম! এত সাচ্চা মুহাব্বৎ। এক নাদান ছোকড়া নোকরের এতো হিম্মৎ। আউর হামলোগ? পাপী জমিন্দারের কুত্তা!

কাবেরী বাইরে এল। পিয়ারীলালকে বলল—ওর সর্বাঙ্গ ফেটে গেছে। কিছু ওষুধ লাগাবার ব্যবস্থা হবে না?

—হোবে। তুমি আপনার ঘরে চলিয়ে যাও। হামি সিদাবাড়িতে রাসমণির কাছে যাবো। উয়াদের একটি বুড়া মাঝি আছে। বহুৎ আচ্ছা দাওয়াই বানায়। হামি লিয়ে এসে উয়ার এলাইজ করায়ে

দিবো। লেকিন্ তোমাকে হামি টাট্টুর সাথে মোলাকাৎ করাবার লিয়ে বাহার আসতে দিয়েছি ঈ বাৎ মালিকের পাত্তা লাগলে হামার হালত বুরা হোবে।

—বেশ। তোমার ভরসাতেই ওকে ছেড়ে যাচ্ছি। দেখবে যেন জমিদার ওকে খতম করে না দেয়।

—হামি তোমাকে জবান দিতে পারবো না কাবেরী, লেকিন কৌসিস জরুর করিয়ে দেখবো। ইয়ে ওয়াদা দিলাম।

সকাল থেকে জমিদারের নাচমহল থরহরি কম্পমান। এই বুঝি জমিদার এল। টাট্টু ঘোষের মাথাটা ধড় থেকে নামিয়ে দিল। কাবেরীকে উলঙ্গ করে চাবুক মারল। চাপরাশীদের চাকরি বরখাস্ত হয়ে গেল। অন্যান্য মেয়েদের বাজারে ব্যবসা করতে নামাল।

এমন কত কি ভয়ের কথা ভাবতে ভাবতে সারাদিন কেটে গেল। সন্ধ্যেবেলা জমিদার এলেন। সঙ্গে গণেশ ঘোষ গোমস্তা।

টাট্টুর ডাক পড়ল। পিয়ারীলাল ওকে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে এল। জমিদারবাবু ঠাণ্ডা গলায় বললেন—তুই কালকের চাকর। তোর এত সাহস কোথা থেকে হল যে চম্পকের মাথায় লাঠি তুলিস ?

টাট্টু নিরুত্তর।

—বল শালা ? জবাব দে—ভীষণ গর্জন করে চাবুক মারলেন।

টাট্টু পড়ে যেতে যেতে টাল সামলে দাঁড়াল। বলল—আপনার চোখের সামনে আপনার স্ত্রীকে যদি কেউ বলাৎকার করে তবে কি আপনি তার মাথায় লাঠি মারবেন না ?

—চোপ ! আবার চাবুক পড়ল।

গণেশবাবু বললেন—ছোটবাবুর মাথায় লাঠি মারতে তোকে কে বুদ্ধি দিয়েছিল ?

আমার ভালবাসা। কাবেরীকে আমি ভালবাসি। জীবনপণ কড়ার ছিল সেই ভালবাসার। তার লাঞ্ছনা আমি সহ্য করতে পারি নি। তাই মেরেছি।

ওঃ। ভালবাসার নাগর ! পিয়ারীলাল—

—জী হুজুর।

—একে সাবাড় করে দাও। এক ঘণ্টার মধ্যে।

—জী হাঁ।

মৃত্যুদণ্ডের আদেশ শুনেও টাট্টু বিচলিত হল না। কোন কথাও বলল না। পিয়ারীলাল ওকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। জমিদারবাবু বললেন—গণেশ, তুমিও যাও। দেখো যেন কাজ নির্বিঘ্নে সমাধা হয়।

পিয়ারীলাল ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল—হুজুর খুন-খারাবীর ব্যাপারে এক গাওয়াই কেনো খাড়া কোরবেন ? আগর হামকো বিশোয়াস না হোয়ে তো গণেশবাবুকোই বলিয়ে কাম ফিনিশ করিয়ে আসবে। লেকিন এক বাৎ শোচিয়ে লেন – ঈ তো কোই খাসী জবাই নেহী হ্যায়। গণেশবাবু গাওয়াই রহেগা। হম খুন করে গা—তো কাল হামসে তুষমণি হোলে পুলিসে খবর করিয়ে দিবে। হামার ফাঁসি হোইয়ে যাবে।

—তবে কি করবে ?

—হাম আপনার নোকর। কাম ফিনিশ করিয়ে লাশ এ্যয়সা গায়েব করিয়ে দিবো যো তুনিয়ামে কোই নিকালনে না শেখে।

ঠিক আছে। তুমি একাই যাও। কিন্তু কাজ শেষ করা চাই।

—জী হা। সেলাম দিয়ে চলে গেল।

জমিদারবাবু বললেন পিয়ারীলাল বিশ্বাসী লোক।

গণেশবাবু বললেন—আজ্ঞে হ্যাঁ ও ঠিক কথাই বলেছে। পাপের সাক্ষী রাখতে নেই।

—আচ্ছা এবার কাবেরীকে ডাকাও।

কাবেরী এল। পাথরের মত শক্ত হয়ে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। জমিদারবাবু ডাকলেন—এদিকে আয়।

—না।

—ওঃ। খুব দেমাক। শুনেছিস—তোর নাগরকে খুন হয়েছে।

কাবেরী চিৎকার করে উঠল শয়তান। তুমি ওকে শেষ করে দিলে ?

—হ্যাঁ। পাপের বীজ বাড়তে দিতে নেই।

—শয়তান। খুনী। লম্পট। আমার ভালোবাসাটা হল পাপ আর তোমার নারী নির্যাতন ও মানুষ খুন পরম ধর্ম!

রাগে দুঃখে কাবেরীর রক্তস্রোত টগবগ করে ফুটে উঠল। এতদিন যে মেয়েটির ললিত কণ্ঠে গানের কলি ফুল হয়ে উঠতো, যার প্রণয় গুঞ্জনে

নাভিমূলে শিহরণ জাগাতো আজ তার সেই কণ্ঠ ঝঙ্কার দিয়ে উঠল বলিষ্ঠ প্রতিবাদে। বলে চলল—আজ তুমি যেমন করে একজন নির্বোধ চাকরকে হত্যা করালে একদিন তোমাকে এমনি করে মরতে হবে।

—কি বললি? গর্জন করে উঠলেন ক্রুর জমিদার।

—কিসের ভয় দেখাচ্ছো হে নাগর? রমনী জীবনের অমূল্য রতন সতীত্ব কেড়ে নিয়ে বেশ্যা বানিয়েছ, তার একমাত্র ভালবাসার মানুষকে খুন করেছ আবার সে কিসের ভয়ে জুজু বনে যাবে?

এই হতভাগীরা জীবনের প্রথম লগ্নেই যদি সমস্বরে এমন প্রতিবাদ করতে পারতো তবে হয়তো এত দুঃখ পেতে হত না। কিন্তু তারা চিকালই দুর্বল। সেই পুরাণে দ্রৌপদীর যুগ থেকে আধুনিক কালের দেবযানী পর্যন্ত একই ট্রাডিশন। পাপিষ্ঠ পুরুষের অঙ্কশায়িনী হয়ে মনের আগুনে মন পুড়িয়ে সুখ বিলি করতে করতেই ফতুর।

জমিদারী রক্তে ষাঁড়া-ষাঁড়ির বান ডেকে গেল। একটা সামান্য নাচুনী এমন করে কথা বলে। লাফ দিয়ে চুলের মুঠি ধরলেন। অশ্লীল খিস্তি করে বললেন—তোকে ন্যাংটা করে চাপরাশীদের মধ্যে ছেড়ে দেবো।

—তারা আমাকে মা বলে কাপড় ঢাকা দেবে। তোমার ছেলের মত মাতৃ হরণ করতে আসবে না। লজ্জা লাগে না জমিদার। এমন ছেলের জন্ম দিয়েছ যে তোমার স্ত্রীকেও বলাৎকার করতে যায়।

—স্ত্রী? কে স্ত্রী? তুই?

—হ্যাঁ আমি। আমার গলায় তুমি মালা দিয়েছ। একটা নয় অমন পঞ্চাশটা মালা আমার ঘরে শুকিয়ে গেছে। সব তোমার দেওয়া।

সে মালা কিসের জন্য। সেই জ্ঞানটুকু যদি তোর না থাকে তবে এই চাবুকের ঘায়ে তা বুঝিয়ে দিচ্ছি। সপাং করে চাবুক বসে গেল।

কুঁকড়ে গেল কাবেরী। তারপরই সোজা হয়ে বলল—ভালবাসার শোকে যার ভিতরটা পাথর হয়ে গেছে তাকে আর কতটুকু ব্যথা দিতে পারবে হে নাগর?

—তোকে আমি খুন করবো।

—পারবে না। আমি তোমার সেই হাঁস যে একমুঠো ধান খেয়ে

সোনার ডিম দেয়। আমার মাংস বিক্রি করে তুমি পয়সা কামাও। যতদিন এইদেহে যৌবন আছে ততদিন তুমি আমাকে পুষে রাখবে হে নাগর।

হঠাৎ মন্মথ ঘোষ ঘরে ঢুকে কাবেরীর গালে এক চড় মারলেন। গর্জন করে উঠলেন কসবি কাঁহিকা! কার সঙ্গে কি কথা বলতে হয় তাও জানিস না। আমাদের এতগুলো মানুষের অন্নদাতা প্রভুর মুখের উপব চোপা, একটা চাকরের জন্য পাগল।

ওর আবার এমন উগ্রমূর্তি যে জমিদারেরও তাক লেগে গেল।

বললেন—ওস্তাদ।

—আজ্ঞে এ মাগীর দেমাক ঠাণ্ডা করতে দেন। এতদিন ভাত-কাপড় দিয়ে পুষেছিলেন কিনা তাই বিষ ওগরাচ্ছে।

কাবেবী আবার চিৎকার করে উঠল—তুমি চুপ কর গুরুজী। না হলে গুরু বলে খাতির রাখবো না।

—এঁ্যা! নচ্ছারী চাকরের সঙ্গে ভালবাসা কবতে গিয়েছিলি। চল তুব হাড়ে হাড়ে হলুদ দিচ্ছি গে।

হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে গেলেন। কাবেরী মাটিতে পড়ে গেল তবু ছাড়ান নেই।

জমিদাববাবু বললেন গণেশ এব কি বিহিত ব্যবস্থা হবে?

দিনকতক সবুর করুন বাবু। ভালবাসা বলে কথা। ঘা শুকাতে সময লাগবে। ও বোধহয পাগল হয়ে গেছে। না হলে আপনার মুখের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারতো না।

—ঠিক বলেছ। এই কে আছিস মদ নিয়ে আয়।

মদ এল। চন্দনা, অঞ্জনা, মধুমিতা এল। গান বাজনার আসব বসল। মন্মথ ঘোষ কাবেরীকে ঘরে তালাবন্ধ করে দিয়ে মাইফেলের সঙ্গত করতে বসলেন।

যেন কিছুই হয় নি এমনি ভাবে সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে তবলা লহবা শুরু করে দিলেন।

মেয়েরা সব নাচল, গাইল, বাহবা কুড়োল। তাদেরই একজন যে শোকে, দুঃখে রাগে দিশেহারা হয়ে কেঁদে কুল ভাসিয়ে দিল, তার ভালবাসার অপমৃত্যু ঘটে গেল—এনিয়ে কারো মাথাব্যথা নেই। সবাই প্রাণপণ প্রচেষ্টায় মালিকের মন ভোলাতে ব্যস্ত।

তখন পিয়ারীলাল নির্বোধ চাকর তারক ঘোষকে দামোদর পার করে মানভূমের সীমানায় নিয়ে গিয়ে বলল জীবনে কখনো দামোদর পার হয়ে আসিস না। এখানে তুই মৃত। যত শীঘ্র পারিস চলে যা। কাবেরীর কাছে আমার ওয়াদা ছিল তাই পুরা করলাম।

তারক ঘোষ ওকে প্রণাম করে চলে গেল।

মহাকাল তার সাক্ষী হয়ে রইল।

দ্বিতীয় পর্ব

॥ এক ॥

প্রকৃতি বড় নিষ্ঠুর। তার কাছে ক্ষমা নেই অজ্ঞতা বা অনভিজ্ঞতার। তাই যদি থাকবে তবে কয়লা পাথর কাটাইয়ের জন্য এত বিদ্যার দরকার হত না। চাপরাশীর লাঠির জোরেই খাদান চলত।

মদনবাবু চিরজীবন জমিদারের মো-সাহেবী করে এত তত্ত্ব বুঝবেন কোথা? পৃথিবী যে একটা চুম্বকক্ষেত্র। ভূত্বক যে সঙ্কোচনশীল লম্বমান শক্তি সম্প্রসারণশীল দিগন্ত বিস্তার শক্তির পারস্পরিক আকর্ষণে অবস্থান করছে, সুড়ঙ্গ পথ খোঁড়া হলে সেই শক্তির ভারসাম্য যে নষ্ট হয় এত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ওর জানবার কথা নয়। তাহলে আর মো-সাহেবী করতে হত না।

এখন সে খাদের মুন্‌শী। মাইনিং সরদার বলেছে চাঁদনী গরম· তাই শুনে ওর মেজাজ বিগড়ে গেছে। আরে বাবা—চাঁদনী রাতের কথাই শুনেছি।. সেই সফেদ রাতের কথাই শুনেছি। সেই সফেদ রাতে সুখী বাবুরা হুরীদের সোহাগ করেন তাই দেখেছি। খাদে যে চাঁদনী হয় তা তো কভু শুনিনি। মূর্খ কি আর গাছে ফলে?

খাদের চাঁদনী। মানে যে অংশের কয়লা কেটে নেওয়া হয়েছে। তার নিচেটা হয় ফাঁকা। অনেকটা মস্তবড় জলাধারের মত। ছাদের পাথর ঝুলে পড়ে। শিলাস্তরের ভারসাম্য নষ্ট করে। উপরিস্থিত শিলাস্তর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করতে করতে ছাদের পাথরে ফাটল ধরায়। তারপর সেই পাথর হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে ফাঁকা জায়গাটা ভরাট করে দেয়। অল্প-স্বল্প ব্যাপার নয়। এই ছাদ যখন ভাঙে তখন নানারকম শব্দ হয়। কখন একেবারে নিস্তব্ধ। কখন মেঘ ডম্বরু। খুব অভিজ্ঞ কান দিয়ে এ শব্দ শুনতে হয়। যাচাই কবতে হয়। আর ছাদের পাথর ভাঙার এই অবস্থাকেই বলে চাঁদনী গরম।

মদনবাবু জোছনা রাতের চাঁদনীর সঙ্গে খাদের চাঁদনীর কোন সাদৃশ্য খুঁজে না পেয়ে বলে বুজরুকি।

একদা সালুঞ্চীর ছয় নম্বর খাদ ছিল মড়া ফেলার জায়গা। লোকে বলত পচা খাদ। মানুষ মারার ফাঁদ। তার চালের পাথরটা ছিল এমনিতেই নরম। যখন তখন কোন সাড়াশব্দ না দিয়ে ন'ইঞ্চি মোটা একটা পাথরের স্তর ভেঙে পড়ত।

এখন চম্পককুমারের ঠিকাদারীতে পিলার কাটিং চলছে। অর্থাৎ দাবার ছকের মত যেসব সুড়ঙ্গ ও স্তম্ভ ছিল তার স্তম্ভগুলি কাটা হচ্ছে। একেবারে নিচের সারির স্তম্ভগুলি কাটাইয়ের কাজ চলছে।

তখনকার প্রচলিত নিয়ম অনুসারেই ব্যারাকলউ সাহেব নকশা তৈরি করে দিয়েছিলেন। কাজও সেইভাবে চলছিল। কিন্তু পিলার কাটিং হলেই তো ছাদ ভাঙবে। শিলাস্তরের ভারসাম্যের নতুন বিন্যাস ঘটবে। এতো বিজ্ঞানের কথা। অজ্ঞতা ও হঠকারিতার ত কোন স্থান নেই।

মদনবাবুর সে জ্ঞান নেই। ও মালিকেব খয়ের খাঁ।

রাত পালি ডিউটী। খাদে গিয়ে দেখে একটা সুড়ঙ্গে একপাল কামিন দিব্যি গামছা পেতে শুয়ে পড়েছে। অন্যদিকে জনকয়েক মাঝি মালকাটা ঝোড়ার ভিতর বসে নাক ডাকাচ্ছে। সবাই সাঁওতাল। তাদের ডিবরী বাতিগুলি কালো শীষ তুলে মিটমিট করছে।

আরে—এতো বড় রামরাজত্ব। খাদের ভিতর এত ঘুম। হাতের লাঠি এলোপাথাড়ি চালিয়ে দিল ঘুমন্ত কুলিকামিনদের উপর। ওরা ধড়মড় করে উঠল। মদনবাবুকে দেখে ভয়ে সিঁটিয়ে গেল। চোখ রগড়ে বলল—মারছিস ক্যেনে বাবু? আমরা কি দুষ করলম?

—আবার শুধাছিস? শ্যালারা ঘুমাবি ত কাজ করবি কখন?

একজন বলল—কাজ কুথায় করব বাব?

—কেন?

মাইনিং বাবু বলে গেইছে- চাঁদনী গরম। ঠাণ্ডা হলে তুদেব ডাকব।

—শ্যালা—বেইমান—সবদারের বাপের খাদ। এতগুলান কুলি-কামিন ঘুম মারবেক। রেজিংয়ের নামে লবডঙ্কা। ছোটবাবুকে বলে সব শ্যালার চামড়া বাদাড়ে দিবো। তুদেব বাপের নাম ভুলাএে দিবো। ভাল চাস ত চল শ্যালারা কাজ কববি।

কুলি-কামিনরা ভয়ে ভয়ে উঠে দাঁড়াল। কাপড় চোপড় সামলে

গাঁইতি, ঝোড়া, বিড়া নিয়ে আয়তনে ঢুকল। একজন মালকাটা বলল—আমাদের ডর লাগছে বাবু।

—ডর কিসের রে ? আমি দাঁড়াচ্ছি।

মাথার উপর পড় পড় ছাদটা যেন ওকে দেখে ভয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে।

বিশ পঁচিশ ফুট লম্বা, দশফুট খাড়াই একটা দেওয়ালের মত কয়লার আয়তন। কাঠ খুঁটো লাগিয়ে ছাদটাকে সাপোর্ট করা আছে। তবে তা প্রয়োজনের তুলনায় কম।

মালকাটারা সেই কয়লার আয়তন থেকে গাঁইতি দিয়ে কেটে কয়লা বের করে। কামিনরা ঝোড়াতে ভর্তি করে মাথায় বয়ে নিয়ে যায়। চারশ ফুট দূরে টবলাইন। যেখানে খালি টব গাড়িগুলো দাঁড়িয়ে থাকে। ওরা তাই ভর্তি করে। ডিবরি বাতিগুলো সার দিয়ে নামিয়ে রাখে খানিকটা দূরে দূরে। মালকাটারা খুঁটোতে ঝুলিয়ে দেয়।

মদনবাবু নিজে সেখানে দাঁড়িয়ে হম্বিতম্বি করছে। ছয়টা মালকাটা গাঁইতির চোট দিচ্ছে, চারটা কামিন ঝোড়া ভর্তি করছে। চারজন কামিন ঝোড়া নিয়ে টবগাড়ি ভরতে গেছে।

হঠাৎ পট্‌ পট্‌ শব্দ। চড়াৎ করে দুটো খুঁটো ভেঙে গেল। মালকাটারা গাঁইতি ফেলে পালাচ্ছে। কামিনগুলো হতভম্ব। মদন-বাবু হাত তুলেছে আর গোটা ছাদটা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। একজন মালকাটা পড়ি কি মরি করে বাইরে ছিটকে বেরিয়ে এল। বাকিসব ভিতরেই রয়ে গেল। তাদের মাথায় পাথর ভেঙে পড়তে লাগল।

চারিদিক ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। ঘন ঘন মেঘ ডাকার শব্দ। ভিতরে পাথর ভাঙছে। কুলি কামিনরা মরণ আর্তনাদ করছে। মুহূর্ত মধ্যে সে জায়গাটা হয়ে উঠল বিভীষিকাময় প্রেতপুরী। পাঁচজন মাল-কাটার বৌ বিধবা হল। চারজন কামিনের ছেলে মেয়েরা মা হারাল। হতভাগ্য মোসাহেব মদন মোহনের দুটো বৌ বিধবা ও আড়াইগণ্ডা ছেলেপুলে অকস্মাৎ পিতৃহীন হয়ে পড়ল।

টবলাইন পর্যন্ত আসার পথে সারিবদ্ধ ডিবরি বাতিগুলো এক ফুঁয়ে দপ করে নিভে গেল। গোটা খাদের সুড়ঙ্গপথ দিয়ে গুম্‌ গুম্‌ শব্দের কানে তালা লাগা ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি অনেকক্ষণ যাবৎ স্থির হয়ে রইল। যেখানে সেখানে কাঠ, খুঁটো বাতি উল্টে পড়ল।

যে মালকাটাটা ছুটে বেরিয়ে এসেছিল তার নাম সোম মাঝি। ছুটছিল দিক্‌বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে। হঠাৎ হাতের বাতিটা নিভে যাওয়াতে একটা কয়লার কাঁথিতে সোজাসুজি ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেল। কপাল ও হাঁটুতে দারুণ চোট। তবু সে তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে কাঁথির ধারে ধারে হামাগুড়ি দিয়ে চড়াই ভেঙে উপর দিকে উঠতে লাগল। ওর মনে তখন একটাই ধারণা যত উপরে উঠতে পারব তত নিরাপদ স্থানে পৌঁছতে পারব। বুকটা হপড় দপড় করছে। বড় বড় শ্বাস নিচ্ছে। একটা জায়গায় এসে কোনোদিকে খোলা পথ না পেয়ে বসে পড়েছে। ওটা বন্ধ সুড়ঙ্গ ছিল।

গোটা খাদে ভীষণ আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। কে কাকে সামলায়? মুনশী, মাইনিং সরদার, খুঁটামিস্ত্রী, টালোয়ান, মালকাটা, পাম্প খালাসী, সাফাই কুলি-কামিন পড়ি কি মরি করে হলেজ রাস্তা দিয়ে এমন ছুটে যাচ্ছে যে পড়ে গেলে হাড় গোড় ভাঙা ছাড়া গত্যন্তর নেই। তবু কত যে আছাড় খাচ্ছে, কত যে চোট লাগছে তার সংখ্যা নেই। বাতি তো সব নিভে গেছে। দু' একটি যা অবশিষ্ট আছে তারই আলোতে পথ চলা। এ ওর ঘাড়ে পড়ছে। টব লাইনে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। সবারই মুখে এক রা—বাঁচাও—বাঁচাও।

হাপরের মত বুক চলছে। হাত পা কাঁপছে। মুখ চোখ ভীষণ আতঙ্কে ভেঙে চুরে একাকার। খাদের সিঁড়ি মুখ দিয়ে পিল পিল করে উঠছে।

রফিক শেখ মাইনিং সরদার, কালো বাউরী খুঁটামিস্ত্রী। দুজনে একটা গোলাইয়ে বসে বিড়ি ফুঁকছিল। হঠাৎ সেই শব্দ এবং কুলি কামিনদের বাধাবন্ধহারা দৌড় দেখে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। ওদের বাত্তি দুটোও নিভে গেল।

—কি হয়েছে? কি হয়েছে?

কে উত্তর দেবে? সব তো প্রাণের ভয়ে দিশেহারা। একজন বলল বাবু পালাঞে যা। বেবাক চাল ভস্‌কে গেইছে। কত যে মরেছে ঠিকানা নেই। ও এক মুহূর্ত দাঁড়াল না।

রফিক শেখের প্রাণ উড়ে গেল। পালাবে না দাঁড়াবে তাই ঠিক করতে পারল না। কালো বাউরী ওর হাত ধরে টানল—চলুন বাবু।

—এঁ্যা। কুথায় যাবো?

—এখন তো উপরে চলুন।

—তাহলে ত সাহেব আমাকে ঠেঙায়ে লাশ বেনাঞে দিবেক। আমার পালিতে এতগুলি লোক একসিডেণ্টে মরে গেল। তার ঠিক ঠাহর করতে হবেক ত।

অনেকক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। খাদ ফাঁকা। কেউ কোথাও নেই। সাড়া শব্দ নেই। এক অভাবনীয় নৈঃশব্দ ও সীমাহীন অন্ধকার। হঠাৎ ওর হুঁস হল। পকেট থেকে চকমকি বের করে ঠুকতে লাগল। সেই আগুনে বাতি দুটি ধরিয়ে নিল। রফিক শেখের তখনকার চেহারাটা এক বিস্ময়। দাড়ি দিয়ে টস্ টস্ করে ঘাম ঝরছে। কেমন একটা ঘোলাটে দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে। থর থর করে কাঁপছে। ব্রেন কাজ করছে না। বুদ্ধিতে কুলোচ্ছে না। প্রাণটা যেন শরীরে নেই। দেহের খাঁচাটা দাঁড়িয়ে আছে। কালো বাউরীর মুখটা যেন একটা মড়ার মুখ।

আলো দুটি জ্বলার পর একটু একটু করে বুকের বল ফিরে আসছে।

আশ্চর্য মানুষের জীবন। অত যে পাথর পড়ল। আধঘণ্টা ধরে এত শব্দ যে এই বুঝি মাথার উপর বাজ পড়ল। কয়লা গুঁড়োর ধোঁয়ায় চারিদিক আচ্ছন্ন। তবু ভাঙাচোরা পাথরের বিশাল স্তূপের ভিতর থেকে মানুষের আর্তনাদ ভেসে আসছে।

রফিক শেখ ও কালো বাউরী চোরের মত চুপি চুপি এক পা এক পা করে এগিয়ে যাচ্ছে। যেন বেশি জোরে হাঁটলে চালটা তাদের মাথাতেই পড়বে।

কালো বলল—বাবু, একসিডেন হল কুথায়?

বুঝতে লারছি। তবে বারো নম্বর লেভেলে ষোল নম্বর ডিপে চাঁদনী গরম ছিল। কিন্তুক্ আমি ত সেখান থেকে কুলি কামিন বার করে দিঞে ফেন্সিং লাগাঞে দিঞেছি। তবে লোক মরবেক ক্যেনে?

ওদের বাতির ছটা দেখে সোম মাঝি চিৎকার করে উঠল—বাবু··

ভয়ঙ্কর নিস্তব্ধতার মধ্যে সেই ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি শুনে রফিক শেখের পিলে চমকে গেল। বুকটা ছ্যাঁৎ করে ওঠার পর ধাতস্থ হল। বলল, মানুষের রা?

কালো বলল—হ্যাঁ।

—কে বট হে ?

—আমি বাবু সোম মাঝি।

—এইখানে আয়।

—যেতে লারব বাবু। আঁধারে পা ভেঙে পড়ে আছি।

ওরা দুজন কাছে গেল। সোম মাঝির কপাল ও হাঁটু থেকে দর দর করে রক্ত বেরোচ্ছে। তখনও থর থর করে কাঁপছে।

ওর অবস্থা দেখে রফিক আরো ঘাবড়ে গেল। কালো বাউরী ওকে টেনে তুলল। বলল—কি রকম একসিডেন হঞেছে ? কে মরেছে ?

—কে মরেছে কে বেঁচেছে জানি না বাবু। তবে চাল যা পড়েছে তাতে কেউ বাঁচবেক নাই।

—তুরা কে কে ছিলি ?

—রাবণ, রসিক, লপনা, রবি, ঝাড়ু, মঙ্গলা আর আমি মালকাটা ছিলম। কামিন ছিল মাকু, শবনী, ছোট নীলমণি, সরি আর মদনবাবু।

—মদনবাবুও ?

—হঁ বাবু। উয়েই ত এইটি ঘটালেক। আমরা ঘুমাচ্ছিলম, মেরে ধরে গরম চাঁদনীতে ঢুকাঞে দিলেক।

—এ হে হে! ন্যাড়া মরে দশঘর ডুবাঞে মরে। ঈ বারে আমি কি করব ? সাহেবদিকে কি কৈফিয়ৎ দিব ?

বলতে বলতে ও প্রায় ভেঙে পড়ল।

বেচারী রাসমণি খবর পেয়েই ভিরমি খেয়ে পড়ল। পড়ি কি মরি করে ধাওড়া ছেড়ে এমন বেরোলো যেন সেই একটি কালো ঘোড়া। বুধনাও পিছন পিছন ছুটল।

ডিপোতে এসে ওর ঐ একটা কথা—হায় আমার কি হল ? আমার এতগুলি কুলি কামিন এমন করে মরে গেল। ঈ-বারে উয়াদের ছিলাপিলা দিকে কি খেতে দিব ?

সিদাবাড়ী, ছাতাবড়া ধাওড়াতে শোকের ছায়া নেমে এল। ঘরে ঘরে কান্নার রোল। কার যে কে মরেছে কে বেঁচেছে তা কেউ জানে না। সিঁড়ি খাদের মুখে এসে দাঁড়াল। চাপরাশীরা কাউকে খাদে নামতে দিল না।

মিঃ ট্রুম্যান মদের নেশায় বেহুঁশ হয়ে ঘুমোচ্ছিলেন। ঠ্যালা মেরে

ওঠানো যায় না এমন দশা। বেচারি আরদালী ডেকে ডেকে হয়রান। অনেক চেষ্টার পর উনি চোখ মেলে হুঙ্কার দিলেন—হু আর ইউ ?

—হুজুর আমি আপনার আরদালী। রসিক দাস। খাদে ভীষণ খতরা। বহুত লোক মারা গেইছে।

—হোয়াট ! লাফ দিয়ে এমন উঠলেন যে গোটা ঘরটা কেঁপে উঠল। চিৎকার করে উঠলেন—একসিডেন্ট ! মেনি মেন ডায়েড ! ওহ ! মাইগড।

ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। চিৎকার করছেন—হর্স ! মাই হর্স !

আবদালী পিছনে পিছনে ছুটে এল ওব জামা কোর্তা নিয়ে।

- হুজুর ! কাপড় পরে নেন হুজুব !

—ইয়া ! মাইগড ! এতক্ষণে তাঁর খেয়াল হল যে তাঁর দেহে বস্ত্র নেই। শীতের দেশের মানুষ গরমের ভাপ সইবেন কী করে ? শোবার সময় কাপড়-চোপড় বাহুল্য। তবু তো তখন হেমন্তকাল।

তাছাড়া স্বাভাবিক অবস্থায় তো ঘুমোন নি। সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রমের পর মদের নেশা। খোয়াবের খোঁয়াড়ে ঘুমের বড়ি নারীদেহ। এবার খোয়ারী ভাঙতে কতক্ষণ লাগে। কোন শোর ঘোর নেই।

আরদালী কাপড় পরিয়ে দিল। সহিস ঘোড়া নিয়ে হাজির। উনি সওয়ার হয়ে চাবুক কষিয়ে দিলেন। অন্ধকারে তীরের বেগে ঘোড়া ছুটল। কিন্তু কোথায় যাবেন ? কোন খাদে একসিডেন্ট ? খাদ তো একটা নয়। পাঁচ নম্বর থেকে দশ নম্বর পর্যন্ত সালুঞ্চী খাদের পরিসর। উনি বিভ্রান্ত। কিন্তু ঘোড়া ওকে ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিল।

অনেকদিন পর চম্পককুমার তাঁর নিজের স্ত্রীর কাছে শয্যা নিয়েছিলেন। সেই টাট্টু কাবেরী কিস্‌সার পর দিন কতক নাচমহলে পা দেন নি। তারপর কুহকের অনিবার্য আকর্ষণে উনি সেখানেই রাত্রিবাস শুরু করলেন। কাবেরী তো প্রায় উন্মাদ। ওকে আর ঘাঁটান নি।

কিন্তু চন্দনা, অঞ্জনা, মধুমিতা হাস্যে, লাস্যে, কৌতুকে, নাচে, গানে, বাজনায় এবং যৌবনের যাদুতে এমন ভাবে মজিয়ে দিয়েছিল যে নিজের স্ত্রীর মান অভিমান অসহ্য মনে হচ্ছিল।

আরে এই এক মেয়ের জাতস্বভাব। যেমনি তার কানে খবর গেল

সোয়ামী পরের ঘরে মৌ খাচ্ছে অমনি তার দুর্জয় মান। সবাই কি কেষ্টঠাকুর হে—যে দেহি পদ পল্লবম বলে মান ভাঙাতে আসবে? ফলতঃ চম্পককুমার ঘরছাড়া ষাঁড়। তার স্ত্রী ক্রুদ্ধা নাগিনী।

শ্বশুর শাশুড়ীকে শুনিয়ে শুনিয়ে কট-কট করে কথা বলেন, যেমন বাপ তেমনি তো ব্যাটা। রক্তের দোষ যাবে কোথায়? বাপে একপাল বেশ্যা পুষে রেখেছে। তারা ব্যাটার মাথা খাবে না তো কি করবে? ঘরের আগুনেই তো ঘর পোড়ে।

শুনে শুনে রাধাগোবিন্দবাবুর মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল। উনি একদিন ছেলেকে বললেন—ছ্যাখ বাপ তুই জমিদারের ছেলে। তোর কাছে মেয়ে হবে এঁটো পাতার মত। নাচমহলে মেয়েরা আছে ব্যবসার জন্য। তুই তাদের টোপ গেঁথে শিকার ধরবি। এইটাই নীতিগত প্রয়োজন। যা আমি এতদিন করে এসেছি। তা নয় তুই নিজেই শিকার বনে গেলি। ঐ মেয়েগুলোকে দস্তুর মতো তালিম দিয়ে বারাঙ্গনা বানানো হয়েছে। ওদের মত ছলা-কলা ঘরের মেয়ে কোথায় শিখবে? তুই তাতেই ভুলে গেলি? এই বুদ্ধি নিয়ে জমিদারী চালাবি না ঠিকাদারী চালাবি? অথচ আমি ভাবছি নিজস্ব কোলিয়ারি করবো। তার সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। তখন তুই কি করবি?

ইহ ভর্ৎসনা শ্রবণে চম্পককুমারের দিব্যজ্ঞান প্রাপ্তি হয়েছিল কি না কে জানে কিন্তু সেদিন তিনি স্বীয় ভার্যার পাণিস্পর্শ করে বলতে চেয়েছিলেন—

মোহং তাবদয়ঞ্চ তন্বী! তলুতাং বিম্বাধরা রাগবান।
সদ্বৃত্ত স্তনমণ্ডলস্তব কথং প্রাণৈর্মম ক্রীড়তি।

কিন্তু সেই প্রগলভা রমণী বল্লভের প্রণয় সম্বোধনে বিন্দুমাত্র রসসিক্ত না হয়ে ঝঙ্কার দিলেন—আমি তো আর ঘাগরা তুলে ঠমক দিতে জানি না। যারা জানে তাদের কাছেই যাও।

তিনি বহুকষ্টে ক্রোধ সংবরণ করলেন কারণ তাঁর ভার্যার পিতা ঠাকুর মহাশয় বিশাল সম্পত্তির মালিক। কাবেরীর মত রিক্ত শূন্য বারাঙ্গনা নয়।

গেটের কাছে পিয়ারীলাল ডাকাডাকি করছে—আরে রামলগন ভেইয়া তেনি গেট খুল দিহ। বড়ি খতরা হো গইল।

—কাহো পিয়ারী ভাই ? ক্যা ভইল ?

দেশোয়ালী ভাইদের পারস্পরিক জিজ্ঞাসাবাদ। ছোট গেটটা খুলে গেল। পূর্ব-দক্ষিণ কোণার বড় ঘরটায় চম্পককুমার থাকেন। তা ওরা জানে। তাই জানালার কাছে দাঁড়িয়ে ডাকাডাকি শুরু করল—হুজুর ! বড়ি মেহেরবানি হুজুর। বড়ি খতরা হো গইল। হুজুর।

মনের দুঃখে চম্পককুমারের ঘুম হয়নি। স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া তখনো শেষ হয় নি। কর্কশ কণ্ঠে বললেন—কোয়া হ্যায় ?

—হুজুর ছ'নম্বর খাদানপর বহুত আদমি চাল ভস্‌কে মর গইল।

—যানে দেও। তুম্‌হারা ক্যা। হাটো হিঁয়াসে।

পিয়ারীলাল আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল। ওকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, দেখো আমার এখন ঘুমোবার সময়। ডিসটার্ব কর না। চলে যাও। মুর্দাগুলোকে চাঁদনীর ভিতর ঢুকিয়ে দাও গে।

হে রাম। পিয়ারীলাল মনে মনে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রজীকে স্মরণ করে স্বগত উক্তি করল—গরিবের জানের চেয়ে বড়া আদমির নিজের কিমত বহুত বেশি।

আরে মূর্খ! এই কথাটা বোঝবার জন্য তুই নাচমহল থেকে পানমোহরা জমিদারবাড়ি পর্যন্ত হপড় দপড় করে ছুটে এলি ? এখন রাত কত জানিস ? যা রামলগনের কাছে বসে খৈনী খা গিয়ে। সকাল হলে বাবুর যদি ঘুম ভাঙে তবে আবার সেলাম দিবি। এখন বাবুর মন খারাপ।

মিঃ ব্যারাকলউ তাঁর ডারলিংকে লিখছেন—

তুমি তো জানো ডারলিং আমরা একশ বছর ধরে যুদ্ধ করেছি ভারতের সমস্ত ভূখণ্ড জয় করার জন্য। এবার শিল্প বিপ্লবের জোয়ার আসবে। খনি শিল্পে দারুণ অগ্রগতি হচ্ছে। ডিসেরগড় ফিল্ডে বেঙ্গল কোল, ইকুইটেবল, সীতারামপুরে আপকার, চরণপুরে মার্টিন, একের পর এক নতুন কোলিয়ারি খুলে যাচ্ছে। পুরনো কোলিয়ারির পুনর্বিন্যাস করছে। আমরাও পিছিয়ে নেই। এগিয়ে যাচ্ছি জোর কদমে।

গভীরতা যত বেশি সমস্যাও তত বেশি। মিথেন গ্যাস আর অত্যধিক গরমের মোকাবিলা করতে আমাদের শেরগড় কোলিয়ারিতে স্টিম ইঞ্জিন দিয়ে পাখা চালু করেছি। এটা আমারই ডিজাইন। তৈরি

করিয়েছি নিজে উপস্থিত থেকে। খাদে ভাল বাতাস যাচ্ছে। সালুঙ্কী ও হাতনলেও একটা করে ফ্যান বসাব।

এবার বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য পাওয়ার হাউস বসাবার কথা ভাবছি। হয়েও যাবে একদিন। ঘোড়ায় টানা হলেজের যুগ পার হয়ে বাষ্পচালিত ইঞ্জিনের যুগে যখন পড়েছি তখন বিদ্যুতের যুগ আনতে পারব। সারা কোলিয়ারি আলোকমালায় সাজিয়ে দেব।

জানো ডারলিং ইণ্ডিয়াতে যে কত কয়লা আছে তা এখনো আমরা ঠিক করতে পারি নি। ডাঃ ফক্স যে সার্ভে করেছিলেন তারপরেও কত নতুন নতুন কয়লাস্তর পাওয়া যাচ্ছে। এ এক বিশাল হিড্‌ন ট্রেজার। এই রত্ন ভাণ্ডার দিয়ে আমরা ইউরোপের সব দেশকে টেক্কা দেব। পৃথিবীর সব দেশে পত্‌ পত্‌ করে উড়বে বৃটিশের বিজয় পতাকা।

মাই ডারলিং—পানমোহরা সাতঘরিয়াতে আমাদের নতুন কোলিয়ারির কাজ বেশ এগোচ্ছে। বোরিং হয়ে গেছে। সব কটাতেই কয়লা পেয়েছি। তিনটি কয়লাস্তর। প্রথমটি আড়াই থেকে তিনশো ফুট নিচে। আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই চানক কাটাইয়ের কাজ শুরু হবে।

জমিদারের সঙ্গে সমস্ত ব্যাপার চুকে গেছে। ওকে কুড়ি হাজার টাকা আগাম রয়্যালটি দিয়ে তল্‌স্বত্বে লীজ বন্দোবস্ত নিয়েছি। এ জন্য আমাকে শেরগড় কোল কোম্পানির সঙ্গে লুকোচুরির খেলা এবং ছলনার অভিনয় চালাতে হচ্ছে। অবশ্য সেটার একান্ত প্রয়োজন। না হলে বাগড়া দিতে পারে। কারণ বর্তমানে জমিদারের ছেলে চম্পককুমার মিঃ হ্যামিলটনের সঙ্গে খুব মাখামাখি করছে। মিসেস নর্টনের কাছে দুজনেই মদ খেতে যায় ও আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে। সব খবর পাই। তবে আমি মোকাবিলা করে নেব।

সহসা তরলা দাসী হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকে সাহেবের ইমোশন বরবাদ করে দিল।

উনি খিস্তি করে উঠলেন—ফাকিন উওম্যান। আই ডোণ্ট ওয়াণ্ট ইউ।

তরলা বলল—জানি সাহেব। কিন্তু মহা বিপদ।

—হোয়াট?

—টুরিম্যান সাহেব খবর পাঠিয়েছেন একসিডেণ্ট হয়ে অনেক লোক মারা গেছে।

—ওঃ মাই গড! এমনিতেই তো মিঃ গ্রাণ্ডি বলেন—ইণ্ডিয়ার কয়লা কুঠিতে তোমার কসাইখানা, কবরখানা, কত কী খুলে দিয়েছ। এর পর একসিডেণ্টের খবর পেলে উনি কি করবেন? কত লোক মারা গেছে?

—অনেক।

—আই সী! ঘোড়া রেডি করতে বল।

সাহেব কাগজপত্র রেখে জামা কোর্তা পরে কাঁধে বন্দুক, পকেটে পিস্তল, হাতে টর্চ নিয়ে ঘোড়ার উপর সওয়ার হলেন।

সালুঞ্চী ছনম্বর সিঁড়ি-মুখে তখন মানুষ-জনের মুখ থমথম করছে। ইনচারজ, ছোট সাহেব, সবাই হাজির। সঙ্গে খুঁটি মিস্ত্রী। কুলি-কামিন। ওরা খাদে নামার জন্য তৈরি। অপেক্ষা মিঃ ব্যারাকলউয়ের জন্য।

অন্যদিকে ব্যথিত, বিষণ্ণ, শোকাকুল সাঁওতাল কুলিকামিনরা ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে। রাসমণি পাগলের মত ছুটে বেড়াচ্ছে—হায় আমার কি হল? কুথায় গেলি আমার মাকু, শবনী। তুদের গিদরা পিদরাগুলান যে কেঁদে মরে যেছে। ওরে রাবণ, ওরে রসিক—আয় ভাই। তুদের লেগে আমরা হাতুসে মরে গেলম রে।

আবার ছুটে আসছে ট্রুম্যান সাহেবের কাছে। অনুনয় করে বলছে—হেই সাহেব! আমার লোকগুলিকে এনে দাও। জীয়ন্ত হোক, মরা হোক আমাকে একবার চোখের দেখা দেখতে দাও। সাহেব আমার কথা শুনতে পেছ নাই।

মিঃ ট্রুম্যান সত্যিই পাথর হয়ে গেছেন। তার বোধবুদ্ধি কিছুই কাজ করছে না। ছুটে এল ব্যারাকলউ সাহেবের ঘোড়া।

॥ ছাব্বিশ ॥

বিভ্রান্ত মাইনিং সরদার রফিক শেখ ও খুঁটা মিস্ত্রী কালো বাউরী মড়া আগলে দাঁড়িয়ে আছে। সোম মাঝির বাত্তিটা জ্বেলে দেবার পর সে গুটি-গুটি পালিয়েছে। কালো বাউরী বলল—দাঁড়িয়ে থেকে কি করবে সরদার? সব তো শেষ হঞে গেইছে। খাদের লোকজনও পালাঞেছে। এখন এই ভূতের রাজত্ব থেকে আমরাও পালাই চল।

রফিক বলল—তোর যদি ভয় লাগছে তবে তুই যা। আমি খানেক দেখি। মনে হচ্ছে ভিতরে কেউ কেউ বেঁচে আছে। শুনতে পেছিস নাই কেমন গোঙানির শব্দ আসছে। কেউ আধ-চাপা হঞে থাকতেও ত পারে। কিংবা যদি কগ কাঁথির খোঁটরে থাকে।

—থাকলেই কি আর বার করতে পারবে?

—সাহেবরা আসুক। যদি কিছু বুদ্ধি বাহার করে।

ওরা দুজন ঠায় বসে রইল। সময় তার আপন নিয়মে এগিয়ে চলল। আস্তে আস্তে তাদের চোখ পরিষ্কার হয়ে এল। এটা ভোরের লক্ষণ। রাত্রে যারা খাদে থাকে তারাই বোঝে ভোর হবার সময় হলেই চোখের দৃষ্টি পরিষ্কার মনে হয়।

ওদিকে ভাঙা পাথরের স্তূপ থেকে একটা চাপা গোঙানি প্রায়ই ভেসে আসছে। রফিক কান পেতে শুনছে। মৃত্যুযন্ত্রণা যে এত মর্মান্তিক হয় তা ও আগে কখনো জানত না। এখন বুকের রক্ত হিম হয়ে আসছে।

মানুষের সাড়া পেয়ে বুকের ভিতরটা দুর-দুর করে উঠল। না জানি সাহেবেরা এসে ওকে কি করবে? তবু এগিয়ে গিয়ে গোলাইয়ে দাঁড়াল। মিঃ ব্যারাকলউ ও মিঃ ট্রুম্যান এগিয়ে এলেন। রফিক সেলাম দিল।

—কে তুমি?

—হুজুর আমি রফিক শেখ। মাইনিং সরদার।

—কি হয়েছে?

—হুজুর একসিডেন্ট।

মিঃ ব্যারাকলউ ঝড়ের গতিতে প্রশ্ন করলেন—কেমন করে হল? কত লোক মরেছে? তোমরা কি করছিলে? কেন আগে থেকে সাবধান কর নি?

বিরাট শব্দ, ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা, মৃত্যুর বিভীষিকা দেখেও যে রফিক শেখ জ্ঞান হারায় নি, ব্যারাকলউ সাহেবের সামনে দাঁড়িয়ে সে এমন কাঁপতে লাগল যেন এখুনি অজ্ঞান হয়ে পড়বে।

উনি বললেন—ওঃ ব্লাডি নারভাস ম্যান। বি স্টেডি। আস্তে আস্তে বল কি হয়েছিল? যা জান তাই বলবে। কোন কথা লুকোবে না। কোন কথা মিথ্যা বলবে না।

—খোদার কসম হুজুর, আমি মিথ্যা বলি নাই। আমার কুন্থু দোষ নাই। বারো নম্বর লেভেলের যোল নম্বর ডিপে চাঁদনী গরম ছিল। আমি কুলি-কামিন সব উখান থেকে হাটাঞে দিঞেছিলাম, কিন্তু জমিদারবাবুর মুনশী মদনবাবু কুলি-কামিনদিকে মারধর করে আয়তনে নিঞে গেইছিল। তখনই চাঁদনী ভস্‌কে গেল।

—মদনবাবু? দ্যাট ব্লাডি জমিদারের চাটুকার? হোল লাইফ মদের বোতল বয়ে আর উওম্যানদের খিদমৎ খেটেই তো দিন কাটিয়েছে। সে খাদের কি জানে? ডাকো ওকে।

—ডাকবো কোথায় সাহেব? সেও তো ভিতরে আছে।

—মাই গড? সেও ফিনিশ। তাহলে তুমি কি করে জানলে যে সেই কুলি-কামিনদিকে ভিতরে নিয়ে গিয়েছিল।

—হুজুর আমার কথা বিশ্বাস না হয় সোম মাঝিকে শুধাবেন।

—কোথায় সোম মাঝি?

—পালাঞেছে হুজুর। চাল পড়ার সময় উ কি করে পালাঞেছিল। হাঁটু কপাল ফুটাঞে, কাপড়ে-চোপড়ে পায়খানা করে বসেছিল। আমরা এসে উয়াকে টেনে তুললাম। বাতি ধরাঞে দিলাম।

—ও ছাড়া আর কোন সাক্ষী আছে?

হাঁ হুজুর। উয়ারা সব রাসমণির কুলি-কামিন। আরো চারটা কামিন ঝোড়া মাথায় টব গাড়ি ভরতে চাঁদনীর বাইরে ছিল। উয়ারা জানে।

—আচ্ছা। চলো জায়গাটা আমাকে দেখাবে।

—হাঁ হুজুর। ভিতরে কেউ কেউ বেঁচে আছে মনে হচ্ছে। শব্দ আসছে।

একটা বিরাট দরদালানের চোদ্দ ফুট চওড়া দশ ফুট খাড়াই দরজার মুখটায় যদি স্তূপীকৃত পাথর এলোমেলোভাবে পড়ে থাকে তবে কি তার ভিতরটা দেখা যায়? না। যায় না। যে চোরাই সুড়ঙ্গ দিয়ে চাঁদনী আয়তনে যাবার পথ তার মুখটা ঠিক ঐভাবে পাথর পড়ে জ্যাম হয়ে গেছে। ভিতর থেকে ভেসে আসছে গোঙানীর শব্দ।

সাহেবরা অনেকক্ষণ যাবৎ দাঁড়িয়ে রইলেন। কান পেতে শুনলেন। বললেন—হ্যাঁ। ভিতরে লোক বেঁচে থাকার সম্ভাবনা আছে।

তাহলে উপায়? মিঃ ট্রুম্যান বললেন: আমাকে আদেশ দিন স্যার উদ্ধারের কাজ শুরু করি।

—কি লাভ? এত বড় ধস সাফ করতে করতেই তো ভিতরে যারা আছে তারা মারা পড়বে।

রফিক বলল—বেঁচেও তো যেতে পারে হুজুর।

—তা থাকলেও হাড়গোড় ভেঙে এমন অবস্থায় বেরুবে যে তখন খেতে না পেয়ে নিজেই সুইসাইড করবে। ওসব করে কোন লাভ নেই। তার চেয়ে লেট দেম ডাই পিস্‌ফুলী।

তার উপর কথা চলে না। সাহেবের হুকুম—ওরা শান্তিতে মরুক, ওহো! কি শান্তি!

ওরা যখন উপরে উঠে এলেন তখন জমিদারবাবু ও চম্পকবাবু দুজনেই মুখ আমসী করে দাঁড়িয়ে আছেন। সাহেবদের গুডমর্ণিং করলেন। সিঁড়ি ভেঙে উপরে ওঠার জন্য ওদের শ্বাস-প্রশ্বাস খুব দ্রুত চলছিল। তাই শুধু ঘাড় নাড়লেন।

একটু দম নিয়ে চম্পকবাবুকে বললেন—সাহেবরা মদ খায়, বাজে কাজ করে। দেখে দেখে তুমিও তাই শিখেছো। কিন্তু শিখতে পারো নি কি গুণের জন্য তারা আজ তোমাদের মাথার উপর বসে শাসন চালাচ্ছে। এখনো তোমার শিখবার যথেষ্ট বয়স আছে। চেষ্টা কর সেই গুণ আয়ত্ত করতে। আর মনে রেখো আমাদের কাছে যা এসেন্‌সিয়াল কমোডিটি তোমাদের কাছে তা বিলাস ব্যসন। সাহেবদের অনুসরণ করতে গিয়ে তাদের দোষটাই আয়ত্ত করেছো। এটা খুব দুঃখের বিষয়।

ঘোড়া তৈরি ছিল। উনি তাতে চড়ে চলে গেলেন।

জমিদারবাবু ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন—বুঝতে পারলে সাহেব কেন তোমাকে ঐ কথা বলল।

হ্যাঁ জানি। আমাকে দেখে ওর বুক টাটাচ্ছে।

—হে ভগবান!

রাসমণি এসে কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল—বাবু, আমার এতগুলিন কুলিকামিন মরে গেল। তাদের লাশগুলি উঠা করাঞে দে। আমরা দামুদরে নিঞে যেঞে পুড়াঞে দিই। কিছু কিছু টাকা পয়সা দে উয়াদের ছোলা পিলাগুলানকে খেতে দিই।

চম্পককুমার খেঁকিয়ে উঠলেন—এঃ শ্যালীর আদিখ্যেতা। টাকার গাছ আছে যে নেড়ে দিলেই পড়ে যাবেক।

—বাবু।

—পালা আমার কাছ থেকে না হলে পিঠের ছাল তুলে দিব।

—তা তো লিবেই বাবু। আমাদের লোক মরল তো তুর কী? তুর টাকা হলেই হল। গরিবের মরণ বাঁচন দেখার দরকার কি?

নিজের সাঁওতালী ভাষায় বলতে বলতে ও সরে গেল। চম্পককুমার ওর বাবাকে নিয়ে চলে গেলেন নিরালা নিকুঞ্জে।

প্রকৃতি সদা হাস্যময়ী। সাত-সকালে এমন ঝলমলে রোদ উঠেছে যে দেখলেই প্রাণ জুড়িয়ে যায়। ঘাসের ডগায় শিশির বিন্দু। পাখীরা ডানা ঝাপটে উড়ে যাচ্ছে। গাছের পাতা নড়ছে। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। যেন কোথাও কিছু হয় নি। সব কেমন শান্ত। কেমন ছন্দোময়।

অসীম উৎকণ্ঠায় সারারাত্রি জাগরণে, মৃত্যুর বিভীষিকায়, মুমূর্ষুর আর্তনাদে, ভীষণ ভয়ে রফিক শেখ ও কালো বাউরীর মনে তখনো ধাঁধাঁ লেগেছিল তারা বেঁচে আছে কি না? সূর্যের আলো তাদের সেই প্রাণে একটু একটু করে তাপ সঞ্চার করছিল।

উপরে উঠতেই চারিদিক থেকে লোকজন পিল পিল করে ওদের ছেঁকে ধরল। কত প্রশ্ন! কত কান্না! কত যন্ত্রণা!

ব্যাচারীদের বাপ-দাদারা কখন সেই হুলমালের বছর এদিক সেদিক ছিটকে গিয়েছিল। রাসমণি তাদের গুটিয়ে গুটিয়ে কয়লাকুঠির দেশে নিয়ে এসেছিল বুঝি বেঘোরে প্রাণটা দেবার জন্য। ব্রিটিশের গুলির হাত থেকে যারা বেঁচেছিল তারা তাদেরই খাদানে প্রাণ দিল। এখন কালো কালো কুলিকামিনের দল এখানে সেখানে ছিতির বিতির হয়ে কেঁদে বেড়াচ্ছে। রফির শেখের মুখে ভাষা নেই। কাকে কি জবাব দেবে? কোনো জবাব তার জানা নেই।

তার ভিতরটা হু-হু করে উঠল। ডুকরে কেঁদে উঠে বলল—ভাইরে! উ চাঁদনীর ভিতরে কেউ বাঁচবেক নাই। একা সোম মাঝি পালাঞে এসেছে। পারিস ত উয়াকে খুঁজে বাহার কর।

—তবে লাশগুলি উঠাবার কি হবেক?

-- জীয়ন্তদিকেই উঠাবার গতি হল নাই তো লাশ। ভিতরে এখনো কেউ কেউ বেঁচে আছে। গোঙানির শব্দ শুনেছি। কিন্তুক উঠাবার কুন উপায় নাই।

শোক উথাল-পাথাল করে উঠল। চারিদিকে হায় হায় রব। হু হু কান্না। কেউ আছাড় খেয়ে পড়ল। চোখের জলে মাটি ভিজে গেল। রফিক শেখ ও কালো বাউরীর মনে হল—তারা কেন বেঁচে আছে।

সেই সাগরে এসে মিশল মদনবাবুর দুটি স্ত্রী, দশটি সন্তান।

চুল খুলে, আঁচল লুটিয়ে এমনভাবে ওরা আসছে যেন এখুনি খাদে ঝাঁপিয়ে পড়বে। এমন ভাষায় বিলাপ করে কাঁদছে যে শুনলে বুক ফেটে হা হা করবে। দশটি ছেলে মেয়ে। কারো গায়ে কাপড় আছে কারো নেই। কেউ বেবাক উদোম। কোলের ছেলেরা কেঁদে কেঁদে নেতিয়ে পড়েছে। একে তো পেটে ভাত নেই, আজ আবার বাপও গেল।

ভগবান যত শোক দুঃখ কী গরিবদের জন্যই বরাদ্দ করে রেখেছেন।

॥ সাতাশ ॥

সিদাবাড়ির উত্তরে একটি বড় পাকুড় গাছ। তার শিকড় বাকড়ের খোপে খোপে সিঁদুর লেপা পোড়া মাটির হাতি. ঘোড়া, ধুনুচি ইত্যাদি। এটা কুমোর বুড়ির থান। গরুর দেবতা। প্রতি বছর অঘ্রানের দিনে পূজো, পাঁঠাবলি হয়। মহা ধুমধামে ঢাক বাজে। মেলা পড়ে। গোমড়ক হলে এখানেই লোকে মানত করে পুজো দিয়ে যায়।

রাসমণি সেই গাছের নিচে বসে শালপাতার চুটি ফুঁকছে। একটু দূরে বুধনা বসে আছে গুম্ হয়ে। এতগুলি লোক মরে গেল। তাদের লাশ উঠিয়ে যে দামোদরে সৎকার করবে তার জো রইল না। ওদের ছেলেপুলেরা কেঁদে ককিয়ে বেড়াচ্ছে। সিদাবাড়ি, ছাতাবড়া, মৌল পাহাড়ীতে শোক ডুকরে উঠছে। একটা দিন ও রাত কাবার হয়ে গেছে।

মৃতদের নিকট আত্মীয়রা রাসমণির কাছে কেঁদে পড়েছে—তুই আমাদের সরদারনী। একটু কিছু কর। লোকগুলিনকে উঠাঞে নিঞে আয়। সাহেবকে বল। ঠিকাদার জমিদারকে বল। না হলে আমরা সবাই মিলে যাব চল।

রাসমণি ভেবে কূলকিনারা পায় না। জমিদার যখন থেকে ঠিকাদার হয়েছে তখন থেকে পেটের ভাত মরছে। পুরা গাড়ি ভরলে তিনপুয়া দাম পায়। তাতে কি পেট চলে? বারোঘণ্টা খাদের খাটালির পর যদি পেট ভরে ভাত না পায় তবে তাদের চলে কি করে? ওঃ খালভরা হাড়মাস সব চিবাঞে খেলেক্।

খাদে লোকজন মরা নতুন কথা নয়। আগেও এমন অনেক হয়েছে। তখন সে লাশ উঠিয়ে এনে সৎকার করেছে। সাহেবরা কিছু পয়সা কড়ি দিতেন তা দিয়ে কুটুমজনকে ভোজ দিয়েছে। কিন্তু এমন তো কখনো হয় নি। একসঙ্গে ন'জন মরে গেল। একটাও লাশ উঠাতে পারল না। কেউ মুখেও শুধাল না। দুটো টাকাও দিল না। এবার সে কি করে?

চুটিটা ফেলে দিয়ে বুধনাকে বলল—চুপ করে রইলি যে? কি করবি বল?

যেন সে বংশবদ ভৃত্য তেমনি করে বলল—তুই যা বলবি।

—অঃ। বড় মুরাদের মরদ তুই।

—আমাকে রাগ দেখাছিস ক্যেনে?

—ত কাখে দেখাব? আমার কি পাঁচ সাতটা মরদ আছে ন'কি? এতবড় একটি বিপদ হল। সেটি কেমন করে সামলাব তার বুদ্ধিটি ত চাই। তুই কেমন মরদ যে একটি বুদ্ধি খেলাতে লারছিস?

—না। আমার বুদ্ধি নাই।

—অমন বললে কি চলে রে? দেখছিস নাই মাঝিগুলান গরম হঞে গেইছে।

—ভালই ত। শ্যালা চাপরাশীর ঠেঙা খেঞে ত হাড়মাস সিজে গেইছে। লোকগুলিনও এডাস্ হঞে গেল। কে বরদাস করবেক?

এতক্ষণে রাসমণি বুধনার মনের হদিশ পেল। ওর ভিতরটা জ্বলছে। বলল—তুই ঠিকেই বলছিস। আমার বাপও ঐরকম বলত।

দুদণ্ড নিরিবিলিতে বসে দুটো মনের কথা বলবারও জো নেই।

একটি দুটি করে মাঝি মিঝান এসে জমতে লাগল। তাদের সেই একটি কথা—একটি কিছু কর। না হলে বলে দে আমরা লেলম। তখন দেখবি কি করি।

এই ভয়েই ওরা ঘর থেকে পালিয়ে গাছতলায় আশ্রয় করেছিল। তাও কপালে সইল না।

জগু হাড়াম ডুকরে কেঁদে উঠল—আমার বন্ধু ব্যাটা দুটাই শেষ হঞে গেল। রাবণের মতন ব্যাটা। কাড়ার পারা গতর। শবনীর মতন বহু। একাই বোঝা বঞে গাড়ি ভবে। আমি বুড়া মানুষ। গিদরা পিদরাগুলানকে কি বুঝাব? তুরা তার লেগে কুছুই করলি নাই। বল কি করব? মনে হচ্ছে কুচিলা বীচ দিঞে তীব বেনাই। তারপর শ্যালাদিকে বিঁধে দিই।

এ সেই বিদ্রোহী বৃদ্ধ। যে রাসমণির মাকে হুলমালের বিপজ্জনক সময়ে জামতাড়া সিদাবাড়ি থেকে পঞ্চকোট পাহাড়ে নিয়ে এসেছিল। তখনো সে বৃদ্ধ ছিল, এখনো সে বৃদ্ধ আছে। বয়সের গাছপাথর নেই। এখনো তার তীরের নিশানা ঠিক। এখনো সে জোয়ান মরদের সঙ্গে কাজিয়া লড়তে পারে। তার ক্রোধ ও শোকের সীমা পরিসীমা নেই।

কার বা আছে? খেতুরি মিঝান দশ আছাড় খেয়ে কাঁদছে—আমার হুপনা কোথায় গেলি বে? তুর লেগে ভাত রেঁদে রেখেছি বাপ। আয়—খেঞে যা। মায়ের বুকে দাগা দিস্ না বাপ।

মঙ্গলার বৌ যুপি মিঝান দশ মাসের পোয়াতি। প্রসব বেদনা আসার জন্য স্বামীর সঙ্গে খাদে যেতে পারেনি। এখন অাঁতুড় ঘরে বসে হাপুস নয়নে কাঁদছে। কপাল ঠুকে ঠুকে ঘা করে ফেলেছে। ওর মুখে একটাই কথা—আমাকেও ক্যেন নিঞে গেলি নাই। যেমন করে রাবণ শবনী মরল তেমনি করে আমরাও একসথে মরতম।

সদ্যোজাত শিশুকে দুধ পর্যন্ত দেয় নি। শিশুটি কেঁদে কেঁদে যমের দুয়ারে পৌঁছে গেছে। মরা ছেলেটা একধারে পড়ে আছে। ওর মুখে মাছি বসছে।

ঘরে বাইরে এমন বিপদের কত কথা রাসমণিকে তাড়া করে ফিরছে। সেই সময়ে গোদের উপর বিষ ফোঁড়ার মত একদা ওর

বিয়ালা পুরুষ, যে ওর গর্ভে সুমিকে রেখে ঘর থেকে তেড়ে দিয়েছিল সে এখন দল পাকিয়ে বেড়াচ্ছে।

রাসমণি অতীতের কথা ভুলে তাকে আশ্রয় দিয়েছিল তার জন্য সে কৃতজ্ঞ নয় বরং মনে করে রেখেছে ঢ্যাঙ্গির জন্য তাকে যেসব কথা বলেছিল।

ঘায়ের ওপর জলবিছুটি দেওয়ার মত করে সে বলল—ঢ্যাঙ্গি একটি জেতের বাহার তালা কুড়ি মেয়ার লাশ উঠাঞে আনি নাই বলে তুই আমাকে বললি কুচুক্ কুড়া খালভরা। তো এখন যে এতগুলিন লোক মরে গেল যা উঠাঞে নিঞে আয় গা।

শুনে রাসমণির পিত্তি জ্বলে গেল। ঝন্ ঝন্ করে বলল—অঃ তুঁই তো বাড়া খঁটা দিছিল।

—হঁত। দিব নাই। তুঁই কিসের সরদারনী? ক্যেনে তুকে কমিশন দিবেক? তুঁই উয়াদের জন্য কি করেছিস?

ওঃ। মানুষ কত নিমক হারাম। রাসমণির বুক ফেটে যায়।

জগু হাড়াম চিৎকার করে উঠল—তুরা ঝগড়া করবি নাকি?

মাহা বলল, না না। ঝগড়া করব ক্যেনে? আমার বুকটি টাটাছে বলেই বললাম। কিন্তুক আমার কি মনে হচ্ছে জানিস—যত হড় একিন হঞে হুল কবে দিই। শ্যালা জমিদারের বাপের নাম ভুলাঞে দিই।

—হঁ। ঠিক বলেছিস।

হঠাৎ টগ বগ করে ঘোড়া ছুটিয়ে হাজির হলেন হাবুসাহেব। একসিডেন্টের খবর পাওয়ার পর থেকেই উনি শুধু ঘাটে ঘাটে ছুটে বেড়াচ্ছেন ব্যাপারটাকে ঘোলঘাট করে একটা কিছু করার চেষ্টায় যাতে সাহেব জমিদার অপদস্থ হয়।

একদা যখন উনি ব্যারকলউ সাহেবের অনুগ্রহপুষ্ট ছোট সাহেব ছিলেন তখন তার প্রতাপে সব কুলিকামিন থরহরি কম্পমান হয়ে থাকত। উনি সাত-সকালে চাপরাশী দিয়ে লাঠিটা পাঠিয়ে দিতেন। সেই লাঠি দেখেই যে যেখানে বিড়ি চুটি ফুঁকত, হাসি মস্করা করত তারা হুড়মুড় করে খাদে নামত।

যদি কোন পালা-পার্বনে, উৎসব আনন্দে কুলিকামিনরা কাজে না যেতো তহেলে উনি চাপরাশী দিয়ে ধাওড়ায় টুপি ঘুরিয়ে দিতেন।

রকমটা ছিল চাপরাশী হাবু সাহেবের টুপি হাতে হাঁক দিয়ে যেতো সব লেবার হুঁশিয়ার। আ-গয়া সাহেবকা টোপী। চলো খাদান। নেহি তো লাঠি বাত্তি পঁহুছ যায়েগা।

মানে তোমাদের গুষ্টির শ্রাদ্ধ হোগা।

ঘোষণা শুনেই কুলিকামিনদের ভয়ে পিলে চমকে যেত। প্রসূতির প্রসব বন্ধ হত। মাতালেরা পেচ্ছাপ, পায়খানা, বমিতে মাখামাখি হয়ে যেত। বাব্বাঃ। লাঠি বাত্তি! সে এক বিভীষিকা।

সেই হাবু সাহেব আজ তাদের গাঁয়ে এসেছেন। ব্যাপারটি তাদের কাছে অভাবনীয়! কে যে কি করবে তা ভেবে পায় না।

উনি বললেন—শ্যালা অড়বোঙা সাঁওতাল। তোরা খাদে চাল চাপা পড়ে মরবি না তো কে মরবে? জমিদারের ভয়ে জুজু বনে গেলি। আমি যখন তুদের সাহেব ছিলাম তখন এইরকম লোক মরেছে? বল তোরা!

কারো মুখে রা নেই। সবাই নির্বাক। শোক ভুলে গেছে। ভাবনা হারিয়ে গেছে। ক্ষিদে পালিয়ে গেছে।

উনি আবার বললেন, জমিদার একটি ঠিকাদার। বারকুলি সাহেব ম্যানেজার। কেউ মালিকও নয়, লাটসায়েবও নয়। তোদের গায়ে যদি রক্ত থাকে, হাড়ে যদি তাগদ থাকে তবে ধর জমিদারকে। বল—আমাদের লোক মেরেছিস খেসারৎ দে, না হলে হুলমাল করে দিব। দেখবি তখন পালাবার পথ পাবেক নাই।

রাসমণি লুলু বড়কার মেয়ে। হুল শব্দটির জাদু তার রক্তের মধ্যে সুপ্ত হয়ে ছিল। ধীরে ধীরে জেগে উঠল। কঠিন কণ্ঠে বলল, ঠিক বলেছিস বাবু। আমরা বনের মানুষ বনকেই চলে যাবো। কিন্তুক, সাহেব, দিকু, জমিদারের জবর-জুলুম বরদাস করব নাই। যতসব হড়—বল তুরা কি বলছিস?

জগু হাড়ামের বয়সটা হঠাৎ তেত্রিশ চৌত্রিশ বছর পিছিয়ে গেল। তীরধনুক বাগিয়ে ধরতে পারলে যে সাহেব, দিকু, জমিদারের বুকের রক্ত জল হয়ে যায় সে দৃশ্যও দেখেছে। রাখশী থানে মহেশ দারোগার লাশ চোখের সামনে ভেসে ওঠে। চিৎকার করে বলে, বেবাক হড় হিজুমে (যত মাঝি এসো)। শ্যালা জমিদারের লাশটি ফেলে দিব। কি মনে করেছে আমরা অরবোঙা জাত বলে চাল ধসকাণ্ডে মেরে দিবেক।

সাঁওতালদের মনের ব্যাটারী চার্জ দেবার এই তো সময়। শোকে দুঃখে দিশেহারা। পেটের ভিতর ক্ষিদে জ্বলছে ভাটার আগুনের মত। রাগ উঠেছে ব্রহ্মতালুতে। দরকার একটা স্ফুলিঙ্গের।

বললেন—তোরা তীর ধনুক টাঙ্গি বল্লম, বলোয়া হাঁসুয়া নিয়ে চলে যা। খাদটা বন্ধ করে দেগা। কাহুকে খাদে নামতে দিস না। জমিদার হোক বা তার ব্যাটা হোক পেঞেছিস কি দে বিঁধে।

রাসমণি বলল—হুঁত। ডর কিসের? আমার বাপ অমন দেদার সাহেব, দিকুকে মেরেছে। আমরাও জীবন থাকতে ছাড়ব নাই।

বুধন হুঙ্কার দিয়ে উঠল—লাগাও হুল।

সমস্বরে চিৎকার উঠল—হুল! হুল!

হাবু সাহেব ঝনাৎ করে টাকা ফেলে দিলেন।

—নিয়ে আয় হাঁড়িয়া। দমে খা। তীর ধনুক বাগাঞে ধর। মার শ্যালা জমিদারকে। কুকুরের মত করে মার। ওদের মগজে আগুন ধরিয়ে দিয়ে চলে গেলেন।

মদের হাঁড়া এল। খালি পেটে চোঁ চোঁ করে মদ গিলল। তৎক্ষণাৎ তার প্রভাবে মাথার ঘিলু গরম হয়ে গেল। সব সাঁওতাল হাতিয়ার হাতে সালুঞ্চী খাদের দিকে এগিয়ে চলল—হুর্‌র্‌ হুর্‌র্‌ শব্দে রাস্তা মাতিয়ে।

তাদের দেখে কে বলবে খাদে লোক মরার জন্য শোকে দুঃখে বিহ্বল। তারা উন্মাদ। চোখে মুখে উলঙ্গ হিংসা উল্লাসে ফেটে পড়ছে।

॥ আঠাশ ॥

দুর্ঘটনার পর ব্যারাকলউ সাহেব বড় বিচলিত বোধ করছেন। রফিকের কাছে সব খবর শুনে বুঝেছেন যে এটা অজ্ঞতার বলি। মদন সরকার খাদের কি বোঝে? সারাজীবন তোষামুদি আর উচ্ছিষ্ট ভক্ষণে যার জীবনপাত সে কি বুঝবে চাঁদনী খাদের মর্ম: সে যদি মুরুব্বি হয়ে পড়ে তবে তো দুর্ঘটনা ঘটবেই।

হাবু সাহেব থাকলে এমনটা হত না। ও সবাইকে চেনে। ওর কাছে এইসব বাবু পাত্তা পেত না। অনেকদিন পর তিনি হাবু সায়েবের

অভাববোধ করলেন। জমিদারের কথায় তাকে অপমান করে তাড়িয়ে না দিলেই হত। লোকটা তো কাজের। আবার ওকে ডেকে পাঠানো যায় কিনা তা নিয়ে ভাবতে হবে।

সন্ধ্যাটা বড় বিরস। হুইস্কিতে নেশা হয় না। নারীদেহ শিহরণ তোলে না। জীবনের খেইটা কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। সব কেমন নীরস ছন্দহীন মনে হয়। আপন বলে কাউকে কাছে পাবার মত নেই। সেদিক দিয়ে মিঃ নর্টনও তার চেয়ে সুখী। হোক্ গে তার স্ত্রী ব্যভিচারিণী। দুটি ফুলের মত মেয়ে তো আছে। তাদের মুখের দিকে তাকালে মনটা হাল্কা হয়। যাবেন নাকি তার বাংলোয়?

না তো! এখন হয়তো মিঃ হ্যামিলটন এসে জুড়ে বসেছেন। তিনি অস্বস্তি বোধ করতে পারেন। চিঠি লিখবেন?

তা লিখতে পারেন। কিন্তু চিঠিতে আর কতটুকু অভাব পূরণ হতে পারে? মাঝে মাঝে মনে হয়—থাক তো ইণ্ডিয়ার চাকবি। হোমে চলে যাবেন। আপন পরিবার নিয়ে সুখে ঘবকন্না করতে বাধা কি?

বাধা তার ভিতরের মানুষটা। যে থামতে জানে না। যার মনের সবটাই দখল করে আছে দামোদর উপত্যকার স্তরীভূত শিলাস্তূপ। কয়লার কালোপাহাড়, বয়লার, চিমনী, হেড গিয়াব, হলেজ, পাম্প, ফ্যান, পাওয়ার হাউস, পিলার কাটিং, একসিডেন্ট। লেবার, সরদার, বাবু, গোমস্তা, ওয়াগণ, ডেস্‌প্যাচ, হর্স, হাউসী, ওয়াইন, উওম্যান।

ঢালু দাস একটা বোতলের ছিপি খুলতে যাচ্ছিল। উনি বললেন—না। ঘোড়া তৈয়ার করতে বল। আমি পাণমোহরা যাবো। বোতলটা সঙ্গে দিও।

গা ছমছমে আঁধার। নাচমহলে স্তব্ধ হয়ে গেছে নুপুরের নিক্কণ, অলঙ্কারের শিঞ্জন। ঘরে ঘরে নেই কোন কলগুঞ্জন। সবাই ঘুমে অচেতন। বৃদ্ধ ওস্তাদ মন্মথ ঘোষ পা টিপে টিপে কাবেরীর ঘরের দুয়ারে এসে দাঁড়াল। কপাটটা খুট করে খুলে গেল।

উনি ঘরে ঢুকে বললেন—আজ সব ফাঁকা। একটি মোটে রাঁধুনী আছে। সেও সন্ধ্যাকালে সিদ্ধি খেয়ে ঘুমোচ্ছে। চাপরাশী, খানসামা সবাই দাঙ্গা করতে গেছে। আজ বিকেল থেকে সালুঞ্চী খাদ বন্ধ করে

দিয়েছে সাঁওতালরা। এমন সুযোগ দ্বিতীয়বার আসবে না। যদি পালাতে চাস তবে এখুনি বের হতে হবে।

কাবেরীর চোখ ঝলসে উঠল। নাচমহলের নরকযন্ত্রণা থেকে উদ্ধার পাবার আশায় সে তৎক্ষণাৎ রাজী। বলল—কোথায় যাবে গুরু?

—তা জানি না। দামোদর পার হয়ে গেলেই ধরা পড়ার বিপদ কেটে যাবে। তারপর যেখানে হোক ঠাঁই একটা মিলবে। মাথার উপর ভগবান আছেন।

গুটিকয়েক শাড়ি, গহনা, নাচের পোশাক ঘুঙুর ও হারমোনিয়ামটা নিয়ে অনির্দিষ্ট পথে বেরিয়ে পড়ল। সোজা গেটের পথে না গিয়ে পাঁচিল টপকে ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর দিয়ে চফলা জোড়ে এসে নামল।

একটি সরু জলের রেখা এঁকে-বেঁকে বয়ে চলেছে। তার পাশ দিয়ে অতি সন্তর্পণে হাঁটছে ওরা। কাবেরীর কাঁধে একটা পুঁটুলি। ওস্তাদের গলায় ঝুলছে হারমোনিয়াম। জীবন ও জীবিকার উপকরণ।

চঞ্চলা জোড় যেখানে দামোদরে মিশেছে সেই স্থানটায় জলের রেখা নানাভাবে ভেঙে গেছে। চ্যাপড়া ঘাস ও শিলাতলের মনোরম পাদপীঠ। ঠাঁই ঠাঁই মড়া পোড়ানোর ছাই, আঙার, কাঁথা, কানি, ভাঙা খাট, মানুষের হাড় ও খুলি। মাথার উপর সাদা চাঁদ। ঝাপসা আলোতে দামোদরের বালুবেলায় অপার ধূসরতা। জলের স্রোত ঝিলমিল করে বয়ে যাচ্ছে।

কোথাও কোন সাড়াশব্দ নেই। ঘোড়াটা পাড়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে। নিচে ঘাসের উপর পা ছড়িয়ে বসে একাই মদ খাচ্ছেন মিঃ ব্যারাকলউ। তার মনের উপর এমন একটা বিষণ্ণতা চেপে বসেছে যে কিছুতেই প্রফুল্ল বোধ করছেন না। তাই এই নিঃসীম আকাশের নিচে চঞ্চলা জোড়ের শ্মশানে একাই মদ খাচ্ছেন.

হঠাৎ স্বভাব সতর্কতার করেণে তার কান খাড়া হয়ে গেল। দূর থেকে ভেসে আসছে পাতা মাড়ানোর শব্দ। ঘোলাটে চোখ মেলে এদিক ওদিক তাকালেন। মাটির কাছাকাছি ভূমির সমান্তরালে চোখ রেখে দেখতে পেলেন দুটি মানুষ খুব দ্রুত হেঁটে আসছে। উনি প্রায় শুয়ে পড়লেন। পকেট থেকে পিস্তল বের করে বাগিয়ে ধরলেন। ওরা কাছে আসতেই তড়াক করে দাঁড়িয়ে বললেন—হল্ট!

ওরা হকচকিয়ে গেল। কাবেরী একটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে মাটিতে পড়ে গেল। ওস্তাদ কাঁপতে লাগল।

উনি জিজ্ঞাসা করলেন—তোমরা কে ?

ওস্তাদ কাঁপতে কাঁপতে বললেন—হুজুর আমরা বে-গানা রাহী।

—কোথায় যাচ্ছো ?

—আমরা কোন আশ্রয়ের সন্ধানে যাচ্ছি।

—রাত্রে কেন ? দিনে যেতে পারতে।

—দিনে যাবার জো নেই সাহেব। ধরা পড়লে প্রাণ যাবে।

—আই সী ! তুমি তাহলে ঐ মেয়েটিকে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছো।

—ঠিকই বলেছেন সাহেব। কিন্তু আপনি যে অর্থে বলেছেন তা নয়।

—আমি ঐ মেয়েটিকে দেখবো।

—আপনার যা ইচ্ছা।

কাবেরী ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে। উঠে দাঁড়িয়েছে। মনে একটা বল এসেছে। এই সাহেব তার অচেনা নয়।

দু'পা এগিয়ে এসে বলল কি দেখবে সাহেব ?

মিঃ ব্যারাকলউ অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইলেন। অস্ফুট কণ্ঠে বললেন—লাভলী ! ভেরী বিউটিফুল।

কাবেরী বলল—আমাদিকে রাস্তা ছেড়ে দাও সাহেব।

—না তা ছাড়তে পারি না। আমি তোমাকে বাংলোতে নিয়ে যাবো।

—কেন সাহেব ?

আমি তোমাকে চাই। এক্ষুণি। অ্যাট দিস মোমেণ্ট।

—কেন চাও তা আমি জানি সাহেব। তারপর আমাদিগকে ছেড়ে দেবে তো ?

—অলরাইট !

ওস্তাদ সরে গেল দৃষ্টির অন্তরালে। নগ্নিকা রমণী ঝাপসা আলোতে অপার রহস্যের মত দাঁড়িয়ে আছে ভঙ্গুর শিলাস্তরের বন্ধুর প্রেক্ষাপটে। মিঃ ব্যারাকলউ চিৎকার করে উঠলেন—নো—নো—নো !

একটা ভয়ঙ্কর স্মৃতি হঠাৎ জেগে উঠল তার মনে। সেই খোলাচুল। নিরাবরণ দেহ। চোখ থেকে ঠিকরে পড়ছে আগুন। ঝুলে আছে কড়িকাঠে। সেই রঙ। সেই অবয়ব।

তাড়াতাড়ি হাত দিয়ে চেপে ধরলেন হুইস্কির বোতল। ঢক্ ঢক্ করে খানিকটা খেয়ে বললেন—ইউ উওম্যান। ড্রেস করে নাও।

কাবেরী এত আশ্চর্য জীবনে কখনো হয় নি। এক কামার্ত পুরুষ নগ্ন নারীদেহের সামনে দাঁড়িয়ে এমন পরাজিত হয় কি করে? ভেবে কুল কিনারা পায় না। পোশাক পরিচ্ছদ পরে তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে বলল -আমি খুব অবাক হয়ে গেলাম সাহেব। যাইহোক এবার যেতে দেবে তো?

মিঃ ব্যারাকলউয়ের মনের বিভ্রান্তি কেটে গেছে। কড়িকাঠ থেকে ঝুলে পড়া অহল্যার প্রতিমূর্তি মুহূর্তের জন্য তার মনের আকাশটা যে ভাবে আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলেছিল তা কেটে যাবার পর আবার কামনার জোয়ার আসতে শুরু করেছে। বললেন—তুমি কি আমার বাংলোয় যেতে পারো না?

—কেন পারবো না সাহেব? আমবা তো আশ্রয়ের সন্ধানেই বেরিয়েছি। তুমি আশ্রয় দিলে তোমারই কাছে যাবো। কিন্তু শপথ কর যে আমাদের প্রাণ রক্ষা করবে।

—অলরাইট। আমি প্রমিস করছি তোমাদের প্রাণ রক্ষা করব। কিন্তু কেন তোমাদের এই প্রাণের ভয়?

—আমি জমিদারের নাচমহলের নাচুনী, উনি আমার শিক্ষাগুরু। জমিদারের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে পালিয়ে যাচ্ছি। ধরা পড়লেই প্রাণ যাবে।

—ব্লাডি জমিদার সবদিকে মানুষ মারার ফাঁদ পেতে রেখেছে। আর আমি হলাম কসাই। অলরাইট। তুমি চল আমার সঙ্গে। তোমার গুরুকে বল আমার বাংলোতে আসবার জন্য।

কাবেরীকে ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে নিয়ে চলে গেলেন। বৃদ্ধ মন্মথ ঘোষ হারমোনিয়ামটি গলায় ঝুলিয়ে সাহেব কোঠার পথ ধরলো।

ভালবাসার বাসরে চারুকলার প্রদর্শনী।

হঠাৎ ছুটে এল দুজন ঘোড়সওয়ার। একজন মিঃ ট্রুম্যান অন্যজন মিঃ শেফার্ড। তাঁরা হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকেই থমকে গেলেন।

মিঃ ট্রুম্যান বললেন—আই য়্যাম সরী।

—ইউ আর এ ফুল। দিলে তো সব চৌপট করে।

মিঃ ট্রুম্যান সেজন্য কম দুঃখিত নন। তাঁর বস যে রোমান্টিক ভাবালুতায় ডুবে ছিলেন তা ওঁর জানা ছিল না। বললেন—একটা বিশেষ দরকার—

- তাড়াতাড়ি বল।

—স্যার সান্থাল পিপলরা রিভোল্ট করেছে।

—হোয়াট ?

—সাঁওতালরা সব তীর ধনুক নিয়ে সালুঞ্চী দু'নম্বর অবরোধ করেছে। খাদ বন্ধ করে দিয়েছে।

—সো হোয়াট ? আমরা জমিদারকে কনট্রাক্ট দিয়েছি। সেই দেখবে।

—জমিদার সিপাই, বন্দুক নিয়ে তৈয়ার হয়ে আছে। যে কোন সময়ে দাঙ্গা হয়ে যেতে পারে।

—তাতে কি হয়েছে ? নেটিভরা নেটিভদের সঙ্গে যদি লড়াই করে মরে তাতে তোমার কি ? ইউ প্রিম্যাচিওর বয়—যাও। নিজের বাংলোয় গিয়ে সেক্স এণ্ড ওয়াইন এনজয় কর গে।

—থ্যাঙ্ক ইউ স্যার। ওঁরা তৎক্ষণাৎ বিদায় নিলেন।

॥ উনত্রিশ ॥

তীর ধনুক হাতে নিয়েই বুধনার মাথায় খুন চেপে গেছে। গলা পর্যন্ত মদ খেয়েছে। শোর খোর নেই। রাসমণি কিছুতেই সামাল দিতে পারছে না। এই কি সেই বুধনা ? সেই ষোল বছরের শাল-কোঁড়ার মত দামাদড় ছোকরা! রাসমণি যাকে হাতে ধরে প্রেম শিখিয়েছে। যে আজ দশটা বছর তার কেনা গোলামের মত শুধু হুকুম তামিল করেছে তার ভিতরে এই জিঘাংসা কোথায় লুকিয়েছিল ?

যতবার তীর ধনুক কেড়ে নিতে যায় ততবার গর্জন করে ওঠে। রাসমণি প্রায় কেঁদে ফেলেছে—হেই বুধনা, তুর পায়ে পড়ি। তীর ধনুকটি আমাকে দে। না হলে তুই মানুষ খুন করে দিবি।

—খুন করতেই তো তীরধনুক হাতে নিএেছি।

—না-না। খুন খারাবী করিস না। আমার কিরা—

বুধনা ওর চুলের মুঠি ধরে দূরে ছুঁড়ে দিল। গর্জন করে বলল—ফের যদি খিচির খিচির করবি তো তুখেই বিঁধে দিব।

—তাই দে। আমাকেই বিঁধে দে। আজ তুই মানুষের খুন না খেঞে তো ঘরকে যাবি নাই। তো আমারই রক্ত খা।

আলু থালু ভাবে উঠে এসে সামনে দাঁড়াল। বুধনা ওকে এমন একটা চড় মারল যে যেমন তেমন মেয়ে হলে ফিট্ হয়ে যেত।

একজন বলল—বেশ হয়েছে। বাঘকে রক্তের সুয়াদ দিঞেছিস। ঈ-বারে ঠ্যালা সামাল।

জগু হাড়াম এগিয়ে এল। গর্জন করে বলল—ক্যেনে তুই খিচির খিচির করছিস। আমরা তো লড়াই করতে এসেছি। এখন তীর ধনুকটি কেড়ে নিঞে যাবি কি রকম? যা তুই ঘরকে যা। আমরা আজ জান লিব না হয় দিব।

সেই বিকেল থেকে কোলিয়ারি বন্ধ। রাত গভীর থেকে গভীরতর হতে চলল। দুপক্ষই তৈয়ার। ডিপোতে টব-গাড়ি উল্টে ব্যারিকেড বানিয়ে চম্পককুমার বন্দুকওলা চাপরাশী মোতায়েন করেছেন। নিজের হাতেও বন্দুক। রাগে সারা শরীর জ্বলছে। শ্যালা সাঁওতাল তুদের এত সাহস যে আমার সঙ্গে লড়াই করতে এসেছিস। এক এক গুলিতে এক-একজনকে সাবাড় করে দিব।

ফরমান জারি করে দিলেন—চালাও গুলি।

চাপরাশীরা এই হুকুমটির জন্যই অপেক্ষা করছিল। গুড়ুম গুড়ুম শব্দে আকাশ-বাতাস তোলপাড় করে গাদা বন্দুকের গুলি ছুটল সাঁওতালদের লক্ষ্য করে।

ওদিক থেকে শাঁ-শাঁ করে তীর ছুটে এল। ঠক্ ঠক্ করে টব গাড়িতে লাগল। মিনিট কয়েক ধরে তীর ও বন্দুকের ঘোরতর লড়াই। পটাপট লোক পড়ল। কেউ বন্দুকের গুলি খেয়ে কেউ তীরবিদ্ধ হয়ে। যেন জামাতাড়া, সাঁইথিয়া, রাজনগরে সাঁওতাল বিদ্রোহের অসম লড়াই।

জগু হাড়াম মরিয়া হয়ে সামনে এগিয়ে গেল। তার পিছনে বুধনা এবং আরো কয়েকজন। ডিপোর উপরে উঠে গেল। আর একটু এগুলেই হাতের কাছে পেয়ে যাবে 'বন্দুকওলাদের। রক্তে ওদের তুফান বয়ে গেল। কালোমানুষ কালো কয়লার সঙ্গে মিশে গেছে।

এক ঝাঁক গুলি ছুটে এল। জগু হাড়াম আর্তনাদ করে পড়ে গেল। বুধনার রক্ত টগবগ করে ফুটে উঠল। ঐ গুলি বর্ষণের মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে একটা টব গাড়ির কাছে পৌঁছে গেল। তারপর চট করে বন্দুক সমেত একজনকে ধরে ফেলল।

দুজনের চিৎকার এবং ধস্তাধস্তি। একজন চাপরাশী ও বুধনা পাক খেতে খেতে ষোল ফুট খাড়াই ডিপো থেকে গড়িয়ে পড়ল নীচে।

বুধনার বুকফাটা আর্তনাদে চমকে উঠল রাসমণি। দিশেহারা হয়ে এদিক-ওদিক তাকাল। তার পাশে কেউ নেই। হয় পালিয়েছে না হয় লড়াই করতে গিয়ে ছিটকে পড়েছে। সে দাঁড়িয়ে আছে একা।

বুকের ভিতরটা হায় হায় করে উঠল। বুধনা স্পষ্ট ওর নাম ধরে ডাকল - রাসমণি !

মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিল। ছুটে গেল শব্দ লক্ষ্য করে। ডিপোর নিচে চাপ কয়লার মধ্যে চাপরাশী ও বুধনা প্রাণপণে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। দুজনেই গুলি খেয়েছে। হাতিয়ার ছিটকে গেছে।

চাপরাশী হাঁক দিল—পিয়ারী ভাই !

বুধনা ডাক দিল—রাসমণি !

রাসমণি ওর কাছে পৌঁছে গেল। অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতা ও আশ্চর্য ক্ষমতায় বুধনার অতবড় শরীরটা চালের বস্তার মত পিঠে নিয়ে দপ দপ করে চলতে শুরু করল। প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তিতে ও অদম্য আবেগে সে প্রায় দুশো গজ যাবার পর টাল খেতে লাগল। আর পা চলে না। এদিকে টাল সামলায় তো ওদিকে টাল খায়। বুধনার হাত দুটোও গলাতে চেপে বসেছে। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। বুকের ভিতর স্টিম ইঞ্জিন চলছে। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল।

ডাকাডাকি শুরু করল– কুন মাঝি আছিস ? আমার রা পেলেই ছুটে আয়। কে আছিস রে --

রাম মাঝি ও ভঁদড় মাঝি গুলির মুখ থেকে ছুটে পালাচ্ছিল। রাসমণির সাড়া পেয়ে ফিরে এল। বুধনা রাসমণিকে দেখে চমকে উঠল। বিস্মিত কণ্ঠে বলল—ঈ বাবা ! বুধনা গুলি খেঞে গেইছে। বাবারে—কত লহু বিরাছে। রাসমণি-বুধনার ঈ কি হল ?

রাসমণি বলল—যা হবার ছিল হঞেছে। ঈবারে ঘরকে নিঞে চল। আর মাঝিগুলান কুথায় গেল ? সবাই পালাল নাকি ?

রাম বলল—সবাই পালাবেক ক্যেনে? মাহা মাঝি মস্ত বেইমানি করলেক। জগু হাড়াম যখন উলটে গেল মাহা তখন পালা পালা করে সবাইকে ডর খাওয়াঞে দিলেক। বুধনা যে এগুতে চলে গেইছে আমরা বুঝতেই লেরেছি। না হলে উয়ার সঁথে যদি যেতম তবে চাপরাশী গুলানের বন্দুক কেড়ে লিতম। শ্যালা জমিদারের বাপের নাম ভুলাঞে দিতম।

হাতে হাত ভাঁজ দিয়ে তার ওপর বুধনাকে বসিয়ে ওরা সিদাবাড়ির রাস্তা ধরল। একটি দুটি করে আরো জনকয়েক মাঝি সঙ্গী হল। তারা একটা খাটিয়া জোগাড় করল। তার ওপর বুধনাকে চড়িয়ে নিয়ে সিদা-বাড়ির মহুল তলায় এসে পোঁছাল।

তখন তারা সব পরাজিত, রণক্লান্ত। তাদের বুকজোড়া হাহাকার। সঘন দীর্ঘ শ্বাস। সক্রোধ আক্ষেপ। নেশা ছুটে গেছে। অনেকেই চোট ঘাট খেয়ে এখানে সেখানে পড়ে আছে। তাদের সবাইকে ঘরে পোঁছে দেওয়া, চিকিৎসার ব্যবস্থা করা এক মহা সমস্যা।

জান গুরু চামরু দিয়াশী একের পর এক চিকিৎসা করছে। একা বুধনার গায়ে আট দশটি ক্ষত। ছররার গুলি সারা দেহে ঝাঁঝরা বিঁধা হয়ে ফুটেছে কোনটার রক্ত ঝরছে, কোনটার মুখে রক্ত জমাট হয়ে গেছে। চামরু এক গামলা গরম জল নিয়ে সে সব ধোয়া-মোছার কাজ করছে। সজারুর পাখা দিয়ে ক্ষতস্থান থেকে বারুদের ছিটেফোঁটা বহু যত্নে বের করছে। বুধনা। যন্ত্রণায় ঝটপট কবছে।

চামরু ওকে বহু যত্নে শিকড়-বাকড় বেটে ওষুধ খাইয়ে শুইয়ে দিল। রাসমণি মাথার কাছে বসে আকাশ-পাতাল ভাবছে। তার চোখে অশ্রুও নেই, বুকে ভরসাও নেই।

সুমি একদিকে ঘুমে ন্যাতা হয়ে পড়ে আছে গাযে গামছা ঢাকা দিয়ে। ছোট দুটি জাগলেই কাঁদছে, ঘুমোলেই গলা ঘড়ঘড় কবছে।

সিদাবাড়ি ছাতাবড়ায় কি যে দুর্যোগ নেমে এসেছে একটির পর একটি অঘটনই ঘটে যাচ্ছে। ব্যাচারী রাসমণির সাধ্য কি এত চাপ সহ্য করে? বড় মাপের সরদারী তকমা আঁটা থাকলেই কি আর রক্ষে আছে?

লড়াই ফতে হয়ে যাওয়ার দরুন চাপরাশীরা জগু হাড়ামের মৃতদেহ ঘিরে প্রেত উল্লাস শুরু করে দিয়েছে। আহত চাপরাশীকে তুলে এনে

ভেরায় পাঠিয়ে দিয়েছে চিকিৎসার জন্যে। ওদেরও বড় অক্ষেপ বুধনাকে জ্যান্ত ধরতে পারল না। তাহলে কুপিয়ে কুপিয়ে কাটত। ঐ শ্যালাই তো রাসমণির মরদ। আসল মাল ধরা পড়ে যেত।

চম্পককুমার হুকুম দিলেন—জগু হাড়ামের লাশ বয়লার ফার্নেসে ঢুকিয়ে দাও। শ্যালা পুড়ে শেষ হয়ে যাক।

পিয়ারীলাল তৎক্ষণাৎ হুকুম তালিম করতে দুজন চাপরাশীকে পাঠিয়ে দিল। বিগলিত বিনয়ে মালিকের তারিফ করল—হুজুরকা ক্যা হিম্মৎ বাটে! শেরকা এ্যয়সা! সাঁওতাল বুড়হা এক গোলিমে খতম।

চম্পককুমার খুশি হয়ে বললেন—আরে মারব বললে আরো কত লাশ ফেলে দিতে পারতাম। আমার বন্দুকে এক নম্বর বিলাতী টোটা। হুজুর হাম লোগকা কো ভি বিলাইতী টোটা দিজিয়ে।

—তবে তো তোমারা লাশের পাহাড় বানিয়ে দেবে। তখন খাদে খাটবার মালকাটা পাবো কোথায়? যাও হুইস্কি নিয়ে এস। বিলাইতী মাল।

বাকি রাতটা সকলে মিলে বিজয় উৎসব করল। ভোররাত্রে পূব আকাশটা যখন ফরসা হয়ে এল তখন চম্পককুমার পিয়ারীলালকে নিয়ে নাচমহলে গিয়ে হাজির।

লড়াইয়ের ধকল, জয়ের আনন্দ; রাত্রি জাগরণের ক্লান্তি ও খোয়ারীর খোয়াব নিয়ে উনি তখন টপ ভূজঙ্গ। নাচমহলের নটী ছাড়া কে আর দিতে পারে বুক তোলপাড় করা সুখ।

কিন্তু ভগ্নদূত খবর দিল—হুজুর! কাবেরী ওস্তাদজীর সঙ্গে পালিয়ে গেছে।

—কি? চীৎকার করে উঠলেন।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। কাল তো নাচমহলে পাহারা ছিল না সেই সুযোগটা নিয়ে দেশ ছেড়ে চলে গেছে।

—বাঃ। মাগীর তো আচ্ছা রীত। এই সেদিন ছোকরা চাকরের সঙ্গে পীরিত করছিল আজকেই বৃদ্ধ ওস্তাদে মন মজে গেল। আর আমি ডাকলেই মাতৃভাব জেগে ওঠে। পিয়ারীলাল খবর নাও—যেখানে পার ধরে নিয়ে আসবে। ওর ঘাড় গর্দান আলাদা না করে দিলে পীরিতের নেশা ছুটবে না।

॥ ত্রিশ ॥

বন্দুকের নলে শান্তির প্রস্রবণ। হলেই বা শ্মশানের শান্তি। তাতে কার কি বয়ে যায়? আব কোন শ্যালার ট্যাঁ ফোঁ করার জো নেই। কেমন চারিদিক নিস্তব্ধ। বিদ্রোহী সাঁওতালরা বনে জঙ্গলে লুকিয়ে আছে। অধিকাংশ পালিয়ে গেছে।

সিদাবাড়ি, ছাতাবড়া. মৌল পাহাড়ীর সাঁওতাল পাড়ায অনেক ঘব খালি হয়ে গেছে। পুরুষরা পালিয়ে বেড়াচ্ছে। মেয়েরা কেঁদে-কেটে কান্নার হাট বসিয়েছে। বাচ্চা-কাচ্চাগুলো ক্ষিদের জ্বালায় ধুঁকছে। কেঁদে কেঁদে নেতিয়ে পড়েছে।

অহো! কি শান্তি!

সকাল বেলায় রুটি, মাখন, ফল, ডিম সেদ্ধ ও এক বোতল রাম দিয়ে মিঃ ব্যারাকলাউ যখন প্রাতঃরাশ করছেন তখন মিছির গোমস্তা গতরাত্রে দাঙ্গা ফৌজদারীর যাবতীয় ঘটনার বিবরণ পেশ করে যাচ্ছেন।

উনি মন্তব্য করলেন—তাহলে চম্পক কুমার এক রাত্রেই হিরো বনে গেল।

হাঁ হুজুব। বাপকা বেটা হ্যায়।

—পুলিসে খবব দেওয়া হযেছে?

-পুলিস কৌন বাস্তে হুজুর? বয়লারে ঢুকায়ে মুর্দার লাশ জ্বালায়ে দিয়েছে। সব আদমী ভাগিয়া গেছে। আর পুলিস বুলাযে কি হবে?

—দ্যাটস রাইট। লেবারদিকে মাঝে মাঝে এরকম ধোলাই না দিলে টাইট থাকবে না। ঠিক হয়েছে। কি বল?

—বহোত ঠিক হুজুব। মিছিরবাবু লম্বা সেলাম দিলেন।

উনি মনে মনে বললেন—এইরকম লড়াই ঝগড়া লাগু থাকলে ব্রিটিশ রাজার ভিত নড়ায় কার সাধ্য।

মিছিরবাবু যাবার জন্য প্রস্তুত। উনি বললেন—গোমস্তাবাবু রাসমণি এক সিমপ্‌ল ট্রাইবাল উওম্যান। বরাবর ভেরী ওবিডিয়েণ্ট। সে কি করে রিভোল্ট করল?

—হুজুর। জমিদারের ব্যাটা লেবার-লোগের উপর বহোৎ অত্যাচার করিয়েছে। বহোত হাজরী কাটিয়েছে। কোই আদমীর পসিনার কিম্মৎ দেই নাই। এতো আদমী মরিয়ে গেল লেকিন এক পয়সা দিলো না। জমিদার আদমী বহোৎ চামচোর আছে সাহাব।

উনি সেলাম দিয়ে চলে গেলেন।

মিঃ ব্যারাকলউ ভাবলেন—সব সত্যি। কিন্তু আর দিনকয়েকের মধ্যে পানমোহরায় চানক কাটাই শুরু করাতে হবে। কাজেই জমিদার চামচোর হোক বা চশমখোর হোক তা দেখলে চলবে না।

এখন তার একশ একর জমি চাই—চানক, ইঞ্জিনঘর, ডিপো, সাইডিং, অফিস, ধাওড়া, পুকুর, রাস্তা, বাংলো, কোয়ার্টার, বাগান, খেলার মাঠ, ক্লাব ইত্যাদির জন্য। চঞ্চলা জোড়ের উপর একটা ব্রিজও তৈরি করতে হবে। না হলে এতসব মালপত্র নিয়ে যাওয়া লোকজনের যাতায়াত হবে কি করে?

জমির অবশ্য অভাব নেই। পানমোহরায় যেখানে চাণক ও ইঞ্জিনঘরের স্থান নির্বাচন করেছেন তার উত্তরে বিশাল মোরাম ভাঙা গোচর ভূমি। সবই জমিদারের খাস খতিয়ানভুক্ত। রায়-বাবুর নায়েব গোমস্তারাই সব ব্যবস্থা করে দেবে। বিঘা পঞ্চাশেক রায়ত স্থিতিবান স্বত্বের জমি স্থানীয় চাষীদের কাছে কিনতে হবে।

খুব গোপনে কথাবার্তা চলছে। এসব তো পাঁচ কান করার ব্যাপার নয়। তাহলেই বাগড়া লাগবে। তাই উনি ভাবছেন জমি জায়গার ব্যবস্থাটা আগে করে নেবেন নাকি চানক কাটাই শুরু করে দেবেন।

কিন্তু গোপন কিছু থাকে না। চাষীদের পেটে কথা থাকা আরো জটিল সমস্যা। যে সুদাম মাজি একদা একটাকা বখশিষে ভাবে গদগদ হয়ে গিয়েছিল সে তার দশ বিঘা জমি ব্যারাকলউ সাহেবের কাছে কোবলা বিক্রয় বাবদ একলপ্তে দুশো পঁচিশ টাকা পেয়ে দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল। জনে জনে বলে বেড়াতে লাগল বারকুলি সাহেব মানুষরূপী দেবতা।

পানমোহরার চাষাঘরে টাকার স্রোত বয়ে গেল। তখনকার দিনে দশ টাকা পনের টাকা দরে জমি বিক্রি হত। ব্যারাকলউ

সাহেব বিঘা প্রতি পঁচিশ টাকা দর দিলেন। গ্রামের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল।

ওদিকে রেজিষ্ট্রি কোর্টে দলিল লেখক নবগোপাল দাস কদিন ধরে দিনরাত কেরোসিনের কুপি জ্বেলে দলিল লিখতে লাগলেন। ঘন ঘন লোক দৌড়াতে লাগল রেজিষ্ট্রি কোর্টে।

নায়েব গোমস্তারা খাস জমি বিলি ব্যবস্থার দরুন বিঘাপ্রতি পাঁচটাকা করে আমলা সেলামী পেলেন। তাতে তাদের বৌয়ের জন্য নতুন চন্দ্রহাব গড়াবার অর্ডার হল। নিজের জন্য এল রূপোর পানের বাটা।

ব্যারাকলউ সাহেব টাকা ছড়িয়ে দিলেন। তাই কুড়িয়ে বাড়িয়ে কত লোকের ভোল পাল্টে গেল।

আবার সেই খবর সংগ্রহ করে হাবু সাহেব তার ভাগ্য ফেরাবার রশদ তৈরি করে নিলেন।

ঘটনাচক্রে মিঃ হ্যামিলটনের সঙ্গে হাবু সাহেবের যোগাযোগ ঘটেছিল। হতেই পারে উদ্যোগী পুরুষের দ্বারা সবই সম্ভব। মারফৎ তরলা দাসী ও রাগিনী বাউরিনী মিঃ ব্যারাকলউয়ের কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর উনি রাস্তা বদল করে নিয়েছিলেন। কাজ করছিলেন মিঃ হ্যামিলটনের চর হিসেবে। সে কাজে তার সাফল্যের ওপরেই নির্ভর করছিল তিনি আবার হাবু সাহেব হয়ে হ্যাশেরগড় কোল কোম্পানিতে চাকরি পাবেন কিনা?

মিঃ হ্যামিলটন বেশ কিছুদিন যাবৎ মিঃ ব্যারাকলউকে খুব চিন্তিত দেখছিলেন। তা হতে পারে তার প্রণয় ঘটিত ব্যাপার, ব্যবসা সংক্রান্ত লোকসান, চাকরিস্থলে গণ্ডগোল অথবা কোন নতুন উদ্যোগ।

প্রথম তিনটি কারণ নাকচ করে দিতে পারেন যেহেতু মিঃ ব্যারাকলউ প্রণয়ের ক্ষেত্রে বড়ই উদার। তাঁর মনে ভাব-প্রবণতা নেই। নারীর ভূমিকা শুধু জৈব প্রয়োজন মেটানো। দ্বিতীয়ত, তাঁর কোন ব্যবসা নেই। তাঁর স্ত্রী আছে। কিন্তু তাতে ওঁর বিশেষ ভূমিকা নেই। চাকরীস্থলে তো তাঁর নাম, যশ, অর্থ সবই বর্তমান।

নতুন উদ্যোগটা ভাববার ব্যাপার। পানমোহরা নিয়ে তিনি এত ব্যস্ত কেন? ইতিমধ্যে কোম্পানির হয়ে তিনি অনেক নতুন

কোলিয়ারি খুলেছেন, নতুন যন্ত্রপাতি চালু করেছেন, বোরিং করিয়েছেন। কখনোই তাকে এত ব্যস্ত ও চিন্তিত দেখা যায় নি।

তার মনে খটকা লেগেছিল। মিঃ ও মিসেস নর্টনের সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে হাবু সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ।

হাবু সাহেব তার নানা রকম রিপোর্টের মধ্যে সাঁওতালেব সঙ্গে চম্পককুমারের খণ্ডযুদ্ধও বর্ণনা করেছিলেন নিপুণভাবে। তাতে জুড়ে দিয়েছিলেন ব্যারাকলউ সাহেব হুকুম পাঠিয়েছিলেন সাঁওতালদিকে গুলি করবার জন্য। মিঃ ট্রুম্যান ও মিঃ শেফার্ডকে জিজ্ঞাসা করে দেখতে পাবেন।

মিঃ হ্যামিলটন তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন – তাতে মিঃ ব্যারাকলউয়ের স্বার্থ কি? খাদটা তো ঠিকা দেওযা হয়েছে।

হাবু সাহেবের ব্যাখ্যা—আসল ঠিকাদাব তো ব্যারাকলউ সাহেব। জমিদার তাব বেনামদার। ভিতরে অনেক ব্যাপার। মনে করুন হাজার টন রেজিং হল। দেড় হাজার টন রিপোর্ট দেওয়া হল। পাঁচশো টনের দরুন টাকাটা ভাগ হয়ে গেল। একবার ভাগের গোলমাল হওয়াতে চম্পককুমারের সঙ্গে ঝামেলাও হয়েছিল। প্রাইভেট ইনকোয়ারী করিয়ে দেখুন।

—তাই নাকি। এটা তো বিরাট করাপশনের ব্যাপার।

—হ্যাঁ স্যার। বড় মানুষের বড় চুরি। ছোটলোকরা তার পাত্তাই পাবে না। আমি অনেকদিন ওর কাছে কাজ করেছিলাম। সব হাল হকিকত জানি।

মিঃ হ্যামিলটন উক্ত দুটি ব্যাপার খোঁজ খবর নিয়ে যদিও নিশ্চিত-ভাবে তার সত্যতা যাচাই করতে পারেন নি কিন্তু তাঁর মনে সন্দেহ ঘনীভূত হয়েছিল।

হাবুসাহেব পুনরায় রিপোর্ট নিয়ে এলেন পানমোহরায় ব্যারাকলউ সাহেব তাঁর স্ত্রীর নামে জমিজমা খরিদ ও জমিদারী পাট্টা নিচ্ছেন। যদি পানমোহরা ভ্যা শেরগড় কোল কোম্পানির নতুন কোলিয়ারি হবার পরিকল্পনা থাকে তবে উনি নিজের নামে জমি কিনছেন কেন?

এটা এক দারুণ জিজ্ঞাসা।

চম্পককুমারকে একদিন সন্ধ্যায় স্বাস্থ্য পান করতে নিমন্ত্রণ করলেন

মিসেস নর্টন। উনি আসার পর কথায় কথায় পানমোহরা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা। মিঃ হ্যামিলটন প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন—সত্যিকরে বলুন প্রিন্স পানমোহরা কি আপনারা মিঃ ব্যারাকলউকে বন্দোবস্ত দিয়েছেন ?

—না-না। তা দেবো কেন ? ওটাতো হ্যা শেরগড় কোল কোম্প্যানিকে লীজ দেওয়া হবে বলেই কথাবার্তা হয়েছে।

—তাহলে মিঃ ব্যারাকলউ নিজের নামে জমি কিনছেন কেন ?

—তা তো জানি না।

মিসেস নর্টন বললেন—আপনার নাচমহল থেকে একটা মেয়ে পালিয়ে গেছে একথা সত্যি ?

—হ্যাঁ।

—সে কোথায় আছে তা জানেন ?

—না।

—তাহলে আপনি কি জানেন ? আপনার নাচমহলের মেয়েকে যে ভোগদখল করছে, আপনার প্রোপার্টি ভোগদখল করতে এগিয়ে যাচ্ছে তা কে আপনি চিনতে পারছেন না ?

মিসেস নর্টনের প্রশ্ন বুলেটের মত ওর বুকে বাজল। মিঃ হ্যামিলটন ক্রুর হাসি হেসে বললেন—প্রিন্স! মিঃ ব্যারাকলউকে যতটা বিশ্বাস করেছেন অতটা বিশ্বাসযোগ্য উনি নন। আপনি আরো ভালোভাবে খোঁজ খবর নিয়ে যা করবাব করুন। কিন্তু মনে রাখবেন পানমোহরা, সাতঘরিয়ায় আমরা জয়েণ্ট কোম্পানি খুলবো বলে একটা প্রস্তাব ছিল।

একে তো লিকারের প্রতিক্রিয়া তারপর এইসব স্বার্থসংঘাত ও নাচ-মহলের নাচুনী বে-দখল হবার সংবাদে উনি প্রায় ক্ষিপ্ত। টেবিল ঠুকে বললেন—নিশ্চয়। আমি আপনাদিকে গ্যারাণ্টি দিচ্ছি পানমোহবা চলবে আমাদের তিনজনের মালিকানায়। মিঃ ব্যারাকলউকে আমি যে কোন উপায়ে হটিয়ে দেব। আমবা জমিদার। কি করতে হয জানি।

মিসেস নর্টন মদালসা ভঙ্গিতে ওর দিকে হুইস্কির গ্লাস এগিযে দিলেন।

॥ একত্রিশ ॥

মদে নেশা নেই। নারীদেহে মাদকতা নেই। মানুষের শরীরে রসকষ নেই। যত রস কালো কয়লায়।

অথচ সেই কয়লা রেজিংয়ে ভাটার টান। বন্দুকের নলে যে প্রাণঘাতী শাস্তির প্রস্রবণ ঝরে পড়েছিল তার ঠ্যালায় বেবাক ধাওড়া খালি। একবার মায়ের খেলায় লেবার পালাবার হিড়িক পড়েছিল। এবার অ্যাক্সিডেণ্ট ও গুলিবারুদের ভয়ে কে যে কখন পালাল তার হদিশ পাওয়া দায়।

যারা পেটের দায়ে কাজ করতে এসেছিল তারা সপ্তাহ শেষের পাওনা টাকাটাও নিতে আসেনি। এমনিতে প্রতি শনিবার হাজরি দেওয়া হয়। রবিবার হাট। যারা পালাবার তারা শনিবারের অপেক্ষা করে থাকে। সেদিন কোনরকমে হাজরিটা তুলে পাওনাওলা সুদখোর, দোকানদার, সরদারদের লুকোচুরি খেলতে থাকে। অবশ্য ধরা পড়ে যায় প্রায় সবাই। আপন আপন পাওনাগণ্ডা সুদে মূলে উশুল করে নেয়। তারপর আবার ধার দেয়। তবুও যদি কেউ পালাতে চায় তবে ঐ শনিবার, রবিবার রাতটাকেই বেছে নেয়। কেউ বা হাটের পথে পাড়ি জমায়। সেজন্য সেই দুটো দিন বাবু, চাপরাশী, সরদার সবাই তক্কে তক্কে থাকে।

কিন্তু এবার এমন হলো যে শনি রবিবারের বাছবিচার রইল না। পাওনা টাকা আদায় করতে কেউ এল না সুদওলা, দোকানদাবদের কিছু জানাল না। স্রেফ প্রাণের ভয়ে পালিয়ে গেল।

লোকই নেই তো রেজিং করবে কে ? চৈতু মুণ্ডার কিছু কুলিকামিন ছিল। পিয়ারীলাল তাদেরকে ভুলিয়ে ফুস্‌লিয়ে খাদে নামিয়েছে। সাঁওতাল একটিও নেই।

রেজিং নেই বলে বাবুরও মনে সুখ নেই। চাপরাশীদের ধমক টমক দিচ্ছেন আর মদ গিলছেন। তারপর নর্টন সাহেবের বাংলো থেকে ফিরে এসেছেন গুলি খাওয়া বাঘের মত।

সেই রাত্রেই নায়েব, গোমস্তাদিকে নাচমহলে ডেকে পাঠিয়ে যা-তা অপমান করেছেন।

—শ্যালারা কার বাপের জমি বন্দোবস্ত দিয়েছিস? ব্যারাকলউ সাহেব তোদের বাপ হয়? আমার হুকুম না নিয়ে আমার জমি অন্যকে বন্দোবস্ত দিয়েছিস কেন?

নায়েব, গোমস্তা তো তটস্থ। যতই হোক তারা ভদ্রলোকের ছেলে। লেখাপড়া জানে। আইন আদালত বোঝে। যা করেছে তাতে খোদ জমিদারের সম্মতি আছে। যদিও পুরো ব্যাপারটা তাঁকে জানান হয়নি!

তারা চম্পককুমারের মুখ থেকে চোয়াড়ী গালি শুনতে অভ্যস্ত নয়। জমিদারবাবু বকাঝকা করেন তা সহ্য হয়। কিন্তু একি? কালকের ছেলে বাপের যুগ্যি মানুষদের তুই তোকারি করে বাপ তুলে কথা বলছে!

তাঁরা ক্ষুব্ধ মনে চলে গেলেন জমিদারবাবুর কাছে অভিযোগ জানাতে। তিনি না শুনলে অন্য ব্যবস্থা নেবার কথাও ভাবলেন। কারণ জমিদারের নামে তাঁরা শুধু পয়সাই কামান না অনেক পাপও তাঁর জন্য করেন।

সেদিনটা ছিল পানমোহরায় নতুন চানক কাটাই শুরু করার দিন। মিঃ ব্যারাকলউ ও মিঃ ট্রুম্যান সকালেই হাজির হয়েছেন। দুটো চানক একসঙ্গে কাটাই হবে। তার দাগ দিতে সার্ভেয়ারবাবু কাজ করেছেন। চুণ দিয়ে দুটি বড় বড় বৃত্ত এঁকেছেন মাটির উপর।

প্রায় চল্লিশজন কুলিকামিন গাঁইতি, শাবল, টাম্না, ঝোড়া নিয়ে সাহেবের হুকুমের অপেক্ষায় আছে।

মিঃ ব্যারাকলউ শেষবারের মত মাপজোক দেখে নিয়ে হুকুম দিলেন —শুরু কর।

কুলিকামিনরা নিজের মত করে মাটিতে সিঁদুর দিয়ে দুর্বাঘাস দিয়ে পুজো করে গাঁইতির চোট দিল।

আস্তে আস্তে বেলা বাড়ছে। মিঃ ব্যারাকলউ খুব খুশি।

হঠাৎ ঘোড়া ছুটিয়ে হাজির হলেন চম্পক কুমার ও পিয়ারীলাল। কোনরকম সম্ভাষণ না করেই কুলিকামিনদের বললেন—এই শ্যালারা কার বাপের জায়গায় মাটি কাটছিস। কাজ বন্ধ কর।

ও ব্যাচারীরা ভয়ে তটস্থ। এ আবার কি বিনামেঘে বজ্রাঘাত?

মিঃ ব্যারাকলউ বললেন - হোয়াটস দ্যাট প্রিন্স? তুমি এতো রেগেই বা আছো কেন? কাজই বা বন্ধ করছো কেন?

—না। আমি আপনাকে এখানে কোলিয়ারি করতে দেব না।

—কিন্তু তোমার ফাদার আমার সঙ্গে এগ্রিমেণ্ট করেছেন!

—সে এগ্রিমেণ্ট মানি না। আমার বাবাকে মদ খাইয়ে কোন কাগজে সই করিয়ে নিয়েছিলেন। ওটা এগ্রিমেণ্ট নয়। আপনি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। শেরগড় কোল কোম্পানির নামে যে প্রোপার্টি লীজ বন্দোবস্ত হবার কথা তা নিজের নামে করিয়েছেন। দিস ইজ ব্রিচ অফ ট্রাষ্ট। মিঃ হ্যামিলটন আসছেন: তিনিই আপনাকে সব বলবেন। এখন কাজ বন্ধ রাখুন।

মিঃ ব্যারাকলউ গুম হয়ে গেলেন। একটু ভেবে বললেন—প্রিন্স আমার হাতে যা কাগজপত্র আছে তাতে তোমার বাধা দেবার কোন রাইট নেই। তবু তোমার বক্তব্য আমি শুনবো। বল কেন তুমি উত্তেজিত?

—আমার বিষয় সম্পত্তি বে-দখল হয়ে যাবে আর আমি উত্তেজিত হুবনা!

—সত্যিই যদি বে-দখল হত তবে নিশ্চয় উত্তেজিত হতে। কিন্তু তোমার ফাদারকে জিজ্ঞাসা করে ছাখো গিয়ে এটা বে-দখল নয়। তার ষোল আনা সম্মতি নিয়েই এখানে নতুন কোলিয়ারি হচ্ছে।

—তার মানে?

—তোমার বাবাকে জিজ্ঞাসা কর গে। আমি এটাকে টপ্ সিক্রেট রেখেছিলাম কিন্তু তুমি ব্যাপারটাকে পাবলিকলি এমন ভাবে প্রচার করে আমার কিছু ক্ষতি করলে, এর বেশি নয়।

—আপনি কাজ বন্ধ রাখুন।

—কাজের শুরুতেই যদি মালিকের ছেলের সঙ্গে এমন মনোমালিন্য হয় তবে কাজ চালিয়ে আরও বেশি ক্ষতি স্বীকার করতে আমি চাই না। কিন্তু তোমাকে অনুরোধ করছি তোমার বাবার সঙ্গে পরামর্শ করে কথা বল।

—আচ্ছা। আমি বাবাকে নিয়ে আসছি। আপনি অপেক্ষা করুন। চম্পককুমার ঝড়ের গতিতে চলে গেলেন।

মিঃ ব্যারাকলউ কুলিকামিনদের বললেন—তোমরা কাজ কর।

একটা উঁচু আলের উপর বসে মিঃ ব্যারাকলউ বললেন—এসো মিঃ ট্রুম্যান। মনে হচ্ছে একটা বড় রকমের ভুল বোঝাবুঝি হয়ে গেছে। আমি এই ছেলেটিকে কিছুতেই পছন্দ করতে পারছি না।

মিঃ ট্রুম্যান বললেন—ওর বাবাকে আসতে দিন স্যার।

— আচ্ছা!

ঘণ্টাখানেক পর মিঃ রায় এলেন তাঁর ছেলের সঙ্গে। তাঁরও মুখ থম থম করছে। প্রীতি সম্ভাষণের পর বললেন- মিঃ ব্যারাকলউ আমার ছেলে উত্তেজনার বশে কিছু কথা বলেছে কিন্তু আপনিও তো বিশ্বাস ভঙ্গ করেছেন? বলুন জমিগুলো কেন নিজের নামেই খরিদ করলেন? কেন এটা পানমোহরা কোল কোম্পানির নামে খরিদ করা হল না? কেন আমার অনুমতি না নিয়েই নায়েব গোমস্তাদিকে টাকা দিয়ে খাস খতিয়ানের জমি, ডাঙা নিজের এবং নিজের স্ত্রীর নামে বন্দোবস্ত নিলেন?

মিঃ ব্যারাকলউ একটু সময় নিয়ে ভেবেচিন্তে বললেন—মিঃ রায় আমি আপনাকে বিশ হাজার টাকা আগাম দিয়ে পানমোহরা সাত-ঘরিয়ার তলস্বত্ব লীজ বন্দোবস্ত নিয়েছি। জমি কিনেছি নিজের টাকায়। আপনার ছেলেকে অংশীদার হিসেবে নেবো এটা ছিল ভদ্র-লোকের চুক্তি। কিন্তু শুরুতেই যদি উনি কাজে বাধা দিতে আসেন তবে সে চুক্তি রাখতে আমি বাধ্য নই। ভদ্রলোকের চুক্তির শর্ত ভদ্র-লোকের মত করেই পালন করতে হবে।

—আপনি কি ভদ্রলোকের কাজ করেছেন সাহেব? আমার নাচমহল থেকে মেয়ে চুরি করে নিজের বাঙলোতে রক্ষিতা রেখেছেন।

—মাইগড! ব্যাপারটা এই ভাবে আপনার কাছে রিপোর্ট হয়েছে?

—আমরা সব খবর পেয়েছি। কাবেরী আপনার বাঙলোয় আছে কি না?

—নিশ্চয় আছে। তবে তাকে আমি চুরি করিনি। সে সালুঞ্চীতে দাঙ্গার রাত্রে পালিয়ে যাচ্ছিল। ঐ চঞ্চলা জোড়ে আমার হাতে ধরা পড়ে যায়। আমি তার রূপে মুগ্ধ হয়ে আমার বাঙলোতে আমন্ত্রণ করি। সে তা গ্রহণ করে।

—বেশ। তাহলে ওকে ফেরৎ দিন।

—আমি খুব দুঃখিত মিঃ রায়।

—ওকে ফেরৎ দেবেন না ?

—আপনি অন্য কোন অনুরোধ করুন।

মিঃ রায় বুঝলেন আর ওর মত বদল করা যাবে না। তাই প্রস্তাবটা সংশোধিত করে পেশ করলেন—আপনি তো তার রূপের ফাঁদে পড়েছেন। তা যতদিন খুশি এনজয় করুন। আমার নাচ-মহলে থাকলে তার ব্যাঘাত হবে না নিশ্চয়। সে আপনার জন্যই রিজার্ভ থাকবে। কিন্তু ফিরিয়ে দিন।

—কেন আপনি একটা মেয়ের জন্য এত জিদ করছেন ?

—কারণ এটা আমাদের প্রেস্টিজ ম্যাটার। কাবেরী আমার সম্পত্তি তা আপনি বে-দখল করে নেবেন এটা আমার সম্মানে লাগছে।

—আপনি তারজন্য ক্ষতিপূরণ নিয়ে নিন।

—না সাহেব। তা হয় না।

—আমি ওকে জিজ্ঞাসা করে দেখবো।

—আপনি একটা বারবণিতার কথায় চলবেন ?

—ব্যাপারটা ওভাবে না দেখে মানবিকতার দিক দিয়ে ভেবে দেখার জন্য অনুরোধ করছি মিঃ রায়।

হঠাৎ চম্পককুমার বলে উঠলেন—আপনি যদি আমাদের কোন প্রস্তাবে রাজী না হন সাহেব তবে আপনারও পানমোহরায় কোলিয়ারি করার সাধ ফুরিয়ে যাবে। আমরা জমিদার কি করে সম্পত্তি রাখতে হয় জানি।

মিঃ ব্যারাকলউ দপ্ করে জ্বলে উঠলেন। বললেন—আমাকে বারবার চোখ রাঙাবেন না প্রিন্স। আমি মিঃ ব্যারাকলউ ইণ্ডিয়াতে কোল ইণ্ডাস্ট্রি করার বহু অবদান রেখেছি। আর তোমার মত পেটী জমিনদার বাচ্চাকে কি করে ট্যাক্‌ল করতে হয় জানি।

আর কথা চলে না। উভয় পক্ষই কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইলেন। তারপর মিঃ রায় চলে গেলেন।

॥ বত্রিশ ॥

পিয়ারীলাল খুঁজে পেতে কুলিকামিন যোগাড় করে আনছে। একটি দুটি করে বাড়তে বাড়তে মাসখানেকের মধ্যে টালোয়ান, মালকাটা, হাজরীবালা, লোডিং মিলিয়ে শ'দুই জুটেছে। দিনে একশো গাড়ি করে রেজিং হচ্ছে। তাতে বাবুর মন একটু ফুরফুরে হয়েছে। পিয়ারীলালের ওতেই আনন্দ।

সেদিন সন্ধ্যায় নাগরা জুতো পরে আংরাখার উপর গামছা চড়িয়ে বিবিবাথানের দিকে যাচ্ছিল। ওখানে সে এক কবুতরী পুষেছে। তার ডানা পালকের উষ্ণ সোহাগ ছাড়া রাতটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। সেই আমেজেই পথ হাঁটছিল।

দুজন মাঝি হুস্ করে সামনে উদয় হল। পিয়ারীলাল চমকে গেল। এই রে! এই মাঝিদের আবার কি মতলব?

না। ভয়ের কিছু নেই। ও হচ্ছে মাহা মাঝি। রাসমণির ডিভোর্সড হ্যাজব্যাণ্ড। বলল—কি রে মাহা? তোরা যে হাবিস হোয়ে গেলি বাপ।

মাহা উত্তর দিল - কি করব চাপরাশীবাবু? আমাদের লোবগুলিন খাদে মরে গেল। তুরা কেউ একটি পয়সাও দিলি নাই। আবার গুলি মেরে তেড়ে দিলি। আমরা ঈ-বারে কুথাকে যাই?

—আমার কাছে আসবি। আমি তোদের জিম্মা লিবো। আমি তোদের খোরাকি দিবো। তোকে আমি সরদার বানায়ে দিবো।

—সত্যি বলছিস বাবু? আমাকে সরদার করবি ত?

—জরুর।

—সরদারী কমিশন দিবি ত?

—জরুর। মরদকা বাৎ হাতীকা দাঁত। তুর কতগুলিন কুলিকামিন আছে?

—বিশ পঁচিশ জন হবেক। তবে দুমকা থেকে আরো লিঞে আসব।

—ঠিক আছে। উয়াদিকে লিয়ে কাল বিহানে আসবি। ঠিকাদারবাবু বড়া জমিন্দার। হামি পাকা বাৎ করিয়ে দিবো। ইয়ে লে চার আনা পয়সা। দারু দাওয়াই পিলায়ে আদমী লোগকো ঠিক করিয়ে লিয়ে আয়।

মচ্ মচ্ শব্দে নাগরা জুতো পায়ে চলে গেল জমিদারের জেনারেল।

মাহার সঙ্গী সুখা মাঝি বলল—এঃ মার তুঁই ত সরদার হঞে গেলি রে। ঈ-বারে রাসমণির দিমাক ভাঙবেক।

মাহা বলল—ঐটি সাঙীন মেয়্যা। উয়ার খাপরে কখন পড়িস না। শ্যালী আমাকে ভেড়ুয়া বেনাঞে বারকুলি সাহেবের সঁথে লটর-পটর করত। এইত বাবা! জুয়ানীটিও গেল—সায়েবও তুর মুখে মুতে দিলেক। কোলের ছ্যেলার মতন যে বুধনাকে ডাগর করে পীরিত শিখালি সে ত গুলি খেঞে উল্টে গেল। কই নাগর ত এল নাই তুর সাধের ভাতারকে ভাত দিতে। আর ঐ বুধনা চরে খেতে পারবেক?

দুজনে খিক্ খিক্ করে হাসল।

উচ্চাকাঙ্ক্ষার কঠিন মোহ। তার তাড়নায় বিবিবাথানের রাগিনী দাসীও ব্যাকুল। যে গরুতে গু খায় সে কি তা ছাড়তে পারে? বড় লোকের পীরিতের সুখ ওর দেহে চারিয়ে গেছে। ঢালু দাসকে স্বামী মনে করতে পরাণে বাধে। কিন্তু কি করবে? বারকুলি সাহেব তো ফুল বাসি হলেই সরিয়ে দেয়। তাহলে ধরে কাকে?

ছলনার ঝগড়া ঝাঁটিতে মন খিঁচড়ে গেছে। খাদের কাজে বড় কষ্ট। সেই কাক ডাকা ভোরে ভিজে ভাত নুন লঙ্কা দিয়ে খেয়ে এক জামবাটি বেঁধে নিয়ে দল বেঁধে যাও। বাতি বাবু মুরলী দাসের কাছে দু'দসান কেরোসিন তেল নাও। হাজরিবাবুর কাছে হাজরি লেখাও। খাদের আঁধারে হুটর পটর করে চল। খাপ ছুরি দিয়ে খুঁটে খুঁটে কয়লা ভর। টব লাইনের ধারে জমা কর। গোলাই থেকে খালি টব গাড়ি ঠেলে আনো। কয়লা বোঝাই কর। মুনশীবাবুর কাছে জোড়-হাত করে দাঁড়াও। মাইনিংবাবুর পা টিপে দাও। ইনচারজবাবুর গা মালিশ করে দাও। তবে ছ'আনা হাজরী।

উঃ বাবা! রোজ খাটতে খাটতে গতর কালি হয়ে গেল। সেই ভোরে খাদে নেমে সাঁঝ বেলাতে ঘরে ঢুকো। পেটের ছেলে হাহুসে মরুক।

কিন্তু মরুভূমিতেও মরুদ্যান থাকে। সমুদ্রের মাঝে দ্বীপ। এতো খাদ!

কত জাহান্নামের মুসাফির পাতালপুরির কালো আঁধারে গা ডুবিয়ে বসে আছে। সেখানে কি বিশাল নিতম্বিনী, ঘটস্তনী রাগিনীর দুঃখ

ঘোচাবার কেউ থাকবে না? পথে বেরুলে সহযাত্রীদের সহযোগিতাতেই পথের ক্লান্তি দূর হয়ে যায়। ওরা তো সহকর্মী।

জাপান বাউরী, বারিক ডোম, জামির মিঞা, রসময় মুচি, খামু বাগদী ওর হয়ে ডবল কাজ করে। রাগিনীর রাগ সঙ্গীতে বিভোর। একবার খাদে গিয়ে পৌঁছতে পারলে হয়। ওর টব গাড়ি ওরাই ভরে দেয়। ও শুধু পান খায়, বিড়ি ফোঁকে আর ফক্কড়ি করে।

তার মনে সাধ জেগেছে—সরদারনী হবে। যারা তার টবগাড়ি ভরে দেয় তারাও সানন্দে রাজী। ভরসা জোগায় তুই সরদারনী হলে আমরা তুর কুলিকামিন যোগাড় করে দিব।

কিন্তু ওকে সরদারনী বানাবে কে?

ধনদৌলত থাকলেই রাজা হয় না। রাজাগিরি করতে গেলেও বাদশার সনদ চাই। প্রচুর উপঢৌকন সহ কর দিতে হয়। তেমনি কিছু পেতে হলেই কিছু দিতে হবে এটাই দেশ রেওয়াজ। না হলে পাওয়ার ঘরে ফাঁকি থেকে যায়।

রাগিনী তা বোঝে। দিতেও রাজী। তবে ঠিক মানুষটি খুঁজে পাচ্ছে না।

তারপর শুনল মাহামাঝির ঘটনা। মাত্র বিশ পঁচিশটি মালকাটা নিয়েই সে সরদার বনে গেছে স্রেফ পিয়ারীলালের সুপারিশে। তাকেই একটা টোপ দিতে দোষ কি?

রাগিনী সেদিন বাতির তেল নিল, হাজরি লেখাল কিন্তু খাদে গেল না। সিঁড়ি মুখে গুমটি ঘরের কাছে বসে রইল। পিয়ারীলাল এল খবরদারী করতে। তখন ওর কাছে এসে মুচকি হেসে বলল—বাবু!

দাঁত দিয়ে আঁচল কাটতে কাটতে বাঁকা হয়ে দাঁড়াল।

পিয়ারীলাল খুব খুশি। এমন একটি খুব সুরৎ আওরৎ তাকে বাবু বলে তোয়াজ করছে আর তার দিলকি ধড়কন্ সবুর মানে?

নরম সুরে বলল—ক্যা রে? তোরা ক্যা বাটে?

রাগিনী তখন আরো মনমোহিনী ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে বলল—বাবু।

—বোল—বোল—হিয়া খোলসা করে বোল।

বলছিলাম কি—খাদে ত এখন মাল কাটার টানাটানি—

—হাঁ—হাঁ—শালা মাঝিলোগ ভাগিয়ে গেছে।

—ত আমি লোক আনা করাব বাবু ?

—তু ? তু কাঁহা আদমী পাবি রে রাগিনী ?

—পাবো বাবু। একটি হুকুম কর ক্যেনে ?

—হাঁ—হাঁ। জরুর।

—তাহলে সরদারীটি দিবে ত ?

—সরদারী ? তব তো মালিকের হুকুম লিতে হোবে।

—তুমার হুকুমেই সব হবেক বাবু। মাহা মাঝিকে তুমিই সরদার বেনাঞে দিলে। আমি তুমার পাওনা দিব।

এমন ভঙ্গিতে বলল যে পিয়ারীলালের রক্ত ছলকে উঠল। পারলে এখুনি গালে টুসকি দিত। গোঁফের ফাঁকে আহ্লাদের হাসি হেসে বলল—ঠিক বা। তোকে হামি সরদারনী বানায়ে দিবো। থোড়া সবুর কর। মালিকবাবুকে আসতে দে।

ওর মালিক চম্পককুমার। একটু দেরি করে আসেন। ততক্ষণ পিয়ারীর সঙ্গে আগড়ুম বাগড়ুম কথাবার্তা। দেনা পাওনার দর ভাউ মোলাই।

তারপর তেজী ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে এলেন চম্পককুমার। রাগিনী যেন কত লজ্জাবতী। আধহাত ঘোমটা টেনে গলায় আঁচল দিয়ে দূর থেকে গড় হয়ে প্রণাম করল।

উনি ভুরু কুঁচকে বললেন—এটা কে !

—হুজুর ! ইয়ে বহোৎ বরিয়ার হিরোইন। ঢালু দাসের দো নম্বর জানানা।

—ওঃ। উনি ব্যাপারটাকে আমল দিলেন না।

পিয়ারীলাল বলল—হুজুর। হিরোইন বহুত নিমূন বাটে। বারকুলি সাহাব কা এথি।

চম্পককুমার এতক্ষণে কৌতূহলী হলেন।

পিয়ারীলাল বলল—আরে রাগিনী এতবড় ঘুঙ্ঘট দিয়ে আপনা সুরত আগর ছিপায়ে রাখবি তো বাবুর সাথে আশনাই করবি কি করে ?

—আঃ মরণ ! ঘোমটার আড়ালে এক হাত জিভ কাটল রাগিনী।

পিয়ারীলাল বলল—হুজুর। রাগিনীর হাতে কুছু লেবার আছে। হুজুরের হুকুমে লিয়ে আসবে।

—তা বেশ তো। নিয়ে আসুক।

—ব্যাস। রাগিনী—আব তো হুজুরের হুকুম পাইয়ে গেলি। যা তোর লোক লিয়ে এসে কাম চালু করিয়ে দে।

—হুঁ বাবু। কিন্তুক—

—সরদারী কমিশন লিবি তো?

—বাবুর দয়া।

—হুজুরের কাছে গোড় পাকড়ে ভিখ মাঙিয়ে লে।

—হুঁ বাবু। রাগিনী চম্পককুমারের পা ধরে প্রণাম করতে এগিয়ে আসে। উনি বলেন—থাক, থাক। যা লেবার নিয়ে আয়। কমিশন পাবি।

ঠিকাদারের লেবার চাই রাগিনীর সরদারী গোমস্তার সেলামী চাই পরের ধনে পোদ্দারী।

এমন মণিকাঞ্চন সংযোগ আর কিসে হয়? প্রথমেই তো দলছুট লেবার আর বিবিবাথানের বিবিজানদের ওর সরদারীর এক্তিয়ারভুক্ত করে দিল পিয়ারীলাল। তারা সব তখনো জানে না যে তাদের সরকারী খাতা থেকে সরদারী খাতায় নাম উঠে গেছে।

তারপরে রাগিনীর ক্যাজুয়েল প্রেমিকরা সকলেই দু' পাঁচজন করে এনে দিল। পাঁচ ফুলে সাজি ভরল। মাসখানেকের মধ্যে রাগিনী জন পঞ্চাশেক কুলি-কামিনের সরদারনী।

॥ তেত্রিশ ॥

সালুঞ্চী কোলিয়ারি আবার কর্মচঞ্চল হয়ে উঠল। সব দিক থেকে লেবার রিক্রুট করে পিয়ারীলাল বরিয়ার গোমস্তা বনে গেল।

ব্যাচারা রাসমণি পড়ল অগাধ জলে। বুধনা শয্যা নিয়েছে। মেয়ে তিনটি কেঁদে বেড়াচ্ছে। ওর নিজের সরদারী গেছে। একটা করে যে হাজিরা পেত সেটাও বন্ধ হয়ে গেছে। কুলি-কামিনরা পালিযে গেছে। তাদের দেনা-পাওনার এক পয়সাও শোধ দেয় নি ঠিকাদার। সব তামাদি করে দিয়েছেন। এমন দুর্বিপাকে সে কখনো পড়ে নি। রাত জেগে বসে থাকে। কপাল ঠুকে হাহাকার করে।

কোলিয়ারির কাজটা সামলে নিয়েই চম্পক কুমার মন দিয়েছেন পানমোহরার দখলী স্বত্ব ফিরে পাবার আশায়। কিন্তু হাতের তীর মুখের কথা একবার ছুটে গেলে ফিরে পাওয়া বড় দায়। জমিদারের দেওয়া চুক্তিনামার বলে ব্যারাকলউ সাহেব চানক কাটাইয়ের কাজ করে যাচ্ছেন। সেদিনের অত তর্ক-বিতর্ক বিফলে গেছে।

সামনে এখন দুটি পথ। একটি আদি ও অকৃত্রিম কায়দায পাইক, সিপাই, লাঠি বল্লম, বন্দুক নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া। ফৌজদারী করে দখল নেওয়া। কুলি কামিনদের ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া।

অন্যটি আদালতের শরণাপন্ন হওয়া।

এই নিয়ে নর্টন সাহেবের বাঙলোতে মিঃ হ্যামিল্টন ও মিসেস নর্টনের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা। প্রথম পন্থায় বহু বিপদ। প্রাণহানির সম্ভাবনা। এতো রাসমণি মিঝান নয়—ব্যারাকলউ সাহেব। কাঁধে বন্দুক, পকেটে পিস্তল নিয়ে উনি ঘোড়ার পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়ান। হাতে দেদার লোকজন। বহু চোর, ডাকাত, খুনী, লাঠিয়াল তার ইশারায় কাজ করে।

চম্পককুমার বলেন—দেখুন আপনাদের সাহেবদের টুপীতে টুপীতে পাক্কা মোহাব্বৎ। বারকুলি সাহেবেরও বন্দুক আছে। আমারও বন্দুক আছে। দু' মিনিটে পানমোহরা বোমবার্ড করে দিতে পারি। জান কবুল করতে পরোয়া নেই। আমার জন্য কেউ কাঁদবে না। সংসারে আমি বাতিলের খাতায় পড়ে গেছি। কাজেই লড়তে বাধা কি? কিন্তু কথা হচ্ছে—তখন আপনারা আমাকে কতটা মদৎ দেবেন?

মিসেস নর্টন বললেন—আপনি ঠিক প্রিন্সের মতই কথা বলেছেন।

—আমি আপনাকে ঠিক বোঝাতে পারছি না মিসেস নর্টন আমার অন্তরে কি রকম আগুন জ্বলছে। বিষয় সম্পত্তি, ব্যবসা বাণিজ্য সবই স্বার্থের ব্যাপার। কিন্তু নাচমহল থেকে মেয়ে বের করে নিয়ে আসা কি অপমানজনক বলুন। সমাজে মুখ দেখানো দায় হয়ে পড়েছে। লোকে টিট্‌কিরী দিচ্ছে।

মিসেস নর্টন আবার বললেন, আমি যতদূর জানি মিঃ ব্যারাকলউ যেমন চরিত্রের মানুষ তাতে একটা মেয়েকে বেশিদিন রাখেন না। উনি সব সময়ে ফ্রেস ব্লাড চান। তাহলে এটাকে কেন রেখেছেন?

মিঃ হ্যামিলটন বললেন—উনি হয়তা এটাকেও প্রেষ্টিজ ইস্যু করে নিয়েছেন।

—আমাদের প্রেষ্টিজ কি এতো খেলো ? মিঃ হ্যামিলটন আপনারা এখনো আমার জবাব দেন নি।

—প্রিন্স। আপনি যেভাবে পারেন এগিয়ে যান। আমরা আপনার পিছনে আছি।

রাধাগোবিন্দবাবু তার চেয়েও বেশি চিন্তিত। হঠকারী পুত্র নিয়ে হঠযোগে কলহ কচলাস্তি তাকে বড় পীড়া দিয়েছে। ব্যারাকলউ সাহেবের সঙ্গে দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব। পানমোহরায় কোলিয়ারি করার পিছনে তার সম্মতি নিশ্চয় ছিল। নিজে কোনদিন চানক কাটাই করে কোলিয়ারী খুলতে পারবেন না। তাই চুক্তি করেছেন। আগাম নিয়েছেন। এখন কোন্ মুখে সে কাজ বন্ধ করতে বলবেন। তাছাড়া কোলিয়ারি চালু হলে বছরে এক লাখ টাকা রয়্যালটি পাওয়া যাবে—এটা কি কম কথা ?

কিন্তু উনি কাবেরীকে নিয়ে তার সম্মানে আঘাত দিলেন কেন ? এই ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হলে তিনি আর ঘাঁটাতেন না। কথাটা নায়েব গোমস্তার সঙ্গে পরামর্শে করে কার্তিকবাবুকেই দুত পাঠালেন।

কার্তিকবাবু জমিদারী সেরেস্তার ঝানু মাল। ব্যারাকলউ সাহেবকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে প্রায় রাজী করিয়ে পরের দিন জমিদারবাবুকে নিয়ে আসবার অভিপ্রায় জানিয়ে ফিরে এসেছেন।

কাবেরী অতকথা জানে না। অনেকদিন পর সে একটু সোয়াস্তি পেয়েছে। মনের খুশিতে বাগানে প্রজাপতি ধরে বেড়াচ্ছে। খুশিটা তার প্রায় বালিকার মত।

মিঃ ব্যারাকলউ পিছন থেকে ওর কাঁধে হাত রাখলেন। কাবেরী মুখ ফিরিয়ে ডাগর চোখে তাকিয়ে রইল ঠোঁট কাঁপিয়ে বলল—ওঃ দুষ্টু তুমি। আমি তো ভয় পেয়ে গেছলুম।

উনি বললেন—দৌড়ে বেড়াচ্ছো। বস।

মখমলের মত সবুজ ঘাসের লন। একটা পানের মত ডিজাইনে সাজানো গোছানো হেজ্। কামিনী গাছটা ফুলে ফুলে সাদা। বেলী ফুল ফটেছে অজস্র। বেলা-কামিনীর সুগন্ধে বাগানটা মাতোয়ারা হয়ে উঠেছে।

কাবেরীর কোমর বেষ্টন করে মিঃ ব্যারাকলউ ঘাসের উপর বসে পড়েছেন। কিন্তু মনে তার রোমান্টিক ফিলিংস আসছে না। নায়েব-বাবুর কথাটাই বারে বারে ঘুরে ফিরে আসছে—কেন স্যার একটা বারাঙ্গনার জন্য জমিদারবাবুর মনে এত কষ্ট দিচ্ছেন? উনি তো বলেইছেন—আপনার যতদিন খুশি ভোগ করবেন। আপনার জন্যই সে রিজার্ভড্ থাকবে। শুধু সম্মানের খাতিরে নাচমহলে ফেরৎ পাঠিয়ে দিন। আপনার অনুমতি পেলে আমি কালকেই জমিদারবাবুকে নিয়ে আসবো। কাবেরীকে পাল্কীতে চড়িয়ে খুব আদর করে নিয়ে যাব। ওর কোন ক্ষতি হতে দেব না।

সেই কথা এখন ওকে কি করে বলবেন? এতদিন যাবৎ এত মেয়েকে পথ দেখার কথা বলতে পেরেছেন কিন্তু কাবেরীর কাছে কেন যে এত দ্বিধা তা নিজেই বুঝতে পারছেন না।

ব্যবহারে ব্যবধান দেখে কাবেরীর মনে খটকা লাগল। সাহেব তো এমন নয়। কত সহজ স্বচ্ছন্দ ব্যবহার ওর। আজ এত গম্ভীর কেন?

জিজ্ঞাসা করল—কি হয়েছে সাহেব? তুমি হাসছো না কেন?

উনি যেন কথা খুঁজে পেলেন। বললেন—কি বলব ডারলিং? চারিদিকে এত চাপ যে সহ্য করতে পারছি না। এ সময় তুমি কি আমাকে সাহায্য করতে পার না?

—বল সাহেব। তোমার জন্য কি করতে হবে?

—তুমি আবার ফিরে যাবে কাবেরী নাচমহলে? ওরা তোমাদের খুব আদর করে পাল্কীতে চড়িয়ে নিয়ে যাবে।

কাবেরীর সহজ সরল চোখের দীপ্তি নিভে গেল। বুকটা কেঁপে উঠল।

তবু স্থির কণ্ঠে বলল—আমি যদি তোমার কাছে বাসি হয়ে গেছি, তবে যেমন রাত্রির অন্ধকারে পালিয়ে যাচ্ছিলাম তেমনি যেতে দাও সাহেব।

—কাবেরী।

—তুমি ভেবো না সাহেব। আমি না খেয়ে মরবো না। আমার পায়ে ঘুঙুর আছে, গলায় গান আছে, দেহে রূপ যৌবন আছে। তার বিনিময়ে অনেক কাপ্তান পাব। বারাঙ্গণার জীবনে আবার কি চাই?

—না-না। আমি সেভাবে বলছি না। তুমি আমার কাছে বাসি

হওনি। আমারই থাকবে। নাচমহলে ওরা তোমাকে আমার জন্যই রিজার্ভ করে রাখবে। তোমার কোন ক্ষতি হবে না।

—ক্ষতি বৃদ্ধির কোন প্রশ্ন নেই সাহেব। যে মেয়ের সতীত্ব হারিয়ে গেছে তার জীবনে আর কত ক্ষতি হতে পারে? তা নয়। আমার একটিই প্রার্থনা—জমিদারের আওতায় আমি যাব না। যদি জোর কর গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়ব।

—নো-নো-নো! চীৎকার করে উঠলেন মিঃ ব্যারাকলউ। তার চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল অহল্যার ঝুলন্ত মৃতদেহ। ভয়ে শিউরে উঠলেন। তারপর আস্তে আস্তে নিজেকে সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। যেতে যেতে ডাক দিলেন—ঢালু দাস ড্রিংক লে আও।

নায়েববাবুর কাছে গ্রীন সিগন্যাল পেয়ে জমিদারবাবু নিজেই পালকীতে চড়ে সাহেব কোঠীতে হাজির। তাঁর ইচ্ছা কাবেরীকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন। মানভঞ্জন করতে দু-পদ অলঙ্কারও দেবেন। এক-ছড়া হার সঙ্গে করেই এনেছেন।

মিঃ ব্যারকলউ তাঁকে অভ্যর্থনা করে ড্রয়িংরুমে নিয়ে গেলেন। ঢালু দাস পানপাত্র নিয়ে হাজির হল।

মিঃ রায় বললেন—আপনার বাংলোয় মনোরমা নাচনী থাকতে ঢালু দাসের হাতে মদ খাওয়াবেন সাহেব?

সাহেব কোন জবাব দিলেন না। দু পেগ খাওয়ার পর মিঃ রায় বললেন—আজ আর খাব না সাহেব। কাবেরীকে আমার সঙ্গে দিন। ওকেই নিতে এসেছি।

মিঃ ব্যারাকলউ আস্তে আস্তে বললেন - মিঃ রায়! কাবেরীকে কিছুতেই রাজী করানো গেল না। জোর করে পাঠালে ও গলায় দড়ি দেবে বলেছে।

মিঃ রায় গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন—ওকে একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে দেবেন মিঃ ব্যারাকলউ?

—হোয়াই নট? তরলা—কাবেরীকে নিয়ে আয়।

কাবেরী এল। দুর্বিনীত ভঙ্গিতে দাঁড়াল। জমিদারবাবু চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন—তোর যদি সাহেব নাগর ধরবারই বাসনা ছিল তবে আগেই আমাকে বলতে পারতিস। আমি সাজিয়ে গুজিয়ে সাহেবের কাছে পৌঁছে দিতাম। আমার মানসম্মান বজায় থাকত।

—যারা মেয়েমানুষের মাংস নিয়ে ব্যবসা করে তাদের আবার মান-সম্মান কি জমিদারবাবু? উত্তরের অপেক্ষা না করেই সে চলে গেল।

খানিকক্ষণ গুম হয়ে বসে থেকে উঠে দাঁড়ালেন মিঃ রায়। বললেন —আর আমাকে দোষ দেবেন না মিঃ ব্যারাকলউ। এবার আমাকে শক্ত হতে হবে।

রাত গভীর। কাবেরী একা লনের উপর এলিয়ে পড়ে আছে। বুক ভারী হয়ে গেছে। আবার সেই জমিদার। সাহেব তাকে রক্ষা করতে পারল না। নিজের দুর্ভাগ্য অপরের ঘাড়ে চড়িয়ে দিতেও মন চায় না। তার জন্য সাহেবের কত ক্ষতি হচ্ছে।

মিঃ ব্যারাকলউ তার কাছে এগিয়ে এলেন। ওর মাথায় হাত রেখে বললেন—তুমি আর ভেবো না ডারলিং। জমিদারকে বিদায় করে দিয়েছি।

—সত্যিই?

—হ্যাঁ। তোমার কি বিশ্বাস হচ্ছে না?

—হচ্ছে সাহেব। একথা বিশ্বাস করে যে বড় সুখ। সাহেব, আমাকে তুমি ভালবাসবে সাহেব? বল আমার মুখে চুমু খেয়ে দিব্যি কর।

জাফরী কাটা জোছনার ফাঁকে সোনারবরণ একটা মুখের উপর নেমে এল একজোড়া সোনালী গোঁফ। চাকর-বাকর, ঘোড়া, সহিস, গাছ-গাছালির সাক্ষি অপলকে তাকিয়ে দেখল—কালো চুলের চুড়ো খুলে সোনালী চুলে ভরা একটা মাথা এলোমেলোভাবে ঢাকা পড়ে গেল। ঝর ঝর করে ঝরে পড়ল কামিনী ফুলের পাঁপড়ি।

অনেক দূরে কেউ যেন হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানাল।

॥ চৌত্রিশ ॥

রাগিনী এখন আহ্লাদিনী। ছলনা তার পদসেবা করে। বঞ্চনা দেয় পান সেজে। ঢালুদাস ঢুলু ঢুলু চোখে খিদমত খাটে। মনসাবাম শার্ট পেন্টুল পরে মাথায় টুপি লাগায়। খেলার সাথীদের ব্লাডি, ফাকিন বলে গাল দেয়। বড়দিকে ডু ডু দেখায়। কারণ সে নাকি নির্ভেজাল সাহেব বাচ্চা।

পয়সা এবং পাওয়ার মানুষকে কেমন করে এ তারই উদাহরণ। যে রাগিনীর জীবনে পুঁজিপাটা বলতে পুরুষ প্রবৃত্তির আগুনে ঝলসানো একখানা ঢলঢলে দেহ তার রোয়াবে বিবিবাথান কম্পমান। কারণ যথাক্রমে ব্যারাকলউ সাহেব, চম্পককুমার, পিয়ারীলাল, জাপান বাউরী, জামির মিঞা প্রমুখের প্রণয় পরশে সে ধন্যা।

মায় বামনগিনা মিশির যিনি নাকি প্রবল প্রতাপশালী গোমস্তা কাম লেবার ফোর্সের ব্যাঙ্কার প্লাস কুসীদজীবী কাম মালিকের আর্মি চীফ অথচ নারীদেহে বীতস্পৃহ তিনিও তাকে রেয়াৎ করে চলেন।

সময় বড় বলবান হে। রাগিনীর এখন সময় ভাল চলছে। তার স্তাবক, প্রণয়ী, পৃষ্ঠপোষক ও অনুগ্রহভাজন ব্যক্তিদের অকৃত্রিম প্রচেষ্টায় সে সরদারনী। বিবি বাথানের অর্ধেক কুলিকামিন তার সরদারীতে খাটে। তাছাড়া আছে অন্যান্য ধাওড়ার সাঁওতাল, বাউরী। সাতান্ন-জন ছিল। আরো বাড়ছে। সপ্তাহে কমিশন পায় টব প্রতি দু'পয়সা হিসাবে প্রায় দশ বারো টাকা। লেবারদের কাছেও সপ্তাহে এক আনা করে আদায় হয়। তাছাড়া তার নিজের দৈনিক ছ'আনা হিসেবে হাজরী। প্রায় সতের আঠারো টাকা রোজগার।

সে যদি একঘণ্টা ধরে পুকুরঘাটে নগ্ন দেহের প্রদর্শনী খুলে ফুলান তেল, সাবান মাখে, পাতা কেটে খোঁপা বাঁধে, বেলকুঁড়ি গাঁথে, এক বোতল মহুয়া খায়, ছাঁচি পান খেয়ে পিচির পিচির করে পিক ফেলে, ঠোঁট উল্টে, নাক চিমড়ে কথা বলে তাহলে ছলনার কিছু বলার নেই।

সেরকম বোকাও সে নয়। তারও একগণ্ডা ছানাপোনা আছে।

সতীনের রোজগারে খেয়ে পরে যদি ডাহাল ডাকু হয়ে ওঠে সে ফয়দা ওঠাবে না কেন? জরুর ওঠাবে। রূপচাঁদের গোলাম কে নয়? রূপ এবং রুপো থাকলে সতীনও আপনও হয়। বিশেষ সে সতীন যদি স্বামীসুখের অংশ না দাবি করে।

রাগিনী যখন নিত্য কলহের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য খাদে খাটতে গিয়েছিল তখন থেকেই সে আর ঢালু দাসকে কাছে ঘেঁষতে দেয় না। এখন তো নিজের গরবেই মশগুল।

কিন্তু রাগিনীর যা গর্ব রাসমণির তা লজ্জা। লোকে যখন বলে হ্যাঁ। মনসারাম সাহেব বাচ্চা বটে। রাগিনী তখন আহ্লাদে আটখানা হয়। অথচ রাসমণি তার অনেক আগেই সাহেব বাচ্চার জননী হতে পারত। তা সে হয়নি। ওষুধ খেয়ে পেট পুড়িয়েছিল। বুধনার সঙ্গে সে সংসার পাতার পর অনেক ওষুধপত্র খেয়ে আবার মা হবার ক্ষমতা ফিরিয়ে এনেছে। অথচ তখন লাল ত্রিকোণের ঢালাও' বিজ্ঞাপন ছিল না। নিজের তাগিদেই মাতৃত্বকে আহ্বান বা বিসর্জন করার ওষুধ তারা জানত।

ওর জীবনের অনেকটা অংশ ঐভাবেই খরচ হয়ে গেছে। সে সময়ে ওর বাপ কিছু জমি জায়গা পেয়েছিল। তার চাষ আবাদ, হাল ফাল, গরু বলদ দেখাশোনা করার জন্য সতেরো আঠারো বছরের বুধনাকে ওর বাপই নিয়ে এসেছিল। সে ছিল খেতের মুনিষ। গায়ে কাড়ার মত তাগদ। তেমনি বিদঘুটে কালো। ভোররাত্রে লাঙল জুড়ে একবিঘা জমি চাষ করে মাঠ থেকে উঠত। কালো গায়ে ঘাম চিক্‌ চিক্‌ করত। সাঁঝ বিহানে আদুল গায়ে শুয়ে থাকত গোয়ালঘরের চালায়।

রাসমণির তখন লব্‌চবানির দিন। মহুয়া মাতাল মনে, টলটলে পায়ে গভীর রাতে ঘরে ফিরত গুন গুন করে গান করতে করতে। তার বাপ লুলু বড়কা তখন সরদার। রাগিনীর চেয়ে অনেক বেশি রোজগার। প্রায় দেড়শ কুলিকামিন।

সব নিমকহারাম। তোরাই বললি—আমাদের এতগুলিন লোক মরে গেল। তার দরুন ঠিকাদার কিছুই দিলেক নাই। ইয়ার বদলা লিতে হবেক। লাগাও হুল।

তাহলে লড়াই করতে গিয়ে পালালি ক্যেনে? বেইমানি করলি ক্যেনে? আজ আবার আমাকে ছেড়ে নতুন সরদার ধরলি। ঐ মাহা মাঝি তুদেদিকে ডেকে এনে কাজ দিঞেছিল?

মাঝে মাঝে ওর মাথা গরম হয়ে যায়। মনটা গুমরে ওঠে। ভিতরে জ্বালা অনুভব কবে। রাগে চোখ জ্বলে। আপন মনেই গজ গজ করে।

বুধনা শুযে থাকে খাটে। শরীরটা আধখানা হয়ে গেছে। হাড় পাঁজর বেরিয়ে গেছে। গুলির ঘাগুলো শুকিয়েও শুকোচ্ছে না। সেপটিক হয়ে গেছে। চিকিৎসা চলছে।

জান গুরু দিয়াশী চামরু বলল—বোঙা নারাজ হঞেছে। পূজা করতে হবেক। একটি ম্যারম চাই। পাঁচসের চাউল। নগদ একটি টাকা। এক থান সিঁদুর। একটি নতুন কাপড়।

রাসমণি তাই দিল। সেই নিয়ে চলল ঝাড় ফুঁক, পুজা পাঠ এবং শিকড় বাটা ওষুধ লেপন। তাতে কিছু ফল হয়েছে।

দিয়াশী বলেছে—ঘা-গুলিনের ঈ-বারে আঁকুর হঞেছে। নতুন মাংস দিঞে পূরণ হবেক। ওষুধটি ঠিকমতন লাগা। আর একটি দিছি সাঁঝ বিহান নিমপাতার সঙ্গে বেঁটে খাবি।

ঐ বিটকেল তেঁতো ওষুধটা যদি বা খাওয়া যায় কিন্তু গরম জলে ঘা ধুইয়ে ওষুধ লাগাবার সময় যন্ত্রণায় বুক ফেটে যায়। তাই সে ভয়ে জুল জুল করে তাকিয়ে থাকে রাসমণির দিকে। সে এখন শিল-নোড়ায় ওষুধ বাঁটছে।

বড় মেয়ে সুমি। জন্ম মাহার ঔরসে। বাপ বলে বুধনাকে। সে-ই এখন হাতের নড়ি। যেতে আসতে, ফাই-ফরমাশ খাটতে সদাই তৈরি। ছোট দুটিকে সে-ই আগলে রাখে। দীঘল দুটি চোখ মেলে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকায়। যেন কিছুই বোঝে না—এমনি সরল তার চাউনি।

ধোওয়া-মোছা করে ওষুধ লাগাতে আধঘন্টা। বুধনা ততক্ষণ যাবৎ হু হু করল। তারপর নিস্তেজ হয়ে পড়ল। রাসমণি ওকে এক-বাটি চাউলী-রসা দিল খেতে। মেয়ে তিনটিকে ভাত দিল। ওরা সারাদিন ভাণ্ডাডহরে হটর-পটর করে গোরু-ছাগল চরিয়ে বেড়ায়। পেটে চারটি ভাত পড়তেই ঘুমে ন্যাতা হয়ে গেল।

রাসমণি এসে বুধনার কাছে বসল। বুধনা বলল—আমাকে নিঞে

কতদিন আর বসে থাকবি ? ঈ-বারে সুমির হাতেই ছেড়ে দে। উ যা পারে করুক। কপালে যা আছে হবেক।

রাসমণি ওর কপালে হাত রাখল। বুধনা আবার বলল—তুর হাড়-পাঁজরগুলিন বিরাঞে গেল। ক্যেনে অত ভাবছিস ?

রাসমণিকে মনে হয় বুধনার দিদি। কথাবার্তাতেও গার্জেনী ভাব। আসলে তাইতো ছিল। বুধনা আগে দিদিই বলত। প্রেমের দরিয়ায় ভেসে গেল বলেই হেরেল (স্বামী) হয়ে গেল। এটা তার জীবনের মস্ত প্রমোশন। মুনিষ খাটতে এসে মালিক হওয়া কম কথা নয়। সে ছ বিঘা জমির হোক বা রাজ্য রাজকন্যার হোক। মালিক তো বটে।

রাসমণি একটা শালপাতার চুটি পাকিয়ে আগুন ধরিয়ে বুধনাকে দিল। বলল—তুই না ভাল হলে বেবাক আন্ধার রে মাঝি। বুঝতে লারছিস আমরা একদম ফতুর হঞে গেইছি। জুমিদারের ব্যাটা আমার সরদারীটি মাহাকে দিঞেছে। পুরানো পাওনা কড়ি কুছুই দিলেক নাই। আমার ছ' আনা হাজরীর কাজটিতেও জবাব হঞে গেইছে তাথেই বলছি তুই যদি তাড়াম তাড়াম ভাল হঞে যেতিস তবে দুসরা কুনু কোলিয়ারিতে কাজ করতে যেতম।

—জমিগুলিনের কি হবেক ?

—কি আবার হবেক ? ক' বিঘা জমি। তার ধানে কি পেট চলবেক ? না চিরকাল জমিই থাকবেক ? খাদ ভস্‌কায় চলে যাবেক না হলে কুম্পানি নিঞে লিবেক।

—তবু একবার বারকুলি সাহেবকে শুদাঞে দ্যাখ। উয়ার হাতে কত খাদান। মনে করলেই হল। সেইখেনে কাজ করব।

—না। উয়াকে শুদাতে যাব নাই। উয়ার লেগে যে আমি এত করলম ত উ আমাদের কি করলেক ? যখন বিপদে পড়লম তখন একটা খবর লিলেক নাই। না হলে উ যদি একটি হুকুম দিত তবে কি জুমিদারের ব্যাটা গুলি করতে পারত ? ন কি আমার সরদারী যেত বেবাক জানি ? কটা চামড়ার লোককে কখন বিশ্বাস করিস না।

এই হচ্ছে রাসমণির অভিমান। একদা যে সাহেব তাকে বুকে নিয়ে নাচত সে তার বিপদে একটা খোঁজ-খবর পর্যন্ত নেয় নি। তা যদি নিত তবে এত দুর্গতি হত না।

বুধনা ঘুমিয়ে পড়ল। রাসমণির ঘুম আসছে না। এ পাশ ও-পাশ করে। ছোট মেয়েটা কেঁদে উঠল। ওর মুখে দুধের বোঁটা ধরিয়ে দিয়ে টানা-টানা সুরে গান ধরল—

লগু বুরু তোড় দ মাড়ার বাহা যম কিনার
আড় গোলে না···
সিন দ সিন সিতুন ইন্দ শিশির বারমে বারমে
তু রুও ড়েনা···

[লগু পাহাড়ে কাঠবিড়ালী দিনে ফুলের রস ও রাত্রে শিশির খেয়ে চলে যায়।]

সাঁওতাল বিদ্রোহের সময় এমন অনেক গান বেঁধেছিল ওরা। একদা তার মা সুর করে গেয়ে তাকে ঘুম পাড়াত। এখন সে তার মেয়েকে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে সেই অনুভূতির দুয়ারে পৌঁছে গেছে যেখানে সে নিজেই লগু পাহাড় অথবা তার অত্যাচারিত জাতি। কাঠবিড়ালী ইতিহাসের সেই ভিলেন চরিত্র যে দিনে ফুলের রস অর্থাৎ তাদের শ্রম এবং রাত্রের শিশির অর্থাৎ নারীর যৌবন শুষে নিয়ে চলে যায়।

অন্তর ছেঁড়া গান। গাইতে গাইতে বুক ফেটে শুকনো চোখে জল গড়ায়। মায়ের মুখে মুখ দিয়ে যে মেয়েটি ঘুমিয়ে পড়েছে তার মুখে ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরে পড়ে সেই অশ্রুজল।

ওর বুকফাটা হাহাকার নিস্তব্ধ সাঁওতাল পল্লীতে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়। ফাঁকা ঘরগুলো হাহাকার করে। কয়েক মাস পূর্বেও কত মানুষ ছিল ঐ ঘরে। সারা দিনরাত ছেলেমেয়েদের কান্নাকাটি। ঠাঁই হত না সব লোকের শোবার বসবার।

কি হয়ে গেল! আবার কি কোনদিন তার সিদাবাড়ি ধাওড়া-কুলি-কামিনে ভরে যাবে? আবার কি তারা তার কাছে এসে দাঁড়াবে?

॥ পঁয়ত্রিশ ॥

ব্যারাকলউ সাহেব যত দুর্দান্ত মাইনিং ম্যান তত ধুরন্ধর মামলাবাজ নন। জমিদার রাধাগোবিন্দ রায় পানমোহরায় ডবল অ্যাকশন করিয়ে দিলেন। প্রথমে একটা মিনি ফৌজদারী। লাঠি সোঁটা নিয়ে দু-চারজন লোকজন দিয়ে চানক কাটাইয়ের জায়গা থেকে কিছুটা দূরে একটা ঘর বানিয়ে ফেললেন। তারপর সেটাকে ভেঙে চুরে ডাঁই করে ব্যারকলউ সাহেবের কুলি-কামিনদের দু-চার ডাণ্ডা মেরে একটা ফৌজদারীর প্রহসন করালেন।

তারপর একই সঙ্গে হাইকোর্ট থেকে সাময়িক নিষেধাজ্ঞা ও রানীগঞ্জ কোর্ট থেকে ১৪৪ ধারা জারী করিয়ে ব্যারাকলউ সাহেবের সেখানে প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দিলেন। কোর্ট কাছারীতে কত ফাঁক ফোকর ওদের জানা। পিছনে হ্যামিলটন সাহেবের মদৎ। তিন চারিদিনের মধ্যে ব্যারাকলউ সাহেবের খাটিয়া খাড়া।

উনি এখনো কোর্ট দেখেননি। উকিল, মোক্তার চিনতেন না। জনাকয়েক কুলিকে, যে পুলিসে ফৌজদারী করার অভিযোগে ধরে নিয়ে হাজতে পুর দিয়েছে তাদের কি করে জামিন করাতে হয় তাও জানেন না।

ডেকে সাড়া পান না মিঃ শেফার্ড কিংবা মিঃ ডিক্সনের। মিছির গোমস্তা এমমিতে রোজ একবার করে সেলাম দিতে আসে কিন্তু ক-দিন থেকে তারও দেখা নেই। মহা মুস্কিল।

জীবনে এই প্রথম তিনি অনুভব করলেন যে তাঁরও একজন উপদেষ্টার প্রয়োজন। হুইস্কির গ্লাস হাতে নিয়ে দারুণ চিন্তায় মগ্ন। কাবেরীর মুখটা বিষণ্ণ। তার জন্যেই জমিদারের সঙ্গে সাহেবের এই সংঘাত। তখন যদি জমিদারের পাল্কি চড়ে সে নাচমহলে যেতো তাহলে আজ এত মামলা মোকদ্দমা নিয়ে সাহেবকে বিপর্যস্ত হতে হত না। নিজেকে বড় অপরাধী মনে হল।

কুণ্ঠিতভাবে বলল—সাহেব! জমিদার আমাকে ফিরে পেলে যদি এইসব ঝামেলা মিটে যায় তবে দাও না আমাকে পাঠিয়ে।

সাহেব ওর দিকে তাকালেন। বললেন—তা হয় না কাবেরী। আমি তোমার কাছে ডবল প্রতিজ্ঞায় বাঁধা পড়ে গেছি।

—সে কি সাহেব?

—হ্যাঁ। প্রথম আমি তোমার জীবন রক্ষা করবো। দ্বিতীয় আমি তোমাকে ভালোবাসবো।

—শুধু প্রতিজ্ঞার জন্যেই ভালোবাসবে নাকি সত্যি হৃদয় দিয়ে ভালোবাসবে সাহেব?

—দুটোই।

—তোমাকে আমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা কি করে জানাবো সাহেব?

—আমার পাশে থাকো। বড় দুর্দিন ঘনিয়ে আসছে। এ সময়ে আমি চাই এমন কেউ আমার পাশে থাকবে যে আমার জন্য নিবেদিত প্রাণ। যার ভালবাসায় হৃদয় ভরে উঠবে। কাবেরী আমি বড় ক্লান্ত।

—এসো সাহেব! আমি তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিই।

অতএব একটা মানুষ একটু ভালবাসার ছোঁয়াতেই ঘুমে কাদা হয়ে গেলেন। এক সপ্তাহ পর তাঁর চোখ জুড়ে ঘুম নেমে এল। কাবেরী অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তাঁর মুখের দিকে। কত শান্ত, কত সরল ঐ মুখ।

পরদিন সকালে যখন ঘুমিয়ে উঠলেন তখন একেবারে তাজা। কাবেরীকে জড়িয়ে ধরে বললেন—ওঃ মাই ডারলিং। কাল রাত্রে খুব ঘুমিয়েছি। আজ মনে হচ্ছে আমি লড়ে যেতে পারবো।

প্রাতঃকৃত্যাদির পর বাইরে বেরিয়ে হাঁক ডাক শুরু করে দিলেন। ঘোড়া তৈরি করতে বললেন। দলিল লেখক নবগোপাল দাশকে ডেকে পাঠালেন। মিছির গোমস্তা ও মিঃ ট্রুম্যানকে ডাকালেন।

সবাই একে একে এসে হাজির হলেন। যাকে যা আদেশ দেবার দিয়ে বিদায় করলেন। নবগোপাল দাশকে বললেন—বাবু তুমি তো কোর্টে কাজ কর। নিশ্চয় জানবে বারের সেরা উকিল কে?

—হ্যাঁ স্যার। তা জানি বইকি। কোর্টের যা কাজ আছে আমাকে বলুন সব করিয়ে দেবো। আজ ত্রিশ বছর কোর্টে কাজ করছি। কোন ঘাটে কে জল খায় তা কি জানি না?

—সেই জন্যই তো তোমাকে ডেকে পাঠালাম। কদিন থেকেই

ভাবছিলাম কি করবো ? কার কাছে যাবো ? আজ সকালেই আমার মাথাটা পরিষ্কার হয়ে গেল। যাক্ তৈরি হয়ে নাও। এখুনি কোর্টে রওনা হব।

তখনকার দিনে কোর্ট ছিল রানীগঞ্জে। মিঃ ব্যারাকলউ ও মিঃ ট্রুম্যান বেলা সাড়ে দশটা নাগাদ পৌঁছে গেলেন। নবগোপাল বাবু তাঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন বারের সেরা উকিল সুশীল চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে।

কোর্টের বারান্দায় চাটাই পেতে তাঁর সেরেস্তা। একজন মুহুরী বসে আছেন কাগজপত্র নিয়ে। কোন কোর্টে বাবুর শুনানী আছে, কোথায় কোন মক্কেলের হলফনামা পেশ করতে হবে, কোন মামলার জাজমেন্ট বের করতে হবে, কার জামিন করাতে হবে ইত্যাদি নিয়ে লম্বা ফিরিস্তি। তখন দেওয়ানী ও ফৌজদারীর জন্য আলাদা আলাদা উকিল ছিলেন না। একই উকিল এস ডি. ও কোর্টে ফৌজদারী ও জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে দেওয়ানী মামলা করতেন। কোর্টে এসে সুশীলবাবুর দাঁড়াবার ফুরসৎ থাকতো না। টাইপিস্টেরও বালাই ছিল না, সব আর্জি হাতে লিখতে হত। এখন যেমন গণ্ডা গণ্ডা স্টেনো, টাইপিস্ট, জেরোক্সের ছড়াছড়ি তখন তার নাম জানতো না কেউ। তবে লেখবার জন্য লোক পাওযা যেত।

সুশীলবাবু প্রথমেই কুলিদের জামিনের আবেদন তৈরি করলেন। তারপর একশ চুয়াল্লিশ ধারার বিরুদ্ধে একশ পঁয়তাল্লিশ ধারা জারী করে জমিদার এবং তার প্রতিনিধিদের পানমোহবায় ঢোকা নিষিদ্ধ করার জন্য আবেদন তৈরি করলেন।

দুটি আবেদন নিয়েই এস ডি ও সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন মিঃ ব্যারাকলউ ও তাঁর উকিল। ভাগ্যচক্রে এস ডি ও সাহেব ছিলেন ইংরেজ। তিনি মিঃ ব্যারাকলউকে সব ঘটনা বর্ণনা করার সুযোগ দিলেন। উনিও ভারতে শিল্প বিপ্লব, কয়লাকুঠি স্থাপন করার মিশন, জমিদারের সঙ্গে চুক্তি, জমি জায়গার দলিল ইত্যাদি নিয়ে নিজের সপক্ষে বক্তব্য রাখলেন। ল'পয়েন্টের ব্যাপারগুলো ব্যাখ্যা করলেন সুশীলবাবু।

বেলা চারটের সময় কোর্টের আদেশ বেরুলো। জামিন ও ১৪৫ ধারা জারী দুটো আবেদনই মঞ্জুর।

সুশীলবাবু বললেন আজ আপনি যান সাহেব। কুলিদের জামিন তো হয়ে গেছে ওদের ছাড়িয়ে নিন। আর ১৪৫ ধারার আদেশ পান-মোহরায় জারী করিয়ে দিন গিয়ে। আমি কোর্ট থেকে লোকের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

কাল বিকেলে ঘোড়ার গাড়ি পাঠিয়ে দেবেন নবগোপালের সঙ্গে। ও আমার বাড়ী চেনে। আমাকে নিয়ে যাবে আপনার বাংলোয়। দেওয়ানী কোর্টের মামলা নিয়ে আলোচনা করবো।

মিঃ ব্যারাকলউ ওকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে ফিরে এলেন।

সাফল্য মানুষকে প্রেরণা দেয়। ব্যর্থতা করে হতাশ।

যিনি জীবনে কখনো মামলা করেন নি তিনি ঐটুকু সাফল্যেই খুশিতে ডগমগ। কাবেরীকে আশমানে তুলে লোফালুফি শুরু করে দিলেন। আদবের ঠ্যালায় কাবেরীর প্রাণ ছাড়ো ছাড়ো অবস্থা। ব্যাকুলভাবে বলতে থাকে ছাড়ো সাহেব। আমি যে মবে গেলুম। ওঃ কি উৎকট আদর!

ওকে একটা টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে উনি বললেন—ডারলিং, আজ আমার খুব ভালো দিন। কোর্ট আমার ফেবারে অর্ডার দিয়েছে।

কাবেরী বলল—সে তো দিবেই। আমি আজ সকাল থেকে ঠাকুর পূজো করেছি যাতে তুমি জিতে আসো সেই কামনা নিয়ে।

—তাই নাকি! ও ভেরী নাইস। তুমি রোজ তোমার ঠাকুর পূজো করবে। ঠাকুর মানে লর্ড শিব অ্যাণ্ড গডেস দুর্গা ভেরী পাওয়ার ফুল।

—সে তো বটেই সাহেব। এবার ঠাণ্ডা হয়ে বসে বলো তো, সারাদিন স্নান করো নি, খাও নি, বিশ্রাম নাও নি তবু এত স্ফুর্তি এল কি করে?

এতো যে গরম তবু সাহেবদের পোশাকের ঘাটতি নেই। চারু মুচি ছুটে এল জুতা খুলতে। তরলা এলো জামা খুলতে। পাঙ্খাওলা জোরে জোরে পাঙ্খা টানতে লাগলো। ঢালু দাস নিয়ে এল ঠাণ্ডা বীয়ার। চার-পাঁচটি লোক লেগে গেল সাহেবের পরিচর্যায়। এমন তাদের কেতা।

কাবেরী ওকে টেনে নিয়ে গেল বাথরুমে। সাবান দিয়ে গায়ের

ঘাম তুলে দিল। ঝর ঝর করে মাথায় জল ঢালল। সাহেব খুব খুশি। স্নান করার পর মেজাজটা আরো ফুরফুরে হয়ে গেল।

তখন হ্যামিলটন সাহেবের বাঙলোয় মিঃ শেফার্ড, মিঃ ডিক্সন ও হাবুসাহেব উপস্থিত। তাদের আলোচ্য বিষয় মিঃ ব্যারাকলউকে কি করে জব্দ করা যায় তাই নিয়ে। মিঃ শেফার্ড ও মিঃ ডিক্সন যথাক্রমে শেরগড় ও হাটনল কোলিয়ারির ম্যানেজার। মিঃ হ্যামিলটন বলছেন তোমরা যদি ব্যারাকলউয়ের সঙ্গে সহযোগিতা না কর, তার আদেশ না মানো তাহলে তাঁর আধিপত্য আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যাবে। আর আমি মনে করি মিঃ হাবুকে যদি শেরগড়ে এ্যাসিষ্টেন্টের চার্জ দিই তবে সে খুব বিশ্বস্ততার সঙ্গে সে দায়িত্ব পালন করবে।

হাবুসাহেব বললেন—ইয়েস স্যার। লেবারবাবু সবাইকে আমি এমন কন্ট্রোল করে রাখবো যে মিঃ ব্যারাকলউ কিছু হদিশ বের করতে পারবে না।

—ও'কে হাবু! তুমি কাল ডিউটিতে জয়েন করবে।

—থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।

ইশারা পেয়ে হাবুসাহেব চলে গেলেন।

মিঃ হ্যামিলটন বললেন এইসব নেটিভদের হাতে রাখবে। এদের কু'বুদ্ধিগুলো খুব পাকা।

মিঃ ডিক্‌সন বললেন—কিন্তু আমাদের বোর্ড অফ ডাইরেকটর্সের কাছে মিঃ ব্যারাকলউয়ের বিশ্বাস ভঙ্গ নিয়ে একটা রিপোর্ট কেন দেওয়া হবে না? যাতে ওর এগ্রিমেন্ট ক্যানসেল হয়ে যায়।

—হচ্ছে! হচ্ছে! সেসবও হচ্ছে। চিন্তা করো না। এসো আমরা আজকের রাতটা স্মরণীয় করে রাখার জন্য স্বাস্থ্য-পান করি।

॥ ছাত্রিশ ॥

বুধনা একটু ভালো হবার পর রাসমণি ঘর ছেড়ে বেরোল। মাথায় বোঝা নিয়ে টবগাড়ি ভরতে হবে। বারোঘণ্টা খাদের গরমে পচতে হবে। অন্ধকারে হোঁচট খেতে হবে। জীবনে কখনো যে কাজ করে নি তাই করতে হবে।

ইহ বাহ্য! তার চেয়েও বড় ভাবনা পাওনাদারদের তাগাদা।

তারা সব ধাওড়ায় গিয়ে হম্বিতম্বি করে। রাস্তা আগলে দাঁড়ায়। সবারই এককথা—আমাদের পাওনা টাকা দে রাসমণি। তুর কুলি-কামিনদের খোরাকির দরুন এত টাকা ধার আছে। আমরা তো আর ওদেদিকে ধার দিই নি। তোর জিম্মাতেই দিয়েছি। ওরা পালিয়েছে তো কি হবে? শোধ তোকে দিতে হবে।

শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে যায়। অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে। বলে শুন বাবু! রাসমণি কারু পয়সা ডুবাঞে পালাবেক নাই। আমি দেড়শো কুলিকামিনের সরদারনী। আজ কপাল ভেঙেছে বলে কি চিরকাল এমনি ছিল না থাকবেক? তুরা দুদিন সবুর করতে লারছিস? আমারো তো দেদার পাওনা। সেসব আদায় করলে ধার উধার রাখব নাই।

এসব ভাবতে ভাবতে ভর দুপুরে গিয়ে হাজির হল মিছিব বাবাব ডেরায়। যতই হোক উনি হেড গোমস্তা। পাঁচ সাতটা কোলিয়ারির কুলিকামিন তার হাতে। ইচ্ছা করলে অনায়াসেই একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারেন।

প্রয়াত মদনমোহনের বড় ছেলে জয়গোপাল তখন তাঁর ভুঁড়িতে তেল মালিশ করছিল। লেঙটি মাত্র সম্বল করে বিশাল দেহী এক মহাজন পরম আয়েসে সেই সুখ ভোগ করছিলেন। তিনি এই ছেলেটিকে বড় স্নেহ করেন। বড়ই অনুগত। বাপ মরে যাওয়ার পর ভাইবোনদিকে নিয়ে মিছিল করে ভিক্ষা মাগতে যেতো। এছাড়া গতি কি? বাপে তো অকালে ভাসিয়ে দিয়ে চলে গেছে। জমিদার একটা কানাকড়িও খেসারৎ দেয়নি। অতঃপর মা ও সৎমায়ের ঝি গিরি ও তার ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়া গতি কি?

কিন্তু ওর ভিক্ষা করতে যাওয়ার পদ্ধতিটি ছিল অন্যরকম। সব ভাইবোন তা প্রায় আটজন ন্যাড়া মাথায় কাঁধে থলি নিয়ে লাইন দিয়ে পথ চলতো। এ প্রদর্শনী যে দেখতো তারই সহানুভূতি জা''তো। ভিক্ষা পেতো চাল, চিঁড়ে, তামার ছিদাম পয়সা।

মিছির বাবু সেই দল থেকে বড়টিকে তুলে নিয়েছেন নিজের হেফাজৎ করবার জন্য। বাকিগুলি এখনো সেইভাবেই ভিক্ষা করছে।

রাসমণি ওদের বলে—তোদের বাপ কি করে গেলরে? এতগুলি লোকের হাতে খলা দিঞে গেল। আমিও ম'লম তুরাও মলি।

দুয়ারের কাছে দাঁড়িয়ে বড় ছেলেটিকে দেখে ওর করুণা হল। কিন্তু বাবুর মউজ ভেস্তে যাবে বলে ডাকাডাকি করল না।

চারখানা লম্বা খড়ের ছাউনী করা ঘরে চাপরাশীদের ডেরা। খোপ খোপ খুপরী। দড়ির খাটিয়া পাতা। এক কোণে জলের ঘটি। থালা বাসন। দেওয়ালে টাঙানো দড়িতে গামছা ও লাল শালুর লেঙটি শুকোচ্ছে।

সামনেটাতে খাটাল। ভাঙা চোরা খড়ের চাল। সারি সারি গরু মোষ দাঁড়িয়ে আছে। লেজ দিয়ে, শিং দিয়ে মাছি তাড়াচ্ছে। আপন মনে জাবর কাটছে। বাছুরগুলির মুখে দড়ির জাল বাঁধা। কোন রকমে ছাড়া পেলে পাছে মায়ের দুধ না খেতে পায়।

ইতঃস্তত গোবর, খড়ের ছানি পচে দুর্গন্ধ উঠছে। মাটির পাৎনায় খইল ভূষি ভিজছে। মাটির দনে কেউ খইল দিয়ে খড়ের ছানি মাখছে। এরই মধ্যে কেউ রুটি বানাচ্ছে। কারো বা উনুনে ভাত ফুটছে। গরম ভাতের গন্ধ ভাসছে।

রাসমণি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে সব দেখছিল আর জোড়ায় জোড়ায় পুরুষের চোখ ওকে দেখছিল। সব খাটিয়া আশ্রয় করে পড়ে আছে পাট ভাণ্ডার। কেউ জেগে, কেউ ঘুমিয়ে। রাত জেগে ডিউটি দিতে হয় কি না তাই।

একজন চাপরাশী কানে পৈতে নিয়ে বালতি হাতে কাছে এসে দাঁড়ালে। জিজ্ঞাসা করল—কাহো রাসমণি? হেনে ক্যা বাটে?

—গোমস্তাবাবুর সঁথে দেখা করব যে চাপরাশী।

—তো বুলা লে। তু কোই নয়া আওরৎ নেই থে।

—দাঁড়া বাবু তেল মাখছে যে।

—আরে! উ লৌণ্ডাতো হরবখৎ বাবুজীকো তেল মালিশ করতাড়ে। ওকরামে ক্যা ভইল? তু বুলা।

রাসমণি বুঝল—এটা নিত্যকার ব্যাপার। ডাকল—বাবু! এ বাবু!

—কৌন বা হো?

আমি বাবু রাসমণি!

—তেনি ঠাহার যা।

ভুঁড়ির উপর গামছা খাঁদালে মিছিরবাবু বেরুলেন। প্রসন্ন দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে বললেন—ক্যা রে রাসমণি? তোরা ক্যা খবর বাটে?

—কি খবর শুনবি বাবু ? আমাদিকে ত মেরে দিলি।

—হামার বদনাম করিস না রাসমণি। হামি কারো লোকসান করি না। লেকিন হাঁ। তোর তগদীর খারাপ।

—সে ত বটেই বাবু।

একজন চাপরাশী হাতের চাটুতে খৈনী ডলে ওর সামনে ধরল। উনি আঙুল দিয়ে খানিকটা তুলে নিয়ে ঠোঁটটাকে টেনে ফাঁক করে দাঁত ও ঠোঁটের মাঝে খৈনীটাকে ঠুসে পুরে একটা লম্বা পিক ফেললেন।

রাসমণি বলল—আমার সব গেল বাবু। অতগুলি লোক মরল। বেবাক কুলিকামিন ভয়ে পালাঞে গেল। ধাওড়া খালি। আমার সরদারী গেল, হাজরি গেল—পাওনাদাররা পেছু লাগল। ঈ-বাবে ছ্যেলা পিলাদিকে কি খাওয়াব ? মরদটির শরীর গুলি খেঞে পড়ে গেল। কি করব ?

—হাঁ। সমস্যা বহুত গম্ভীর। বারকুলি সাহাব ভি আপনা পান-মোহরা কোলিয়ারি লিয়ে পরেসান। এক কসবির লিয়ে জমিদারবাবুর সাথ বহোৎ মামলা ঔর লড়াই লাগু আছে। নেহী তো এক বাৎ পর ফয়সালা হোইয়ে যেতো। তু ভি উয়ার কাছে দিলপিয়ারী আওরৎ ছিনি।

—তবে বাবু ? কুছু বেবস্থা হবেক নাই ?

উনি একটু ভেবে বললেন—এক কাম কর। সালুখি নয়া খাদানে একটো পাম্পা মেসিন বৈঠাবাব কাম চালু আছে। সাহাব রোজ দশ-বাজে কাম দেখবার লিয়ে হাজির হয়। কাল তু চলিয়ে আয়।

বলতে বলতে উনি একটা খাটিয়ায় বসে পড়লেন বাঁশের বাজু মচ করে একটা শব্দ দিয়ে ধনুকের মত বেঁকে গেল। মিছিরবাবুর ওজনদার শরীরটা খাটের ভিতর ঢুকে গেল এবং দড়ির বুননসহ পাছাটা মাটির যোগান পেয়ে থিতু হল।

এত দুঃখেও রাসমণি ফিক করে হেসে ফেলল। বলল—ঠিক আছে বাবু। তাই যাব। তুই আসবি তো ?

—হাঁ—হাঁ। জরুর যাবো।

রাসমণি চলে গেল। একদা যে রাসমণির সাহেব কোঠাতে অবারিত দ্বার ছিল আজ তাকে ভায়া মুরুব্বি সাক্ষাৎ করতে হচ্ছে এও এক পরিহাস ! তারজন্য ওরা কিছু মনে করে না।

নারীদেহ তো এঁটো পাতা। লোকে বাজারে শালপাতার ঠোঙায় মিষ্টি কিনে খায়। খাওয়া হলেই পাতা ছুঁড়ে ফেলে দেয়। তখন তা কুকুরে চাটে। ঠাকুর ঘরে যেতে হলে নতুন পাতা চাই।

রাসমণিরা এঁটো পাতা। আদর করে মুখের কাছে ধরার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। রাসমণি তা জানে। হঠাৎ যদি সাহেবের কাছে সোহাগ দেখাতে যায় তবে হাণ্টারের ঘা খেয়ে ফিরে আসতে হবে। সেজন্য মিছির বাবার প্রয়োজন।

ব্যারাকলউ সাহেব এখন আমোদ-স্ফূর্তি প্রায় ভুলেই গেছেন। আগে রকম রকম মেয়ে আমদানি হত। সারা রাত ধরে হুইস্কির ফোয়ারা ছুটত। হেকিমি দাওয়াই সেবনে মদমত্ত অশ্ব তীব্র রিরংসায় খান্-খান্ করে দিত তাকে। অসহ্য সুখের তাড়নায় তার আর সাড় থাকত না। কুণ্ডলীকৃত মাংস পিণ্ডের মত জবু থবু হয়ে পড়ে থাকত।

তরলা দাসী তাকে তুলে নিয়ে যেত বাথরুমে। স্নান করিয়ে, কাপড় পরিয়ে, ব্রাণ্ডি খাইয়ে সুস্থ করে তুলত। সেই সাহেবকে মিইয়ে যেতে দেখে ও খুব ভাবনায় পড়ে গিয়েছিল। কাবেরীর উপর মনে মনে রাগ করত। হলোই বা রূপের ডালি। ও আসার পর থেকেই যত রাজ্যের ঝামেলা সাহেবের ওপর ভর করেছে। বড় অলক্ষুণে মেয়ে।

কিন্তু কিছু বলার নেই। সাহেবের সঙ্গে ভালবাসার খেলাঘর পেতেছে। রোজ সন্ধ্যায় বাগানে বসে দুজনে ফুসুর ফুসুর করে। কাবেরী গান শোনায়।

আসলে তা নয়। রোজ সন্ধ্যায় সাহেব ঘাসের উপর টান টান হয়ে শুয়ে থাকেন। কাবেরী সুরের মায়াজাল দিয়ে ঘিরে রাখে তাঁকে। তাঁর জীবনে এইটুকুই সোয়াস্তি। না হলে সময় কাটছে দারুণ দুর্ভাবনায়।

মামলা মোকদ্দমায় জেরবার। ফৌজদারী মামলাটা গুছিয়ে এনেছেন নিরীহ গোবেচারা কুলিদের জমিদার ষড়যন্ত্র করে দাঙ্গা ফৌজ-দারীর আসামী বানিয়ে দিয়েছেন একথা বিচারককে বোঝাতে পেরেছেন। অবশ্য সে মামলা এখনো শেষ হয়নি। আগামী মাসের দশ তারিখে শুনানী হবে।

কিন্তু দেওয়ানী মামলাটা এখনো অগাধ দরিয়ায়। সুশীলবাবুকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে গিয়েছিলেন। প্রখ্যাত ব্যারিস্টার

বারওয়েল সাহেবকে ব্রিফ দিয়েছেন। পানমোহন্নায় জমিদারকৃত চানক কাটাইয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেবার জন্য আদালতে আবেদন জানিয়েছিলেন। শুনানীর তারিখ পড়েছে। সেই দিন তার ভাগ্য পরীক্ষা হবে। সেই উদ্বেগেই দিন কাটছে।

এদিকে মিঃ হ্যামিলটন কড়া নোট পাঠিয়েছেন এই বলে যে মিঃ ব্যারাকলউ তার ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে এত ব্যস্ত যে কোম্পানির স্বার্থ দেখছেন না। কারণ সালুঞ্চী কোলিয়ারির কোম্পানি পরিচালিত নয়-দশ নম্বর খাদে প্রস্তাবিত মাইন ফ্যানটা রেডী থাকা সত্বেও তা ইনস্টলশনের কাজ ত্বরান্বিত হচ্ছে না। মিঃ ব্যারাকলউ যেন ভুলে না যান যে তিনি চাকরি করছেন।

ব্লাডি কানিং জ্যাকেল! মাইন ফ্যান বসাবার পরিকল্পনা আমার, ডিজাইন আমার, ইনস্টল কবছি আমি আর উনি কোম্পানির বিরাট শুভাকাঙ্ক্ষী হয়ে গেছেন। দেরী হচ্ছে তাই তাগাদা।

রাগে গজ গজ্ করতে থাকেন।

খাদে বায়ু চলাচল তখনকার দিনে এক ভীষণ সমস্যা ছিল।

খাদ যত নিচে যাবে তত জল বেশি হবে। সেই জল উপরে তোলার জন্য ষ্টীম পাম্পের ব্যবস্থা। কিন্তু খাদের ভিতর তা চালানো এক মহা সমস্যা। ঘচ্-ঘচ্ করে পাম্প চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার এক্সহস্ট থেকে এত ষ্টীম বেরোতে থাকে যে মুহূর্তে সে জায়গা অন্ধকার। বাতাস ভারী হয়ে থাক থাক কুয়াশার মত সুড়ঙ্গ পথে জমে থাকে।

আবহাওয়া যেমন গরম তেমনি আর্দ্র। আর এই ভিজে গরমের এমন বিশ্রী প্রতিক্রিয়া যে কিছুতেই শরীরের ঘাম হয়ে ঝরে যাবে না। ভিতরে জ্বালা করবে। বড় বড় ফোস্কা উঠবে। পেটের কন্‌কনানিতে দাঁড়ানো দায় হয়ে উঠবে। নেহাৎ নেটিভ খালাসী। ব্যাটাদের হাড়-মাংস-চামড়া কি জানি কোন অন্য ধাতুতে তৈরি নাকি তাই চালাতে পারে। সাহেবরা ঐ গরমে ঘণ্টাখানেক থাকলেই টেঁসে যেত।

উনি অবশ্য এই যন্ত্রণা অনুভব করেন। সেজন্য ষ্টীমের এক্সহস্ট দূরে করে দিয়েছেন। যাতে রিটার্ণ বাতাসে ভর করে বেরিযে যায়। কিন্তু তাতেই কি হয়? অত বাতাস কোথায়? যদিও ষ্টীমের গরমে বাতাসটা গরম হাওয়ার দরুন প্রাকৃতিক বায়ুপ্রবাহ কিছুটা বাড়ে।

মিঃ ব্যারাকলউ তা নিয়ে খুব ভাবতেন। শেরগড় কোলিয়ারিতে

ফ্যান বসিয়ে সফল হয়েছেন। অনেকটা সমস্যার সমাধান হয়েছে। ফায়ার ড্যাম্প গ্যাসকে বাতাসে মিশিয়ে তার ঘনত্ব লঘু করে বায়ু চলাচলের প্রস্থান পথ দিয়ে বের করে দিচ্ছেন। তার সঙ্গে ষ্টীম যুক্ত হয়ে ফায়ার ড্যাম্পের ভয় অনেকটা কেটে গেছে।

তাই সালুঙ্কীতেও সেই ফ্যান বসানোর প্রস্তাবনা।

সালুঙ্কী পাঁচ ও ছয় নম্বর পিলার কাটিং খাদ। সাত ও আট নম্বরে সুড়ঙ্গ কাটাই হচ্ছে। চারটি সিঁড়িয়া চলছে চম্পককুমারের ঠিকাদারীতে। কিন্তু নয় ও দশ নম্বর নূতন খাদ। কোম্পানির নিজের পরিচালনাধীন। তাই একটা হাওয়া চানক কাটিয়ে তার মুখে ফ্যান বসানো হচ্ছে যাতে বাতাসটা সাত থেকে দশ নম্বর পর্যন্ত প্রবাহিত হয়।

কাজ চলছে। একটা ষ্টীম-ইঞ্জিনের ফ্লাই হুইলে গ্রুভ কাটা আছে। মোটা মোটা রসা দিয়ে সেই ফ্লাই হুইল থেকে ফ্যানের গ্রুভড পুলিচাকা ঘোরানো হবে। তাইতে ফ্যান ঘুরবে। খাদের বাতাস বাইরে টেনে আনবে। তার জন্য পথ-ঘাট তেমনিভাবে তৈরি হয়েছে।

সেদিন ইঞ্জিনের হোল্ডিং ডাউন বোল্টস্ জ্যাম করা চলছিল। ইঁট গাঁথুনীর ফাউণ্ডেশনের উপর ইঞ্জিন বসিয়ে তা যাতে নড়াচড়া না হয় তাই বেডপ্লেটকে ছ'ফুট লম্বা বোল্ট ফাউণ্ডেশনের সঙ্গে চুণ, সুরকী, মশলা দিয়ে জ্যাম করে দিতে হয়। লেভেলিং ও সেণ্টারিং শেষ বারের মতো দেখে নিলেন মিঃ ব্যারাকলউ নিজে। তাঁর সঙ্গে ছিলেন মিঃ নর্টন ও মিঃ ট্রুম্যান।

মিছির বাবু এসে সেলাম দিয়ে বললেন—হুজুর। ইয়ে যো মিশিন হাপনি বৈঠালেন, একরা হাওয়া কেতো আদমীর নয়া জিন্দাগী বানায়ে দিবে। শেরগড় কোলিয়ারির হাওয়া মিশিন হাপনি বৈঠায়েছেন। তো হুজুর হিন্দুস্থানে ইয়ে মহান কীর্তি আপনার নাম পর ঘোষিত হোবে। য্যায়সা শ্রীরামচন্দ্রজীকা নাম।

তোষামোদে কে না বশ হয়? তাই যদি আবার গোমাংস, শূকর মাংস ভক্ষক, নারীমাংস লোলুপ সাদা চামড়ার সাহেবকে পুরাণের পবিত্র পুরুষ শ্রীরামচন্দ্রজীর সঙ্গে তুলনা করা হয়!

ব্যারাকলউ সাহেব দীর্ঘদিন ভারতে থাকার দরুন লর্ড শ্রীকৃষ্ণ, লর্ড শিব, লর্ড শ্রীরামচন্দ্রজীর নাম ও কিঞ্চিৎ তাৎপর্য বোঝেন। তাই খুশি হয়ে বললেন:

—ইয়েস গোমস্তাবাবু, নেটিভদের জন্য আমরা কি করেছি তাই দেখো।

—হামি তো হরবখত দেখছি সাহাব। হাপনার নাম দিলেই খোদাই করিয়ে লিয়েছি।

—থ্যাঙ্ক উ মাই নেটিভ ডগ।

ও হো! কি আদরের কথা।

একটু পর মাথায় ঝুড়ি নিয়ে রাসমণি এল। ওর মুখে বয়সের ছাপ পড়ে গেছে। ছ'মাস আগেও যাকে চঞ্চলা তরুণী মনে হত তার এখন গাল ত্যাপ্ড়া, গা ফাটা। বিদ্রোহ করতে গিয়ে শুকিয়ে আমসি।

কিন্তু আজ তার চোখে আছে গুলাবী নেশা। তালরসের ফেনা পেটে গজ্ গজ্ করছে।

মিছির বাবু বললেন—ইয়ে রাসমণি। বহুত দুখে আছে।

আমাকে ক্যেনে চিনতে পারবি সায়েব? আমি তো তুর কেউ লই? তুর লেগে আমি কুছুই করি নাই।

— ও হো মাই ব্ল্যাক হিরোইন—তোর এত রাগ কিসের?

—রাগ কাকে দেখাব সায়েব? তুই কি মানুষ বটিস?

মিছির বাবু ভয় পেয়ে গেলেন। রাসমণি আবার কি সুরে কথা বলছে? এ যে সেই পুরনো প্রেমের কাসুন্দি। হায় রাম! তুই বুড়ী হয়ে গেলি। এখন আবার মান অভিমানের কথা বলছিস?

বললেন—আরে! ঈ সব কি বাৎ কোরছিস?

—তুই গুটেক বকিস্ না ত। আমি সাহেবের সাঁথ কথা বলছি। আয় সাহেব—ছ্যাখ তোর লেগে কি এনেছি?

বলতে বলতে ঝুড়ির ঢাকনা খুলল। একটি হাঁড়ি বের করল। ফেনায়িত তাল রস টল টল করছে। গন্ধে নতুন ফ্যান হাউস সুরভিত হয়ে উঠল।

ব্যারাকলউ সাহেব লাফিয়ে উঠলেন—ওফ! মাই ব্ল্যাক হিরোইন। সেই জন্যই তুই এসে থেকে লম্বা লম্বা বাৎ ঝাড়ছিস।

রাসমণির কালো মুখে সাদা দাঁত ঝক্ ঝক্ করে উঠল। ঝুড়ি থেকে বেরুলো শাল পাতায় মোড়া দুটো মুরগী পোড়া। ছাল ছাড়িয়ে, নাড়িভুঁড়ি বের করে নুন লঙ্কা মিশিয়ে নিলেই হল। গোটা কয়েক ডিম সিদ্ধ। কাঁচা পিঁয়াজ ও লবণ।

একটা গাছ তলে তিনটি পোড়া ইটের যোগান দিয়ে তিনটি সাহেব বসে পড়লেন। তিনখানা টুপি যেন এক ত্রিভুজের তিনটি প্রান্ত বিন্দু অথবা এক উনোনের তিনটি ঝিক্। পরম আয়েসে তালরস পান করতে লাগলেন। ব্যারাকলউ সাহেব বললেন--ওহ ফাইন! রাসমণি অনেকদিন বাদে তোব হাতে খেলাম। ভেরী নাইস।

মিছির বাবু বললেন—তবে তো রাসমণি তোর মুস্কিল আসান হোয়ে গেল।

—কই হল? আসল কথাটাই তো বাকি।

—সেটি তুই ফুরসৎ মাফিক সাহেবের কানে গুজগুজ করে বলবি।

—ছ্যাখ বাবু, অমন কথা বলিস না। আমার ছিলাপিলা আছে, মরদ আছে, বয়স হঞেছে—আব সেই দিন নাই। অনেকদিন পরে সাহেবের সাথে দেখা কবতে এলম তাতেই ঈ-সব লিঞে এসেছি। তুই উল্টা বুঝিস না।

মিছির বাবু গোঁফ চুমরে হাসতে লাগলেন। ব্যারাকলউ সাহেব বললেন

—কি হল রাসমণি? তুই এত বকছিস কেন?

—কুছু না। সাহেব। আমি ছিলাপিলা লিঞে মবে গেলে তুর ভাল হয় ন'কি সেই শুধাতে এসেছি।

—কেন? মরবি কেন?

—বাঁচব কি খেঞে? এমন ঠিকাদাব দিলি যে বন্দুকেব গুলীতে আমাদের সব শেষ কবে দিলেক। কি কবে বাঁচব?

মিছির বাবু ব্যাখ্যা করলেন—হুজুব। জমিদাব বাবুলোগ বহুত অন্যায় কবিযেছে। বাসমণিকে জবাব কবিযে দিয়েছে। উয়াব কুলিকামিনদেব পাওনা হাজবি নাই। একসিডেনেব কুছু খেসারৎ দেই নাই। বাসমণির মরদ গুলি খাওযে বিমারে পড়িয়েছে। পাওনাদার লোগ রাসমণিকে বহুত তক্‌লিফ দিচ্ছে। আব উ-ব্যাচারীর বহুত মুস্কিল!

উনি বললেন—এত কথা তো তুই আমাকে বলিস নি রাসমণি।

চিরাচরিত সাঁওতালী ঢঙে ও বলল—বলি নাই।

—অলরাইট। মিঃ ট্রুম্যান তুমি হিসেব করে দেখবে বাসমণির লেবারের কত পাওনা আছে। ঠিকাদারকে তা পেমেণ্ট দিতে বলবে।

যদি না দেয় তবে ওর রেজিং কনট্রাক্টের দরুন যা পাওনা হবে তার থেকে কেটে দিয়ে দিও। ঠিক আছে? গোমস্তা বাবু?

—হাঁ হুজুর। উ রূপেয়া পাইলে বেচারীর উধার উশুল হয়ে যাবে।

রাসমণি বলল - তারপরে কি খাব সাহেব?

—কেন? কাজ করবি। হাজরি পাবি।

—কি কাজ করব সাহেব? আমার তো লোকজন সব পালাঞে গেইছে।

—তোকে আবার আমি সরদারনী বানিয়ে দেব।

রাসমণির চোখ দুটো কৃতজ্ঞতায় ছলছল্ করে উঠল।

কিন্তু ভাঙা কপাল আর কি জোড়া লাগবে? পরদিন মিছির-বাবু রাসমণিকে সঙ্গে নিয়ে চম্পককুমারকে সেলাম দিলেন। সুদীর্ঘ ভনিতা ও কৈতববাদিতার পর বললেন—হুজুর! ঈ-ব্যাচারীকে কেনো তক্‌লিফ দিচ্ছেন। থোড়া কিরপা করিয়ে দিন। উয়ার সরদারী উয়াকে আপস করিয়ে দিন।

উনি অধৈর্য হয়ে বললেন—ওহে সরদারী কারো পৈতৃক সম্পত্তি নয়। লর্ড কর্নওয়ালিশ রাসমণিকে খাটোয়ালী স্বত্বের পাট্টা দিয়ে যান নাই।

মিছিরবাবু এবার ট্রুম্যান সাহেবের হুকুমনামাটি বের করে বললেন—হুজুর। ইয়ে হ্যায় টুরিম্যান সাহেবের চিট্‌ঠি। খুদ বারকুলি সাহেবের অর্ডার। রাসমণির যেতো লেবারের হাজরী পাওনা আছে সব দিতে হোবে। উয়ার যেতো লেবার ছিলো—সব ইধার-উধার হোইয়ে গেছে—সব কমিশন উ পাবে। উয়ার সরদারী কায়েম থাকিয়ে যাবে।

চিঠিটা চম্পককুমারের হাতে তুলে দিয়ে খৈনী ডলতে শুরু করলেন। রাসমণি এসে দুয়ারে দাঁড়াল।

তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন চম্পককুমার। কাঁচা খিস্তি করে বললেন—শালী কসবি। সাহেব নাগর পেয়েছিস। তাকে দিয়ে লিখিয়ে এনেছিস। যা এবার তোর নাগর বাপকে বলগা আমি তোকে একটা পয়সা দিব না। কাজ দিব না। সরদারী দিব না। শালী কুটনী ফের যদি তোকে দেখি তবে জুতিয়ে মুখ ভেঙে দিব।

রাগে রাসমণির কালো মুখ ঝলসে গেল। বলল—গুলি করে মুখ

ভাঙতে লেরেছিস বাবু জুতাতে কি ভাঙবি? কিন্তক মনে রাখিস আমাদের একটি দিন আসবেক।

—আরে যা-যা নিকাল যা।

মিছিরবাবু অবহেলায় খৈনী মুখে দিয়ে বললেন—চলিয়ে আয় রাসমণি। বাবুর বহুৎ গোসা হোইয়ে গেছে। তোর তগদীরে রুপিয়া থাকলে পাবি—না হোলে ভিখ মাঙবি। আউর ক্যা?

রাসমণিকে নিয়ে উনি চলে গেলেন।

চম্পককুমার তখনো গজগজ করছেন—শ্যালা আমাকে সাহেবের হুকুম দেখাচ্ছিস। তুদের বাপ হ্যামিলটন সাহেব আমার হাতের লোক।

॥ আটত্রিশ ॥

ওদের সাহেব কোঠাতে পৌঁছতে বেলা বারোটা বেজে গেল। রাসমণি হতাশ এবং বিরক্ত। বলল আমার লেগে ক্যেনে আর দুয়ারে দুয়ারে ঘুরছিস বাবু? উয়ারা দিবেক নাই।

—ক্যেনে দিবেক নাই? খাদান তো উয়ার বাপের লয়। টুরিম্যান সাহেব ম্যানিজার আছে। বারকুলি সাহাব যো হুকুম দিয়েছে সো তো জরুর তামিল কোরবে। তু ঘাবড়াস না।

—কুছু হবেক নাই বাবু। উয়ারা জমিদার বটে। উয়াদের চেঞে আমরা কি সাহেবদের কাছে বেশি আপন হতে পারি? ছেড়ে দে ঈ-সব। চলে যাই। আমরা বনের মানুষ। বনের পাতা তুলেই পেটের ভাত যোগাড় করব।

—তোকে পাতা কেনো তুলতে হোবে রে রাসমণি? আমি তো হেড গোমস্তা। কুলিকামিনদের জবাব বহালি তো হামার হাতে। তোর নোকরীর কি ভাওনা? সরদারীটির লিয়ে এত তকলিফ।

গেটের চাপরাশী মিছিরবাবুর আমদানি। জাতিতে যাদব গোয়ালা। আরা জেলায় বাড়ি। ওঁর পায়ে হাত দিয়ে বলল—গোড় লাগি বাবা।

—জিতা রহো বেটা।

—তো ক্যা খবর বাবুজী?

—এক বাৎ বাটে। খাটিয়া লাগা দিহ। হম থোড়া লেট যাইয়ি সাহাব আনেসে পুকার দিহ।

চাপরাশীটা ব্যস্ত সমস্ত হয়ে অশ্বত্থ গাছের নিচে খাটিয়া পেতে দিল। শোয়া মাত্র ঘুমিয়ে পড়লেন উনি। ঘড় ঘড় শব্দে নাক ডাকতে লাগল। সেই শব্দ তরঙ্গে গাছের পাখীগুলো ঝঠ্‌পঠ্‌ উড়ে পালাল।

রাসমণি গাঝে গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসে চিবানো তামাক শাল-পাতা বের করে একটি চুটি পাকাল। চকমকি ঠুকে আগুন ধরালো। আয়েস করে টানতে টানতে উদাস চোখে গাছ গাছালি, পাখ পাখুড়ীর দিকে তাকিয়ে রইল। জোড়ায় জোড়ায় শালিক পাখীরা খুঁটে খুঁটে ফল খাচ্ছে। উড়ে বেড়াচ্ছে। অশ্বত্থ গাছের তলায় অজস্র জাম রঙের ছোট ছোট ফল পড়ে আছে। মিছিরবাবুর ভুঁড়িতেও দু'চারটে টুপ টাপ খসে পড়ছে! উড়ন্ত পাখীরা মলত্যাগ করছে।

সাহেবের আসার সময় হয়েছে। মিছিরবাবুর নাক ডাকছে। রাসমণি ঝিমুচ্ছে। কাবেরী ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল।

বারান্দার পর মোরাম বিছানো রাস্তা। তারপরেই শাল, মহুয়া, পিয়াল, বহড়া, শিশু শিরীষের বাগান। আগে ছিল বন। এখন তা সাজানো বাগান। কাবেরীর দৃষ্টিতে পড়ল গেটের কাছে অশ্বত্থ গাছের তলে খাটিয়া আশ্রিত মিছিরবাবুর বিশাল ভুঁড়ি। কৌতুহলী হয়ে দেখতে গেল এ কোন বনের চিড়িয়া।

পরনে নীলাম্বরী শাড়ি। পিঠ ভর্তি এলো চুল। গায়ে সোনার গয়না!

কাছে গিয়ে চোখ নাচিয়ে রাসমণিকে ঈশারা করল। রাসমণি বলল, হুঁ। বাবুর এমন নাক ডাকছে যেমন টেরেন আসছে রাণী-গঞ্জের ইষ্টিশনে।

কাবেরী বলল—তোরা কে? কোথা থেকে আসছিস?

—ঈ-বাবা! এইটি গোমস্তাবাবু বটে। বাবু এ বাবু মেমসাহেব ডাকছে—

—এঁ্যা। সাহেব মেমসাহেবে নিবেদিত প্রাণ পরম ভক্ত ব্রাহ্মণের কানে মেমসাহেব শব্দটা শ্রীরাধার কানে শ্রীকৃষ্ণ নামের মতই মধুর ব্যঞ্জনায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। উনি তৎক্ষণাৎ উঠে বললেন—হায় হায়। মেমসাহেব কাঁহা! ইয়ে তো বনবাসী শ্রীরামচন্দ্রজীকো পত্নী জনক নন্দিনী সীতা হ্যায়।

কামশাস্ত্রে পরম অভিজ্ঞা পুরুষ প্রাণমোহিনী যবন প্রিয়া নর্তকী নিজেকে সীতাদেবীর সঙ্গে উপমিত হতে শুনে আহ্লাদে আটখানা। নৃত্য ভঙ্গিমায় গাছের ডাল ধরে দাঁড়িয়ে বলল—গোমস্তাবাবু! আপনি এখানে কেন?

আহা! মধুস্বরা।

মাথার চাঁদি ফাটা রৌদ্রে যে কান ঝাঁ ঝাঁ করছিল তা শীতল হয়ে গেল। গদ গদ ভাবে বললেন—হম প্রভু শ্রীরামচন্দ্রজীকো সেবক। আর সীতাদেবীকো ভি দর্শন মিল গইল। ধন্য হো।

কাবেরীর পরিচয়ের গণ্ডীটা খুব ছোট। এরই মধ্যে সে দেখেছে পুরুষের লালসা কুটিল দৃষ্টি। তার মধ্যেও যে কেউ নারীকে দেবীরূপে দেখতে পারে এটা ওর ধারণাতেই ছিল না।

চাপরাশী একটা চেয়ার এনে পেতে দিল। কাবেরী তাতে বসল পা এলিয়ে। হাতলের উপর কনুইয়ের ভর দিয়ে মিছিরবাবু ও বাসমণির পেশা, নেশা, ঘর সংসার ও ছেলেপুলের ব্যাপারে নানা মেয়েলী প্রশ্নোত্তরে ওরা বেশ সহজ হয়ে উঠল। কাবেরী বলল—হ্যা রে মিঝান। তুর যদি কাজে জবাব হয়ে গেছে তবে তো বড় কষ্টে আছিস। তোর তিনটিই মেয়ে। আহারে একটা ছেলে যদি থাকতো।

জীবনের এত সংগ্রাম, এত লড়াই ঝগড়া, মাথার ওপর রোদের এত কড়া আঁচ যার চোখ থেকে একফোঁটা জল বের করতে পারেনি সেই বাসমণি কাবেরীর হৃদয়স্পর্শী সংলাপে কেমন হয়ে গেল। চোখ দুটো ছল ছল করে এল। গলার কাছে একদলা সর্দি আটকে গেল।

ধরা গলায় বলল—আমাদের দুখের খবর কে লেয় মেমসাহেব! তাতেই কাহুকে বলি না। তুই শুদালি বলেই বললাম।

খট্ খট্ শব্দে ঘোড়া ছুটিয়ে ব্যারাকলউ সাহেব গেট পেরিয়েই লাগাম টেনে ধরলেন। মুখটা সিঁদুরের মত লাল। গল্ গল্ করে ঘাম ঝরছে। ঘোড়া থেকে নেমে কাবেরীর কোমর ধরে বললে—ডারলিং। তুমি এখানে কেন? এসো—

মিছিরবাবু বললেন—আহা! রাম-সীতা যুগলমূর্তি হামার অন্তর পবিত্র হোইয়ে গেলো।

—তোমার কি বাৎ মিছিরবাবু?

যোগাযোগ
রে। আর
কান খুলে

—সেলাম সাহাব। হামি গরিব আদমী। ইয়ে রাসমণি হামসে ভি গরিব। লেকিন হম্‌লোকক৷ থোড়া বহুত ইজ্জত ছিল। জমিদারকো লেড়কা বরবাদ করিয়ে দিল। হম্‌লোগকো নিকালে দিল। রাস-মণিকে জুতা-সে পিটাই কোরবে বোলিয়ে দিলো। বহুত জুলুমসে পুকার দিল—তোরা নাগর বাপকো বোল এক পয়সা দিবো নাই। সরদারী দিবো নাই। হরগিজ নহী। হম্‌ সাহাবকো নোকর নহী। রূপিয়া আউর আওরৎ দেকর ঠিকাদারী কায়েম কিয়া। ইসমে বারকুলি সাহাবকো হুকুম নেহী চলে গা।

শুনতে শুনতে ব্যারাকলউ সাহেবের মুখটা রাগে গজ্‌গজ করতে লাগল। বললেন—ব্লাডি নেটিভ জমিন্‌দার-বাচ্চার এত স্পর্ধা! এই কৌন হ্যায়, আমার বন্দুক নিয়ে আয়। মিছিরবাবু সারে আদমী তৈয়ার করো। ট্রুম্যান সাহেবকো খবর দাও। রাসমণি একদিন হুল করতে গিয়েছিলি না? যা যত পারিস তীর ধনুক, সাঁওতাল নিয়ে আয়। আজ আমি জমিন্‌দার-বাচ্চাকে বোমবার্ড করে দেবো।

কাবেরীর বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। মিছিরবাবু থর-থর করে কাঁপতে লাগলেন। রাসমণি জোড়-হাত করে বলল—হেই সায়েব আমার কিরা রইল। খুন-খারাবী করিস না। আমার লেগে এত রাগ করিস না।

—তোর লেগে নয়রে রাসমণি। দিস্‌ ব্লাডি জমিন্‌দার-বাচ্চা হরদম আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। ওর বাপ আমার কাছে বিশ হাজার টাকা আগাম নিয়ে বেইমানি করেছে। পানমোহরা বন্ধ হয়ে গেছে। আর আমি বরদাস করবো না।

কাবেরী বলল—ঠিক বলেছ সাহেব। ঐ লোভী কুত্তাটার শিক্ষা পাওয়া উচিত। কিন্তু আমার মাথার দিব্যি রইলো—তুমি ঘরে এসো। স্নান করে খাওয়া-দাওয়া কর। মাথা ঠাণ্ডা করে ওকে ঢিট্‌ করার উপায় চিন্তা কর। এমন হড়বড় করলে ফল হয়তো উল্টো হবে। এসো, হঠকারিতা কোর না।

—মিছিরবাবু বললেন—হাঁ হুজুর। মেম সায়েব ঠিক বাৎ বলিয়েছেন।
কানে মেমসাহে ঔর হাতিয়ার যোগাড় করিয়ে আপনার কাছে হাজির
ব্যঞ্জনায় পরিপূর্ণ
হায়। মেমসাহেতব-তক্ক খানা-পিনা করিয়ে লেন।
পত্না জনক নন্দিনীর হুকুম যেন খেয়াল থাকে।

—জরুর। সাহেবকে সেলাম দিয়ে রাসমণিকে নিয়ে চলে গেলেন।

মিঃ ট্রুম্যান ডাক পাবার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলেন। ব্যারাকলউ সাহেব তখন সবেমাত্র লাঞ্চ সেরেছেন। রাগের মাত্রাটা কিছু কম হয়েছে। মিঃ ট্রুম্যানের উদ্বিগ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—আজ একটা এ্যাকশন করতে হবে মিঃ ট্রুম্যান। তুমি কি রেডী?

—কি এ্যাকশন স্যার?

—জমিনদার বাচ্চার ঠিকাদারী খতম করে তাকে কোলিয়ারি থেকে ঘাড় ধরে বের করে দিতে হবে।

—কেন স্যার?

—তুমি জানো সে আমাদের অর্ডার ডিসওবে করেছে। আমি প্ল্যান করেছি আজ সন্ধ্যায় আক্রমণ করব। জমিদার-বাচ্চাকে বেঁধে আনবো। কোলিয়ারি বন্ধ করে দেব। তাতে যদি দাঙ্গা ফৌজদারী, খুন খারাবী হয় তো হোক।

—কিন্তু স্যার। তার জন্য এতসব করতে হবে কেন? ঠিকাদারী খতমের নোটিশ দিলেই তো হবে।

—হ্যামিলটন সাহেব ঐ জমিনদারকে যে নোটিশ দেবেন না। উনিই চীফ। কাজেই নোটিশ ওকে সহি করে দিতে হবে। কিন্তু উনি তা করবেন না। দেখলে না যে হাবু সাহেবকে আমি ডিস্‌মিস করেছিলাম, তাকে উনি আবার বহাল করেছেন আমার মত না নিয়েই। ব্যাপারটা আমি মেনে নিয়েছি কোম্পানির স্বার্থে। কারণ হাবু সাহেব কাজের লোক।

মিঃ ট্রুম্যান আর কি পরামর্শ দেবেন? তব বললেন—আমরা একটা সুপারিশ করে দেখি না।

—কোন লাভ নেই। মিঃ হ্যামিলটন জমিনদারের পিছনে আছে। তারই প্রশ্রয়ে সে এত বেড়েছে। তারই পরামর্শে পান-মোহরায় মামলা হয়েছে।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। মিসেস নর্টনের মারফৎ জমিনদার বাচ্চা যোগাযোগ রাখে। আমার অজ্ঞাতে ওঁকে নাচ-মহলে নিমন্ত্রণ করে। আর জানোই তো, রাডি জমিনদার সেখানে সেক্সের দোকান খুলে

রেখেছে। কাউকে এনে ফেলতে পারলে সে কিছু বুঝবার আগে কাজ বাগিয়ে নেবে। মিঃ হ্যামিলটন সেই নাচ-গার্লদের সেঙ্গে ডুবে গেছে। কাজেই উনি আমাদের সুপারিশ মানবেন না।

—তাহলে ডাইরেক্ট এ্যাকশন হয়ে যাক।

—সিওর্‌। ঢালু দাস, সরাব নিয়ে এসো।

মিছিরবাবু জমিদারের উপর মোটেই প্রসন্ন ছিলেন না। সাহেবের হুকুম পাওয়া মাত্র তোড়জোড় শুরু করে দিলেন। দাঙ্গা ফৌজদারীর একদল লোক ওর সব সময়ে মজুত থাকত। তাছাড়া খাদে কুলির কাজে লেগে থাকত অথচ দাঙ্গাবাজ, তাদেরকেও জরুরী তলব দিয়ে নিয়ে এলেন। লড়াই জরুর লাগু হোবে।

॥ উ· চল্লিশ ॥

সারাদিন ধরে রাগে গজ্ গজ্ করতে করতে ক্লান্ত চম্পককুমার জ্যৈষ্ঠের ঘোলাটে সন্ধ্যায় হুইস্কির বোতল খুলে বসেছেন। তখনও মাটি থেকে আঁচ উঠছে। ঘরে থাকা দায়। গাছেরও পাতা নড়ছে না। গরমে গা গজ্ গজ্ করছে। নিরালা নিকুঞ্জেও শান্তি নেই। দাওয়া উঁচু বারান্দায় একটা প্রদীপ জ্বলছে। উনি বসে আছেন ফাঁকা উঠোনে।

সেই সময়ে রাগিনী এসে জুটল। খোঁপায় ফুল, চোখে কাজল, ফ্যাচ্‌না দিয়ে পরা শাড়ি। দাঁড়াল যেন বৃন্দাবনের নাগরী। গলায় দরদ ঢেলে বলল, ওমা। বাবু যে একেবারে ঘেমে নেয়ে গেছে গো। মুখপোড়া চাকরের দল একটু পাখা করতে পারে না।

দ্রুত পায়ে ছুটে গেল ঘরের ভিতর। একটা হাত পাখা নিয়ে ছুটে এল। ঘন ঘন পাখা চালিয়ে বাবুর গায়ের ঘাম শুকিয়ে দিল। ওঃ নাগর কি বস্তু? এমনি করে যদি ঢালু দাসকে কোনদিন বাতাস করতিস রাগিনী তবে সে বেচারা হাতে আকাশের চাঁদ পেতো।

তালপাতার পাখার বাতাস বড় মিষ্টি। বড় সুখ সেই বাতাসে গা মেলে দিতে। চম্পককুমার খুশি হয়ে বললেন—এইজন্যই তোকে এত পছন্দ করি।

পাখার ডাঁট দিয়ে পিঠ চুলকে রাগিনী বলল—বাবুর পায়ের

তলায় থাকব, চরণামৃত প্রসাদ পাব—সেই ভরসাতেই তো আছি বাবু। আপনার দয়াতে আজ দুটো পয়সার মুখ দেখেছি। না হলে সতীনের ঝাঁটা খেয়ে গায়ে খিল ধরে গিয়েছিল।

বলতে বলতে খালি গ্লাসটা ভর্তি করে ওঁর মুখের কাছে ধরল।

উনি গ্লাসে চুমুক দিয়ে বললেন—ভাবিস নে। তুই যখন আমার পায়ে এসে পড়েছিস। তখন আর কোন্ শ্যালা কি করতে পারে? আজ আমি হাঁকিয়ে দিয়েছি।

—কাকে বাবু?

—আরে তুই জানিস না? বারকুলি সাহেব বুড়া মিছিরকে দিয়ে হুকুম পাঠিয়েছিল ওর সেই পুরনো রাণ্ডী রাসমণি মিঝানকে সরদারীটা ফিরিয়ে দেবার জন্য। আমি বলে দিয়েছি—কারো বাপের ধার ধারি না। কোন শ্যালার ফোপর দালালি মানবো না।

বাগিনীর বুকটা কেঁপে উঠল। আবার যদি রাসমণি এসে জোটে তবেই তো তার সব খোয়ার বরবাদ। তাইতে আবার বারকুলি সাহেবের মদৎ। চম্পককুমার যতই তড়পাক্ সাহেবের কাছে একটা শিশু। এতদিন ওঁর কাছে থেকে সেই শিক্ষা ভালো করেই পেয়েছে।

বলল—বাবু! বারকুলি সাহেব সাংঘাতিক লোক।

তবে পানমোহরা থেকে হাবিস করলাম কী করে? ও বাবাজীর কোলিয়ারির মালিক হওয়ার সাধ খতম করে দিয়েছি। আরে সব বাপেরই বাপ আছে। বারকুলি সাহেবেরও ওপরওলা আছে। তার সঙ্গে আমার ব্যবস্থা। ফার্স্ট ক্লাস মেয়ে ব্যবস্থা করে দিয়েছি ওকে। বুঝলি ও যদি যায় ডালে ডালে তবে আমি যাব পাতায়। হুঁ হুঁ বাবা—আমার সঙ্গে চালাকি!

গভীর আত্মপ্রসাদে বাগিনীর কোমর ধরে বুকের কাছে টেনে নিলেন। পুলকে শিহরিত বাগিনী তৎক্ষণাৎ শৃঙ্গার রসে আপ্লুত হয়ে গেল।

ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া নিয়ে ছুটে এল পিয়ারালাল। তড়াক করে নেমেই বলল—হুজুর! জলদি ঘোড়া পর সওয়ার হোইয়ে চলিয়ে যান।

তীব্র রিরংসায় দেহ মন যখন টগ্‌বগ্‌ করে ফুটছে তখন এই হঠাৎ ছন্দপতনে উনি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন। বললেন—কেন?

—কারণ হ্যায় হুজুর। আইয়ে—জলদি কিজিয়ে। এই রাগিনী ভাগো হিঁয়াসে। ভীষণ ভয়ে হাঁটুর উপর কাপড় তুলে রাগিনী দৌড় শুরু করল। পিয়ারীলাল একরকম জোর করে চম্পককুমারকে ঘোড়ার উপর তুলে দিল। বলল—সিধা আপনার ঘরে চলিয়ে যান। বলেই ঘোড়ার পিঠে চাবুক মারল।

ঘোড়া ছুটতে লাগল। চম্পককুমার কোনরকমে রেকাবে পা রেখে লাগাম ধরে টাল সামলালেন। তারপর বাড়ির দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। জীবনে কখনো কখনো মালিককেও নোকরের হুকুম মানতে হয়।

পিয়ারীলাল বনের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তার একটু পরেই এক ঘোড়সওয়ারের দল দুরন্ত বেগে ছুটে এসে নিরালা নিকুঞ্জ ঘিরে ফেলল। টপাটপ্‌ ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নামলেন মিঃ ট্রুম্যান ও মিঃ ব্যারাকলউ। তাদের কাধে বন্দুক। কোমরে তলোয়ার। হাতে পিস্তল। ভারী বুটের শব্দ করে নিরালা নিকুঞ্জে ঢুকতে ঢুকতে বললেন—ফাকিন্‌ জমিন্‌দার বাচ্চা—হাত ওঠাও। হ্যানডস্‌—আপ!

কিন্তু কোথায় জমিন্‌দার বাচ্চা! ঘর খালি।

—মাই গড! ফাকিন্‌ পালিয়ে গেছে। খোঁজ—খোঁজ।

চারিদিক খুঁজেও পাওয়া গেল না। ওরা ডিপোর উপর উঠলেন। টালোয়ানরা ভয়ে ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপছে। মিঃ ব্যারাকলউ বললেন—ডরো মাৎ ম্যান। জমিন্দার বাচ্চা কোথায় গেল তাই বল।

জেরা করতে করতে খবর পেলেন—এই মাত্র ঘোড়া ছুটিয়ে পালিয়ে গেছে।

—অলরাইট। আজ থেকে কোলিয়ারি আমরা দখল নিলাম: জমিদার যেন ঢুকতে না পায়।

একজন টালোয়ান বলল—হুজুরেরই তো খাদ। যা বলবেন—তাই হবে।

—অলরাইট। চল মিঃ ট্রুম্যান—আমরা ছ-সাত নম্বর দখল নিই গে।

—ও কে স্যার।

আবার ঘোড়া ছুটল।

সাহেব কোঠির বাগানে ঢুকলে কে বলবে এটা জ্যৈষ্ঠের রাত। মনে হবে বসন্ত যেন চিরস্থায়ী। কচি কচি ঘাসের লনে নবমীর চাঁদের জাফরী কাটা জোছনা। লবঙ্গ লতিকার মৃদু সুবাস। বিবিবাগ থেকে ভেসে আসা পদ্ম ফুলের সুগন্ধ। জলসিক্ত ফুলগাছগুলির উপর দিয়ে বাতাস বইছে শিরশির করে।

সফল অভিযানের নায়ক মিঃ ব্যারাকলউ ফিরে এসে সেই লনে বসে পড়েছেন। মিঃ ট্রুম্যানও সঙ্গে আছেন। ডালু দাস নিয়ে এল বান্না করা বাছুরের ঠ্যাং। তরলা দাসী খুলে দিল হুইস্কির বোতল। কাবেরী এগিয়ে দিল গ্লাস। বিজয় উৎসব পালনের জন্য উভয়ে চিয়ার্স করে শুরু করলেন।

কাবেরী আক্ষেপ করে বলল—শয়তান জমিদার বাচ্চাকে ধরতে পারলে না সাহেব। আফশোষ।

মিঃ ব্যারাকলউ বললেন—ভাবিস্ নে। ওর জন্যে জোড়াটি ওর গালে বসাবার ব্যবস্থা আমি করে দেব।

সেই রাত্রিটা ওঁরা দারুণভাবে বিজয় উৎসব পালন করার প্ল্যান করলেন।

ডাক পড়ল বিবিবাথান পার্টির। খুলে দিলেন মদের ভাণ্ডার। সাহেব বাঙলো নাচে গানে কাদা হয়ে গেল।

কাবেরী নেশায় বুঁদ। সুরের আগুন লেগেছে তার বুকে। টলটলে পায়ে এগিয়ে গিয়ে নাচুনী বাজনদারদের থামিয়ে দিল।

বলল—তোরা থাম। আমি নাচব।

সব থ বনে গেল। মেমসাহেব বলে কি?

ওস্তাদ মন্মথ ঘোষ চারু মুচির গলা থেকে ঢোলকটি নিয়ে বললেন—তোদের ঐ বাঁদর নাচ বন্ধ করে এখানে সব বোস। দ্যাখ নাচ কাকে বলে।

বাস্তবিক সে এক অপূর্ব নাচ। চিনির চোখ ট্যারা। ওর বড় গুমোর ছিল ওর মত কেউ নাচতে জানে না। চারু মুচি ভাবত ওর মত ঢোলকে বোল তোলার ওস্তাদ নেই। সে তো মন্মথ ঘোষের

পায়ে লম্বা হয়ে বলল—গুরু! তুমি এমন এক পাতলুকা আম। এতদিন আছ—আমরা বুঝতেই পারিনি যে এত গুণের গুণী তুমি।

আসলে ওরা কেউ কারেরী, মন্মথ ঘোষের আসল পরিচয় জানে না।

ব্যারাকলউ সাহেব দারুণ খুশি। সারা রাত কেটে গেল।

যুদ্ধের পরেই শান্তি বৈঠক। বিতর্ক, আলোচনা, শান্তি প্রস্তাব এর চুক্তি। এইটেই মোটামুটি নিয়ম। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হল না। মিঃ হ্যামিলটন প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলেন—এই ঝগড়া কি করে মিটিয়ে নেওয়া যায় তার জন্যে।

মিঃ ব্যারাকলউ সাফ বলে দিলেন—দেখুন আপনার প্রশ্রয় পেয়েই জমিদার এতটা বেড়েছে। না হলে ওর কি সাধ্য ছিল পান-সাঙবায় আমার সঙ্গে মামলা লড়তে যায়। জানি না এতে আপনার কি লাভ হয়েছে। কিন্তু আমি তো একজন ইংরেজ। ভারতে শিল্পবিস্তারের নীতিগত প্রয়োজনে একজন ইংরেজ অন্য ইংরেজকে সাহায্য করবে এটাই রীতি। কিন্তু আপনি হলেন তার ব্যতিক্রম। ঐ প্রোপার্টিতে যদি আপনি নিজে কোলিয়ারি করতে আগ্রহী ছিলেন তবে আমাকে সে কথা বললেই পারতেন। একদা আমরা এক গ্লাসে দুজনে মদ খেয়েছি, একই মেয়ে দুজনে এনজয় করেছি। তেমনি কোলিয়ারিতেও সানন্দে অংশীদার করে নিতাম।

মিঃ হ্যামিলটন বেশ অস্বস্তির মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন। আমতা আমতা করে বলেছিলেন—এভাবে আমাকে অভিযুক্ত করবেন না মিঃ ব্যারাকলউ। জমিদারের সম্পত্তিকে জমিদার যা ভাল বুঝেছেন করেছেন। আমার তাতে দায়িত্ব নেই। বরং আপনিই একটি মেয়েকে কেন্দ্র করে ঝগড়াটা বাড়িয়েছেন।

—কোন মেয়েকে আমি কি করেছি তাতে আপনার কি?

—না-না। তা বলছি না। তবে সব ইস্যুগুলো এক সঙ্গে গুলিয়ে দেবেন না। মিঃ রায়ের সঙ্গে ঠিকাদারী চুক্তি আমি করেছি। অথচ আপনি জবরদস্তি বন্ধ করে দিলেন। আইনের কাছে আমি দোষী হলাম।

—আপনি ওর ঠিকাচুক্তি বন্ধ করুন। কারণ একজন ঠিকাদার

আমার হুকুম অমান্য করবে তা বরদাস্ত করব না। আপনি করবেন ?

—আচ্ছা। ওদের ঠিকাচুক্তি ক্যানসেল করব কিন্তু তাহলেও তিন মাস সময় চাই।

—ঠিক আছে। তিন মাস সময় দিলাম। আপনি কালকেই নোটিশ দেবেন ?

—নিশ্চয়। আপনি আমাকে বিশ্বাস করুন। কালকেই নোটিশ দেব।

—ধন্যবাদ। উনি চলে গেলেন।

ঠিকাচুক্তির মেয়াদ শেষ হবার আগেই তা একতরফাভাবে বন্ধ করে দেবার নোটিশটা পেয়েই মিঃ রায় ও চম্পককুমার এলেন মিঃ হ্যামিলটনের কাছে। বললেন—তাহলে স্যার সত্যি সত্যিই আমাদের ঠিকা বন্ধ করে দেবেন ?

—হ্যাঁ। মিঃ ব্যারাকলউয়ের সঙ্গে সেই কথাই হয়েছে। তবে ভেরি প্রাইভেটলি আপনাদের জানাচ্ছি যে তিন মাসের মধ্যে হয়তো ব্যারাকলউয়ের চাকরির চুক্তি নাকচ করে দেওয়া হবে। অতএব আপনারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

॥ চল্লিশ ॥

—ধন্যবাদ স্যার।

চম্পককুমার আবার তার নিরালা নিকুঞ্জে ফিরে এসেছেন। কিন্তু তার দেমাক ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। এখন উনি বড়ই চিন্তিত। ব্যারাকলউ সাহেবের সেই রুদ্র মূর্তি, লাঠি, বল্লম, তীর ধনুক, বন্দুক পিস্তল তরোয়ালের বিবরণ শুনেই পিলে চমকে গেছে। এতো আর সাঁওতাল নয়। দস্তুরমতো সাহেব। তাছাড়া সাহেবদের টুপীতে টুপীতে যে পাকা মহব্বৎ তার পরিচয় ঠিকা চুক্তি বন্ধের নোটিশ। হ্যামিলটন সাহেব যতই বলুন ব্যারাকলউ সাহেবের মেয়াদ শেষ হয়ে এসেছে—সেকথা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। ওদিকে পানমোহরা মামলার প্রথম শুনানী হয়ে গেছে। ইংরেজ মক্কেল, ইংরেজ ব্যারিষ্টার ও ইংরেজ বিচারপতি। মামলার রায় যে

কোন দিকে গড়াবে কে বলতে পারে ? স্বত্ব স্বামীত্বের মামলাটা অত সহজে মিটবার নয় কিন্তু সাময়িক নিষেধাজ্ঞা তো প্রত্যাহৃত হয়ে যাবে। মিঃ হ্যামিলটনের উপর এতটা ভরসা করা উচিত হয়নি।

আবার সেই মিছিরবাবু এবং রাসমণি। দেখেই ওর পিত্তি জ্বলে গেল। বললেন—কি হে মিছির গোমস্তা—খুব তো খেল দেখালে। মনে রাখবে আমরা জমিদার।

মিছিরবাবু বিনয়ে গদগদ কণ্ঠে জবাব দিলেন—হুজুর। বম্নিয়ার আদমী। গরিবের উপর কেনো গোসা কোরছেন ? হামি আপনার নোকর।

—হুঁ। মুখে তো মিছরির সরবৎ।

—হুজুরের মেহেরবানী। আমার কোন কসুর নাই। লেকিন হুজুর গরিবের উপর থোড়া খেয়াল রাখবেন। ইয়ে ব্যাচারী রাসমণি ভুখ পিয়াসে মরছে। পাওনাদার লোগ্ তন্ করিয়ে দিয়েছে। ইয়ার পাওনাটো উসুল করিয়ে দেন। হামি ভিখ মাঙতেছি।

উনি গম্ভীরভাবে কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন তারপর ওর বাবুকে ডেকে রাসমণির হিসাবনিকাশ করে পয়সা পেমেণ্ট করবার হুকুম দিলেন।

মিছিরবাবু ওকে সাতবার সেলাম দিয়ে চলে গেলেন।

যেতে যেতে রাসমণিকে বললেন—এতো দিনে তোর তক্‌দীরের থোড়া সাহারা মিললো। রূপিয়াটো আদায় করিয়ে লে ওকর বাবদ সরদারীর লিয়ে ফির আসবো—কি বল ?

রাসমণি বলল—বাবু তুই আমার বাপের মতন কাজ করলি। আর আমি উয়ার কাছে সরদারী করতে আসব নাই। টাকা পয়সা যা আদায় হবেক তুঁই লে গা। পাওনাদার দিকে শোধ দিঞে বেবাক তুঁই লিঞে লিস। আমাকে অন্য খাদে একটি কাজ ঠিক করে দে, গতর খাটাঞে খাব। বহুৎ ফোকটের পয়সা কামাঞেছি বলেই আজ আমার এই দশা। আর লয়। ই-বারে আমি তুকেই বাপ বলে মানব।

বলতে বলতে হঠাৎ ও মিছিরবাবুর পায়ে মাথা ঠুকতে শুরু করল।

—হায় রাম! আরে রাসমণি—তুই কি পাগল হোইয়ে গেলি রে ?

—না বাবু। পাগল হব ক্যানে? বুকটি ডহল বিকল করছে ত।

— ঠিক বা। চল ভুকে শেয়গড কলিয়ারীতে হাজরি কামিনের কাম বন্দবস করিয়ে দিবো। হাবু সাহাব পুরানা আদমি হ্যায়। তোর তকলিফ হোবে না।

—তাই কর বাবু।

—লেকিন এক বাৎ রাসমণি। আমি তোর রূপিয়া লিবো না।

—ক্যানে? লিবি নাই ক্যানে? এতকাল লিতে পেরেছিস। আজ ক্যানে রাগ করছিস।

—রাগ করি নাই রে রাসমণি। তুই আমাকে বাপ বললি— আর কি তুর কাছে রূপিয়া লিতে পারি? চল-চল বহুৎ দেরী হোইয়ে গেছে। হাবু সাবের খাদান চলিয়ে যাবে।

সেদিন সন্ধ্যায় বিবি বাথান গরম।

বাগিনী এক কাণ্ড করে বসেছে। এমনিতেই ওর যৌবনের গরবে মাটিতে পা পড়ছে না। তাইতে আবার চম্পককুমার নিরালা নিকুঞ্জে ফিরে আসাতে সেদিন সন্ধ্যায় হাঁটুর উপর কাপড় তুলে দৌড়বার কথা বেমালুম ভুলে গেছে কিন্তু ওর দেমাক ঢালু দাস সইতে পারে। অন্যে কেন সইবে?

বিবি বাথানের যে মেয়েগুলি ওকে সরদারনি বলে মেনে নিয়েছিল তারাই এখন বেঁকে বসেছে। সেই ব্যারাকপুর সাহেবের বিজয় উৎসবের রাতে দেদার খানা পিনা, নাচ গান, বাজনার পর ঘরে ফিরে এসে এক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে বাগিনী, চম্পককুমার সব ঝুটা মাল। আসলি মোতি বারকুলি সাহেব। আমরা যখন তাঁরই আশ্রিতা তখন বাগিনীকে কমিশন দিতে যাবো কেন?

বঞ্চনা দাসীর বরাবরের খর গলা। এক্ষেত্রেও সেই গলার জোরে সেকথা চাউর করে দিল।

আর রাগিনীও জানতো না যে মালিকের তকদীরের ফেরে নোকর চাকর, রক্ষিতা, বেগম সবাই আবর্তিত হয়। ও মনে করছে তার হকের পয়সা যে মারছে সে হারামী।

পিয়ারীলালকে সে কমিশনের ভাগ দেয়। কাজেই প্রথমে তারই শরণাপন্ন হল। সে গোঁফ চুমরে বলল—ঠিক বা। হামি সব

শ্যালীকে ঠাণ্ডা করিয়ে দিবো। তু ঘাবড়া মৎ।

কিন্তু সম্মুখ সমরে তার টিকিটিও দেখা গেল না। এদিকে দেখতে দেখতে চার সপ্তাহের কমিশন অনাদায়ী পড়ে রইল। সে এবার পুরোনো স্যাঙাত জাপান বাউরী, জামির মিঞার সাহায্য চাইল। ওরা বলল—ঠিক হঞেছে। বড় গাছে ন্যাড়া বেঁধে আমাদিকে ভুলে গেইছিলি। ই-বারে বুঝলি ত?

রাগিনী বলল—হঁ। বুঝলম। আর ভুল হবেক নাই!

জাপান বলল—ঠিক আছে। আজ খাদেই ইয়ার ফায়শালা করে দিবো। শ্যালীকে ধরে এ্যয়সা ধোলাই করবো যে বাপের কালে আর কমিশন দিতে ভুলবেক নাই বুঝলি।

এই ছিল তখনকার নিয়ম। কেউ বেগড়বাই করলে ধোলাইটাই ছিল আসল ওষুধ। এই ওষুধে চাপরাশীরা বশ করেছিল কুলি-কামিনদিকে। আর মালিক ম্যানেজাররা বশ করেছিল সবাইকে।

জাপান ও জামির দুজনে মিলে খাদের অন্ধকারে সেই বশীকরণ মন্ত্রের প্রয়োগ করল বঞ্চনা দাসীকে। কারণ তার গলাটাই প্রখর।

চুলের মুঠি ধরে একটা বন্ধ সুড়ঙ্গে টেনে নিয়ে গিয়ে কাপড়-চোপড় ছিঁড়ে আচ্ছাসে ধোলাই করে বলল—বল শ্যালী সবদাবী কমিশন দিস নাই ক্যেনে? গোটা গাঁয়ের লোককে মাতাঞে বেড়াঞে ছিলি। ই-বারে তুর কুন বাপে রাখবেক?

বঞ্চনার মুখ শুকিয়ে আমসি। এই অন্ধকার সুড়ঙ্গে ওকে মেরে ফেলে দিলেও কেউ হদিশ পাবে না। অপোগণ্ড ছেলেমেয়েগুলি না খেতে পেয়ে মা মা করে হাহুসে মরে যাবে।

রাগিনী খোঁপা খুলে চুলের কাঁটা দিয়ে ওর উরুসন্ধিতে ফুটিয়ে দিল। একবার নয়—বারবার।

বঞ্চনা যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল। হাতজোড় করে বলল—হেই রাগিনী তুর পায়ে পড়ি—আমাকে আর মারিস না। আমি কখন কিছু বলব নাই। ঘরে যেঞেই তুর সবদাবী কমিশন দিঞে দিব।

কবুলতি আদায় করে ওকে ছেড়ে দিল। কিন্তু কাল-সাপের লেজে পা দিয়েছে তা ওরা জানত না।

ছাড়া পেয়ে বঞ্চনা সোজা উপরে উঠে এল। বিবিবাথানের ঘরে ঘরে কেঁদে ককিয়ে বিলাপ করে অত্যাচারের কাহিনী বলল। তেঁতুল-তলার আড্ডাখানায় যতসব ছেলেবুড়ো মেয়ে পুরুষের সামনে প্রকাশ্য দিবালোকে আঙুল দিয়ে উন্মুক্ত উরুসন্ধির ক্ষতস্থান দেখাল।

সবাই ছিঃ ছিঃ করে উঠল। ছেলেরা আবার ছড়া কাটল।

বঞ্চনার কিন্তু ক্লান্তি নেই। সারাদিন পেটে ভাত পড়ে নি। মুখে জল পড়ে নি। মাথার চুল উড়ছে ফর ফর করে। কতবার কাদায় আছাড় খেয়েছে। সারা গায়ে কালি। খাদের কাদা লেগে সুরৎটাই পাল্টে দিয়েছে। ছেঁড়া কাপড় টেনে পাড়ায় পাড়ায় ক্ষ্যাপার মত বেড়াচ্ছে। পিছনে পিছনে তার নিজের ছানা-পোনা-গুলি ঝিলিং ঝিলিং করে ছুটছে। আর কিছু ছেলেমেয়ে যাচ্ছে তামাশা দেখতে। শ্রাবণের রোদ মাথার উপর আগুন বর্ষণ করছে। মাটি থেকে উঠছে ভিজে মাটির ভাপ। নির্যাতনের নিষ্করুণ বিজ্ঞাপন ক্রমশ লোকের কাছে পরিহাসের খোরাক হয়ে দাঁড়াল। কেউ কেউ হাসাহাসি শুরু করল, যারা সত্যিই দুঃখ পেয়েছে তারাও বিরক্ত-বোধ করল।

কিন্তু মলিন্দ ধোবী স্ত্রীর অপমানে ক্রুদ্ধ। সে তেঁতুল তলে বসে আছে। তেমন লোক পেলে বলছে—দ্যাখ হে মানুষ কেমন বেইমান। এই রাগিনীকে ছলনা দাসী ঘর ঢুকতে দিচ্ছিল না। ঐ বঞ্চনা তার জন্যে কত ঝগড়া করেছে। আর আজ সেই রাগিনীই কি না তাকে কাঁটা ফুটিয়ে দিল।

ও বেশি কথা বলে না। রাগটা তাই ভিতরে ভিতরে গুমরাচ্ছিল বিকেল-বেলায় রাগিনী যখন পুকুর ঘাট থেকে স্নান করে ফিরছিল তখন তার উপর বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল।

রাগিনীর কাঁখ থেকে পড়ে গেল জলের কলসী। পিতলের কলসী জোড়ের জায়গায় ভু'ফাঁক হয়ে গল-গল করে জল গড়িয়ে পড়ল। কাপড় ধরে টানাটানি, বঞ্চনাকে সে যেমন করে মেরেছে তেমনি করে সে রাগিনীকেও মারবে-এই তার পণ। সেজন্য সেও একটা চুলের কাঁটা নিয়ে রেখেছে।

রাগিনীও রণে ভঙ্গ দেবার মেয়ে নয়। উভয়ের দারুণ লড়াই। চেঁচামেচি। গালমন্দ, খিস্তি খেউড়। মলিন্দ ওকে প্রায় জব্দ করে

এনেছে। এবার কাঁটা ফুঁড়বে তখন রাগিনী তীক্ষ্ণ দাঁতের কামড় বসিয়ে দিল। যেন কাছিমের কামড়। মেঘ না ডাকলে ছাড়বে না।

আশে-পাশে লোক জমে গেছে তামাশা দেখতে। কেউ টিট্‌কিরী দিচ্ছে। কেউ বা রাগিনীর নিরাবরণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের তারিফ করে স্বীয় বাঞ্ছা প্রকাশ করছে। কিন্তু কেউ ছাড়াতে আসছে না। রাগিনীর দৃষ্টিনন্দন দেহপ্রান্তে সবাই নিমগ্ন হয়ে গেছে।

তখন কোথায় ছিল এক ধানীলঙ্কা ছুটে এসে এক লাঠি মারল রাগিনীর মাথায়। মলিন্দের এক খাবল মাংস নিয়ে টাল খেয়ে পড়ে গেল ও। তারপর নিজের বেহাল, বে-আবরু কম্পমান পয়োধরের উপর ধুলো কাদায় মাখামাখি ভিজে কাপড়ের নুড়ো চেপে ধরে স্রেফ লজ্জা ঢাকতে এমনভাবে ছুটে পালাল যে দর্শকরা সব— শিয়াল বে-শিয়াল রে বলে চিৎকার করে উঠল।

মলিন্দ সেই ধানী লঙ্কাটিকে দু'হাতে তুলে নাচতে লাগল— সাবাস বেটা সাবাস ! ও ছিল বঞ্চনার ছেলে।

।। একচল্লিশ ।।

নাটক যদি এখানেই শেষ হত তবে তো কথাই ছিল না। সন্ধ্যাকালে বসে গেল সালিশ বিচারের মস্ত প্রহসন। গড়িয়ে চলল গভীর রাত অবধি। বাণ্ডিল বাণ্ডিল বিড়ির ধোঁয়া উড়তে লাগল। খচ্ খচ্ করে চক্‌মকি জ্বলল। বিবিবাথানের যতসব গোলাম বিবিরা কেউ উকিল, কেউ জুরি, কেউ বা মুরুব্বী।

এক মামলায় আসামী রাগিনী বাউরিনী ফরিয়াদী বঞ্চনা দাসী। অন্য মামলায় আসামী মলিন্দ ধোবী ও ধানী লঙ্কা ফরিয়াদী রাগিনী বাউরিনী।

জুরির আসনে একদা জীবন রায়ের ঝুমুর দলের নাচুনী চিনি বর্তমানে হাঁড়িলালের স্ত্রী। সে হাত নেড়ে কথা বলে। নাক চিমড়ে হাসে। আর আছে সহিস মকবুল হোসেন, আরদালী কালিরাম ও মেথর বুড়া হাঁড়ি। বিচারক হল সাহেব কোঠির প্রবীণ গোলাম—হাঁড়িলাল বাবুর্চি। সে খুব ভাল শিক্-কাবাব বানাতে পারে। বাছুরের ঠ্যাং রান্না করতে পারে এবং শুয়োর-

বাচ্চার অসাধারণ স্বাদ সৃষ্টি করতে পারে। চিকেন কারী, মোরগ মোসল্লাম তো মামুলি বাৎ। ব্যারাকলউ সাহেব তার হাতের রান্না ভীষণ পছন্দ করেন।

একদিকে ছলনা, রাগিনী ও ঢালুদাস। তাদের উকিল চারুমুচি।

অন্যদিকে মলিন্দ, বঞ্চনা ও তাদের ব্যাটা ধানী লঙ্কা। তাদের উকিল কোতোয়াল ইরফান আলী। কারণ তার ছটি বেগম রাগিনীর দেমাকে বিক্ষুব্ধ। তাছাড়া একক পরিবার হিসেবে তার ঘরেই কর্মীসংখ্যা বেশি। তবু তো একটা বেগম গত হয়েছে বসন্ত রোগে। নাহলে তার সাতটি বেগম ছিল।

মামলার শুনানী শুরু হল।

বঞ্চনা দাসী তার অত্যাচারের কাহিনী করুণ ভাষায় বর্ণনা করে উপস্থিত জনমণ্ডলীর সহানুভূতি আদায় করে নিল।

ফিচেল উকিল চারুমুচি সওয়াল করল—তোমার কোন অঙ্গে কেমন করে কাঁটা ফুটিয়েছে তা দেখাও।

এ বড় লজ্জার কথা। রাগ এবং নেশার ঘোরে মানুষ অনেক কিছুই করতে পারে। তাই বলে বিচার মণ্ডপে কি সম্ভব? বঞ্চনা বড় মুশকিলে পড়ে গেল।

জুরিদের মধ্যে চিনি আপত্তি জানিয়ে বলল, বঞ্চনা তার রাগের বশে স্ত্রীলোকের সহজাত লজ্জা বিসর্জন দিয়ে বহুলোককে পুনঃপুনঃ সে ক্ষতস্থান দেখিয়েছে। অতঃপর তাকে আর লজ্জা দেবার প্রয়োজন নেই।

চিনি নাচুনী, চারুমুচি বাজনদার। কত আসরে সঙ্গত করেছে। তার ঢোলকে বোল বলেছে, সেই বোলে চিনির পায়ের ঘুঙুর ঝঙ্কৃত হয়েছে। আজ সে-ই কিনা তার দাবি নাকচ করে দিল! এ বড় দুঃখের কথা।

অতঃপর স্বীয় মক্কেলের সাফাই দিতে সে প্রশ্ন করল—লজ্জাবতীর লজ্জা ভাঙার কোন অভিপ্রায় তার নেই। কিন্তু বঞ্চনার দেহের যাবতীয় ক্ষত যে রাগিনী করেছে তার প্রমাণ কী?

বঞ্চনা বলল—ই বাবা! ইয়ার আবার পরমাণ চাই নাকি? উয়ার ছুঁছুটা নাগর আমাকে তুলাধুনা করে দিলেক।

ফুঁসে উঠল রাগিনী—চুপ কর ব্যাটাখাকী ! তুই আমার নাগর দেখলি কুথায় ? আবার যদি নাগরের নামে খোঁটা দিবি তো নোড়া দিয়ে তুর মুখ থেঁাতা করে দিব ।

বঞ্চনা ঠোঁট বেঁকিয়ে ছড়া কাটল—ও মাগো—

নাগর আমার হরি—
সেই জ্বলনে মরি ।

—চাড়ুম ! তেহাই দিল চারুমুচি । বিবাদী পক্ষের উকিল । সবাই হো হো করে হেসে উঠল ;

বিচারক হুঙ্কার দিলেন—এই গোল হচ্ছে । সবাই চুপচাপ থাকো ।

চারুমুচি বলল—কেউ কাপড় খুলে নেচে বেড়ালেই তো রাগিনী দুষী হবেক নাই । দোষ পবমাণ করতে হবেক ।

বঞ্চনা হতভাগিনী । তার কোন সাক্ষী নেই । সওয়াল জবাবে তাব উকিল ইরফান আলী বড় অসুবিধায় পড়ে গেল । এবার গলাবাজী ছাড়া অন্য কোন পথ নেই ।

সে বলল—বাগিনী বড় ঘুঘু মেয়ে । আঁট-ঘাট বেঁধে লোকজন নিয়ে খাদের আঁধারে এমনভাবে বঞ্চনাকে ধোলাই করেছে যেন কেউ সাক্ষী না থাকে । কিন্তু খোদা জানেন আসল ঘটনা কী ? দোষী কে ? আচ্ছা আপনারাই বলুন, কোন মেয়েমানুষ কি পারে প্রকাশ্যে দিবালোকে এত লোকেব সামনে নির্লজ্জ হয়ে গুপ্তস্থানের ক্ষত দেখাতে ? যদি তাব দেহে এবং মনে সাংঘাতিক আঘাত না লাগে ।

তার বক্তৃতায় সব মুগ্ধ হয়ে গেল । জুরীগণও বুঝি বা প্রভাবিত ।

চারুমুচি দৃঢ়তাব সঙ্গে বলল—হাজার কথা বলে তো লাভ নাই । ফৌজদারী মামলায় সাক্ষী না হলে বেবাক ফাঁকা । এইটি আইনের কথা । রাগিনীকে যাতে সরদারী কমিশন দিতে না হয় তাই বঞ্চনা যে নিজেই নিজের রক্ত বাব করে নেচে-কুদে বেড়াচ্ছে না তার পবমাণ কে দিবেক ?

বঞ্চনা বলল—আমি দিব । এই ছাখ সবারই সামনে আমি ব্যাটার মাথায় হাত দিএ কিরা করে বলছি—আমার সব কথা সত্যি ।

বলতে বলতে ও ধানী লঙ্কার মত তুখোড় ছেলেটিকে কাছে টেনে

তার মাথায় হাত রেখে আবার বলল—যদি মিছা কথা বলি তবে হে ভগবান তিন দিনের মধ্যে আমার ব্যাটা যেমন মুখে রক্ত উঠে মরে।

উকিল, মোক্তার, জুরি সব চুপ। মা হয়ে ছেলের মাথায় হাত দিয়ে এমন ভয়ঙ্কর দিব্যি গালার পর ইহাই প্রমাণিত যে বঞ্চনার অভিযোগ জলজ্যান্ত সত্য।

মক্কেলের দৃঢ়তা ও পারদর্শিতায় উকিল ইরফান আলী মুগ্ধ। দাড়িতে হাত বুলিয়ে তওবা, তওবা করে ঘাড় নাড়ল।

রাগিনী দোষী সাব্যস্ত হতে চলেছে। কিন্তু সে হারতে চায় না।

ঝন্ ঝন্ করে বলল—ও মাগো—মাছের আবার পুতের শোক। যার গণ্ডা গণ্ডা ছ্যেলা তার অমন একটি ছ্যেলায় মাথায় হাত দিঞে কিরা কাটলে কি বঞে যাবেক ?

চিনি বলল—তবু ত ছ্যেলা। বত্রিশ নাড়ী পাক দিঞে জনম নিঞেছে। বুকের দুধ দিয়ে মানুষ করেছে। কুন্ মায়ে কি মিছামিছি সে কিরা কাটতে পারে ?

বঞ্চনা বলল -সব পুত সমান লো রাগিনী। কই তুই একবার ব্যাটার মাথায় হাত দিঞে কিরা করে বল তো আমাকে বন্ধ সুঁদে টেনে নিঞে যেঞে জাপান আর জার্মিবের সঙ্গে তুইও মারিস নাই। মাথা থেকে কাঁটা খুলে ভুঁকে দিস নাই বল তবে আমি হার মেনে লিব।

জুরীদের সঙ্গে পরামর্শ করে চিনি বলল—হঁ। বল রাগিনী। না হলে জানব তুই দুষী।

রাগিনী এখন হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। তার মনে শুধু জয়েরই বাসনা। অসম্ভব জেদ। মনসারামের মাথায় হাত দিয়ে অবলীলায় দিব্যি গেলে বলল—এই দ্যাখ, আমার একটি ব্যাটার মাথায় হাত দিয়ে কিরা করে বলছি—বঞ্চনার কথা বেবাক মিছা। উ যে কুথায় কি ঘা ফোঁড় করে এনেছে তার কিছুই জানি না। ই-কথা যদি মিছা হয় তবে আমার ব্যাটাও মুখে রক্ত উঠে মরবেক।

বঞ্চনা থ' হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ব্যাটার মাথায় হাত দিয়ে কেউ যে এমন মিথ্যা দিব্যি করতে পারে এটা ওর ধারণাতেই নেই। ওর বিস্ময়ের সীমা রইল না।

রাগিনী তখন রাগে ভয়ে ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপছে। ওর প্রেমিক, নাগর, অনুগ্রহপুষ্ট এবং পৃষ্ঠপোষকগণ হৈ হৈ করে উঠল। তাদের বিচিত্র কলরব ও বহুৎ বাহবা শুনে রাগিনীর হুঁশ হল।

চারু-মুচি মলিন্দের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলার শুনানী ও মিথ্যা অভিযোগ করে তার মক্কেলের মানহানি ঘটানোর জন্য নতুন অভিযোগ নিয়ে আবেদন পেশ করে ফেলল।

বলা বাহুল্য এ মামলার বহু সাক্ষী। এমন কি জুরিদের অনেকে নিজের চোখে সে দৃশ্য দেখেছে। কাজেই এটাতেও রাগিনীরই জিৎ।

প্রবীণ গোলাম হাঁড়িলাল বাবুর্চি জুরিদের সঙ্গে পরামর্শ করে এক বৈপ্লবিক রায় দিয়ে ফেলল—অতঃপর আবেদন, নিবেদন, সওয়াল জবাব, ও সাক্ষ্য প্রমাণের বলে মলিন্দ ধোবী, বঞ্চনা দাসী ও ধনী লঙ্কা ধোবীকে দোষী সাব্যস্ত করা হল। কিন্তু যেহেতু তারা গরিব সেজন্য জুরিগণের লঘুদণ্ডের সুপারিশ মোতাবেক আসামীদিকে দু' হাঁড়া মদ ও একটি খাসি ছাগল জরিমানা দিতে হবে। উভয়বিধ শাস্তি অবিলম্বে কার্যকরী হবে।

হাততালি ও হর্ষধ্বনি সহকারে বিচারকের রায়কে অভিনন্দন জানানো হল।

বঞ্চনা বোবা। টস্‌টস্‌ করে চোখের জল ফেলে বলল—হে ভগবান! মানুষের আদালতে ন্যায্য বিচার পেলাম না। তুমি দেখো—তোমার আদালতে যেন ন্যায় বিচার পাই।

ব্যাচারী মলিন্দের মাথায় বজ্রাঘাত। জরিমানার দরুণ দু'হাঁড়া মদ ও একটা খাসি ছাগল কেনার পয়সা সে পাবে কোথায়?

শুভানুধ্যায়ীরা পথ বাৎলে দিল। একদিন সময় নিল ও। তারপর কেঁদে পড়ল মিছিরবাবুর কাছে। অনেক ধানাই-পানাই করে খৎয়ের উপর মলিন্দের টিপ-ছাপ নিয়ে একটি টাকা ধার দিলেন সপ্তাহে দু' আনা সুদের কড়ারে। অর্থাৎ ঐ এক টাকাতেই বন্ধক পড়ে গেল বঞ্চনা ও মলিন্দ। তার ঘরে কান্নার রোল উঠল।

তেঁতুল তলে ঢাক বেজে উঠল। হতভাগ্য শ্রমিক জবাইয়ের পয়সায় ভোজ লেগেছে। নাচো, কুদো, গান কর, মদ খাও। জরিমানা আদায় উসুলের স্ফূর্তি ওড়াও।

এমন কত নাটক নিয়তই ঘটে চলেছে। দেনার দায়ে বাঁধা

পড়েছে হতভাগ্য শ্রমজীবী। অত্যাচারে, নির্যাতনে জর্জরিত হয়েছে হৃদয়। ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠেছে মুখে। দলিত মথিত হৃৎপিণ্ডের উপরে ছুটে গেছে দুরন্ত ঘোড় সওয়ার।

তবু কি উৎসবের ঘাটতি আছে ?

না। নেই। তাই চিনি একটা কাঁচা খিস্তির গান বেঁধে ফেলেছে—

বঞ্চনা লো বঞ্চনা—

কেন করিস গঞ্জনা....

সুরকার ঃ হাঁড়িলাল বাবুর্চি ! তবলা লহরায় ঃ চারু মুচি !

সেদিন সালুঞ্চা কোলিয়ারির নূতন হাওয়া চানকে ত্বা শেরগড় কোল কোম্পানির যত সাহেব এসে হাজির। মিঃ ব্যারাকলউ, মিঃ ট্রুম্যান, মিঃ নর্টন তো আছেনই। কারণ তাঁরাই এই বিরাট যজ্ঞের হোতা, উদগাতা এবং তন্ত্রধারক। অর্থাৎ প্ল্যানার, ডিজাইনার এবং একজিকিউটার। মিস্টার হ্যামিলটন ও ফাদার উইলিয়ামও এসেছেন। কারণ আজকের এক্সপেরিমেণ্ট যদি সফল হয় তবে ভারতের কয়লাখনিতে একটা বিপ্লব ঘটে যাবে।

যেমন একবার ঘটেছিল যখন ষ্টিম পাম্প দিয়ে খাদের নিচে থেকে পাইপ মারফত উপরের জমিতে জল ফেলা হল। সেই বৈপ্লবিক কর্মের সাফল্য খাদের জল নিকাশেব একটা মস্ত সমস্যার স্থায়ী সমাধান করেছিল।

॥ বিয়াল্লিশ ॥

আবার আজ যদি ফ্যান চালু করে খাদের ভিতর বায়ু চলাচলের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করতে পারেন তবে গ্যাস নিকাশের স্থায়ী সমাধান হবে। তারই জন্য উন্মুখ প্রতীক্ষা।

অবশ্য ইতিপূর্বে শেরগড় কোলিয়ারিতে ফ্যান চালু হয়েছে। তবে তা ছিল প্রথম প্রয়াস। আকারে অনেক ছোট। এত ব্যাপক আয়োজন নেই। তবু তারই সাফল্য আজকের এই বৃহৎ পরিকল্পনার জনক।

ঈদ্রিস মিঞা ও মাণিক বাউরী ফিটার মিস্ত্রী। জনকয়েক

হেলপার নিয়ে সকাল থেকে সাফসুতরো, নাটবল্টু টাইট করা ও তেল গ্রিজ দেওয়ার কাজে লেগে আছে। ওরা একজন পূজারী ব্রাহ্মণ নিয়ে এসেছে। মা কালী ও বাবা বিশ্বকর্মার পূজা সেরে তবে চালু করবে।

সাহেবরা খৃষ্টান। তাদের ধর্মে মা কালী বলে কোন দেবতা নেই। কিন্তু বঙ্গদেশের অপ্রতিহত প্রভাবশালী দেব-দেবীরা সেই সাহেবদেরও মগজ ধোলাই করে নিজেদের ভালভাবেই প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছেন। এমন যে গোঁড়া পাদরী সাহেব ফাদার উইলিয়াম তিনিও বললেন—হ্যাঁ। নেটিভদের তাদের দেবতার পূজো করতে দাও।

হুঁ হুঁ বাবা! ভিতরে ভিতরে সব বাবাজীরই ভয় আছে।

পূজারী ঠাকুর ফুল বেলপাতা দিয়ে পূজো সারলেন। ইঞ্জিনের গায়ে সিঁদুর দিয়ে স্বস্তিক চিহ্ন আঁকলেন। জবাফুল চড়ালেন। সাহেব, মিস্ত্রী সবারই কপালে সিঁদুরের টিপ দিলেন।

তারপর বললেন—মায়ের নাম নিয়ে ইঞ্জিন চালু কর মাণিক।

ঈদ্রিস, মাণিক ও বয়লার ফায়ারম্যান শিবু ডোম গড় হয়ে প্রণাম করল। মায়ের প্রসাদী ফুল মাথায় নিয়ে তৈরি।

সিঁড়ি বেয়ে শিবু ডোম উঠে গেল বয়লারের ভাল্ব খুলতে। মাণিকের হাতে ইঞ্জিনের ষ্টিম লিভার। হেড মিস্ত্রি ঈদ্রিসের চোখ দুটো ইঞ্জিনের অন্ধি-সন্ধি জরিপ করে ফিরছে। মিঃ ব্যারাকলউ গম্ভীর। অর্ডার দিলেন—স্টার্ট।

শিবু আস্তে আস্তে ষ্টিম ভাল্বের চাকা ঘোরাল। দুরু দুরু বুকে লিভার টেনে ধরল মাণিক। ষ্টিম ঢুকল সিলিণ্ডারে—হস্!

একটু একটু করে ষ্টিম বাড়ছে। একটু একটু করে ইঞ্জিনের ফ্লাই হুইল ঘুরছে। বসার টানে ফ্যান ঘুরতে শুরু করেছে।

হস্ হস্—হস্ হস্। হস্ হস্। ষ্টিম বাড়তে বাড়তে ফুল স্পীডে ইঞ্জিনের ফ্লাই হুইল দ্রুত তালে ঘুরতে লাগল। সেই সঙ্গে বোঁ বোঁ শব্দে ফ্যানের গর্জন উঠল। ঝড় বইতে শুরু করল। কার সাধ্য তার সামনে দাঁড়ায়। বিরাট যন্ত্রদানব হাজার হাজার ঘনফুট বাতাস প্রতি মুহূর্তে উগরে দিতে লাগল।

রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষার পর চূড়ান্ত সাফল্যে ব্যারাকলউ সাহেব উল্লাসধ্বনি করে উঠলেন—হুররে!

সব সাহেবের চোখ-মুখ আনন্দে ঝক্‌ঝক্‌ করে উঠল। সবাই সমস্বরে হুররে বলে উঠলেন।

মিঃ হ্যামিলটন হাত বাড়িয়ে মিঃ ব্যাবাকলউয়ের করমর্দন করে বললেন—কন্‌গ্র্যাচুলেশনস্‌ মিঃ ব্যাবাকলউ। তুমিই ভাবতে শিল্প বিপ্লবের বৈতালিক।

মিঃ ব্যারাকলউ তখন আনন্দে আত্মহারা। অভিনন্দন পর্ব চলল বেশ খানিকক্ষণ ধরে। তারপর উনি বললেন—মিঃ ট্রুম্যান আমার সঙ্গে চল খাদে কেমন বাতাস যাচ্ছে দেখে আসি।

—ইয়েস স্যার। মিঃ ট্রুম্যান তৎক্ষণাৎ রাজী।

মিঃ হ্যামিলটন বললেন—ও, কে, মিস্টার ব্যাবাকলউ। আজকের এই সাফল্যের জন্য আজ সন্ধ্যায় ইউরোপীয়ান ক্লাবে ডিনার পার্টির আয়োজন করব। নিশ্চয় আসবেন।

—সিওর।

মিঃ ডিকসন বললেন—এলং উইথ ইয়োর ডাবলিং স্যার। আমরা ওঁর নাচ দেখতে পেলে নিজেকে ধন্য মনে করব।

অফকোর্স! অফকোর্স! ওঁরা দুজন ঘোড়ায় চড়ে চলে গেলেন। ন'নম্বর সিঁড়ি মুখের দিকে।

খাদের কুলি-কামিনদের তাক লেগে গেছে। হরিপদ পাম্প খালাসী অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে পাম্পটার দিকে। যেখানটা ঘন পাম্পে অনবরত অন্ধকার হয়ে থাকত তা কেমন পরিষ্কার হয়ে গেছে। পাম্প থেকে নির্গত বাষ্প বর্ষার মেঘের মত হেলতে দুলতে বায়ু নির্গমনের পথে চলে যাচ্ছে। এমন অলৌকিক দৃশ্য সে জীবনে কখনো দেখেনি।

টালোয়ানরা গোলাইয়ের টব গাড়ি ঠেলছিল। তাদের ঘাম ঝরা শরীর মৃদু সমীরে শীতল হয়ে গেল। একদল কুলি-কামিন ঘাম জবজবে কাপড়-চোপড় খুলে প্রায় উলঙ্গ হয়ে বসেছিল। তাদের গায়ে ঠাণ্ডা বাতাসের এমন মধুর আবেশ জড়িয়ে পড়ল যে ঘুমে ন্যাতা হয়ে গেল।

একেবারে আয়তনে যারা কয়লা কাটছিল তারা খবর পেয়ে ছুটে এল গোলাইয়ে। প্রাণভরা শ্বাস নিল। এখানে সেখানে পুঞ্জ পুঞ্জ কুলি কামিনের ভিড় জমে গেল ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে মাখার

বাসনায়। তাদের মনে কি যে আনন্দ হচ্ছে তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারছে না।

ভজন দাস মাইনিং সরদার বলল—আরে ব্যাটারা গায়ে হাওয়া লাগাঞে লে।

একজন জিজ্ঞাসা করল—এত হাওয়া কুথা থিকে এল বাবু?

— আরে তাও জানিস না। বারকুলি সাহেব নয়া হাওয়া মেশিন বসাঞেছে। আজকে চালু হল বুঝলি।

—অ। তাথেই। বাডা মেশিন বসালেক, দেহটা ঠাণ্ডা হঞে গেল।

ওরা সব কাজ ছেড়ে হাওয়া রাস্তায় হাজির। নানা প্রকারের জল্পনা-কল্পনায় মগ্ন। হঠাৎ ভারী বুটের শব্দে পিলে চম্‌কে গেল। যতসব কুলিকামিন পড়ি কি মরি দৌড় দিল। অন্ধকারে এলোমেলো বাতির ছটা দেখে মিঃ ব্যারাকলউ হাঁক দিলেন—হল্ট! দাঁড়াও। ডোণ্ট ডরো ম্যান। তোমরা ফিরে এসো। গায়ে কেমন বাতাস লাগছে বল।

কুলিকামিন, টালোয়ান সবাই ভয়ে ভয়ে ফিরে এল।

উনি বললেন—আমি জানি তোমরা এই বাতাসের জন্য সবাই হাওয়া রাস্তায় ভিড় করেছ। অন্যদিন হলে অবশ্যই চাবুক মেরে পিঠের ছাল তুলে দিতাম। কিন্তু আজ করব না। আজ খুব আনন্দের দিন। ভারতবর্ষে কয়লা-কুঠির ইতিহাসে এক গৌরবময় দিন। তোমরা যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন এই ব্যারাকলউ সাহেবের নাম করবে। আমি তোমাদের পচা গরম থেকে বাঁচাবার জন্য, প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন পাবার জন্য হাওয়া মেশিন চালু করেছি, তোমরা খুশি হয়েছ তো?

—হুঁ স্যার। হুঁ সায়েব। হাঁ হুজুর।

ওরা সব পরমানন্দে সায় দিল।

দিসেরগড়ের ইউরোপীয়ান ক্লাব সদা সর্বদাই বিবাহ বাসরের রূপ সজ্জায় সজ্জিত।

দামোদরের আধ মাইল উত্তরে একখানি সুদৃশ্য বাংলো। তার বাগানে মরশুমী ফুলের সমারোহ। রাস্তার দুপাশে দেবদারু কৃষ্ণ-

চূড়ার সারি। গেটে চাপরাশী। আস্তাবলে ঘোড়া, গাড়ি, কচোয়ান, সহিস। বাগানের পরিচর্যায় একদল মালি। তাছাড়া আছে বয়, বাবুর্চি, খানসামা, বাটলার, মুচি, মেথর।

ঝক-ঝকে তক-তকে মেঝে। দেওয়ালে চুনকাম। দরজা জানালায় রং। সুন্দব সুন্দব পর্দা। আবলুশ, মেহগনি ও সেগুন কাঠের চিত্র বিচিত্র কারুকার্যময় ফার্নিচাবস। সব কোম্পানিব খবচে।

মাঝের ঘরটার সাইজ একখানা টেনিস গ্রাউণ্ডেব সমান। উঁচু ড্যান্স ফ্লোব। মাথাব উপব ঝাড়লণ্ঠন। দুপাশে নানা রকমের ঘর। বসবাব, গুলতানি মারবাব ও প্রেম করবাব বিশেষ সুবন্দোবস্ত। বান্নাঘব, বাথরুম, মদ্য ভাণ্ডাব, তাস, দাবা ও হাউসী খেলাব আলাদা আলাদা ঘব।

মদের ভাণ্ডারে নানাবকম মদ। যার যেটা পছন্দ অর্ডাব দিলেই বাটলার টেবিলে গিয়ে সার্ভ করবে। সাহেব শুধু কুপনে সহি কববেন। মাসেব শেষে তাও হিসেব কবে বেতন থেকে কেটে নেওয়া হবে। অথবা কেউ নগদে দিতে পাবেন।

সাহেবরা ইচ্ছা করলেই পার্টি দিতে পাবেন। খরচটি দিলেই হল। ক্লাবে সাহেবদেব সঙ্গে মেমসাহেবরাও আসেন। মিসদের বিপুল ভাবে অভ্যর্থনা কবা হয়। তারা সব মদ্য পান করে বড় ঘরটায় নাচেন। ক্লাবের তরফ থেকে নানারকম অনুষ্ঠান হয়। অর্থাৎ নানা রকম রংদার প্রোগ্রামে জম-জমাট হয়ে থাকে।

আজ সেখানে মিঃ ব্যারাকলউ ও কাবেবীকে ঘিরে সাহেব মেমসাহেদের বিচিত্র গুঞ্জবণ। মিঃ হ্যামিলটন ড্যান্সফ্লোবে দাঁড়িয়ে একটা নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে ফেললেন—লেডিজ এণ্ড জেণ্টস!

আজ আমরা মিঃ ব্যারাকলউকে অভিনন্দন জানিয়ে স্বাস্থ্যপান করবো। সেই সঙ্গে অভিনন্দন জানাবো মিঃ ট্রুম্যান ও মিঃ নর্টনকে। কারণ তাঁদের অক্লান্ত সহযোগিতায় মিঃ ব্যারাকলউ এক যুগান্তকারী ঘটনা ঘটিয়ে দিলেন। আশা করি এই উদাহরণ মনে রেখে আমরা মহারাণীর বিজয় পতাকা ক্রমশ পৃথিবীর সব দেশে উড়িয়ে দিতে পারবো। লং লিউ দ্য কিং।

ওঁর বক্তৃতা শেষ হবাব পব মিঃ শেফার্ড ড্যান্সফ্লোর উঠে ঘোষণা

করলেন—লেডিজ এণ্ড জেন্টস ! আই হ্যাড এ গ্রেট প্লেজার টু ইনট্রডিউস মিস কাবেরী এ ম্যাগনিফিসিয়েন্ট বিউটি অফ ইণ্ডিয়া। নাউ সি উইল প্রেজেন্ট এ ক্লাসিক ইণ্ডিয়ান ড্যান্স উইথ অল চার্ম।

হাততালিতে হল ভরে গেল।

নাচের পোশাকে সুসজ্জিতা কাবেরী ড্যান্স ফ্লোরে দর্শকদের অভিবাদন জানাল।

॥ তেতাল্লিশ ॥

রাগিনীর বড় মন খারাপ। ছেলের মাথায় হাত দিয়ে দিব্যি করার পর থেকেই এক অজানা আশঙ্কায় হঠাৎ হঠাৎ চমকে ওঠে। মনসারামকে চোখের আড়াল করে না। কি জানি যদি হঠাৎ কিছু হয়ে যায়। লোকে বলে মিথ্যে দিব্যি করলে নাকি তে-রাত্তির পার হয় না। তাহলে ডাকু ছেলে মুখে রক্ত উঠে মারা যায়। তাই তিনদিন তিনরাত ওর চোখে ঘুম নেই, পেটে ভাত নেই। মনসারামকে বুক দিয়ে আগলে রেখেছে।

মামলাব জিতলেও লোকে ওর কথা বিশ্বাস করে নি। আড়ালে অনেক নিন্দে-মন্দ হয়েছে। ওর সতীন ছলনা দাসীর বুক টন টন করে উঠেছে। সেই যে একদিন হাবু সায়েবের চাকরির তদবির করতে রাগিনী গিয়েছিল সাহেব কোঠী। মনসারাম ট্যাঁ ট্যাঁ করে কেঁদে ছিল। সেদিন ছলনা নিজের বুকের স্তন্য দিয়ে সতীনপোর চোখে ঘুম এনে দিয়েছিল। তখন থেকেই সে তাকে নিজের সন্তান বলেই মনে করে।

মাতৃস্তন্যের অপার মহিমা। যে শিশু খায় সেও যেমন যে মাতা খাওয়ায় সেও তেমন আশ্চর্য মমতায় বাঁধা পড়ে যায়। মনসারাম তাকে বড় মা বলে। সেই ডাকে ছলনারও জগৎ সংসার মধুর হয়ে ওঠে।

সে বলেছিল—কেন মিছে ব্যাটার মাথায় হাত দিয়ে কিরা করতে গেলি ? হারলেই বা কি হত ? ঐ তো কটি টাকা জরিমানা। তারজন্যে এমন কাজ করলি। ব্যাটা হেন ধন একবার গেলে কেঁদে

কুল পাবি ? বুক ফেটে মরে যাবি না ? আঁটকুড়ির বিটি তুই শেষে এই করলি।

বাগিনী ছলছল্ চোখে সতীনের হাত ধরে অনুনয়ে ভেঙে পড়েছিল—তুই ত অনেক কাটান ছিটান জানিস দিদি। একটি কিছু করে দে। আমার মনসার যেন বিপদ আপদ না হয়।

—সে ত করবই রে। ক্ষ্যাপাকালীর পূজা দিব। সারাদিন উপাস দিঞে বাবা ধর্মরাজের তলায় ধন্না দিব। মদন ঠাকুর দিয়াসীর কাছ থেকে কবচ এনে পরাব।

—দিদি। আমার বড় ভুল হঞে গেছে। তুই আমাকে পায়ের ধুলা দে। বলতে বলতে এমন যে গরবিনী আহ্লাদিনী সেও শুঁটকি সতীনের পা ধরে কেঁদে ভাসিয়ে দিয়েছিল।

দুই সতীনের বহুপ্রকার পূজা আচ্চা, মানত, উপবাস ধর্ণা ও কবচ মাদুলীর জোরেই হোক বা প্রকৃতির নিয়মেই হোক মনসারাম বহাল-তবিয়তে বেঁচে রইল। সে নির্বিকার চিত্তে শার্ট কোট প্যাণ্ট পরে ছড়ি হাতে খনার সাথীদের সাহেবদের নকলে শাসায়—ব্লাডি ফাকিন, আমি তোমার নোকরী খটম করিয়ে ডিবো।

তে-রাত্তির পার করে বাগিনী কুল্জি-রোজগারের ধান্দায় বের হয়। কুলি-কামিনদের খবর খবর নিয়ে ঘরে ফিরে এল। তারপর আবার গেল সন্ধ্যাকালে। এখন দেখা হল মাহা মাঝির সঙ্গে। ও বলল —আরে বাগিনী, তুই যে ঘরে বসে আছিস আ ঈ-দিকে আমাদের সরদারীটিই যেতে বসেছে।

—ক্যানে ? তা যাবেক কোনে ? ও এমনভাবে শুধালো যেন সরদারীটা কোন বিষয় সম্পত্তির পাট্টা কবুলতি।

মাহা বলল—এই বুদ্ধি নিঞে সরদারী করবি বাগিনী ? জানিস না সেই স্যাঙান মেয়া রাসমণি শেরগড় কোলিয়ারিতে কাজে ঢুকেছে ঈ-দিকে জুমিদারের ঠিকাদারী খতম করবার জন্যে সাহেবরা নোটিশ দিঞেছে। তাহলে জুমিদারের ঠিকাদারী যদি চলে যায় তবে কি রাবকুলি সাহেব তুকে আমাকে সরদারী দিবেক ?

—হুঁ ত। সে ত বটে।

—তবে কিছু ত করতে হবেক। তুই আমার সঁথে সাথ দিবি ত ?

—হুঁ হুঁ। সে নিশ্চয় দিব।

—ঠিক আছে। তুই খাদকে আয়। একটি বুদ্ধি আমার মাথায় আছে।

মাহা মাঝি চলে গেল। একটু পর রাগিনীও গেল।

খানিকক্ষণ বাদ চম্পককুমার এলেন। ঘোড়াটা সহিসের হাতে ছেড়ে দিয়ে ডিপোতে একটা কাঠের পাটাতনের উপর বসলেন। মনটা বিক্ষিপ্ত। যে হ্যামিলটন সাহেবকে এত তোয়াজ করে বশে আনলেন তিনিই গতকাল হাওয়া মেশিন চালু হবার পর ব্যারাকলউ সাহেবের সঙ্গে গলায় গলায় ভাব জমিয়ে নিয়েছেন। রাত্রে ইউরোপীয়ান ক্লাবে বিরাট ডিনার পার্টি হয়েছে। তাতে নাকি কাবেরী দারুণ নাচ নেচেছে। সাহেবরা হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানিয়েছে। কোন এক হোমড়া চোমড়া সাহেব নাকি সে নাচ দেখে এত খুশি হয়েছিলেন যে নেশার ঘোরে কাবেরীর গালে চুমু খেয়ে ফেলেছেন।

শ্যালা নিমকহারামের জাত।

ঐ হ্যামিলটন সাহেবের পরামর্শেই পানমোহরায় মামলা মোকদ্দমা তারই উস্কানীতে ব্যারাকলউ সাহেবের আদেশ অগ্রাহ্য। রাসমণি তো উপলক্ষ মাত্র।

মনটা বড়ই খিঁচড়ে গেছে। এ সময়ে রাগিনীটা থাকলে তবু যাহোক মেজাজ ঠাণ্ডার দাওয়াই পাওয়া যেত। শ্যালী গেল কোথায়? দু'দিন থেকেই দেখছি না।

একজন টালোয়ান খাদ থেকে উঠে এল। ওকে জিজ্ঞাসা করলেন —আরে টালিয়ান, রাগিনী কোথা রে? ওকে দেখেছিস?

—হঁ বাবু। উত বারোনম্বর গোলাইয়ে বসে মাহামাঝির সঁথে ফুসুর ফুসুর করছে।

—হুম্। রাগে ছাতি ফেটে গেল। শ্যালা ছোটলোকের মেয়ার স্বভাব চরিত্রই আলাদা। নিত্যনতুন নাগর না হলে চলে না। দাঁড়া তোকে দেখাচ্ছি মজা।

—অ্যাই। আমার বাতি নিয়ে আয়।

ছ'নম্বর খাদের বায়ু চলাচল কেমন এলোমেলো। সিঁড়ি মুখ

দিয়ে বাতাস ঠিকই ঢুকছে। ফুরফুর করে গায়ে লাগছে। কিন্তু বারো নম্বর গোলাই পার হয়ে সামনেই ঘন কুয়াশার মত অন্ধকার। বাতাস আর ভিতরে যাচ্ছে না। যত সব ষ্টিম, ডাস্ট ওখানে থম মেরে দাঁড়িয়ে আছে।

কারণ বাতাস বারো নম্বর গোলাই দিয়ে পূব মুখে বয়ে যাচ্ছে একজষ্ট ফ্যানের টানে। তার নিচে যাচ্ছে না যেহেতু চাঁদনীর পাথর পড়ে হাওয়া রাস্তা বন্ধ।

গোলাইয়ে একটা কাঠের উপর পাশাপাশি বসে মাহা ও রাগিনী ফুসফুস করে বিড়ি টানছে। তাদের বাতি দুটো মিট্ মিট্ করে জ্বলছে। দুজনেই চিন্তিত।

মাহা ফিস্ ফিস্ করে বলল—দ্যাখ ঈ-ছাড়া গতি নাই। উ ম্যেয়া যতদিন বেঁচে থাকবেক ততদিন আমাদের বুকের কাঁটা বিরাবেক নাই। উয়াকে শেষ করে দিতে হবেক।

রাগিনীর বুকটা কেঁপে উঠল। অস্ফুট কণ্ঠে বলল—ঈস্! জীবনে মেরে দিবি ?

—কালসাপকে বাঁচাঞে রেখে কি করবি ? তুঁই বাবুর হুকুমটি একবার লে। উয়ার লেগে বাবুরও বহুত হেনস্থা হঞেছে। বললেই রাজী হবেক। তারপরে যা করবার আমি করব।

—কি করবি ?

—মেরে চাঁদনীতে ফেলে পাথর জঁাকা দিঞে দিব। কেউ বুঝতে লারবেক।

—ঠিক তো ?

—হঁ। মাহা নিচের দিকে নেমে গেল।

চম্পককুমার আসতে আসতে দ্রুত অপস্রিয়মান একটি বাতি দেখতে পেলেন।

রাগিনী ঘরে বসে আছে। উঠে দাঁড়াতে বা কোথাও যেতে পা চলছে না। যেন কত ভারী সেই পা দুটো। লোকের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করা····এক কথা আর জীবনে শেষ করে দেওয়া আরেক কথা। ষড়যন্ত্রের শামিল হতেই দুর-দুর করে বুক কাঁপছে।

হঠাৎ ওর মুখে বাতির ছটা লাগল। মুখ তুলে তাকাতেই দেখল সামনেই চম্পককুমার। ওর উঠে দাঁড়াবার ত্বর নেই। চড়াৎ

করে একটা ছড়ি বসল ওর পিঠে। ও কুঁকড়ে গেল। চম্পক-কুমার কর্কশ কণ্ঠে অশ্লীল ভাষায় যা বলল তাতে ওর বুক কেঁপে উঠল। কাতর কণ্ঠে বলল—না-না বাবু! সেটি মমে লিবেন নাই। আমি আপনার ছিচরণের দাসী। মাহার সঁথে অন্য একটি কথা হচ্ছিল।

—কি কথা?

ছ-তিনবার ঢোঁক গিলে বলল—মাহা বলছিল রাসমণির লেগে বাবুর বাডা হেনস্থা হএঞছে। সেইটির শোধ লিতে বাবু যদি হুকুম দেয় তবে উয়াকে খতম করে দিব।

—সত্যি বলছিস?

—হঁ বাবু। এই দেখুন চোখের কিরা করে বলছি।

—রাখ তুর কিরা। তুই ব্যাটার মাথায় হাত দিয়ে মিছা কিবা করিস। তোকে বিশ্বাস কি?

—তবে কি করলে বিশ্বাস হবে বলুন?

—তোকে ন্যাংটো করে চেকিং কবব। কি কবছিলি তা হাতে নাতে ধরব।

রাগিনীর কাপড় ধরে হ্যাঁচ্‌কা টান লাগালেন। ও শিউরে উঠল। বলল—বাবু! এই খানটা গোলাই বটে। কতলোক যাবেক আসবেক! তুমার ছটি পায়ে পড়ি আমাকে এত লজ্জা দিও না।

—বেশ। তবে ঐ দিকে বন্ধ জায়গাতে চল।

রাগিনীকে নিয়ে তেরো নম্বর লেভেল ধবে চলতে লাগলেন। তার নিচে দিকটা চাঁদনী হয়ে গেছে। চালের পাথর পড়ে সুড়ঙ্গ মুখ জ্যাম ধবে গেছে। সারিবদ্ধ খুঁটো দিয়ে শালবন বানিয়ে দিয়েছে। বাতাস ভারী হয়ে আসছে।

চলতে চলতে একটা চাতাল মত জায়গা পেল। রাগিনী সেখানে একটা খুঁটি ধরে দাঁড়াল। মুখটা নিচু।

এতটা পথ একসঙ্গে চলতে চলতে চম্পক কুমারের রাগ অনুরাগের আকার নিয়েছে। আসঙ্গ লিপ্সার পোকা মগজে কিলবিল করছে। মুখের কাছে বাতি ধরে বললেন—মুখ তোল।

রাগিনী মুখ তুলল। কৌতুকে উজ্জল ছটি চোখ। বলল—

বাবু। কি চেকিন করবেন? আমি মাহা মাঝির কাছে গেইছিলাম কিনা? এই তো!

—হ্যাঁ।

—তবে দেখুন।

নির্লজ্জা যুবতী নগ্নিকা মূর্তিতে দাঁড়াল যেন কোন জীবন্ত ভাস্কর মূর্তি। ঘন অন্ধকার পটভূমিতে দু'দিকে দুটি হলুদ আলোর শিখা তার উপর যোগ করল নতুন মাত্রা। প্রকৃতি নিস্তব্ধ। বাতাস অবরুদ্ধ। পাতাল পুরীর চাঁদনী থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল অশরীরি প্রেতাত্মার দল।

চম্পককুমারের মনে হল—একি? কোন যাদুকরী তাকে তলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে অতল অন্ধকারের দিকে? এ কোন রাগিনী? এমন অলৌকিক যৌবনের আশ্চর্য দ্যুতি এতদিন কোথায় লুকিয়েছিল? মুগ্ধ বিস্ময়ে তারদিকে তাকিয়ে রইলেন।

রাগিনী বলল—কই বাবু? চেকিন করুন।

শিল্কের আংরাখা, জরি পাড় শান্তিপুরী ধুতি সযত্নে টাঙিয়ে রাখলেন একটা খুঁটিতে। বিবস্ত্র মানব রিরংসায় ব্যাকুল।

আলো ঠিকরে পড়েছে চাতাল মত জায়গাটাতে। উনি সেখানে ডাকলেন—আয় রাগিনী। বোস এখানে।

সেই রাবণ, রসিক, হপনা, রবি ঝড়ু, মঙ্গলা, শবনী, নীলমণি, মাকু, সরির দল তাদের ঘিরে দাঁড়াল। একান্ত অনুগত মদন সরকার হাতজোড় করে সামনে দাঁড়াল। তার চোখে মুখে কি কাতর প্রার্থনা—প্রভু। আপনাদের নিতে এসেছি। আসুন। সেই প্রেত লোকের রাজারাণী হয়ে থাকবেন। এরা আপনার অনুগত কুলি কামিন। নতুন খাদ খুলেছে। খুব ভাল কয়লা। আপনি ছাড়া কে তার ঠিকাদারী করবে? আসুন বাবু—আমি নতুন মদের ভিয়েন করে রেখেছি।

নিকষ কালো অন্ধকারের যবনিকায় দুটি আলোর হলুদ শিখা খুব ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে আসছিল। দুটি হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন খুব গভীর--খুব গাঢ়—খু-উ-ব নি-বি-ড় হতে হতে দ্যুতিহীন দীপ ও শব্দহীন সুড়ঙ্গে ক্রমশ বিলীন হয়ে গেল।

তৃতীয় পর্ব

॥ এক ॥

বিবি বাঁধের ঘাটে চিনি হাত তুলিয়ে গান গায়—

এক মরণে তুজন মরে এমন মরে কয়জনা....

এ গান বঞ্চনার কানে মধু বর্ষণ করে। পোকা খাওয়া দাঁতের মাড়ি বের করে হাসে। হিস্ হিস্ করে শব্দ হয় সেই হাসিতে। ঘাটের মানুষকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে—হুঁ হুঁ বাবা! উপরে ভগমান আছে। তার বিচারে কারু রেহাই নাই। টাকার গরম কুথা গেল? কুথায় রইল জুয়ানীর লবচবানি? এই তো বাবা-- কুকুরের মত ম'লি।

সে এক ঘৃণ্য জঘন্য কেচ্ছা-কাহিনী। লোক হাসির হদ্দ। মৃত্যু সব জীবেরই অনিবার্য পরিণতি। কিন্তু রাগিনী চম্পকের মত মরণ যেন কারো না হয়।

মিঃ ট্রুম্যানের জিভ আড়ষ্ট হয়ে যায় তাঁর বসের কাছে রিপোর্ট দিতে গিয়ে। তুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরের দিন ব্যাপারটা জানাজানি হয়। এখনো ডেডবডি উদ্ধার হয়নি। মিঃ ট্রুম্যান মিঃ ব্যারাকলউকে বললেন—স্যার! দেয়ার ইজ এ ন্যাষ্টি একসিডেন্ট।

উনি বললেন—হোয়াট?

---ইয়েস স্যার। প্রিন্স চম্পক এণ্ড রাগিনী ডায়েড বাই ইনহেলেশন অফ কারবন ডাই অক্সাইড গ্যাস হোয়াইল দে ওয়ের কাপল্ড টুগেদার।

—এলাস! দ্য পুওর ম্যান এণ্ড উওম্যান।

এরপর উদ্ধারকার্য। রিপোর্ট লেখা। সাহেবদের ডিউটি শেষ। ইউরোপীয়ান ক্লাবে বসে রসিয়ে রসিয়ে সেই গল্প করা আর মদ্যপান। হ্যামিলটন সাহেব ডিপ্‌লী শক্‌ড। তাঁর একটা হাতিয়ার ভেঙে গেল বলে। জমিদার লজ্জায় ঘৃণায় শয্যাশায়ী পুত্র শোকের জ্বালায়। ঢালু দাস, ছলনা দাসী আতান্তরে পড়ল তাদের তুধেল

গাইটা মারা গেল বলে। অথচ মনসারাম হ্যাট কোট পরে দিব্যি ঘুরে বেড়ায় খেলার সাথীদের ড্যাম ব্লাডি গাল দিয়ে। সে বুঝতেই পারেনি মা মারা গেলে কি হয় ?

শোকদুঃখের মর্মান্তিক ঘটনা হাসি মস্করার ব্যাপার হয়ে পথে ঘাটে আলোচিত হতে লাগল।

মিঃ ব্যারাকলউ তাঁর ডায়েরীতে এই দুর্ঘটনার কার্যকারণ সম্পর্কে লিখলেন নতুন মাইন ফ্যান চালু হবার পর খাদের মধ্যে বায়ু প্রবাহের বড় রকম অদল—বদল ঘটেছিল। বায়ুচাপের তারতম্যের দরুন চাঁদনীর ভিতর থেকে ব্ল্যাক ড্যাম্প গ্যাস বেরিয়ে এসেছিল। রাগিনী ও চম্পক তা চেনে না ও জানে না। শ্বাসকষ্ট নিশ্চয় হয়েছিল। তা থেকে অনুভব করা উচিৎ ছিল কিন্তু আণ্ডার এক্সট্রিম সেকস্যুয়াল আর্জ তারা নিজেদের হারিয়ে ফেলেছিল। এণ্ড দে লষ্ট ফর এভার।

কোন এক মৌ-ঝরা সন্ধ্যায় নর্টন সাহেবের বাংলোয় তুলকালাম কাণ্ড। ব্যাচারি কামার মিস্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার হয়ে কি হ্যাপাতেই না পড়েছেন। মিঃ হ্যামিলটন তাঁকে ব্লাডি, ফুল, বাসটার্ড ইত্যাদি গালাগাল সহ গুড ফর নাথিং ঘোষণা করে চাকরি নট হুমকি দিয়েছেন। মিসেস নর্টন তাঁকে গেট আউট বলে দিয়েছেন।

অথচ সে ব্যাচারি জানেন না কেন তার কপালে এত লাঞ্ছনা জুটল ? তিনি তাঁর পৌরুষের মর্যাদাটুকুও ওঁর হাতে সমর্পণ করে দিয়েছেন তবু মন পেলেন না। একটা ঘরে ঢুকে মদের বোতল খুললেন। কিন্তু টিউলিপ তৎক্ষণাৎ তার হাত থেকে তা কেড়ে নিয়ে অনুনয়ে ভেঙে পড়ল—ফর যীশাস্ ক্রাইষ্ট ! ড্যাডী, তুমি ড্রিংক করোনা।

উনি ভাঙা গলায় বললেন—মাই চাইল্ড ! আমি যে কেন এত ড্রিংক করি তা তোকে বলতে পারব না। বড় হয়ে সব বুঝবি।

গভীর অবসাদে জামা-প্যাণ্ট জুতো পরেই বিছানায় এলিয়ে পড়লেন। টিউলিপ অনেকক্ষণ তার দিকে ট্যাপ্ ট্যাপ্ করে তাকিয়ে রইল। চোখ জ্বালা করে উঠল।

মিঃ হ্যামিলটন তখনো গর্জন করছেন তুমি তো জানো ডারলিং,

প্রিন্স চম্পক কুমার আমার সঙ্গে রীতিমত এগ্রিমেণ্ট করেছিল—পানমোহরা ও সাতঘরিয়া তলস্বত্বের লীজ বন্দোবস্ত দেবার। কিন্তু তার আগেই ওঁর বাবা তা মিঃ ব্যারাকলউকে দিয়ে বসে আছেন। এটা ব্রীচ অফ ট্রাস্ট। আমি যখনই জানতে পারলাম তখনই জমিন্দারকে দিয়ে দেওয়ানী, ফৌজদারী মামলা করালাম। কিন্তু এখন প্রিন্স চম্পকের মৃত্যুব পর আমাদের অবস্থাটা খারাপ হয়ে উঠল না কি?

—তা ঠিক।

—অথচ খ্যাখো—তোমার হাজব্যাণ্ডের রীত চরিত্র। মিঃ ব্যারাকলউয়ের সঙ্গে আমাদের এমন একটা ব্যাড রিলেশন তথাপি সে তার বাংলোতে যায় মদ খেতে। ব্লাডি ফুল এক বোতল মদ পেলে নিজের বৌটাকেও বিক্রি করে দিতে পাবে এত নীচু তার মন।

মিসেস নর্টন বললেন—ডোণ্ট বি সিলি ডিয়ার। উনি তো সে কাজটা করেই ফেলেছেন। কিন্তু কথা হচ্ছে—আমাদের মিস্ ফরচুন—

—প্রিন্স চম্পকের অকাল মৃত্যুর কারণে; আমাব সন্দেহ হয় এখানেও মিঃ ব্যারাকলউয়েব ষড়যন্ত্র আছে। কারণ যে মেয়েটিব সঙ্গে ঐ নোংরা ব্যাপাবটা ঘটেছে সে তো তাঁরই রক্ষিতা ছিল।

—সত্যি তো। একথাটা তো ভেবে দেখিনি।

—ভেবে খ্যাখো। এমন তো হতে পারে যে চম্পককে কোন বিপজ্জনক জায়গায় টেনে নিয়ে যাবার জন্যই মেয়েটিকে কাজে লাগিয়েছিল।

মিঃ হ্যামিলটনের মাথাটা পরিষ্কার হয়ে গেল। আহা-হা—এইসব মেয়েদের দুষ্টু বুদ্ধিগুলো বাস্তবিক মারাত্মক। চম্পককুমাবেব মৃত্যুর সঙ্গে মিঃ ব্যারাকলউয়ের কোন হাত নেই জেনেও কথাটাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়ে জমিদারবাবুর মগজ ধোলাই করতে দোষ কী?

বললেন—হ্যাঁ। কথাটা আমি ব্লাডি ওল্ড ফক্স জমিন্দারকে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেব। ওর কাছ থেকেও পানমোহরা

সাতঘরিয়া মৌজার লীজ বন্দোবস্তের একটা এগ্রিমেণ্ট করিয়ে নিয়ে আমরা পানমোহরার দখল নেব।

—রাইট।

টিউলিপ আড়াল থেকে সব শুনছিল। মনে মনে হাসল—হায়রে দুরাশা! তাব মা মালিক হবার স্বপ্ন দেখে। বিষয় ভাবনা কত নিম্নগামী। সে আবাব তার বাবার ঘবে ঢুকল। কিন্তু তখন উনি সেখানে নেই। এঘর, সেঘর খুঁজল। বাবুর্চি খানসামাদেব জিজ্ঞাসা কবল কিন্তু তারাও কিছু বলতে পারল না। অবশেষে গেটের দারোয়ান বলল—হ্যাঁ—সাহেব বাইরে গেছেন।

ও ভীষণ বিচলিত হয়ে পড়ল। ঝোঁকের মাথায় বাইরে গেছেন। না জানি কোথায় কি করে বসবেন? রাগ, বিদ্বেষ, অপমান, লাঞ্ছনা সবই হয়তো মদের সঙ্গে হজম হয়ে যেত। নেশায় বেহুঁশ হয়ে পড়তেন। টিউলিপ তা হতে দেয় নি। সেজন্য নিজেকে বড় অপরাধী মনে হল।

ক্রমশঃ রাত বাড়ছে। মিঃ হ্যামিলটন চলে গেছেন। মিসেস নর্টন নেশায় বেহুঁশ হয়ে নগ্নদেহে বিছানায় গড়াগড়ি খাচ্ছেন। তাকে সে অবস্থায় দেখলেই বমি আসে টিউলিপের। একটা প্রচণ্ড ঘৃণার স্রোত সর্বাঙ্গে রী রী করে ওঠে।

রাত গভীর। চারিদিক নিঝুম। সবাই ঘুমোচ্ছে। কোথাও কোন সাড়াশব্দ নেই। বাড়িতে এতগুলো মানুষ কিন্তু তার বাবার জন্য কারও এতটুকু ভাবনাচিন্তা নেই। অথচ সে মাথাব ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করে তবে সব ফুটানি করে।

টিউলিপ আস্তে আস্তে বেরিয়ে আস্তাবলে এল। ঘোড়া বের করল। টানতে টানতে গেটের কাছে এল দারোয়ান তখন অকাতরে ঘুমুচ্ছে। তার ঘুম না ভাঙিয়ে নিজের হাতেই গেট খুলে ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে গেল।

রাস্তাঘাট সব চেনা। এখানেই সে বড় হয়েছে। প্রায় সবারই বাংলো চেনে। কিন্তু কার কাছে যাবে এইটাই ভেবে স্থির করতে পারছে না। দুল্‌কি চালে ঘোড়া চলছে। মাঝে মাঝে গা ছম্‌ছম্‌ করছে। ঝোপ জঙ্গলের ছায়া পার হতে ভয় করছে। হঠাৎ ভীষণ ভয়ে বুকটা কেঁপে উঠল। কে যেন ওকে

বলেছিল এখানে একটা হুমদো ভূত আছে। সে খাদের এক্‌সিডেণ্টে মরে ভূত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কথাটা মনে পড়তেই হাত থেকে লাগাম খসে পড়ল। সারা গা থরথর করে কেঁপে উঠল। ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে পড়ল। সামনের বাংলো থেকে পাহারাওলা হাঁক দিল—কৌন হ্যায় ?

টিউলিপ আরো ভয় পেয়ে গেল। পাহারাওলা কাছে এসে বলল—সেলাম মেমসাব। আপনি এত রাতে কোথায় যাবেন ?

মানুষ দেখে টিউলিপের ধড়ে প্রাণ এল। জিজ্ঞাসা করল—তুমি কার বাংলোর চাপরাশী ?

—জী ! টুরিম্যান সাহেবের।

কিন্তু না ভেবেই টিউলিপ বলল—আমি ওর সঙ্গে দেখা করব। পাহারাওলার গোঁফের ফাঁকে এক বিচিত্র হাসি খেলে গেল। ওর নিজের সাহেবের জন্য বেশ গর্ব হল এই ভেবে 'যে এমন সুন্দরী খাস বিলাইত বালা আওরৎ তার সাহেবের কাছে অভিসারে এসেছে।

বলল—আইয়ে মেমসাব। অন্দর আইয়ে সাহাবকো খবর করিয়ে দিচ্ছি।

ওকে বেশ খাতির করে মেহেদী গাছের বেড়া দেওয়া বাউণ্ডারী পার করে বাগানে একটা চৌকিতে বসতে দিল। ও গেল সাহেবকে ডাকতে। খানিক পর ট্রুম্যান সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে ফিরল, টিউলিপ ওকে দেখে উঠে দাঁড়িয়েছে। মিঃ ট্রুম্যান বললেন—হ্যাল্লো টিউলিপ তুমি ? এত রাত্রে ? কি ব্যাপার ?

টিউলিপের মুখ দিয়ে কথা সরল না। পাহারাওলা সরে গেল ! মিঃ ট্রুম্যান বললেন—বল টিউলিপ ! এনি ট্রাবল ?

টিউলিপের ধাত এল। বলল—হ্যাঁ—মিঃ ট্রুম্যান।

মিঃ ট্রুম্যান ওর হাত ধরে চৌকিতে বসিয়ে দিয়ে বললেন—হ্যাঁ বল।

এই মেয়েটি ওর চোখের সামনেই তর তর করে বেড়ে উঠছে। তাই পরস্পরের মধ্যে একটা স্নেহ ভালবাসার সম্পর্ক ছিল। হাত ধরে অন্তরঙ্গভাবে কথা বলতে দেখে পাহারাওলা মনে করল—হ্যাঁ

—মুরগা ফাঁস গইল। চোখ দুটো জ্বেলে রাখল দৃশ্যের ক্লাইমেক্স দেখার জন্য।

টিউলিপ একটু একটু করে সব ঘটনা বলল এবং মিঃ ট্রুম্যানের হাত ধরে কান্না-ভেজা গলায় তার বাবাকে খুঁজে দেবার আবেদন করল।

উনি বললেন, তুমি কিছু ভেবো না টিউলিপ। চল আমরা আগে কলিয়ারী গিয়ে সম্ভাব্য সব জায়গায় লোকজন পাঠিয়ে দিই গে।

—চলুন।

দুজনে দুটি ঘোড়ায় চড়ে প্রথমে আটনম্বর খাদের হাজরি ঘরে পৌঁছলেন। আর সেখানেই পেয়ে গেলেন মিঃ নর্টনের সংবাদ। হাজরিবাবু বললেন—উনি অনেকক্ষণ আগে খাদে গেছেন।

মিঃ ট্রুম্যান টিউলিপকে সঙ্গে নিয়ে খাদে নামলেন। বেশ বড় খাদ। ঘুরতে ঘুরতে সবাইকে জিজ্ঞাসা করছেন। কিন্তু কেউ সঠিক বলতে পারছে না। অবশেষে একজন পাম্প খালাসী বলল —উনি ষোল নম্বর পূর্বা ডিপের পাম্প দেখতে গেছেন।

টিউলিপ স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল—যাক একটা খবর পেলাম।

ষোল নম্বর পূর্বা ডিপ অনেকদূর। চলতে চলতে বুক হাঁস-ফাঁস করছে। গায়ের জামা প্যান্ট ঘামে ভিজে সপ সপ করছে।

মিঃ ট্রুম্যান বললেন—তোমার চলতে কষ্ট হচ্ছে টিউলিপ?

ও লজ্জিত কণ্ঠে বলল—তা একটু হচ্ছে।

—তাহলে এখানে একটু বোস। আমি দেখে আসি।

টিউলিপ আঁৎকে উঠল—ও-নো-নো। আমি ভীষণ ভয় পাবো।

মিঃ ট্রুম্যান হেসে ফেললেন। ওর পিঠে আলতো টোকা দিয়ে বললেন—চল।

—আমি আপনাকে খুব কষ্ট দিচ্ছি-তাই না?

—ইউ সুইট গার্ল! আমি তোমার সঙ্গে এমন একটা অভিযানে অংশ নিয়েছি বলে রীতিমত রোমান্স ফিল করছি।

টিউলিপ ওতেই গলে গেল। লজ্জায় রাঙা হয়ে বলল—সত্যি!

—নিশ্চয়!

চলতে চলতে ষোল নম্বর পূর্বা ডিপে পৌঁছে গেলেন। একটা গোলাইয়ে কয়লার দেওয়ালে ঠেস্ দিয়ে চোখ বুজে বসে আছেন মিঃ নর্টন। মিঃ ট্রুম্যান তাঁর দিকে টর্চের ফোকাস দিলেন। টিউলিপ প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল।

মিঃ নর্টন চমকে উঠলেন। মেয়েকে জড়িয়ে ধরে আবেশ আপ্লুত কণ্ঠে বললেন—মাই সুইট চাইল্ড। তুই এখানে কী করে এলি মা?

টিউলিপ গল্-গল্ করে কত কথা বলে ফেলল তাদের উদ্বেগ ও অভিযান নিয়ে।

মিঃ ট্রুম্যান বললেন—এ্যাট লাস্ট—আমাদের অভিযান সফল হল।

মিঃ নর্টন বললেন—মিঃ ট্রুম্যান, আমি ভাবতে পারছি না যে তুমি আমার মেয়ের জন্য এতটা করেছ। তোমাকে সহস্র ধন্যবাদ।

—আমার ডিউটি করেছি মিঃ নর্টন। চলুন এবার ফেরা যাক্।

মিঃ নর্টনের রাগ অভিমান জল হয়ে গেছে। বরং লজ্জিত কণ্ঠে বললেন—আমি রাগ করে কার উপর প্রতিশোধ নিতে চেয়েছি? শুধু শুধু এই মেয়েটির উদ্বেগ ও কষ্টেরই তো কারণ হলাম।

চড়াই ভেঙে আসতে আসতে টিউলিপের খুব কষ্ট হচ্ছিল। কখনো মিঃ নর্টনের, কখনো মিঃ ট্রুম্যানের হাতে ভর দিয়ে উঠছিল। ওর বুকটা হাপরের মত জ্বলছিল। উপরে পৌঁছে বড় বড় শ্বাস নিল। মিঃ নর্টন ওঁর ঘোড়া আনতে গেলেন।

মিঃ ট্রুম্যান বললেন—আজ রাতের অভিযানের কথা ভুলব না টিউলিপ।

টিউলিপ হাঁপাতে হাঁপাতে ফিক্ করে হাসল। কপাল থেকে ঘাম ও চুল সরিয়ে বলল—আমিও না।

—তুমি বেশ বড় হয়ে গেছ টিউলিপ।

—শুনে খুব খুশী হলাম।

দুজনেই হেসে উঠল।

মিঃ ট্রুম্যান হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল—আবার দেখা হবে নিশ্চয়। একটা প্লিজেণ্ট চমক পাবার জন্য অপেক্ষা করব।

টিউলিপের কোমল ঘর্মাক্ত হাতটা মিঃ ট্রুম্যানের হাতের মধ্যে একটু কেঁপে উঠল।

॥ দুই ॥

কয়েকটা মাস কেটে গেছে। শীতেব কুয়াশায় আচ্ছন্ন দিগন্ত খোলা মাঠে হাড় কন্‌-কনে বাতাস। চাষীরা মনের আনন্দে ধান কাটছে। সে বছব ধানের ফলন বেশ ভালই হয়েছিল। থোকা থোকা সোনালী ধানেব শীষ নিজেব ভারে মাটিতে পড়েছিল উপুড় হয়ে।

বাসমণি ধান কাটছিল। ওব ডাইনে টুরু বাঁয়ে সুমি। বাঁদনার পর ওদের বিয়ে হবে। কথাবার্তা পাকা হয়ে গেছে। তাই টুরু এসেছে হবু শাশুড়ীব সুসার কবতে।

কারণ বাসমণি এখন আব সবদারনী নয়। সে শেরগড় কলিয়াবীর হাজবি কামিন। রোজ ভোবে উঠে এক থালা পান্তা ভাত খেয়ে এক জামবাটী ভাত গামছায় বেঁধে অন্যান্য কামিনদের সঙ্গে সার বেঁধে আলপথ দিয়ে হেঁটে যায়। পূব আকাশের স্বর্ণালী প্রেক্ষাপটে সারিবদ্ধ মেয়েদের পরস্পরের সঙ্গে একই ব্যবধান রেখে একই তালে পা ফেলে হাঁটা, একই তালে হাত নাড়া দূর থেকে এক আশ্চর্য চিত্রের মত দেখায়। কি সুন্দব শৃঙ্খলা ওদের জীবনে।

একসময় রাসমণির জীবনটা কুলি কামিনদের হাজার হ্যাপায় ভরে থাকত। সকাল থেকে বাবু, চাপরাশী, মুন্সী, গোমস্তা, সাহেবদের কাছে ঘুরে বেড়াত। কুলি কামিনকে বকাবকি করত। হুকুম দিত। খবরদারি করত। হপ্তা হাজবিব দিন ঝম-ঝম করে টাকা-পয়সা গুনত। সব সময়েই চোখ লাল। একটা বোতল শেষ হল তো অন্য বোতল খুলল।

আজ সেই রব-রবা থেকে অনেকদূরে সরে গেছে। আগে হুকুম দিয়ে কাজ করাত এখন নিজে করে। দেনা-পাওনা চুকে বুকে গেছে। বুক থেকে বোঝা নেমেছে। জীবনটা হাল্কা হয়ে গেছে।

এখন তাকে নিজেই জমি চাষ করতে হয় ধানও কাটতে হয়। বুধনা সেরে উঠেছে। তবে আগের মত গতর নেই। তাই মেয়ের বিয়ে ঠিক করে হবু জামাইকে নিয়ে এসেছে।

টুরু মাঝি নবীন কিশোর। এখনো গোঁফ-দাঁড়ি বেরোয় নি। শরীরটা যেন ডোলারাইট পাথর। তেমনি শক্ত। যেমন কালো তেমনি পিছল। বাবরি ছাঁট চুল। কালো ভুরু। ছোট চোখ। মোটা ঠোঁট। বাঁ হাতে মোটা বালা। ছেঁদা কানে ঝুলছে লাল ফল।

লক্‌লকে লাউডগার মত বেড়ে উঠেছে সুমি। মুখটি ভারী সুন্দর। ফোটা ফুলের মত কোমল লাবণ্য। প্রভাতের সূর্যকিরণে ওর নাকের তেঁতুল পাতা নোলকটি ঝিক্ ঝিক্ করছে। ঘাড় নীচু করে উবু হয়ে দাঁড়িয়ে বাঁ হাতে ধানের গুছি ধরে ডান হাতে কাস্তে চালাচ্ছে। কচ্ কচ্ শব্দ উঠছে। এক মুঠিতে এক হালা। দু'মুঠিতে আঁটি। চার আঁটিতে আউড়। সার করে ধানের আঁটি ফেলে যাচ্ছে মাটিতে। সে যেন এক নাচের ছন্দ। কোথাও তাল ভঙ্গ নেই।

ওকে নিয়ে বুধনা রাসমণির বড় আহ্লাদ। ওর বিয়েতে কত কুটুম নিমন্ত্রণ করবে। কি রকম ভোজের আয়োজন হবে। কতগুলো মাদল লাগরা বাজবে ও মাঝি মিঝান নাচবে। এই নিয়ে দুজনের সুদীর্ঘ পরামর্শ হয়।

ছাগল, গরু, শুয়োর, মুরগীর হাই-হেফাজত সেরে বুধনাও একটি কাস্তে নিয়ে মাঠে আসছিল। দূরে একটা চাপরাশীকে আসতে দেখে বলল—হেই সুমি তুর মাকে বল চাপরাশী আসছে।

রাসমণি কাস্তে চালাতে চালাতেই বলল—আসুক ক্যেনে?

চাপরাশী কাছে এসে বলল—এ্যাই রাসমণি, হাবু সায়েব তোকে ডাকছে।

—ক্যেনে?

—কুছ কাম হোবে।

—হুঁ হুঁ জানি কি কাজ। দু'দিন কাজ কামাই করেছি বলেই তো তাগাদা দিতে এসেছিস। কিন্তুক্ এত কষ্টের আজানো দুটি

ধান কাটতে পাব নাই ন'কি? গরু বাছুরে ক্ষেতেই মাড়ন করে দেক সেইটি তুরা চাস তো?

—আমি তো সে বাৎ বলি নাই। সাহেব বুলায়েছে। যাবি তো বোল?

এরা সব পুরানো চাপরাশী। রাসমণিকে ভাল করে চেনে। তাই কণ্ঠস্বরে জুলুম নেই। অন্য কেউ হলে ভাষাটা অন্যরকম হত।

রাসমণি ধান কাটতে কাটতেই বলল—অখন যেতে লারব। তুর সাহেবকে বলে দেগা—ধান কেটে ঘরে সাম করাব তবে যাব।

—ঠিক বা। ওহি বাৎ সাহেবকো বলিয়ে দিবো।

—হঁ যা।

এ সেই হাবু সায়েবের ডাক। যার লাঠি টুপি ধাওড়া পবিক্রমা করলেই বেহেড মাতালের নেশা ছুটে যেতো। রাসমণি তাকে কত সহজে ফিরিয়ে দিল।

সুমি বলল—ক্যেনে মা উয়াকে তেড়ে দিছিস। ধান তো আমরা কাটছি। তুই একঘড়ি যেঞে শুনে আয় ক্যেনে?

বুধনাও সেই কথা বলল। 'কিন্তু তাতে রাসমণির গোঁয়ের কোন পবিবর্তন হল না। চাপরাশী গজ্ গজ্ করে চলে গেল।

হাবু সাহেবের আদেশ অমান্য! এত স্পর্ধা ঐ রাসমণির! ঠিক আছে। তোকে টিট্ করতে আমার সময় লাগবে না। কি মনে করেছিস ব্যাবাকলউ সাহেবের কাছে চুগলি করবি গিয়ে। তাতে আমার বয়ে গেল। ও তো আমাকে চাকরিতেই জবাব দিয়েছিল। তবে আবার হাবু সাহেব হলাম কী করে? ঐ ব্যারাকলউ সাহেবের গুষ্টির শ্রাদ্ধ করে। তার গুমরে তুই আমার ডাকে এলি নাই।

হাবু সাহেবের তাওয়া গরম। রাসমণিকে পেলে চিবিয়ে খাবেন। একটা সাঁওতাল কামিনের এত বেয়াদবি বরদাস্ত করবেন না।

আসলে রাসমণিকে উনি ভাল চোখে দেখেন না। কারণ সে ব্যাবাকলউ সাহেবের অনুগৃহীতা। সেজন্য একটা চাপা আক্রোশ ছিলই। সবসময়ে ওর দোষ খুঁজে বেড়াতেন। আজ পেয়ে গেলেন।

পরদিন দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়েছে। অথবা দুপুর বিকেলে কি বা তফাৎ, দিন রাত সব সময় অন্ধকার। খাদের রাত্রি শেষ হবার নয়। তবু ক্লান্তি দিয়েই প্রহর গোনা হয়।

রাসমণি হাবু সাহেবের সঙ্গে দেখা না করেই খাদে চলে এসেছে। মনে করেছিল দু'তিনদিন কাজ কামাই ও সাহেবের ডাকে না যাওয়া সে কাজ দিয়ে উশুল করে দেবে। কাজ করতে দেখলে আপনি সাহেবের রাগ থিতিয়ে যাবে। কিন্তু এ রাগ তো সে রাগ নয়। এইটাই সে বোঝে না।

ওর মাজা কোমর টন্ টন্ করছিল। সকাল থেকে এক নাগাড়ে কোমর ভাজ করে মেন লাইন ঝাড়ু দিচ্ছিল সে পরিশ্রম যাবে কোথায় ?

হলেজে হড় হড় করে বোঝাই টব গাড়ির সারি টেনে নিয়ে যায়। তা থেকে ছলকে পড়ে কয়লার টুকরো। চাল থেকে, কাঁথি থেকেও কয়লা পড়ে। ইতঃস্তত ছড়িয়ে। রাসমণির কাজ ছিল সে সব তুলে জড় করে রাখা মেন লাইন সাফ সুতরো করা।

বুয়ান গাছের সরু সরু ডাল দিয়ে ঝাঁটা তৈরি হয় খাদ ঝাড়ু দিতে। রাসমণি তাই নিয়ে কাজ করে। সারাদিনে প্রায় এক টব গাড়ি কয়লা জড় হয়। মুনশী বাবুরা সেই কয়লা তাদের পীরিতের মেয়ে মানুষকে দিয়ে টব গাড়িতে বোঝাই করিয়ে তার নাম লিখে দেয়। সেই মেয়েটি পয়সা পায়। রাসমণি খেটে মরে। সব জেনেও না জানার ভান করে। এটাই দেশ রেওয়াজ।

কোমরের ব্যথায় রাসমণি একটা চ্যাটান পাথরে বসে খুঁটিতে ঠেস দিয়েছিল। সেই অবস্থাতেই তার চোখে ঘুম নেমে আসে। বুঝতেই পারে নি কখন হাবু সাহেব এসে তার সামনে দাঁড়িয়েছেন। লাঠির খোঁচা খেয়ে উঠল।

কাঁচা খিস্তি করে উনি বললেন—খাদে ঘুমোবার জন্যে হাজরি দিই তুকে ? খাদের ভিতর ফুলশয্যা। তা একা ক্যেনে ? একটি নাগর নিঞে আয়।

রাসমণি মুখ কাঁচু-মাচু করে অপরাধিনীর মত দাঁড়িয়ে থাকে। এত বিশ্রী কথারও জবাব দেয় না।

উনি বলেন—কাল থেকে তোর হাজরি কামিনের কাজ খতম।

মালকাটার কাজ করবি। গাড়ি ভরবি পয়সা পাবি। ঘুমোবার জন্য হাজরি দেবো না।

—কাজে কুন্থ ফাঁকি দিই নাই সায়েব। অত রাগ করিস না। হাজরি কামিনেব কাজ না দিলে আমি একা কি করে মাল কাটার কাজ করব ?

—কেন ? তুর মরদ আছে। তাকে নিঞে আসবি।

—গুলি খেঞে উয়ার গতর পড়ে গেইছে বাবু। মালকাটার কাজ করতে লারবেক।

তুর আধ-জুয়ান বিটি আছে জামাই করব বলে মস্ত লাহাঙ্গা মবদ এনে ঘরে রেখেছিস। সবাইকে নিঞে আসবি। এক সঙ্গে কাজ করবি।

—তবে তো হত সাহেব। কিন্তুক্ বিটিটিকে খাদে খাটতে আনব নাই।

—কেন ? কি হবেক ?

—সব তো জানিস সায়েব। খাদের আঁধারে কত পাপ। আমার ফুলের পারা বিটিটাকে কেউ যদি নষ্ট ভষ্ট করে দেয় তখন ?

—ওঃ সতীর বিটি মহাসতী। তুই নিজে কত সতী ছিলি যে তুর বিটি সতী হবেক ? ঘরে যে লাহাঙ্গা মরদ পুষে রেখেছিস তার সঙ্গে যদি লটর পটর করে তবে কি হবেক ?

—কি হবেক বাবু ? উয়াদের তো বিয়া হবেক।

—বিয়া হবেক ? তার আগেই যদি তুর বিটির পেট করে দিঞে চলে যায় তবে ?

—না সাহেব। আমাদের জাত সাঁওতাল অত বেইমান লয়। ভালবাসার একটি মর্ম আছে। সেটি তুরা বুঝবি নাই।

—ওঃ! সুয়াগ রাখবার জায়গা নাই। ভাল করে শুনে লে—কাল থেকে মালকাটার কাজ করতে হবেক। না হলে ভিটে মাটি উচ্ছন্নে দেবো।

সাঁঝ বেলাতেই সিদাবাড়ি আঁধার। গোটা পাড়াটায় ভাঙাচোরা ঘর, দুয়ার, ঝুপড়ি। পুকুরে স্নান করে ঠাণ্ডায় হি-হি করতে করতে

ঘরে আসে রাসমণি। কোনরকমে কাপড় ছেড়ে উনুনসালে বসে পড়ে।

সুমি তখন রান্না করছিল। আগুনের আভায় ওর কোমল মুখটা লাবণ্যে টস্-টস্ করছিল। সেদিকে তাকিয়ে রাসমণির বুক ফেটে কান্না আসছিল।

ঐ টুকু মেয়েকে খাদে খাটতে নিয়ে যাবে? কি জানে ও খাদের? কত কষ্টের কাজ। সে কি ও পারবে? এক টব গাড়ি কয়লা বোঝাই করা কি সহজ? তারপরে কত খালভরা জাহান্নামের মুসাফির হাঁ করে আছে। আঁধার সুড়ঙ্গে ঐ কচি মেয়েটাকে যদি পেয়ে যায় তবে তো কাঁচা চিবিয়ে খাবে। তখন টুরু কি বলবে? সে যদি বিয়ে না করে? যদি বলে তুর নষ্ট ভ্রষ্ট বিটিকে বিয়া করব না।

সেই তো তার নিজের মত দশা হবে। সে যেমন সতীত্ব দিয়ে সুখ কিনেছিল। তারপর আজ খাবি খাচ্ছে। তেমনি তো তারও দশা হবে। মায়ের পাপ কি বিটিকেও অর্শাবে নাকি? ভাবতে বুকে কাঁটা দেয়।

এক থালা গরম ভাত বেড়ে সুমি ডাকল—আয় মা খেঞে লে।

রাসমণি উঠে দাঁড়াল। সুমির দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তারপর হঠাৎ ওর মুখটা নিজের বুকে চেপে ধরে হু-হু করে কেঁদে ভাসিয়ে দিল।

সুমি অবাক। জীবনে কখনো তার মাকে এমন করে কাঁদতে দেখে নি।

॥ তিন ॥

মিঃ ব্যারাকলউ চিঠি লিখছেন। রাত ঝম্ ঝম্ করছে। মাঝে মাঝে স্টিম হলেজে গাড়ি টানার শব্দ ভেসে আসছে। তাছাড়া সব নিঝুম।

চিঠি আর শেষ হয় না। উনি লিখেই চলেছেন। কাবেরী বসে আছে। মাঝে মাঝে সাহেবের গ্লাসটা পূরণ করে দিচ্ছে। এইটাই সাহেবের স্বভাব। এক তো বেহেড মাতাল না হলে চিঠি

লেখার ভাব আসে না। তারপর লিখতে বসে এক ঢোঁক এক ঢোঁক করে মদ খান। তবে কলম থেকে দারুণ দারুণ শব্দেরা এসে বাক্য গঠন করে।

কাবেরী তা জানে! তাই ঠিক সময়ে ঠিক বস্তুটির যোগান দিয়ে যাচ্ছে।

মিঃ ব্যারাকলউ একবার মাথা তুলে বললেন ডারলিং। রাত প্রায় ছুটো বাজে। তুমি কেন বসে আছো? যাও শুয়ে পড়-গে।

কাবেরী বলল, সে কি সাহেব? তুমি রাত জেগে চিঠি লিখবে। সারাদিন ঘোড়ায় চড়ে দৌড়ে বেড়াবে। আর আমি মজা করে ঘুমোব তা হয় না।

উনি বললেন, ইউ থ্যা ইণ্ডিয়ান উওম্যান। তোমাদের সেবার তুলনা হয় না। আমি খুবই কৃতজ্ঞ।

—যাক সাহেব। অত প্রশংসার যোগ্য আমি নই। তুমি নিজে শরীরের দিকে একটু তাকাও তবেই আমি খুশি হব।

সাহেব একটু হাসলেন। গ্লাসের তলানি পর্যন্ত এক চুমুকে শেষ করে বললেন—ডারলিং। ইচ্ছা করে কে নিজের শরীরকে কষ্ট দেয়? কিন্তু আমার যে এত আয়োজন পণ্ড হতে বসেছে। একদিকে মিঃ হ্যামিলটন শত্রুতার চূড়ান্ত করে ছেড়েছে। ব্লাডি জমিনদারকে এত টাকা দিয়েও মন পেলাম না। কে আবার ওর মাথায় ঢুকিয়েছে যে আমিই নাকি ষড়যন্ত্র করে রাগিনীকে দিয়ে ওর ছেলেকে খুন করিয়েছি। তারপর একটা ভীষণ অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। পানমোহরা নিয়ে কিছু কাজ হচ্ছে না।

—আমি তোমাকে একটা কথা বলবো সাহেব।

—তুমি তো সেই সারেণ্ডার করার কথা বলবে। কিন্তু সে শর্তে আমি রাজি নই। তাছাড়া এ হচ্ছে স্বার্থের জটিল সংঘাত। জমিনদার তোমাকে একটা ইস্যু খাড়া করলেও আসলে তা নয়।

কাবেরী হাসল। সাহেবের পিঠের উপর নিজের শরীরের ভর দিয়ে বলল—আমাকে বলতে দেবে তো?

—হাঁ—হাঁ। বল। বাঁ হাত দিয়ে ওর কোমরটা জড়িয়ে ধরে সামনের দিকে টেনে নিলেন।

—জমিদারের নায়েব গোমস্তার কথা ভেবেছো?

—ওরা কি করবে? খোদ জমিদারের যখন ব্যাপার।

—বেইমানি তো করতে পারবে। ওরা লোভী, ধূর্ত এবং চতুর। পারে না এমন কাজ নেই। ওদেরকে বশ করতে পারবে না?

একটুক্ষণ ভেবে উনি বললেন—আচ্ছা। সেটাও আমি দেখছি।

গোপন যোগাযোগ করে একদিন সন্ধ্যায় দামোদরের গর্ভে ওদের সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা হল। ঝাপসা অন্ধকারে কাবেরী একা দাঁড়িয়ে। কিছুক্ষণ পর কার্তিকবাবু এলেন।

কাবেরী বলল, নমস্কার কাকাবাবু। ভালো আছেন তো?

উনি একটু চমকে উঠেন। বললেন, কে?

—আজ্ঞে আমাকে চিনতে পারলেন না, আমি কাবেরী।

—ওঃ। নাচমহলের কাবেরী। বাঃ বাঃ? সাহেব তোমাকে মেম সাহেব বানিয়ে দিয়েছেন দেখছি।

কাবেরী একটু লজ্জা পেল। বলল—সাহেব আমাকে আপনার জন্য অপেক্ষা করতে বলেছিলেন। আপনি একটু বসবেন? আমি ওকে ডেকে দেবো?

—বেশ। আমি বসছি।

পাড়ে ঘোড়া ছিল। কাবেরী তড়াক করে ঘোড়ায় চড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। কার্তিকবাবু সেদিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলেন। একটা অতি দরিদ্র বাঙালী মেয়ে যাকে ওর বাপ একদিন বিক্রি করে দিয়েছিল, পুরুষ মনোরঞ্জনের সেবায় নিযুক্ত ছিল, সে আজ সাহেবের হাতের ছোঁয়া পেয়ে এত তুখোড় হয়ে উঠেছে। ধন্য সাহেবের হাতযশ। ঘরের কোণে বসে থাকলে জীবনে বড় কিছু হবার আশা থাকে না। জাত পাত, সংস্কার, দু'চার বিঘে জমি জায়গা নিয়ে কলহ বিবাদ করেই জীবনটা ফুরিয়ে যায়। অথচ সাহেবদের ছোঁয়ায় ন্যাড়া গাছেও ফুল ফোটে।

ঘোড়ার ক্ষুরের খট-খট শব্দে ওর ভাবনার সূত্র ছিন্ন হল। ব্যারাকলউ সাহেব ও কাবেরী একটা ঘোড়াতে চড়েই এসে পড়লেন।

মিঃ ব্যারাকলউ বললেন—গুড ইভ্‌নিং মিঃ বোস। আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়াতে আমি খুব খুশি হয়েছি।

করমর্দন করে বালির উপর বসে পড়লেন। সাহেবের মত কাবেরীর পরনেও ফুল প্যাণ্ট ও শার্ট, ঘোড়ায় চড়ে কোথাও যেতে হলেই ও এই পোশাক পরে। হেসে বলল—একটু হাল্কা ড্রিংকসের ব্যবস্থা করব কী ?

সাহেব বললেন—আমাব বন্ধুকে আপ্যায়ন করতে হলে তাই করা উচিৎ। কিন্তু আবার তোমাকে বাংলোয় ফিরে যেতে হবে সেসব আনতে।

কাবেরী তেমনি হাসতে হাসতে বলল—তুমি শুধু হুকুম কর না সাহেব তারপর কি করতে হবে আমি বুঝবো।

—আচ্ছা। তাই হোক।

কাবেরী তৎক্ষণাৎ একটা জায়গার বালি খুঁড়ে বোতল ও গ্লাস বের করে নিয়ে এল। কার্তিকবাবু বললেন—আগে থেকেই রেখে-ছিলে বুঝি ?

—হ্যাঁ।

ওই জায়গাটাই আর একটু গভীর করে খুঁড়তেই জল বেরলো। কাবেরী পরিপাটী করে গ্লাস সাজিয়ে দিল। পকেট থেকে বাদাম ও ছোলাভাজা বের করে একটা কাগজের উপর রাখল। ওরা দুজন খুব খুশি। শত মুখে কাবেরীর তারিফ করলেন। পরস্পরের মধ্যে সুন্দর বন্ধুত্ব কামনা করে পানপাত্র মুখে তুললেন।

মিঃ ব্যারাকলউ বললেন—মিঃ বোস আপনি আমাকে সাহায্য করুন আমি আপনাকে করবো। পরস্পরের বন্ধুত্ব অটুট থাকবে। জমিদারবাবুও লাভবান হবেন। কারণ পানমোহরা চললে তিনি বছরে এক লাখ টাকা রয়্যালটি পাবেন।

ক্রমে ক্রমে কার্তিকবাবুর জিভ জড়িয়ে আসছিল। কিন্তু মাথা একেবারে সাফ। এইসব ভেটারেন মানুষেরা মদ খেয়ে মাতাল হন না।

বললেন—সাহেব! টাকাকড়ি আমার যথেষ্টই আছে। ইচ্ছা করলে আমিও একটা জমিদারী খরিদ করতে পারি। কিন্তু এই মধ্যবিত্ত জীবনের তলানি ভোগ করার ইচ্ছা আমার নেই। আমি চাই শহরে বাড়ি করতে। ছেলেমেয়েরা সাহেব সুবোর মত ঠাটে বাটে থাকবে।

—নিশ্চয়! সেটাই তো হওয়া উচিৎ।

—কারো কাছে চার আনা সুদ, কোন প্রজার কাছে চার আনা আমলা সেলামী, পুকুরের মাছ নিয়ে ঝগড়া, ধানের ভাগ নিয়ে কলহ এসব যেন আমার আমলেই শেষ হয়। ছেলেদিকে আমি সাহেব করব।

—আপনার উচ্চাকাঙ্খার প্রশংসা করি মিঃ বোস। বলুন আমি তার জন্য কি করতে পারি?

কাবেরী ফট করে বলে বসল—কাকাবাবুর বড় ছেলেটিকে বিলেতে পড়বার ব্যবস্থা করে দাও সাহেব।

কার্তিকবাবু এত খুশি হলেন যে ছেলেমানুষের মত কাবেরীর পিঠে থাপ্পড় বসিয়ে বললেন—অ্যাই। ঠিক কথা। আমার বড় ছেলে বি-এ পাস করেছে। ওকে আমি ব্যারিষ্টারী পড়াব।

—অলরাইট! ওকে আমি আমার মিসেসের কাছে পাঠিয়ে দেব। উনি ওর পড়া-শুনার যাবতীয় ব্যবস্থা করে দেবেন। আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না।

—থ্যাঙ্ক ইউ সাহেব!

জমিদারের যাবতীয় মোকদ্দমার তদবির করেন কার্তিক বোস। পানমোহরা কোল কোম্পানি বনাম সালুঞ্চী জমিদারী সেরেস্তার মামলায় মূল আর্জি ছিল মিঃ এফ জি ব্যারাকলউ অন্যায়ভাবে তাঁর কোল প্রোপার্টির উপর কোলিয়ারি খুলছেন। তাঁকে অবিলম্বে সেই অবৈধ কার্যকলাপ থেকে বিরত করা হোক।

এই মর্মেই ছিল নিষেধাজ্ঞা। তারপর স্বত্ব-স্বামীত্বের বিচার। এ জন্য উভয় পক্ষই পর পর কয়েকটি হলফনামা আদালতে পেশ করেছিলেন। মামলাটা ক্রমশ জটিল হয়ে পড়েছিল।

এদিকে কার্তিকবাবু ব্যারাকলউ সাহেবের টোপ গিলে ফেলেছেন। তিনি একটা ব্যাপার ভালই বুঝেছেন যে জমিদারীর চেয়ে কোলিয়ারির মুনাফা অনেক বেশি। সাহেবদের রাজত্বে জমিদারের পক্ষে মামলা জিতে নেবার সম্ভাবনা নেই! তাছাড়া জমিদার নিজেই যে দলিল সাহেবের হাতে তুলে দিয়েছেন তা জাল প্রতিপন্ন না করতে পারলে জেতার আশা নেই। এবং তা করাও সম্ভব নয়। কাজেই এ শুধু সাময়িক বাধা। সাহেব একদিন তা অতিক্রম করবেনই।

তিনি একটু সাহায্য করলে তা ত্বরান্বিত হবে এইমাত্র। সেই জন্য যদি তার ছেলে ব্যারিস্টার হতে পারে তবে আর রাধাগোবিন্দ রায়ের কে তোষামোদ করে? ওর জমিদারীই বা ক'দিন? ছেলেদের যা মতিগতি তাতে উনি চোখ বুজলেই সব ফুটে যাবে।

অতঃপর তিনি পুরনো উকিলবাবুর সঙ্গে অযথাই ঝগড়া করে বসলেন। তাঁকে বললেন—আমাদের জেতা মামলা আপনি লড়তে পারছেন না। বার বার তারিখ পড়ছে। কোনবারেই শুনানী হচ্ছে না। এতে আমাদের জমিদারবাবু দারুণ সন্দেহ করছেন।

উকিলবাবু তৎক্ষণাৎ পানমোহরার ব্রীফ ওঁর হাতে দিয়ে বললেন —আপনি অন্য উকিল দেখুন।

কার্তিকবাবু তো তাই চাইছিলেন। উনি অন্য উকিল নিযুক্ত করলেন। তিনি শুনানীর দিন ব্যারাকলউ সাহেবের উকিলের সঙ্গে পেয়ে উঠলেন না। নিষেধাজ্ঞা উঠে গেল।

শুনানীর দিন জমিদারবাবু নিজেই কোর্টে উপস্থিত ছিলেন। কার্তিকবাবু তাঁকে বোঝালেন—আগেকার উকিল আমাদের মামলাটা কাঁচিয়ে দিয়েছেন। এখন আর কি করা যাবে। যাই হোক নিষেধাজ্ঞা উঠে গেলেই তো আর মামলা শেষ হল না। টাইটেল স্যুট বাকি আছে। ওটা লড়তে ব্যারিস্টার দেব। এসব হেঁজিপেঁজি উকিলের কর্ম নয়।

উনি গম্ভীর ভাবে বললেন—তা ঠিক।

কার্তিকবাবু আরো বললেন—কিন্তু বাবু, আপনার ঐ দলিলটা সাহেবের পক্ষে একটা অস্ত্র হয়ে গেছে।

—তাতো জানি! যাক্ এটা নিয়ে ভাবতে হবে।

সকালে স্নান করে কাবেরী চুল শুকোচ্ছে। বারান্দায় মিঠে রোদ। চেয়ারে বসে রোদ পোহাতে বড় সুখ! সাহেবেরও ব্রেকফাস্ট হয়ে গেছে। চারু মুচি জুতো পরিয়ে দিচ্ছে। তখন এলেন মিঃ বাসু।

গুড মর্নিং বলে দাঁড়ালেন। সাহেব ওর দিকে চওড়া হাতের পাঞ্জা বাড়িয়ে হ্যাণ্ডসেক্ করলেন। বললেন হ্যাল্লো মিঃ বাসু! তুমি এসে গেছো?

—হ্যাঁ স্যার। সাহেবের করমর্দনে বাসু সাহেব কম্পমান।

—বোসো। তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে।

—বলুন স্যার। আমি তো আপনার হুকুমের গোলাম। ডাক পেয়েই ছুটে এসেছি।

—শোনো। তুমি হয়তো জানো যে পানমোহরা ও সাতঘরিয়ার তল স্বত্ব লীজ নিয়েছি। সেখানে চানক কাটাই শুরু হয়েছিল। কিন্তু মামলা মোকদ্দমার জন্য কিছুদিন কাজ বন্ধ ছিল। এখন নিষেধাজ্ঞা উঠে গেছে। তাই অবিলম্বে কাজ শুরু করতে চাই। তোমাকে দরকার আছে। আমার কাছে কাজ করতে রাজী আছো?

—কি কাজ করতে হবে স্যার?

—অ্যাজ ম্যানেজার!

বাসু সাহেব গদগদ কণ্ঠে বললেন—হুজুর যে এতদিন পর আমাকে স্মরণ করেছেন এতেই আমি ধন্য।

—ধন্যবাদ। চল আজই পানমোহরা যেতে হবে।

বাসু সাহেব আসলে হরিপদ বসু। মোকাম-চালতা। জেলা—বাঁকুড়া। নন্ ম্যাট্রিক। ইংরেজী বলতে কইতে পারেন। চলতা পূরজা আদমী। বহুদিন পূর্বে ব্যারাকলউ সাহেবের কাছে ইন্‌চারজের কাজ করেছিলেন। তার কাজের তারিফ করে লোকে বাসু সাহেব বলত। ব্যারাকলউ সাহেব তাকে পানমোহরার ম্যানেজার পদে বহাল করলেন।

তখনকার ব্যাপারই এরকম ছিল। মুখে মুখেই জবাব, বহাল। ব্যতিক্রম শুধু ইউরোপীয়ানদের ক্ষেত্রে। তাঁরা আসতেন মেয়াদী চুক্তি করে। দু'বছর পাঁচ বছর যার যেমন সুবিধা। আসা যাওয়ার সব খরচ কোম্পানির।

নূতন কর্মের উদ্যমে ব্যারাকলউ সাহেব টগ্‌বগ্ করে ফুটছেন। পানমোহরা তাঁর স্বপ্ন। মামলাগুলো ওঁকে বড় জব্দ করে দিয়েছিল। এখন আবার উনি পুরানো তৎপরতায়।

ঘোড়ায় চড়ার জন্য তৈরি। কাবেরী ছুটে এসে বলল—সাহেব! লাঞ্চের সময়টা ভুলে যেও না। একটার মধ্যে যদি না আস তবে আমি খুব রাগ করব।

—আচ্ছা! আচ্ছা! ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন।

কাবেরী ওর দিকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো।

॥ চার ॥

টুরু ও সুমি মনের আনন্দে ধান কাটছে। ভাবী স্বামী-স্ত্রী। প্রণয় ভাবনায় মশগুল। বাঁদনা পরবের পরে ওদের বিয়ে হবে। ধান কেটে ঘরে নিয়ে যাবে। সে ধানের পেট থেকে চাল বের হবে। তবে বিয়ের ভোজ হবে। ভোজের মদ তৈরি হবে।

রঙীন স্বপ্নে বিভোর হয়ে কাস্তে চালাচ্ছে। একই সুরে গান গাইছে। হঠাৎ জনকয়েক চাপরাশী এসে বলল—এ্যাই তোরা কার বাপের জমির ধান কাটছিস রে? এটা কোম্পানির জমি। এখনি ধানকাটা বন্ধ কর।

ওরা ঠায় দাঁড়িয়ে পড়ল।

একজন চাপরাশী বলল—রাসমণি কোথা?

বুধনা কোথা থেকে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে হাজির হল। বলল—উ-ত খাদে খাটতে গেইছে চপরাশীবাবু।

—হঁ। তোরা বহুৎ সিয়ান আছিস হাবু সাহেব সব খবর পাইয়েছে। তোদের বিলকুল ধান কোম্পানি ক্রোক্ করিয়েছে। আভি চল হাবু সাহেবের সাথ বাৎ কোরবি।

হাবু সাহেবের গতিটা বড় সর্পিল। ওঁর আসল লক্ষ্য সুমি। নিজের জন্য নয়। ওঁর প্রভু মিঃ শেফার্ডের জন্য। উনি একদিন ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন—আমি ফ্রেশ ব্লাড চাই। এ জেনুইন ভারজিন গার্ল।

বে-তরিন কুমারী আর কোথায় পাবেন তবু কাঁচা ঢলঢলে মেয়ে পেলে চালান যায়। হাবু সাহেবের তালিকায় তেমন অনেকগুলি মেয়ের নাম আছে। আর তালিকার শীর্ষে আছে সুমি।

সেজন্য উনি এমনভাবে অগ্রসর হতে চান যাতে নির্ঝঞ্ঝাটে কাজ হাঁসিল হবে। কিন্তু সুমিকে ঘর থেকে টেনে খাদের আঁধারে না নামাতে পারলে সরীসৃপের কুটিল প্যাঁচে কি করে ফেলতেন?

তাই উনি রাসমণির স্বপ্ন ও সাধের ধানগুলিতেই প্রথম চোট দিয়ে বসলেন।

বুধনা এসে দাঁড়াল যেন কত অপরাধী। উনি বললেন—তুই জানিস ঐ জমিটা কোম্পানির খাস খতিয়ান ভুক্ত। ব্যারাকলউ সাহেব তোদেদিকে তার ধান খেতে দিয়েছিল রাসমণি তখন সরদারনী ছিল বলেই। এখন সে সরদারনী নাই তাহলে কেন দেবো? যে সরদারী করবে তাকেই দিব।

বুধনা বলল - হঁ বাবু। কুম্পানীর জমি যদি কুম্পানী নিঞে লিব বলে ত আমরা গরীব লোক কি করব? কিন্তুক্ আমরা ত ঐ জমিটি গতর খাটাঞে তৈয়ার করেছি। ফসল আঞ্জাঞেছি। ই-বারে তুদের যা বিচার হয় করবি।

—তুরা হচ্ছিস অবাধ্য সাঁওতাল। আমার খাদে মালকাটা নাই। রেজিং কমে গেইছে। কিন্তুক্ তুরা একঘরে চারটি কুলিকামিন বসে বসে ভাত মারছিস। কোম্পানির জমি ভোগ করছিস। এ্যা। অত সুখ রাখবি কোথা? শ্যালা সবাইকে খাদে কাজ করতে হবেক! এটা মামাঘর নয়। শ্যালা নিমকহারাম সাঁওতাল।

বুধনা চুপচাপ বসে। ব্যাচারা দুনিয়াদারীর কিছুই বোঝে না। গায়ের ঘাম ঝরানো কাজ ছাড়া আর কিছু জানে না। ওর কাছে রাসমণিই সব। তার কথাতেই ওঠে বসে।

হাবু সাহেব বললেন—এ শ্যালা ভেড়ুয়ার সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই। খাদ থেকে রাসমণিকে ডেকে আন। মিছিরবাবুকে খবর দাও।

ঘণ্টা খানেকের মধ্যে ওরা দুজনেই হাজির। হাবু সাহেব তো গায়ের যত ঝাল রাসমণির উপর ঝেড়ে দিলেন। রাসমণি চুপ করে শুনল।

মিছিরবাবু বললেন—রাসমণি নোকরী যব করতে হবে তব হাবু সায়েবের খিলাপ করে তো তোর কুছু নাফা হোবে নাই।

হাবু সাহেব বললেন—ওর বরং লাভ হবে। একার রোজগারে এতবড় সংসার কি করে চালাবে ও? জমির ধানগুলির গরবে তো এত জিদ। কিন্তু শেফার্ড সাহেব বলে দিয়েছেন কোম্পানির জমি সরদারকে দেওয়া হবে।

রাসমণি বলল—সে তুমার যাকে খুশী দাও ক্যেনে। কিন্তুক ঈ-বছর কত কস্ট করে কাদা ঘেঁটে চাষ করেছি। তাও যদি লিবে তো লাও। আমরা ভিখ মাগব।

মিছিরবাবু বললেন—ভিখ ক্যেনে মাগবি রে? তোরা চার পরাণী কাম কর। রোজগার ভি হোবে।

—হঁ ত। বলছি ত। বাঁদনা পরবের পর বিটির বিয়া দিব তাবপর খাদকে খাটাতে আনব।

—ওঃ। আমাব গা-টি সলগা দিঞে উঠল। তুই বাড়া শিয়ানরে।

রাসমণির ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে গেল। বলল—অত বলিস না বাবু। আমি একদিন দেড়শ মালকাটার সরদাবণী ছিলম। আজকে কপাল ফেরে যা হুক্যু হএেছে তারপর অত গাল দিস্ না। রাসমণিকে তুরা কিনে লিস্থু নাই। একদিন আমরা জীবন দিঞে লড়াই করেছিলাম। দবকার হলে ফের করব। আমাদের রক্ত লহান লাশগুলিনকে খাদে নামাঞে দিবি।

মিছিববাবু বললেন—অত ক্যেনে তড়পাছিস্ রে রাসমণি? খাদে মালকাটা কমে গেইছে। কোম্পানির রেজিন কম হলে তো চলবে নাই। তুই একটি বাৎ লিঞে যদি এত জিদ করিস তব তো বাৎ বাড়িয়ে যাবে।

—হঁ ত। কি করব বল? তুই যা বলবি—তাই করব।

—তুই এক কাম কর। জলদি জলদি ধান কাটিয়ে লে। উস্‌কে বাদ খাদানে কাম শুরু কর। চাব পরাণীর রোজগার হবে। বাঁদনা পরব আভি এক মাহিনা দেরী আছে। কাম করিয়ে লে। ফের ছুটি লিয়ে বিটিব বিয়া দিবি। ক্যা হাবুসাব ঈ-বাৎ মঞ্জুর আছে তো?

—আপনি রাসমণিকেই শুধান। কিন্তু একথা যদি শেফার্ড সাহেবকে বলি তবে ওঁর ধাওড়ায় আগ্ লাগায়ে দিবে।

—ছোড়িয়ে দেন বাবু। আংরেজ সাহাব লোগ্ এ্যায়সাই হ্যায় ক্যা রাসমণি বোল? খামোস হলে তো চলবে না।

—ঠিক আছে বাবু। তুকে আমি বাপেব পাবা মানি। ঈ-কথাটিও

মেনে নিলাম। কিন্তুক্ দেখবি যেমন আমার বিটির শরম-ভরম নষ্ট না হঞে যায়।

—কেনো হোবে রে? তুই আপনা সাথ লিয়ে কাম করবি।

শীতের দুপুর অলস প্রহর। ধানকাটা বন্ধ করে দিয়ে গেছে চাপরাশী দল। ধান পাহারা দেবার জন্ম ছোট্ট কুঁড়েঘর করেছিল মাঠের একপাশে। পছনে মস্ত উঁচু পগার। টুরু ও সুমি উদাস হয়ে মাঠের দিকে তাকিয়ে আছে।

সুমি বলল—হঁ মাঝি—তুর খিদা লাগে নাই?

—হঁ ত! লেগেছে ত।

—সুমি ফিক্ করে হাসল। বলল—তবে বলিস নাই যে?

ও চিরাচরিত সাঁওতালী ঢঙে বলল—বলি নাই!

সুমি একটা বড় জামবাটিতে করে ভাত এনেছিল; তাই এগিয়ে দিল টুরুর দিকে। নুন, কাঁচা লঙ্কা ও আলু পোস্ত দিয়ে টুরু প্রায় এক সের চালের চালের ভাত সেঁটে নিল। তারপর বলল—তুঁই খেলি নাই যে?

—আমি ঘরকে যেঞে খাব।

—তবে আমি টুক্‌তুন জিরাঞে লিই। কুঁড়ের ভিতরে মাথায় খড়ের আঁটি দিয়ে খড়ের উপর শুয়ে পড়ল। সুমি এঁটো গুটিয়ে হাত ধুয়ে ওর কাছে এসে বসল। বলল—চুটি খাবি মাঝি?

—হঁ ত। দে।

সুমি দুটো শালপাতার ভিতর চিবানো তামাক দিয়ে চুটি বানাল। একটা টুরুকে দিয়ে অন্যটা নিজে নিল। দুজনে পরম আরামে টানতে লাগল।

টুরু বলল—আমাদের গাঁয়ের পছিতে বাঘমুড়ি পাহাড় আছে। ডাগর ডাগর কেঁদ গাছ আছে। পিয়াল যা হয় খেঞে শেষ করতে লারবেক। হাটকে বিকতে নিঞে যায়। শিঁয়াকুল বনকুল ত ভূতে খায় না। তুদের ঈ-দেশ একদম রুখুসুখু। আমার ভাল লাগে না। বিয়া হলে তুই আর আমি চলে যাব বাঘমুড়ি পাহাড়ে। আছে মস্ত বড় বড় পাথর চাতাল। মাথার উপর শাল-মহুলের ছায়া দুজনাতে সিখানে বসে দেদার আছে। সেরেঞ (গান) করব।

যাবি ত সুমি?

—হঁ ত। তুঁই যেখানে নিঞে যাবি সেইখানেই যাব। তুই আমাব মবদ হবি। হবি ত?

—হঁ ত। নিচ্চয় হব। তুব মাকে বলবি বিয়াতে যেমন তুটা ডাংবা (বলদ) আমাদিকে দেই। আমাদেব জমি আছে। মাটি কেটে ঠিক কবব। চাষ কবব। ধান গম দেদাব হবেক। একটি গ?ই কিনব। আমাদেব গিদ্‌বা পিদ্‌বা (ছেলেমেয়ে) দিকে তুধ খাওয়াতে হবেক ত। ন'কি বল?

—হঁ ত। ঠিক বলছিস ত।

—ঈ-খাদেব খাটালি খাটতে আসব নাই। শ্যালাবা মস্ত পাপী। তুঁই বাজী তো?

—হঁ ত। নিচ্চয় বাজী।

আহা। কি সুন্দব স্বপ্ন। হে মাবাং বোঙা ওদেব স্বপ্ন সার্থক কব ঠাকুব।

চুটিটা শেষ হয়ে গিয়েছে। টুকুব চোখ তুটি ঘুমে ঢুল ঢুল কবছে।

সুমি বলল—হঁবে মাঝি! তুদেব বাঘমুডি পাহাড়ে বাঘ আছে।

—হঁ। মস্ত ডাগব। হঁ বলাব পব তু'হাতে আকাব দেখিয়ে বলল—এত ডাগব ডাগব ঝিঙাফুলা বাঘ।

—ঈ-বাব্বাঃ। হুডাল আছে?

—হঁ। আছে ত।

—ঈ-বাচ্চাঃ বে। সুমি যেন ভয়ে শিউবে উঠল।

টুকু ওব মুখে হাত দিয়ে বলল—ঈ-বাবা তুঁই ডবাছিস ক্যেনে?

—তুই জানিস না মাঝি। হুড়াল মস্ত খাবাপ জন্তু। আমাব মায়েব একটি ভাইকে হুড়ালে নিঞে পালাঞে ছিল।

—ইস্‌। তাই বলে আমাদিকেও নিঞে পালাবেক ন'কি? শ্যালা মাবব এক কাঁড (তীব) যে উয়াব পেটটি ছ্যাদা হঞে যাবেক।

তীব চালনাব বলিষ্ঠ অঙ্গভঙ্গিতে সে হাঁটু গেঁড়ে বসল। সুমি পুলকে ব্যাকুলিত হয়ে ওব কাঁধ ধবে ঝুলে পডল। বলল—এঃ মাঝি! তুঁই বাড়া মবদ বে!

—হেঁ—হেঁ। বীবত্ব গর্বে টুকুব বুকটা ফুলে উঠল। প্রসন্ন

হাসিতে চোখ দুটি বুজে গেল এবং সাদা সাদা দাঁতের সারি বের হয়ে পড়ল।

দূর থেকে হাঁক পাড়তে পাড়তে বুধনা এল—সুমি। এ সুমি। তুরা কুথায় গেলি বেটা। আয়। তাড়াম তাড়াম ধানগুলিন কেটে লে।

টুরু ও সুমি নাচের ছন্দে ধান কাটতে শুরু করল। প্রকৃতি দিল আশীর্বাদ।

॥ পাঁচ ॥

তখন ভর দুপুর। মাথার উপর মিঠে রোদ। চোখের সামনে দামোদর। দু'পাশে বিস্তীর্ণ বালুচর। মধ্যখানে গতিশীল জলধারা। এখন একে দেখলে কে বলবে এরই রুদ্র তাণ্ডবে দিক্ দেশ ভেসে যায়। জল প্লাবনে শত সহস্র মানুষ গৃহহারা হয়। কত নৌকাডুবি হয়। কত প্রাণ অকালে হারিয়ে যায় বেগবান জলোচ্ছ্বাসে।

একান্ত নিরিবিলির মধ্যে গাছগাছালির মনোরম ছায়াঘেরা এক উপবন। কোন এক সময়ে পীর সাহেবের দরগা ছিল। এখন পীর সাহেবও নেই তার দরগাও নেই। আছে শুধু তার সযত্ন লালিত গাছগুলি। তারই নিবিড় ছায়ায় নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ মিঃ ট্রুম্যান ও টিউলিপ। প্রেম করার এমন আদর্শ উপবন যে তারা কি করে খুঁজে বের করল তা তারাই জানে।

এই টিউলিপকে নিয়ে মিসেস নর্টনের ভাবনার অন্ত নেই। মেয়ের এখন উঠতি বয়স। টিন এজের লাবণ্য ও চাপল্যে ঝক্‌মক্ করছে। তাই ওকে ইউরোপীয়ান সোসাইটিতে একটা ইমেজ গড়ে তোলার জন্য ক্লাবে, পার্টিতে, গীর্জায়, সুইমিং পুলে সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছেন। সম্ভাবনাময় ইংরেজ তরুণদের সঙ্গে নিবিড়ভাবে মেলামেশার সুযোগ করে দিচ্ছেন।

প্রতি সপ্তাহে একদিন করে নিজের বাংলোতে ডিনার পার্টির আয়োজন করেন। তাতে বিশেষ বিশেষ সাহেবরা নিমন্ত্রিত হন।

কিন্তু কদাচ মিঃ ট্রুম্যানের নিমন্ত্রণ হয় না। যেহেতু উনি মিঃ ব্যারাকলউয়ের প্রতি অনুগত সেজন্য মিসেস নর্টনের চোখের বালি। তাছাড়া টিউলিপের সঙ্গে ওর গোপন আলাপচারিতার সংবাদ পেয়ে এমন ব্যবস্থা করেছেন যাতে ওদের দেখা সাক্ষাৎ না হয়। তাই কি সম্ভব?

সেদিন ছিল রবিবার। সাহেবদের প্রার্থনার দিন। গীর্জায় গিয়ে ফাদারের সারমন গ্রহণ করে কৃতার্থ হওয়ার দিন। কয়লা কুঠির সাহেববাও গীর্জায় যান। প্রার্থনা করেন। আরো পাঁচজনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয়। বন্ধুবান্ধবেব সঙ্গে গল্প গুজব হয়। বান্ধবীর সঙ্গে মধুর আলাপ হয়। গীর্জা সাহেবদের মিলন কেন্দ্র।

ঠিক বেরবার মুখেই মিঃ ট্রুম্যানের সঙ্গে টিউলিপের দেখা হয়ে গেল। সদ্য গীর্জা থেকে বেবিয়েছে। মন বড় পবিত্র। প্রভু তাদেব মনে অপাব শান্তি দিয়েছেন।

মিঃ ট্রুম্যান বললেন—হ্যাল্লো টিউলিপ।

— হাই! মিঃ ট্রুম্যান। ঝর ঝব কবে হাসল ও। চুল ঝাঁকিয়ে ঘাড় দোলাল। শ্বেতদ্বীপবাসিনীব শ্বেত শুভ্র ফ্রকের অজস্র কুঁচি বাতাসে ভর করে ফেঁপে উঠল।

মিঃ ট্রুম্যান বললেন—আমরা কাছাকাছি বাংলোয় থাকি অথচ সাক্ষাৎ কবতে হলে গীর্জায আসতে হয়। এটা বড় দুঃখের নয় কী?

—তুমি তো মাঝে মাঝে আসতে পার আমাদের বাংলোয়।

—নিমন্ত্রণ কববে তবে তো যাব।

—অলরাইট। আজ বাত্রে তোমাব ডিনারের নিমন্ত্রণ রইল। রাজি?

—স্বচ্ছন্দে।

—বাই! টিউলিপ অ্যাবাউট টার্ণ করে ঘোড়ার গাড়ির দিকে চলে গেল। মিঃ ট্রুম্যানও ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে চাবুক কশালেন।

উনি যখন মিঃ নর্টনের বাংলোয পৌছলেন তার অনেক আগে মিঃ-ডিকসন আসর জমিযে বসেছেন। উনিও শেরগড় কোল কোম্পানির একজন বড় সাহেব। খুব দুর্দান্ত মানুষ। পাঁচ বছরের এগ্রিমেণ্টে ভারতে এসেছেন। তাতে বছর তিনেক হয়েছে। এরই মধ্যে শত-খানেক রমণীর সবনাশ করেছেন, তিন বছরের ম্যানেজারীতে ছোট বড় এক্সিডেণ্টে সাতান্ন জন লোক মেরেছেন, চাবুক দিয়ে পিটিয়ে ছ'জন কুলিকে সাবাড় করেছেন, দুবার কুলি ধাওড়ায় আগুন দেওয়ার হুকুম দিয়েছেন হাজার বিশেক টাকা জমিয়েছেন। শ'দুই কুলিকামিনকে জবরদস্তি করে পাদ্রীসাহেব দিয়ে ধর্মান্তরিত করিয়েছেন।

মজার কথা মানুষ যেমন তার পুরস্কার প্রাপ্তি, ডিগ্রী প্রাপ্তি, দান

ধ্যানের কথা ফলাও করে প্রচার করে উনি তেমনি স্বীয় কুকীর্তির কথা জোর গলায় বলেন। লোকে তারিফ করে—হাঁ—হিম্মৎবালা আদমী বটে।

উনি এখন মিসেস নর্টন দ্বারা অ্যাপয়েন্টেড টিউলিপের প্রেমিক। ইতিমধ্যেই আধ বোতল হুইস্কি খেয়ে চুর। মুখটা থম থম করছে। ঘন ঘন ঘাড় দোলাচ্ছেন ও টিউলিপের অনাবৃত উরুতে চুম্বনের ইচ্ছা প্রকাশ করে ফেলছেন।

সেই সময় মিঃ ট্রুম্যানের আগমন একটা ফালতু ঝামেলা। মিঃ-ডিক্সন ভদ্রতার জন্য করমর্দন করলেন বটে কিন্তু উষ্মা ভরে বললেন—তুমি কেন চার্চে গিয়ে টিউলিপকে বিরক্ত করেছিলে?

মিঃ ট্রুম্যান তো অবাক। বললেন—সে কি কথা! টিউলিপ নিজেই—

—নো-নো। ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যা কথা বল না। আমরা চাই না যে টিউলিপের সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্ক থাকুক।

—সেটা তো তোমার কথায় হবে না মিঃ ডিকসন।

মিসেস নর্টন এগিয়ে এসে বললেন—আমি বলছি। তুমি এখান থেকে চলে যাও।

মিঃ ট্রুম্যান হতভম্ব। এমন অভ্যর্থনা হবে জানতেন না। তিনি টিউলিপকে উদ্দেশ্য করে বললেন—তুমি আমাকে ডিনারে নিমন্ত্রণ করেছিলে টিউলিপ। তা কি এইভাবে অপমান করার জন্য?

টিউলিপ কিছু বলার চেষ্টা করছিল। কিন্তু মিঃ ডিকসন গর্জন করে উঠলেন—ইউ বাস্টার্ড! গেট-আউট।

মিঃ ট্রুম্যানের ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো। চিৎকার করে বললেন—শাট্-আপ। বাজে কথা বললে এক ঘুষিতে নাক ভেঙে দেব।

অ্যাবাউট টার্ণ করে চলে যাচ্ছিলেন। চোখে পড়ল টিউলিপ একটা চেয়ার ধরে কাঁপছে। ওর দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন—মনে রেখো টিউলিপ আমি তোমার প্রথম প্রেমিক। তোমার উপরে একটা অধিকার আছে। সে অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আমি ডুয়েল লড়তেও রাজি।

মধ্যযুগীয় সেনানায়কের মত বলিষ্ঠ পদক্ষেপে চলে গেলেন।

॥ ছয় ॥

পানমোহরায় নতুন কর্মযজ্ঞ। ব্যারাকলউ সাহেবের সাধের কোলিয়ারির চানক, হেড গিয়ার, বয়লার, পাম্পা, অফিস, ধাওড়া, কোয়ার্টার, বাংলো, পুকুর, কুয়ো, রাস্তা, ক্লাব, খেলার মাঠ—কোথায় কি হবে তার মাস্টার প্ল্যান নিয়ে বাসু সাহেব ম্যানেজার ও সত্যবাবু সার্ভেয়ার মাঠের উপর দাগ দিয়ে বেড়াচ্ছেন। মাপজোক এতটুকু এদিকে ওদিকে হবার উপায় নেই। ব্যারাকলউ সাহেবের এমন তৈরি চোখ যে হাজার ফুট লম্বা লাইনে যদি কোথাও ছ'ইঞ্চি বাঁক খায় তবু উনি বলে দেবেন—বাবু! তুমি কেমন দাগ দিলে? ঠিক করে খুঁটি ধরেছ? ওখানটা যে বাঁকা বোঝাচ্ছে।

তাই ওদের সাবধানতার শেষ নেই।

পানমোহরা ও সাতঘরিয়ার গ্রামের মাঝে এক বিশাল ঘুসিক চূণের নুড়ি বিছানো ডাঙা। স্থানীয় গোচর ভূমি। কিন্তু কোথাও ঘাসের লেশ-মাত্র নেই। গরুগুলো দূরের নাড়া ওঠা মাঠে চরে আর ডাঙায় বসে রোদ পোয়াতে পোয়াতে জাবর কাটে। লেজ, সিং নেড়ে মাছি তাড়ায়। রাখাল ছেলেরা ডাণ্ডাগুলি খেলে। কেউ কেউ গোবর কুড়োয়। ঠাঁই ঠাঁই গর্ত করে গোবর রাখে। সেগুলো পচে উৎকৃষ্ট সার হয়। কে জানতো যে সেখানে এক নগরীর পত্তন হবে।

পর পর পাঁচটা গরু গাড়িতে কাঠ, বাঁশ খড়, দড়ি এসে পৌছাল। কুলি কামিন মিস্ত্রি নিয়ে আগেই হাজির হয়েছে রাধু রাজোয়াড়। লেবার সরদার। মিছির বাবুর পেয়ারের আদমী। চানক কাটাইয়ের জন্য শক্ত সমর্থ লোক চাই। সাঁওতাল বাউরী দিয়ে কাজ চলবে না। ওদের ঢাক বাজলেই পরব। অত কামাই করা কুলি কামিন নিয়ে কাজ করতে গেলে দেরিই হবে। তবু ওদেরও বাদ দিয়ে কাজ চলবার নয়। তাই ওদেরও একটা দল আছে। আর দেশের মোহান থেকে একদল মিঞা নিয়ে এসেছেন। ওরা পাথরের যম। বংশ পরম্পরায় পাথর কাটার কাজ করে আসছে।

গ্রামবাসীদের সব তাক্ লেগে গেল। কি ব্যাপার? এত লোক লস্কর কেন? রাখাল ছেলেরা সাধের গো-ডহরে দাঁড়িয়ে মজা দেখতে লাগল।

খুঁটি পুঁতে বাঁশের কাঠামো করে খড়ের ছাউনি করা ঘর। তিন

চারদিনের মধ্যে চার সারি ঘর তৈরি হয়ে গেল। সাত ফুট বাই আট-ফুট কামরা। তাতেই বৌ ছেলেপুলে নিয়ে ঘরকন্না। সামনে জ্বলন্ত উনুন। দু'বেলা ভাত হয়। প্রথম কদিন সরকারি খরচে একসঙ্গেই পাতা পেড়ে খাওয়া-দাওয়া চলছিল। খিচুড়ী ও চাটনী। বড় সোয়াদের রান্না। কুলি কামিনরা খুব খুশি। ওরা জানেই না জীবনে এর চেয়ে বেশি উপাদেয় খাদ্য আছে কিনা।

যেমন যেমন ঘর তৈরি হয়েছে তেমন তেমন কুলিকামিনরা আপন গুষ্টি বিরীঙ্গিৎ নিয়ে ধাওড়ায় বসবাস শুরু করেছে।

মুন্সীবাবুর নাম সত্যনারায়ণ সিং। আরা জেলার রাজপুত। হিন্দিতে নাম লিখতে জানেন। বয়স হয়েছে পঞ্চাশের উপর। ন্যাড়া মাথা। ঢ্যাঙা গড়ন। পাই পয়সার হিসাব রাখেন। সব কুলি-কামিনকে রোজ চারআনা করে খোরাকী হাওলাৎ দেন। সপ্তাহের শেষে পাওনা গণ্ডা হিসেব করে কেটে নেবেন।

তাঁবু আছে তিনখানা। একটা বড় তাঁবু ব্যারাকলউ সাহেবের অফিস কাম খাস কামরা। একটা তাঁবু সাধারণ অফিস ও গুদাম। অন্যটিতে থাকেন বাসু সাহেব।

কাজের খুব তোড়জোড়। পাশাপাশি দুশো ফুটের ব্যবধানে দুখানি চানক খোঁড়া হচ্ছে। বাইশ ফুট ব্যাস। প্রথমে সাতফুট মাটি ও মোরাম কাটার পর খুরুষ পাথর লেগেছে।

স্যার আলফ্রেড নোবেল যে ডিনামাইট আবিষ্কার করেছিলেন তা তখনো ভারতের কয়লা খনিতে ব্যবহারের উপযোগী করে তৈরি হয় নি। ব্যারাকলউ সাহেব বনতুলসী চারকোল ইত্যাদি দিয়ে বাংলা বারুদ তৈরি করিয়েছিলেন। পাথরে শাবল দিয়ে গর্ত করে বাংলা বারুদ (গান পাউডার) ঠাসানি করে পলতেতে আগুন দেয়। ব্যাস দুম দাম আওয়াজ হয়। পাথর ফেটে পড়ে। কুলিকামিনরা শাবল, গাঁইতি, কুনিয়া হ্যামার দিয়ে সেই ফাটা পাথর ভেঙে খান্ খান করে ঝোড়ায় ভরে উপরে তোলে।

চানকের ধারে ধারে বৃত্তাকারে বেড় দিয়ে এক ফুট চওড়া সিঁড়ি কেটে কেটে ওঠবার রাস্তা। কামিনগুলো মাথায় ঝোড়া নিয়ে দিব্যি উঠে যায়। অথচ পা পিছলে একবার পড়লেই ভবলীলা সাঙ্গ।

বাস্থু সাহেব ঠায় বসে থাকেন। হরদম হাঁক-ডাক করেন। ব্যারাকলউ সাহেব দিনে অন্তত একবারও আসেন। কাজের প্রোগ্রেস দেখে যান। কিন্তু চানকের গায়ে সিঁড়ি ভাঙা রাস্তার মরণ ফাঁদ তাঁর পছন্দ নয়।

তিনি একদিন এলেন মিঃ নর্টনকে সঙ্গে নিয়ে।

বললেন—হেড গিয়ার, ইঞ্জিন, বয়লার, স্টিম পাম্প, ডুলি, রোপ, ইত্যাদি সাজ-সরঞ্জাম বিলেতের একটা কোম্পানিকে অর্ডার দিয়েছি। কিন্তু সে সব আসতে ছয়মাস থেকে একবছর সময় লাগবে। অবশ্য আমার মিসেস তার তাগাদা করার জন্য আছেন। ততদিন কাজ ঠিক ভাবে চালাবার জন্য কাঠের হেড গিয়ার বসাবার কথা ভাবছিলাম। তুমি কি বল?

মিঃ নর্টন বললেন—আপনি স্যার একজন অতি সুদক্ষ ডিজাইনার হয়ে আমাকে একথা জিজ্ঞাসা করছেন?

—পাঁচজনের কাছে পাঁচটা বুদ্ধি নিয়েই তো আমি ডিজাইন বানাই তাই কাউকে ছোট মনে করি না। তুমি যতটা পারো আমাকে সাহায্য কর।

—নিশ্চয়ই করব স্যার। আমাকে একটা নক্‌শা করে দিন। দেখে দেখে করে দেব।

—ধন্যবাদ মিঃ নর্টন। দেখুন এই একটা নক্‌শা। চানকের চার কোণে চারটে কাঠের খুঁটি। মোটা শাল গাছের গুঁড়ি বলতে পারেন। প্রত্যেকটি খুঁটিকে সাপোর্ট দেবার জন্য কর্ণার খুঁটিও থাকবে। মাথার উপর প্লাটফরম। কিন্তু মুস্কিল হয়েছে কাঠের হেড গিয়ারে লোহার পুলিচাকা বা তারের রসা তো চলবে না। কাঠের পুলি ও মোটা নারকেল ছোবড়ার দড়ি ব্যবহার করতে হবে। ডবল পুলিও চাই। না হলে অত মাল উঠবে কি করে?

—হ্যাঁ স্যার। মহা সমস্যা। কিন্তু আপনার মাথায় নিশ্চয়ই কিছু বুদ্ধি এসে যাবে।

—আমি চিন্তা করছি।

মিঃ নর্টন চলে গেলেন।

হতভাগা মুনশী বলে বসলেন—ঈ সায়েব কিছু জানে না। কেন যে নিয়ে এলেন?

ব্যারাকলউ সাহেব বললেন—তুমি চুপ কর। ও কি জানে বা না জানে তার তুমি কি বুঝবে ?

বাসু সাহেব হাসছিলেন।

ব্যারাকলউ সাহেব বললেন—টেল হিম বাসু—বিলেতের মুদ্দাফরাসও ইণ্ডিয়ার ডাক্তার হতে পারে। তবে কামার মিস্ত্রী ইঞ্জিনীয়ার হলে দোষ কী।

বাসু সাহেব বিনয়ে বিগলিত হয়ে বললেন—নাথিং স্যার। তবে কাঠের হেডগিয়াব আমিই বানিযে দিতে পারি। যদি আপনার হুকুম পাই।

—জানি বাসু। তুমি আমার একটি এ্যাসেট।

মিঃ নর্টন বাংলোতে ফিরলেন সন্ধ্যার পব। এসেই খাদে নেমেছিলেন। তাই ঘামে, গর্দায়, কালিতে, তেলে চুবচুবে হয়ে যখন ফিরলেন তখন মিসেস নর্টনের মুখে আষাঢ়ের মেঘ নেমেছে।

মিঃ নর্টনকে চার্জ কবলেন—শুনলাম তুমি ব্যারাকলউয়ের কোলিয়াবিতে গিযেছিলে।

– হ্যাঁ। ঠিক শুনেছ।

—জান মিঃ হ্যামিলটন এসব পছন্দ করেন না।

- সো হোয়াট ?

—খেয়াল রেখ তিনি তোমাব উপবওলা। বিলেতে হাতুড়া পিটছিলে ইণ্ডিয়াতে এনে ইঞ্জিনীয়ার বানিয়েছেন উনিই।

—ইচ্ছা করলে উনি আমার সে পদ কেড়ে নিতে পারেন।

—তাতো নেবেনই। তিনি পছন্দ করেন না এমন কাজ করলে তোমার চাকরি থাকবে মনে করছ ?

—তোমার চাকরিটা থাকবে তো ? আই মীন তোমার শেক্‌স শপ ?

—শাট্ আপ। তীব্র কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলেন মিসেস নর্টন। গালি পাড়তে লাগলেন ব্লাডি বাষ্টার্ড! সান অফ বীচ। তোমাব এত স্পর্ধা।

মিঃ নর্টনের রক্ত গরম হয়ে উঠছিল। তিনিও চিৎকার করে উঠলেন—ইউ ফ্যাকিন হোর—শাট ইয়োর মাউথ।

ঝাঁপিয়ে ওঁর টুঁটি টিপে ধরলেন। টিউলিপ ছুটে এল। মিঃ নর্টনকে

ধরে কাঁদো কাঁদো মুখে বলল—ড্যাডি! প্লীজ। ড্যাডি। টানতে টানতে বাথরুমে নিয়ে গেল।

মিসেস নর্টন একটা চেয়ারে বসে পড়লেন। মিঃ নর্টনের এই রুদ্রমূর্তি জীবনে কখন দেখেন নি। উনি চিরদিন সহ্যই করেছেন। কখন আক্রমণ বা প্রতি আক্রমণ করেন নি। তাই তাঁর আচরণের সবটুকু দায়িত্ব মিঃ ব্যারাকলউয়ের ঘাড়ে ফেলে আপন মনে গজরাতে লাগলেন। খানসামাকে হুকুম দিলেন—সরাব নিয়ে আয়।

একটু পর মিঃ হ্যামিলটন এলেন। মিসেস নর্টনকে বললেন – হ্যাল্লো ডারলিং, তুমি একাই ড্রিংক করছ?

মাতাল কণ্ঠে মিসেস নর্টন বললেন—মনটা ভাল নেই ডিয়ার।

—কেন? কেন?

—কেন আবার? ব্লাডি বীস্ট নর্টনকে নিয়ে আর পারছি না। ব্লাডি ব্যারাকলউ ওর মেজাজ বিগড়ে দিয়েছে। তুমি ওর ব্যবস্থা কর ডিয়ার।

—হচ্ছে ডারলিং। তুমি নিশ্চিন্ত থাক। আমি ত্যা শেরগড় কোল কোম্পনির চীফ। আমাকে টেক্কা দিয়ে কেউ যেতে পারবে না।

মদের গ্লাস এগিয়ে দিয়ে মিসেস নর্টন বললেন—কি ব্যবস্থা করেছ ডিয়ার? আমার শুনতে খুব ইচ্ছে হচ্ছে।

—ধীরে। খুব ধীরে। সবই শুনতে পাবে। ব্যারাকলউকে ইণ্ডিয়া থেকে বিদায় করে দেবার ব্যবস্থা করেছি। তারপব পানমোহরার মালিক হব তুমি আর আমি।

—ওহ্! ডিয়ার। তোমার মাথা এত ঠাণ্ডা!

মিঃ হ্যামিলটনের গলা জড়িয়ে প্রায় ঝুলে পড়লেন। উনি ওকে দু'হাতে কোলে তুলে বড় আয়নাটার সামনে দাঁড়ালেন।

বললেন—ডারলিং! দেখ তোমাকে কত সুন্দর দেখাচ্ছে।

উনি জড়িত কণ্ঠে বললেন—তোমাকেও খুব সুন্দর দেখাচ্ছে।

বিবিবাথানের ভাবনা শুধু ভাত আর ভাতারের। ছেলে-পুলে জন্ম নেয় জৈবিক কারণে। তার বেশির ভাগই জারজ। ছলনা, বঞ্চনা, বেলী, চামেলীর যৌবন হারিয়ে যায় নিবয়ণ কালচক্রের অমোঘ আবর্তনে। মহাকালের কাছে কারো ক্ষমা নেই। একটা রাগিনীর অকাল মৃত্যু কোন ব্যাপার নয়। অমন কত রাগিনী প্রতিনিয়তই হারিয়ে যাচ্ছে। জাত হারিয়ে সবাই ঈশ্বরের পুত্র কন্যা।

তাদের কানে অমৃত পুরুষ যীশুর বাণী পৌঁছে দেবার জন্য আছেন ফাদার উইলিয়াম। সাঁওতালদের হুলমালের পর তাদের মগজ সাফ করে হিংসার পথ পরিত্যাগ করাবার মহান ব্রত নিয়ে এসেছিলেন। ডুমকা, গোড্ডা, জামতাড়া পালাজুড়ির পথে ঘোড়ার গাড়ি হাঁকিয়ে পরিক্রমা করেছেন তাদের শান্ত শিষ্ট সুবোধ বালকের মত ব্রিটিশ এম্পায়ারের গোলাম বানাবার জন্য। তাদের কানে অকাতরে অমৃত পরিবেশন করেছিলেন অনেককাল ধরে। সহস্রাধিক দরিদ্র, পঙ্গু, রোগজীর্ণ সাঁওতালকে অমৃত দিয়ে ব্ল্যাক মডেলের খ্রীশ্চান বানিয়েছেন—হেমব্রাম, মারাণ্ডী, টুডু, ঘুঘু ইত্যাদি খেতাব দিয়ে।

এখন উনি আসানসোল রাণীগঞ্জের খনি অঞ্চল ও রেল কর্মীদের মধ্যে কাজ করছেন। আপাততঃ দিনকয়েক ব্যারাকলউ সাহেবের বাংলোতে আতিথ্য গ্রহণ করেছেন। কাবেরীর কানে ফুস মন্তর দিচ্ছেন। তাঁর চামড়ার রঙ সোনালী। কুক্ষিতে ধারণ করে আছে ভবিষ্যতের ব্যারকলউকে। মনসারাম যেমন একটি নমুনা।

বাতাসের নাম ফাগুন হাট। অর্থাৎ ফাগুন মাসের মলয় হিল্লোল। আসলে তা হা হা করা হাহাকার। মধু যে কোথায় ঝরে কে জানে? প্রাণ অতিষ্ঠ ধুলোবালির ঠ্যালায়। লোকে বলে মধুমাস।

ওসব কথার কথা। রাঢ়ভূমিতে ফাগুণ আসে বসন্তরোগ নিয়ে। পলাশের বোঁটা টিপে তার দাওয়াই বের হয় না।

বিবি বাথানের ছলনা দাসী তার ঠ্যালায় জেরবার। খাদে খেটে গ্যালন গ্যালন ঘাম ঝরিয়ে সব যন্ত্র বিকল। রাগিনী ওর মাথায় পাথর চাপিয়ে দিয়ে গেছে। সতীন হলে কি এমনি শত্রুতা করতে হয়? গিলতেও পারে না উগ্‌রতেও পারে না।

রাগিনীর যৌবন হিল্লোলে যে সরদারী চলত তা শুঁটকী চামচিকী ছলনা চালাবে কী করে? অথচ ছাড়তেও পারে না। তবু তো কিছু পয়সা কড়ির রোজগার হয়। রাগিনী ছিল একটা দুধেল গাই।

তার ছেলে মনসারামের গায়ে মায়ের খেলা। হলই বা সতীনের ছেলে। মানুষ তো তার কাছেই হচ্ছে। নিজের দুধের বোঁটা টিপে তার মুখে দিয়েছে। সে ছেলের সারা গায়ে ডাগর ডাগর বসন্তের গুটি। মুখটা বীভৎস। সারা দিনরাত যন্ত্রণায় ছটফট করে। মা

মা করে চেঁচায়। মা-হারা ছেলের মা ডাক শুনে ছলনার বুকের রক্ত ছলাৎ ছলাৎ করে। মাথার কাছে লম্ফ বাতি জ্বেলে ঠায় বসে থাকে। নিমপাতার বিছানায় শুইয়ে রাখে। এ রোগের কোন ওষুধ নেই। মাথা ঠুকে হা পিত্যেশ করা আর মা শীতলার পূজো দিয়ে ফুল জল দেওয়া ছাড়া কিছুই জানে না।

ঢালু দাস রাত দুপুরে নেশা করে ঘর আসে। ভোঁস ভোঁস শব্দে নাক ডাকিয়ে ঘুমোয়। তার যেন কোন দায় ধাক্কাই নেই।

এই সময়ে ফাদার উইলিয়ম তাঁর সেবার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। কারণ মনসারামকে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে। ইউরোপীয় রক্তে তার জন্ম। তাকে খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষিত করা ফাদারের পবিত্র কর্তব্য।

কাবেরী আর একটি শিকার। সে হিন্দুধর্ম থেকে অনেক আগেই বহিষ্কৃত হয়েছে। খ্রীষ্টানের ঘরকন্না করছে। জাতপাত সব হারিয়েছে। সাহেবের সঙ্গে গরুর মাংস দিয়ে মদ খাচ্ছে। অতএব ওর একটা ধর্মীয় আশ্রয় অতি অবশ্যই প্রয়োজন। না হলে কে তাকে অমৃত দেবে? ইত্যাদি অনেক কিছুই ওকে বুঝিয়েছেন। বাংলা ভাষাটাও উনি ভালভাবে রপ্ত করেছেন। কথাবার্তা খুব মিষ্টি। কাবেরী প্রায় রাজী হয়ে গিয়েছিল!

একদিন রাত্রে ডিনারের সময় ব্যাবাকলউ সাহেবকে বলল—সাহেব! তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করব?

—নিশ্চয়।

—পাদ্রী সাহেব অনেকদিন থেকে আমার পিছু লেগেছেন। প্রায়ই বলেন তুমি খ্রীশ্চান হয়ে যাও। মনে খুব শান্তি পাবে।

—কেন? তুমি কি খুব অশান্তিতে আছ নাকি?

—না-না সাহেব। আমি সেকথা বলতে চাইনি। তুমি উল্টো বুঝনা।

—আচ্ছা আচ্ছা উনি ঘাড় নাড়লেন।

কাবেরী বলল—এখন সাহেব আমি কি করব?

—তোমার যা ইচ্ছা।

—এটা কি কথা হল সাহেব? তুমি রাগ করে বলছ।

মিঃ ব্যারাকলউ বিব্রত হয়ে বললেন—আরে না-না। আমি মনের কথাই বলেছি। তোমার ধর্মের কথা তুমিই ভাববে। আমি বলব না।

—তাহলে আমি কার কাছে পরামর্শ নেব? কে আমাকে পথ দেখাবে?

—ছাখ ডারলিং তুমি এসব জটিল প্রশ্ন আমার কাছে এনো না। আমি সত্যিই ধর্ম সম্পর্কে কিছু জানি না।

—তবে আমি খ্রীষ্টান হব না।

—বেশ। বেশ। ফাদারকে আমি বলে দেব।

ডিনার শেষ করে উঠে পড়লেন।

জাল বিছিয়েও টানতে পারছেন না। এই অবস্থাটি উদ্বেগজনক। রোজ সন্ধ্যায় চোখের কাজল কান পর্যন্ত টেনে তেল চুকচুকে খোঁপায় পলাশ ফুল গুঁজে কোমরে ঝোড়া নিয়ে খাদে যায় সুমি। তার আগে টুরু মাঝি। পিছনে রাসমণি মিঝান। তিনজনের ছোট্ট মিছিল। মাঝখানে ফুলের কুঁড়ি।

হাবু সাহেবের জিভ লক্ লক্ করে। রোজ মনে হয় ঐ ফুলটি তুলব—গলায় মালা করব। কিন্তু হয়ে উঠছে না। কোথায় যেন একটা অদৃশ্য বাধা আছে।

যত দিন যাচ্ছে সুমির বালিকা দেহ যৌবনের পল্লবে তত সুসজ্জিত হচ্ছে। নতুন বর্ষার জল ধারায় ভিজে মাটিতে যেমন শ্যামল ঘাসের সবুজ আস্তরণ রূপে লাবণ্যে বিকশিত হয় বিয়ের পর মেয়েরাও তেমন পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিতা হয়। সুমির এখন ফুটে উঠবার পালা। ওর চোখ, মুখ, ঘাড়, নিতম্ব, স্তন, উরু চঞ্চল বিভঙ্গ ছন্দোময়ী।

তাই রাসমণির এত ভয়। হাবু সাহেব সাপের চেয়েও কুটিল সে তথ্য ওর চেয়ে বেশি কে জানে? ও কি কম পাপ করেছে। নাকি ওকে দিয়েও কম পাপ করিয়েছে? সব জানে ও।

আজ যখন সেই কোপটা নিজের মেয়ের উপর পড়তে চলেছে তখন ওকে তক্কে তক্কে সাবধান থাকা ছাড়া জো কি? বিড়ালের মুখ থেকে মাছ জিইয়ে রাখতে হবে বৈকী।

সেইজন্য ও নিজে হাজরি কামিনের কাজ ছেড়ে মেয়ে জামাইয়ের সঙ্গে মালকাটার কাজ্‌ করছে। সন্ধ্যাকালে তাজা ফুলের মত খাদে নামে। সারারাত ধরে গরমে ঘামে গজ গজে হয়ে টব গাড়ি বোঝাই করে। সকালবেলায় যখন খাদ থেকে ওঠে তখন যেন তিনটি চলন্ত

কয়লার চাপ। সাদা বলতে দাঁতগুলি। কথা বলবার সময় ঝক্ ঝক্ করে।

হ্যামিলটন সাহেবের সঙ্গে ব্যারাকলউ সাহেবের স্বার্থ সংঘাত যত তীব্র হচ্ছে স্তা শেরগড় কোল কোম্পানির রেজিং তত কমছে। অবস্থা অবনতির দিকে। সেজন্য ব্যারাকলউ সাহেবের ঘাড়ে দায়িত্ব চড়িয়ে দিয়ে হ্যামিলটন সাহেব বিলেতে বোর্ড অফ ডাইরেক্টার্সের কাছে বিস্তর রিপোর্ট পাঠাতে পারেন কিন্তু তাব দ্বারা প্রোডাকশন হয় না।

মিঃ হ্যামিলটন সেজন্য কম উদ্বিগ্ন নন। তিনি ম্যানেজারদের নিজের অফিসে ডেকে কড়া ধাতানি দিয়েছেন। ম্যানেজাররাও কোলিয়ারিতে ফিবে এসে মাইনিং ইনচারজ ও গোমস্তা বাবুদের ওপর দশগুণ ধাতানি দিয়েছেন।

মিঃ শেফার্ড আরো এককাঠি সরেস। তিনি মিছিরবাবুকে বললেন—ফাকিন গোমস্তা তুমি কি করছ? তিনদিন সময় দিলাম। এর মধ্যে যেখান থেকে পার মালকাটা নিয়ে এসে রেজিং বানাও। না হলে দেশে চলে যাও। আমি দুসরা গোমস্তা রাখব।

মিছিরবাবুর মাথায় যেন বাজ পড়ল। তাঁর চাপরাশিদের মধ্যে সাজ সাজ রব পড়ে গেল। মাথায় গামছা বেঁধে মালকাটা খুঁজতে বেরুল।

হাবু সাহেব তো ধমকের চোটে কাপড়ে চোপড়ে হয়ে হয়ে গেলেন। মিঃ শেফার্ড তিনফুট লাঠি নাচিয়ে বললেন—ব্লাডি ফাকিন্। আমি তোমার চরিত্র জানি। তোমার ভয়ে কোন মালকাটা তার যুবতী স্ত্রীকে নিয়ে খাদে আসতে পারে না। তুমি তাদেরকে রেপ কর, মার্ডার কর, চাঁদনীতে পাথর চাপা দাও?

উনি বললেন—হুজুর যত পাপ করেছি সব আপনাদের হুকুম তামিল করতে। যা চেয়েছেন তাই করেছি।

—শাট আপ! মিথ্যাবাদী। আমি তোমাকে খাদের কামিনদের রেপ করতে বলি নি। যদি ভাল চাও তাহলে ওসব ছেড়ে দিয়ে রেজিং কর। মনে রাখবে তিনি দিনের মধ্যে যদি রেজিং ডবল না হয় তাহলে—আই শ্যাল পুস্ দিস ষ্টিক স্ট্রেইট টু ইয়োর রেকটাম।

হাবু সাহেবের মাথায় হাত। এ আবার কোন বনের বাঘ? এযে দেখছি ব্যারাকলউ সাহেবের বাপ। এই চাকরির জন্য উনি

এত তদবির করেছেন। ব্যারাকলউ সাহেব তাঁকে মেনসের কাপড় কাচতেই বলেছিলেন। ইনি তো গুহ্য প্রহার করতে চান।

এই ছিল ব্রিটিশ আমল। একজন দেহাতী সাহেব যাঁর কৌশলে ও দক্ষতায় বিলিতি সাহেবরা মদ খাবার অঢেল সুযোগ পান তাঁকেই এমন কথা বলতে পারেন। তবু কেউ তর্জনী তুলে কথা বলতে পারে না।

উনি জনে জনে প্রত্যেক সরদার, প্রত্যেক বাবু, প্রত্যেক মাল-কাটাকে ফরমান জারী করলেন—সব মালকাটাকে ডবল রেজিং দিতে হবেক। সাহেবের কড়া হুকুম। না হওয়া পর্যন্ত কারু ছুটি নেই। কেউ খাদ থেকে উঠতে পাবে না।

পাগলের মত সারা খাদে নেচে বেড়াতে লাগলেন।

॥ সাত ॥

রাত দশটায় রাসমণির আয়তনে পৌঁছে হাবুসাহেব ডাক দিলেন—রাসমণি। টুক এখন একটি ডিপ সুঁদে গাঁইতি দিয়ে কয়লা কাটছিল। রাসমণি ও সুমি কামারশালে তৈরি বালতিতে করে জল তুলে ফেলছিল। তখনকার ব্যাপার এই রকমই ছিল। মালকাটারা নিজেরাই জলকাদা, পাথর সাফ করে কয়লা তুলত। সেজন্য আসল কয়লা কাটার কাজের চেয়ে এইসব উটকো কাজটাই বেশি হয়ে পড়ত। তার মজুরি ফাউ।

হাবু সাহেবের ডাক পেয়ে রাসমণির বুক ধড়ফড় করে উঠল। গরমের চোটে গায়ে কাপড় রাখা দায়। হাঁটুর উপরে ফ্যানাড়ী পরে বুকে ছেঁড়া গামছা ঢাকা দিয়ে সুমি তখন জড়সড়। রাসমণি ওকে আড়াল করে দাঁড়াল।

উনি ওর মনোভাব বুঝতে পেরে বললেন—তোর জিয়ল মাছটিতে এখন দরকার নেইরে রাসমণি। আমার অন্য কাজ আছে।

রাসমণি ভয়ে ভয়ে বলল—ভাল সায়েব। তুই যা বলেছিলি তাই করেছি। আরো কি করতে হবেক বল?

—তুরা দিনাম কত করে রেজিং করিস?

—কত করব সায়েব? তিনজনে তিন গাড়ি করি। বেবাক কাছিয়া তো?

—না। ডবল দিতে হবেক। তিনজনে ছ-গাড়ি। বুঝলি?

—ঈ বাবা! তুর কথায় দুধের ছেন্যা নিয়ে কাজ করছি। অত গাড়ি কুথা থিকে করব বাবু।

—এ্যাঃ দুধের ছেন্যা! যৌবনে ডগমগ করছে। বাঘে খেলে ফুরাবেক নাই। আবার দুধের ছেন্যা। শুনে আমার গা-টি সলগা দিঞে উঠল। ভাল করে শুনে লে। তিনজনে ছ-গাড়ি রেজিং কববি তবে খাদ থেকে উঠবি। না হলে চাবকাঞে চামড়া বাদাড়ে দিব।

উনি চলে গেলেন ঐ একই কথা অন্য মালকাটাদেবকে বলতে।

টুরুর দিকে তাকিয়ে রাসমণি বলল—পারবি বেটা? ছ গাড়ি!

—ঈ বাবা! তিনগাড়ি কাটতেই এক হাত জিভ বিরাঞে যেছে। ছ-গাড়ি কি করে কাটব?

টুরুর কথা খাঁটি সত্যি। কয়লা কাটা পুরুষের কাজ। একজনে একটব গাড়ি কেটে ভরতে পারলে মনে করে জীবনটি ধুক ধুক করছে। সে জায়গায় টুরুকে রোজ তিনগাড়ি কয়লা কাটতে হয়। সুমি, রাসমণি কয়লা কাটতে পারে না। ওরা টব বোঝাই করে। টুরুর খাটালি এমনিতেই ডবল! এবার রি-ডবল হবে।

রাসমণি বলল—কাল থিকে মাঝিকেও নিঞে আসব। উ তো আগে ভাল কয়লা কাটতে পারত।

সুমি বলল—হ্যাঁ মা। উয়ার কি সেই গতর আছে।

—নাই ত। কিন্তুক কি করবি? সায়েব খালভরা যে কথাটি বললেক তাব নড়চড় হবার লয়। উ সাঙীন্ লোক।

যেখানে যত কড়াকড়ি সেখানে তত চুরি। হাবুর হুকুমে সবাই তটস্থ। সরদাররা আরো। মাইনিংবাবুকে ধরল গিযে—বাবু একটি উপায় করে দাও।

—কি উপায় করব রে?

—ক্যেনে আয়তন থেকে যা উপায় করে কাজ করছি তাই করব। বাকিটা লাইন ধারের কাঁথি কেটে ভবে দিব।

—ওরে বাব্বাঃ। তাবপরে যদি ধস্‌কে যায়।

—খুঁটা কগ্ লাগাঞে দিবি বাবু।

সাহেবরা যদি জানতে পারে।

—লুকাঞে লুকাঞে কাটব বাবু।

—এঃ। তুরা বাড়া শিয়ান রে। নিজেরা বেশি গাড়ি ভরবি ত বেশি পয়সা পাবি। আমি কি পাব ?

—তুকেও ভাগ দিব বাবু। এখন জীবনটি বাঁচা। হাবু সাহেবের ডাং খেঞে মরি ক্যেনে ?

—তবে খুব সাবধান। বুঝলি ত। কেউ যেমন জানতে না পারে।

শুরু হল আত্মহননের পাপ। এর নাম রবিং। মালকাটারা সুবিধা মত জায়গায় রবিং করে গাড়ি ভরে। সুড়ঙ্গের চওড়া বাড়ে। উপরিস্থিত স্তরীভূত শিলার ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়।

ওদিকে টালোয়ানদের নাভিশ্বাস উঠছে। ডবল রেজিং কি সোজা কথা। কিন্তু হাবুসাহেব লাঠি হাতে ডিপোতে দাঁড়িয়ে। কড়া হুইস্কি খেয়ে মেজাজ টং। কোচোয়ান যেমন আধমরা ঘোড়াকে গাড়িতে জুতে চাবুক মেরে চালায় তেমনি করে উনি টালোয়ানদের চালাচ্ছেন।

পুব আকাশটা লাল হয়ে উঠেছে। গ্রামে গ্রামে লোকজন জাগছে। পাখ পাখালি ডাক ছাড়ছে। টব রেজিংয়ের কাঁটা তুশো পার হয়ে গেল। ঝক্ ঝক্ করে লুস চলছে। ট্রাম লাইনের উপর এক্সপ্রেস ট্রেনের মত টবগাড়ি ছুটছে। ষ্টিম লিভার হাতে ইঞ্জিন খালাসী হরদম তৈয়ার।

সকাল ছ'টা। গাড়ী উঠল—তুশো পঞ্চাশ।

হাবুসাহেব হুঙ্কার ছাড়লেন—চালাও, যতক্ষণ না তিনশো হয় ততক্ষণ লুস চালাও।

কেউ যেতে পাবে না।

সাহেবরা সাতটার সময় ডিপোতে হাজির। তখন দিন পালি চালু হয়ে গেছে। রাত পালির রেজিং তুশো আশি। হাবু সাহেবের অসাধারণ কর্মোদ্যমের ফসল।

মিঃ শেফার্ড ওর পিঠ ঠুকে বললেন—ওয়েল ডান ওল্ড ম্যান। ইয়ে লেও বখশিষ।

যাও দারু পিয়ো।

ঝনাৎ করে ফেলে দিলেন মহারানী ভিকটোরিয়ার ছাপমারা একটি রূপোর টাকা। এসব খরচ লেখা হবে জব প্রমোশনের হিসেবে।

অবশেষে পানমোহরার চানক কাটাইয়ের জন্য কাঠের হেড গিয়ার, পাল্লা, পুলিচাকা বসে গেল। গরুর গাড়ির চাকার ডিজাইনে

প্রুভ কাটা পুলি হল। তাতে মোটা রসা পার করা হল। এক প্রান্তে হুক দিয়ে বড় বালতি ঝোলানো হল। অন্য প্রান্ত জুতে দেওয়া হল ঘোড়ার সঙ্গে। ঘোড়া চলে রসা লোল হাবিস হয়। পাথর, মাটি, জল ওঠে বালতিতে করে। মানুষজনও তাতেই ওঠানামা করে। চানকের উপর পাটাতন করে দেওয়া হয়েছে ওঠানামার সুবিধার জন্য। কাজ ডাবল হয়ে যায়। নিজের কারিগরি বিদ্যার উদ্ভাবনী শক্তিতে ব্যারাকলউ সাহেব নিজেই খুশি। চানক কাটাই চলছে জোর কদমে।

কবে যে হেড গিয়ার, ষ্টিম ইঞ্জিন ইত্যাদি যন্ত্রপাতি এসে হাজির হবে সেই আশায় উনি দিন গুণছেন। স্বপ্ন দেখছেন শিল্প বিপ্লবের জোয়ার আসবে। ডাঙাব মাঝে জনপদ সৃষ্টি হবে। তাপ শক্তির অমোঘ প্রভাবে কল কারখানা গড়ে উঠবে।

সাতঘরিয়ার ঘুসিক চুনেব নুড়ি বিছানো ডাঙায় মানুষেব কোলাহল দিনে দিনে বেড়েই চলেছে। ভাতের সন্ধানে কত অভাগা এসে জুটেছে। তাদের বাচ্চা, বুতরু, মেহেরারু শীত পেরিয়ে বসন্তে পা দিয়েছে। কাঠ বাঁশ খড়ের ঘরের চারিপাশে মাটির দেওয়াল দিয়ে আপন আপন সরম ভরম, আবরু ইজ্জতের জন্য আবরণ ও আচ্ছাদন তৈরি করে নিয়েছে।

কিন্তু প্রকৃতির এমন অভিশাপ যে যেখানে জনপদ সেখানেই সেই আদিপাপ। নারী দেহের উরু সন্ধিতে কত টনের যে চুম্বক আছে কে জানে কিন্তু অবলীলায় টেনে আনে দেড়মনী, দুমনী জোয়ানটিকে। তীব্র আবর্তে পাক দিয়ে নিংড়ে ফেলে রসকষ।

মায় অহিফেন সেবী সত্যনারায়ণেরও মৌতাত জমে না সোনার মায়ের কোমল হাতের ছোঁয়া না পেলে। সোনার বয়স দশ বৎসর সে গরু রাখালি করে। বাড়ি সাতঘরিয়ায়। ওর মা ঝিগিরি করতে এসেছিল। সত্যনারায়ণ দু-সের চাল চার আনা পয়সা দিয়েই ওর মন কেড়ে নিয়েছেন।

আবার ওদিকে খেলা দাসীব যাদুকরী খেলায় বাসু সাহেব হাবুডুবু খাচ্ছেন। উনি হট্ ড্রিংকস পান করেন। হেকিমী দাওয়াই সেবন করেন। বোজ বোজ কাটুল্লী মুরগীব ঝোল খান। আণ্ডা দিয়ে ব্রেকফাস্ট সারেন।

দামোদরে বগেড়া পাখি পাওয়া যেত। মাঝিরা ফাঁদ পেতে সেই পাখি ধরে বিক্রি করত। উনি তা চড়া দামে কিনে নিতেন। ছোট ছোট চড়ুই পাখির মতো সাইজ। দারুণ গরম। মাংস তো নয় যেন শুক্র সঞ্জীবনী আয়ুর্বেদিক ঔষধ। সাধে কি তিনি কোয়ার্টার জিন্দেগী পার করে দিয়েও খেলাদাসীর মহড়া নিতে পারছেন। তাঁর সঙ্গমে পূর্ণ যৌবনা রমণী সুখের ঠ্যালায় কঁক্ কঁক্ করে।

একদিন ব্যারাকলউ সাহেব রসিকতা করে বললেন—বাসু! আশা করি তোমার কর্মক্লান্ত প্রহরগুলি ভরিয়ে রাখতে পেরেছ। কারণ তোমার সুখের সাকী বিপুল পয়োধরা এবং নিতম্বিনী।

বাসু সাহেব গদ-গদ কণ্ঠে বললেন—ইয়েস স্যার। ডু ইউ লাইক টু টেস্ট স্যার ?

—অফ কোর্স! অফ কোর্স!

সেদিন খেলাদাসী হাড়ে হাড়ে বুঝল আখাম্বা পৌরুষ কাকে বলে।

একদিন মিঃ ব্যারাকলউ শেষরাত্রে বাংলো ফিরছেন। চারিদিক নিস্তব্ধ। কেমন যেন গা ছমছমে অন্ধকার। মরা চাঁদের ফিকে আলোতে পায়ে চলার সুঁড়ি পথটা ঝিক্-ঝিক্ করছে। গাছ-গাছালির ছায়ায় ঢেকে আছে বাংলোটা।

গেটের কাছে পৌঁছামাত্র দারোয়ান গেট খুলে সেলাম দিয়ে দাঁড়াল। সাহেব ফেরেনি তাই সদা সতর্ক। এবার আয়েস করে ঘুমুবে।

সাহেবের ঘোড়া এগিয়ে চলল। সামনে তাকিয়ে দেখলেন তার বেডরুমের জানালা খোলা। ভিতরে বাতি জ্বলছে। বুকের উপর বেহালা ধরে পটে আঁকা ছবির মতো অপূর্ব সুন্দরী এক নারী মূর্তি। খোলা চুলের চালচিত্রে নিপুণ শিল্পীর তুলিতে আঁকা দীঘল ভুরু ও আয়ত চোখ ঈষৎ অবনত চিবুক।

ঘোড়ার লাগাম টেনে পলকের মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়লেন। বিমূঢ় বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন। যেন তাঁর দৃষ্টি বিভ্রম ঘটেছে। এই তার নায়িকা কাবেরী। এত সুন্দরী সে। ওহ! ওয়াণ্ডার ফুল।

কাবেরী ছুটে এসে ওর হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল। গলায় অভিমান ঢেলে বলল—তুমি এত দুষ্টু কেন সাহেব ?

ব্যারাকলউ সাহেবের মনে হল পৃথিবীতে এর চেয়ে বড় আশ্চর্য

কিছু নেই। রমণীর প্রেম ও তার উদ্‌গ্রীব প্রতীক্ষা।

বললেন—ডারলিং। আর কোনদিন দেরি করবো না। কিন্তু তুমি আরেকবার অমনি করে ভায়োলিন হাতে দাঁড়াও। আমি দু' চোখভরে দেখি।

কাবেরী ভায়োলিন হাতে দাঁড়াল তেমনি মনোমোহিনী ভঙ্গিতে। তারযন্ত্র বেজে উঠল। গান ধরল অতি সুমিষ্ট কণ্ঠে।

নয়নে নিরখিব শ্যাম—

ধীরে ধীরে বিশ্ব প্রকৃতির রূপ ও অরূপের মাঝে দরজাটা খুলে গেল। সুরের ইন্দ্রজালে আবিষ্ট দুরন্ত ইউরোপীয়ান ম্যানেজার মিঃ ব্যারাকলউ তার সাধের সাকীর দিকে অপলকে তাকিয়ে রইলেন।

পুব আকাশের প্রেক্ষাপটে আলোর ঝরণা চিত্র-বিচিত্র ঐশ্বর্যময় রঙে ও রেখায় ঝলমল করে উঠল।

তখন কাবেরীর মন জুড়ে স্বপ্নের সম্ভার। চোখের পাতা ভারী। গাল দুটি ভরাট। মাতৃস্তন্যের প্রস্রবিনীধারা দানা বেঁধে উঠেছে। স্পর্শকাতর যুগল স্তনের অভ্যন্তরে ঘটে যাচ্ছে রাসায়নিক বিক্রিয়া। নিবিড় গোলাপী দুটি বৃন্তের রঙ হয়েছে কালো। চিরন্তনী নারী প্রকৃতির স্বপ্ন, সাধ, অহংকার আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে রূপ দিতে চলেছে। দেহ যন্ত্রের তারে তারে ঝঙ্কৃত হচ্ছে নতুন সৃষ্টির বার্তা।

॥ আট ॥

সেই এক শ্রাবণ সন্ধ্যা। মেঘ ভারাক্রান্ত থমথমে আকাশ। চারিদিকে ঘন অন্ধকার। সাহেব কোঠীর সাধের বাগান দেখাচ্ছে যেন নিবিড় বন। গাছের পাতায় ফোঁটা ফোঁটা আলোর মতো জোনাকী পোকার চুমকি। মাঝে মাঝে আকাশ ফালা ফালা করে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। মেঘ ডাকছে গুড়-গুড় শব্দে।

সাহেব কোঠীর বিরাট ড্রয়িং রুমে নিস্তব্ধ হয়ে বসে আছেন দুই মহাপ্রাণী। তাঁদের মাথার উপর ঝুলন্ত ঝাড় লণ্ঠন। পাঙ্খাওলা জোরে জোরে পাঙ্খাগুলি চালাচ্ছে। তথাপি ঘাম ঝরছে গায়ে।

ছোট একটা টেবিলের উপর হুইস্কির বোতল। দুটি গ্লাস। এক প্লেট মাংস। এক প্যাকেট চুরুট ও দেশলাই। লেখার টেবিলে

একরাশ কাগজপত্র। চিঠি, খাম বিলাতী খবরের কাগজ কাটিং। একটা চেয়ারে বসে আছেন মিঃ আডামসন। মিসেস ইসাবেলা ব্যারাকলউয়ের সেক্রেটারী। মাথায় একটা বড় টাক। মুখটা চক্‌চকে। চিবুকটি ছুঁচালো। খুব গম্ভীর মুখে হুইস্কি খাচ্ছেন।

মিঃ ব্যারাকলউ ভিতরে ভিতরে গুমরে উঠছেন। তাঁর চোখের সামনে পেপার কাটিংয়ে হেডলাইন—"ইণ্ডিয়ান কোলিয়ারি ম্যানেজার—এ গ্রেট বুচার।"

ভারতে কয়লাখনির নামে কসাইখানা চলছে। লোকজন দুর্ঘটনায় মরলে বা আহত হলে একটা বন্ধ চানকে ফেলে দেওয়া হয়। সেখানে জমে মৃতের পাহাড়। চাঁদনীর মধ্যে পাথর চাপা দেবার অসংখ্য ঘটনা। কয়লার ফার্ণেসেও লাশ জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। তা ছাড়া আছে ক্ষমতা দখলের লড়াই। বন্দুকের গুলিতে লোক মেরে খাদে ফেলে দেওয়া হয়। তেমন একজন ম্যানেজার মিঃ ব্যারাকলউ।

"হারেম ফর কোলিয়ারি ম্যানেজার।"

ভারতবর্ষে মুসলমান সম্রাটদের শাসনকালে নবাব, বাদশাদের থাকতো হারেম। হিন্দু রাজাদের অন্তঃপুর। সে যেন যুবতী রমণীদের যৌবন প্রদর্শনী। আর এখানকার কোলিয়ারি ম্যানেজারদের থাকে বিবি-বাথান। আসলে একটা গণিকা পল্লী। পরম সুখে সম্ভোগ ও জারজ প্রজন্মের অবাধ প্রজনন। সভ্য দুনিয়ার খোলা বাজারে এত সুখের বেসাতি চলে ভারতবর্ষের খনি অঞ্চলে।

—অল বোগাস্। চাপা কণ্ঠে গর্জন করে উঠলেন মিঃ ব্যারাকলউ। একটা চুরুট ধরিয়ে বললেন—এই কাগজওয়ালারা কি বলতে চায় কি? ওদেরও কি বিবিবাথানের মধু খাবার লোভ হয়েছে? তাহলে একবার ইণ্ডিয়ায় আসতে বলুন। এখানে মশার কামড়টাও খেয়ে যাক।

— ঠিক বলেছেন স্যার। আমি একদিনেই টের পেয়ে গেছি। কথা কটি বলে হুইস্কির গ্লাসটায় চুমুক দিলেন মিঃআডামসন।

এবার অন্য একটি খাম থেকে বের করলেন একটি চিঠির নকল। মিঃ হ্যামিলটন বোর্ড অফ ডাইরেক্টার্সের কাছে রিপোর্ট পাঠিয়েছেন।

আর পাঁচটা ব্যাপারের সঙ্গে মিস্টার ব্যারাকলউয়ের প্রসঙ্গ—শেরগড় কোলিয়ারির ম্যানেজার মিঃ ব্যারাকলউ সম্প্রতি পান মোহরায় সাতঘরিয়া অঞ্চলে নিজস্ব কোলিয়ারি খুলেছেন। সেখানে ভূতাত্ত্বিক

সমীক্ষা চালানো ও নিম্নসত্ব, উপর স্বত্বের মালিক স্থানীয় জমিদার মিঃ রাধাগোবিন্দ রায়ের সঙ্গে লীজ বন্দোবস্ত গ্রহণের জন্য কোম্পানির তরফের যাবতীয় কথাবার্তা চালানোর ভার তাঁর উপর ন্যস্ত ছিল। উনি কোম্পানির বোরিং মেশিন ও লোকজন নিয়ে সেখানে ভূতাত্বিক সমীক্ষা চালান। পর পর তিনটি স্তরে ছত্রিশ ফুট মোটা কয়লা পাওয়া যায়। উনি তখন জমিদারকে কুড়ি হাজার টাকা সেলামী দিয়ে নিজের নামে লীজ বন্দোবস্ত নেন। যা নেওয়া উচিত ছিল ত্থা শেরগড় কোল কোম্পানির নামে।

এখনো কোম্পানির মাল মশলা, যন্ত্রপাতি ও লোকজন নিয়ে ভুটো চানক কাটাই করাচ্ছেন। তিনি নিজের পঞ্চাশ শতাংশ সময় সেখানে ব্যয় করেন। অথচ বেতন ও সুবিধা ভোগ করেন কোম্পানির।

তাঁর নামে বহু দুর্নীতির অভিযোগ। সেই সূত্রে উপার্জিত অর্থ স্বীয় ব্যবসায়ে লগ্নি করেছেন। অন্যথায় এত টাকা পাবেন কোথায়?

উপরোক্ত দুর্নীতি ও কোম্পানির সঙ্গে বিশ্বাস ভঙ্গের অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে চার্জ গঠন ও উপযুক্ত শাস্তি বিধানের সুপারিশ করা হচ্ছে।

—বাঃ বাঃ। বড় সতী মিঃ হ্যামিলটন। আপনি জানেন না মিঃ আডামসন, এই ভদ্রলোক আমাকে বার বার টোপ দিয়েছিলেন কোলিয়ারির কয়লা বিক্রি করে দেবার জন্য। অনুরোধ করেছিলেন পানমোহরায় তাঁর একটা শেয়ার ব্যবস্থা করতে। তার লগ্নি টাকা কয়লা বিক্রি করে উঠিয়ে নিতে বলেছিলেন। ব্লাডি স্কাউণ্ড্রেল। হোক আমার বিরুদ্ধে চার্জ গঠন। দেখবো কার কত ক্ষমতা!

ওঁর মুখটা রাগে লাল হয়ে গেল। মিঃ আডামসন আরেকটা পেপার কাটিং দিয়ে বললেন—আরো আছে স্যার।

—ড্যাম ইট। উনি সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

মিসেস ব্যারাকলটয়ের চিঠিটা খুললেন। যথারীতি প্রণয় সম্ভাষণের পর উনি লিখছেন—খবরের কাগজের সংবাদ নিয়ে আমার আইনজীবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলাম। উনি মানহানির মামলা দায়ের করার পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু আমি ভাবছি কোন অভিযোগই তো অসত্য নয়। মামলা করে যদি হেরে যাই তবে লজ্জা রাখবার জায়গা নেই।

ইহ বাহ্য। তুমি ইণ্ডিয়াতে গিয়েছো নিজস্ব কোলিয়ারি করার

জন্য। চাকরি করাটা প্রস্তুতি। কিন্তু চাকরির মোহে পনেরো-ষোল বছর কাটিয়ে দিলে। তা হোক। তাতে আমি কিছু মনে করি না।

মনে করি তখন যখন তুমি বিজনেসের উপরে একটা নাচ-গার্লকে ঠাঁই দাও। আমার কাছে কনফার্মড খবর আছে যে ঐ নাচ গার্লকে কেন্দ্র করেই জমিদারের সঙ্গে তোমার সংঘর্ষ। মামলা মোকদ্দমা। কাজ বন্ধ। যেহেতু তুমি নাচ মহল থেকে নাচ গার্ল বের করে নিয়ে এসেছ সেজন্য জমিদার সেটাকে প্রেস্টিজ ইস্যু করে নিয়েছেন। ফলতঃ তোমার নতুন পরিকল্পনা চৌপট হতে বসেছে।

কিন্তু আমি ভাবতে পারছি না এই পরিণত বয়সে তুমি কি করে রূপের ফাঁদে পড়লে? শুনেছি মেয়েটি নাকি পরমাসুন্দরী। তাই বলে বিশ হাজার বিঘা কোল প্রোপার্টির চেয়ে বেশি সুন্দর নয়। তুমি তো দেখছি আমার সঙ্গেও বিশ্বাস ভঙ্গ করছ।

যাইহোক তুমি ঐ মেয়েটিকে অবিলম্বে বিদায় করে দাও। তাতে টাকাকড়ি, ঘরবাড়ি, জমি যা দিতে হয় দিও। না হলে আমি তোমাকে শিল্প প্রসারের জন্য সাহায্য করতে পারব না।

পড়তে পড়তে মিঃ ব্যারাকলউয়ের মুখ রাগে লাল হয়ে গেল। তাঁর প্রতিক্রিয়া দেখবার জন্য মিঃ আডামসন আড়চোখে তাকিয়েছিলেন। বললেন—সব তো পড়লেন মিঃ ব্যারাকলউ। বলুন আমি মাডামকে কি জবাব দেব?

উনি বললেন—সুদূর বিলেত থেকে ভারত পর্যন্ত আসার কি এই একটিই উদ্দেশ্য আপনার মিঃ আডামসন?

—ঠিক তা নয়। ম্যাডাম বলেছেন মিষ্টার ওখানে খুব অসুবিধার মধ্যে আছেন। যদি কিছু সাহায্য করতে পারা যায় তা দেখবার জন্যই আমাকে পাঠিয়েছেন।

—ধন্যবাদ। আকাশের দিকে তাকিয়ে উনি চুরুট টানতে লাগলেন।

সাহেব খুব গম্ভীর।

মেম সাহেবের চিঠি এসেছে।

মেম সাহেবের কোম্পানিতে লাখটাকা ক্ষতি হয়ে গেছে।

মেম সাহেবের কোম্পানিতে অনেক চুরি হচ্ছে।

মেমসাহেব একা চালাতে পারছেন না।

সাহেব ছয় মাস ছুটিতে যাবেন।

সব ব্যাটাকে ঠাণ্ডা করে দেবেন।

চাকর-বাকররা নিজেদের মধ্যে এইসব আলোচনা করছে' ঢালু দাস, চারু মুচি, মলিন্দ ধোবী, ইরফান আলী, রমজান শেখ, ঝাড়ি লাল, চামরু দুশাদ, গুপী পোদ্দার প্রভৃতি সাহেব কোঠীর রান্নাঘরে জুটেছে। যেহেতু সাহেব চিন্তিত সেজন্য তারাও চিন্তিত। আর চিন্তা-ভাবনা বস্তুটা এত জটিল যে মদ্যপান ছাড়া মাথাটা খোলসা হয় না। তাই ওরা তরলার কাছে আবদার করছে—দে মাইরী দু' বোতল মহুযা

তরলা দাসী সাহেব কোঠীর আয়া কাম স্টোরকিপার কাম কেযার টেকার। তার হুকুমেই সাহেবকোঠী চলে। সাহেব আর কতটুকু দেখেন। মেমসাহেব তো মোমের পুতুল। তিনি কিছুই মাথা ঘামান না।

ঢালুদাসের আবদারটা একটু বেশি। সে বলে—দে মাইরী। দিবি নাই? তবে আমি দিব সব গোলমাল করে।

—কি গোলমাল করবি রে খালভরা। যা দিব নাই।

মলিন্দ ধোবী সেই রাগিনীর সঙ্গে ফৌজদারী মামলার আসামী তবলার পা ধরে বসল। চারু-মুচি গান ধরল—

রাঙা সইলো—চোর পড়েছে সাহেবকুঠিতে—

ওদের গোলমাল শুনে কাবেরী এসে দাঁড়াল। ওকে দেখামাত্র সবাই খাড়া দাঁড়িয়ে পড়ল। কাবেরী বলল—কি হয়েছে? তোরা গোলমাল করছিস কেন? সাহেবের কানে গেলে রক্ষে থাকবে?

তা তো বটে। সবাই খুব লজ্জিত। ঢালুদাস বলল—এই কান মলছি মেমসায়েব আর গোলমাল করব না।

—কিন্তু ব্যাপারটা কি?

তবলা বলল—ওরা দু' বোতল মদ চাইছে

- কেন?

—খাবার জন্য। সাহেবের সর্বনাশ ওদের পৌষমাস।

তীব্রকণ্ঠে প্রতিবাদ করল চারুমুচি —এমন কথা বলিস না তরলা। আমরা সাহেবের দাস। সাহেবের মন খারাপ বলে আমাদের মন খারাপ। সেজন্যই তোর কাছে মদ চাইছি। না দিবি তো না দে। বদনাম দিস না।

কাবেরী বলল—ঠিক আছে। ঠিক আছে। দে তরলা—দিয়ে দে।

তরলা দুটি বোতল বের করে দিল। ওরা মেমসাহেবকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ও তরলাকে কঞ্জুষ বলে সাহেবের দুর্ভাবনার ভার নিজেদের কাঁধে নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে লাগল।

রাত বাড়ছে। সহিস, কচোয়ান, বয়, বাবুর্চি খানসামারা, নেশার ঘোরে পড়ে আছে। কিন্তু ঘরে ফেরার হুকুম নেই। সাহেবের ডিনার হবে। তারপর উনি পনের মিনিট পায়চারি করবেন। তবে তবলা দাসী ওদের ছুটি ঘোষণা করবে। এইটাই সাহেবকোঠীর নিয়ম।

কাবেরী আর অপেক্ষা করতে পারল না। অন্যদিন সাহেবের কাছেই বসে থাকে। আজ মিঃ আডামসন এসেছেন বলে সে ভিতরেই আছে।

বাইরে এসে দেখল দুই সাহেব বুঁদ হয়ে বসে আছে।

কাবেরী বলল—অনেক রাত হয়েছে সাহেব। ডিনারটা সেরে নাও।

—ও হ্যাঁ হ্যাঁ। আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম।

মিঃ আডামসন কাবেরীকে যতবার দেখছেন ততবার অবাক হচ্ছেন। বাস্তবিক এ রূপের কাছে হার না মেনে উপায় নেই। বললেন—মিঃ ব্যারাকলউ মেয়েটির মধ্যে মাতৃত্বের সম্ভাবনা ফুটে উঠেছে। কিন্তু আপনাকে একটা সিদ্ধান্ত নিতেই হবে। যেভাবে পারেন ওকে ডেসপ্যাচ করে দিতে পারলেই ম্যাডাম খুশি হবেন।

মিঃ ব্যারাকলউ বললেন—মিঃ আডামসন আপনি যেভাবে কথা বলছেন শুনে মনে হচ্ছে আপনি বুঝি আমার জীবনের ভাগ্যবিধাতা।

—না না। আপনি এভাবে কেন নিচ্ছেন? আমি ম্যাডামের কথাটাই বললাম।

—আপনার ম্যাডাম তাঁর বক্তব্য চিঠিতে লিখেছেন। আপনি পুনঃপুনঃ তাঁর ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করেছেন। তারপরে আমি কি সিদ্ধান্ত নেব তা আপনাকে বলতে হবে না।

—আপনি রেগে যাচ্ছেন স্যার। কিন্তু ম্যাডাম চান না যে ঐ মেয়েটির সঙ্গে আপনি কোন সংস্রব রাখুন।

—আপনার ম্যাডামকে বলে দেবেন তিনি একটি অতি সাধারণ মেয়েমানুষের উর্ধে উঠতে পারেন নি। তিনি বহু টাকার মালিক। এত বড় একটা কোম্পানির ডিরেক্টর হওয়া সত্ত্বেও মেয়েলি সেন্টিমেন্ট অতি-ক্রম করতে পারেন নি।

—বলব স্যার। কিন্তু তিনি যা চান তা নাহলে হয়তো পানমোহরা গড়ে তোলার জন্য আর্থিক সহায়তা নাও করতে পারেন।

—আমি এফ, জি, ব্যারাকলউ। পানমোহরা আমার স্বপ্ন। তা রূপায়িত করার জন্য কারো সহায়তা না হলেও আমি করব। আপনার ম্যাডামকে স্মরণ করিয়ে দেবেন তিনি যা ফাইন্যান্স করবেন তার দরুন মুনাফার অংশ পাবেন। এই অফারটা যদি অন্য কাউকে দিই তবে তিনিও টাকা দিয়ে সাহায্য করবেন। একটা জুজুর ভয় দেখিয়ে আমাকে ব্ল্যাকমেইল করতে আপনাকে বিলেত থেকে ছুটে আসতে হত না। বাইট। আসুন ডিনার রেডী।

সাজিয়ে গুছিয়ে খেতে দিয়েছে কাবেরী। সঙ্গে আছে তরলা ও ঢালু দান। খেতে-খেতে মিঃ ব্যারাকলউ বললেন - তরলা, নতুন সাহেবের যাতে ঘুমের ব্যাঘাত না হয় তার জন্য কাউকে ডেকে দে।

তরলা ঘাড় নাড়াল। খাবারে রুচি দুই সাহেবের মধ্যে কারুরই ছিল না। পেটের মধ্যে আঙুর, আপেল, মহুয়ার রস ঝাঁপ ধরে আছে।

॥ নয় ॥

সকালে উঠে ব্রেকফাস্ট করতে যা দেরী মিঃ হ্যামিলটনের দূত এসে হাজির। অবিলম্বে মিঃ ব্যারাকলউকে তাঁর চেম্বারে যেতে হবে।

উনি খুব বিরক্ত হলেন। সকালবেলা মিঃ আডামসনকে নিয়ে পানমোহরা যাবার কথা। ওঁকে সব দেখিয়ে দিতে হবে। মিঃ ব্যারা-কলউ যে আকাশে ফানুস ওড়ান নি তা তো দেখাতে হবে।

মেজাজটা কাল থেকে খিঁচড়ে আছে। আরো খিঁচড়ে গেল। দূতকে বললেন—বিকেলে মিঃ হ্যামিলটনের অফিসে যাবো। ওকে বলে দাও গে। সে ব্যাচারী সেলাম করে চলে গেল।

সাহেব যাবার জন্য প্রস্তুত। কাবেরী মুখটা নীচু করে কাছে

দাঁড়াল। উনি জিজ্ঞাসা করলেন—কিছু বলবে কাবেরী।

কাবেরী ঘাড় নাড়ল।

উনি ভিতরে ঢুকলেন। কাবেরী মুখ তুলে তাকাল। ওর দু'চোখে জল টল-টল করছে। সাহেব আবার বললেন—কি বলছিলে বল?

—কাল আমি সব শুনেছি। আমাকে নিয়েই তুমি বারবার ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ছো।

—তাতে কি হয়েছে?

– আমার মনে খুব দুঃখ হচ্ছে। তোমার জীবনের যত বিড়ম্বনার কারণ হচ্ছি আমি।

—তোমার ভাবনার সব ভার তো আমি নিয়েছি। তবে কেন দুঃখ পাচ্ছো। নিশ্চিন্তে থাকো। চিয়ার ইউ। ওর মুখে চুমু খেয়ে চলে গেলেন।

মিঃ হ্যামিলটনের অফিসটায় তখন দরবার বসে গেছে। বিলেত থেকে এসেছেন কোম্পানির সেক্রেটারী মিঃ মরিস। ডাক পড়েছে মিঃ শেফার্ড, মিঃ নর্টন প্রভৃতি সব সাহেবদের। মিঃ ব্যারাকলউয়েরও ডাক পড়েছিল কিন্তু তিনি আসেন নি।

মিঃ ব্যারাকলউয়ের বিরুদ্ধে বিশ্বাস ভঙ্গের অভিযোগ তদন্ত করতেই তাঁর আসা।

মিঃ মরিস পাকা কৌশলীর মত প্রশ্ন করছেন।

মিঃ হ্যামিলটনকে বললেন আপনি বলতে চান যে পানমোহরা সাভঘরিয়া লীজ বন্দোবস্ত নেবার জন্য শেরগড় কোল কোম্পানির তরফ থেকে মিঃ ব্যারাকলউকে আলোচনা করতে দেওয়া হয়েছিল। এর সপক্ষে আপনার কোন সাক্ষী আছে?

—ইয়েস। মিঃ রায়কে সেজন্য ডেকে এনেছি। ওঁরই প্রোপার্টি তো।

—মিঃ হ্যামিলটনের কথাটাই সত্যি। প্রথমে সেই কথাই হয়েছিল। বোরিং করার পর মিঃ ব্যারাকলউ আমাকে তাঁর নামে লীজ দিতে বললেন।

—কোম্পানির সঙ্গে যখন কথা-বার্তা হচ্ছিল তখন মিঃ ব্যারাকলউকে আপনি লীজ দিলেন কেন?

—কারণ তিনি বেশি টাকা অফার দিয়েছিলেন। আফটার অল আমরা তো ব্যবসায়ীর দৃষ্টি ভঙ্গিতে তা দেখবো।

—সে তো নিশ্চয়। বোরিং কার খরচে হয়েছে ?

মিঃ হ্যামিলটন বললেন—কোম্পানির খরচে। আমাদেরই বোরিং মেশিন, আমাদের সার্ভেয়ারে মাপজোক করেছেন, আমাদের লোকেই বোরিং করেছে।

—মিঃ ট্রুম্যান। আপনি তো তাঁর সহকারী ছিলেন। এ কথা সত্যি ?

হ্যাঁ স্যার।

—মিঃ নর্টন কি বলেন ?

হ্যাঁ স্যার।

মিঃ হ্যামিলটন বললেন—মিঃ নর্টন তো এখনো তাকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করছেন। উনিই পানমোহরায় কাঠের হেডগিয়ার ফিট করেছেন। আমাদের স্টোর থেকে ঘোড়া, গাঁইতি, শাবল, বালতি প্রভৃতি স্টোর মেটিরিয়েলস গেছে।

—হুঁ। মিঃ ব্যারাকলউয়ের সঙ্গে একবার কথা বলা খুব দরকার।

—উনি বিকেলে আসবেন। কিন্তু বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগ কি প্রমাণিত হচ্ছে না ?

—তা হচ্ছে বৈকি !

দিন দুই পর আরেক কনফারেন্স বসল মিঃ ব্যারাকলউয়ের বাংলোয়।

কাবেরীকে মাঝে বসিয়ে একদিকে মিঃ আডামসন ও অন্যদিকে ফাদার উইলিয়াম দার্শনিক, নান্দনিক ও পৌরাণিক তথ্যের পসরা খুলে বসেছেন।

প্রথমে মিঃ আডামসন শুরু করেছেন—কাবেরীদেবী আপনার মত বিউটী আমি জীবনে কখনও দেখিনি। মিঃ ব্যারাকলউ সত্যিই ভাগ্যবান।

কাবেরী বলল—ও কথা বলবেন না সাহেব। আমার জন্যই ওনার যত ভাগ্য বিড়ম্বনা।

ফাদার উইলিয়াম বললেন—তা অবশ্য ঠিক। সব মেয়ে সব পুরুষের সঙ্গে ঠিক ম্যাচ করে না। যদিও রূপে গুণে তোমাদের

পরস্পরের দারুণ মিল। মনের দিক থেকেও পরস্পরের ভালবাসা খুব গভীর। তবু ভাগ্যটা ম্যাচ করছে না।

মিঃ আডামসন বললেন—ঠিক বলেছেন ফাদার। মিঃ ব্যারাকলউয়ের সামনে এখন বিপদ। জমিদার পানমোহরার মামলাটা জটিল করে ফেলেছেন। এ সময় ভাগ্য যদি সহায় না হয় তবে উনি হেরে যাবেন। এত টাকা লগ্নি সব জলে যাবে। মিসেস ব্যারাকলউ ভীষণ রেগে গেছেন। টাকা পাঠানো বন্ধ করে দেবেন বলেছেন। বিলেত থেকে কোম্পানির সেক্রেটারী মিঃ মরিস এসেছেন মিঃ ব্যারাকলউয়ের বিরুদ্ধে বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগ তদন্ত করতে। সবদিকেই ওর শিবে সংক্রান্তি।

ফাদার বললেন—মিঃ ব্যারাকলউয়ের জীবনের দুই-তৃতীয়াংশ সমস্যা কার্বেরীকে নিয়ে। হিন্দু পুরাণে ভালবাসার জন্য দারুণ দারুণ সব ত্যাগের গল্প আছে। আমি পড়েছি। রামায়ণের নায়িকা সীতা স্বামীর প্রতি ভালবাসার জন্য দু'বার বনবাসিনী হয়েছিলেন। প্রথমবার তো লর্ড রামচন্দ্রের সঙ্গে গিয়েছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয়বার একা। যদিও তিনি তখন অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। তারপর মহাভারতে নলরাজার স্ত্রী দময়ন্তী রাজাকে ছেড়ে একাই বনে গিয়েছিলেন। সবই ভালবাসার জন্য। স্বামীর সম্মান রক্ষার জন্য। সত্যি বলছি মিঃ আডামসন এখনো আপনি বহু হিন্দু মেয়ে দেখতে পাবেন যিনি তাঁর স্বামীর জন্য অথবা ভালবাসার জন্য এমন ত্যাগ নেই যা করতে পারবে না। এমন কি তাঁর স্বামীর জীবন, তাঁর সন্তানের জীবন বিসর্জন দিতে পারেন। এত গভীর তাদের প্রেম।

প্রেম, ভালবাসা, ত্যাগ ও তিতিক্ষার নানা কাহিনী ও উপমা শুনে কাবেরীর মনে হল ঠিক তার ভালবাসার মানুষ তারই জন্য এত বিপদ-গ্রস্ত অথচ সে কেমন স্বার্থপরের মত তাকে জড়িয়ে ধরে আছে। এটা তো তার উচিত হচ্ছে না। সাহেবের চলার পথ নিষ্কণ্টক করার জন্য তার সরে যাওয়াই উচিত।

সরলভাবে জিজ্ঞাসা করল—আচ্ছা সাহেব আমি যদি সরে যাই তবে কি আমাদের সাহেবের বিপদ কেটে যাবে।

ফাদার বললেন—তাতো যাবেই। কারণ তখন জমিদারের সঙ্গে তার বিরোধ মিটে যাবে। মিসেস ব্যারাকলউ তাঁর স্বপ্ন রূপায়ণের জন্য টাকা পাঠাবেন। আর কোম্পানির সঙ্গেও একটা মিটমাট হয়ে যাবে।

—তাহলে সাহেবকে সে কথা জিজ্ঞাসা করে দেখবো।

—নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। আমরা এ বিষয়ে তোমাকে কিছু বলতে চাই না। তোমার নিজের ব্যাপার নিজেই ভাববে। তবে আমার মনে হয় ব্যারাকলউ সাহেবকে একথা জিজ্ঞাসা করলে তিনি কিছুতেই মত দেবেন না।

ফাদার বললেন—সেটা ও নিজেই বুঝবে। তবে হ্যাঁ—তুমি যদি কোন সিদ্ধান্ত নাও তাহলে আমাদের জানাবে। আমরা তোমাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করব। আজ আমি উঠি। কয়েকটা বসন্তের রুগী দেখতে হবে।

মিঃ আডামসন বললেন—ওহো ভুলেই গিয়েছিলাম। আজ মিঃ মরিসের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ করার কথা। ফাদার আশীর্বাদ করুন আমি যেন মিঃ মরিসকে বোঝাতে পারি যে মিঃ ব্যারাকলউয়ের কোন দোষ নেই। সব মিঃ হ্যামিলটনের চক্রান্ত।

ওরা দুজনে ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়লেন। কারণ একটি মেয়ের মগজ ধোলাই করবার জন্য যা প্রয়োজন তা করে ফেলেছেন। চিরন্তনী নারী প্রকৃতির দুর্বলতম স্থানটিকে ব্রিটিশ কায়দায় মোলায়েম ছুরি চালিয়ে এত রক্তপাত ঘটিয়ে দিয়েছেন যে তা নিরাময় হওয়া দুঃসাধ্য। কত অবলীলায় তাঁদের নিজের ইচ্ছাটা ওর ঘাড়ে চড়িয়ে দিলেন। প্রেম, ভালবাসা, ত্যাগ, তিতিক্ষা ইত্যাদি বড় বড় শব্দের যাদুতে কাবেরী প্রায় দিশেহারা হয়ে গেল।

বিরাট বেডরুমের একপাশে একটি চেয়ায় নিয়ে চুপচাপ বসে রইল। অন্তরটা তোলপাড় করে উঠল। সত্যি তো সাহেব তার জন্য কি না করেছে? এমন কি নিজের স্ত্রীর অনুরোধ অগ্রাহ্য করেছেন। জমিদারের সঙ্গে যাবতীয় কলহ কচকচি, মামলা মোকদ্দমা তারই জন্য! একটা এতবড় মানুষ যিনি কয়লাশিল্প প্রসার ও উন্নতির জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করে বসে আছেন তার পথের বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে সে। এতদিন নিজের স্বার্থটাকে এতবড় করে রেখেছে। ছিঃ ছিঃ। তার জীবনের কি দাম? সে তো একটা নাচমহলের নাচুনী। সমাজ পরিত্যক্তা গণিকা। সে তো অনির্দিষ্টের পথেই চলে যাচ্ছিল। সাহেবের চোখে পড়েছিল বলেই জীবনের ধারাটা পাল্টে গেল।

কিন্তু এ সময়ে কার সঙ্গে পরামর্শ করবে? একজন ছিল তার গুরু

মন্মথ ঘোষ। তিনি তো চলে গেছেন। সঙ্গীত যাঁর সাধনা তিনি কি বসে থাকতে পারেন? কাবেরীর জন্য দুর্ভাবনা ছিল। তাকে সুখী হতে দেখে নিজের সাধনা নিয়ে চলে গেছেন। তাহলে সে কাকে বলবে? কে ওর মনের কথা বুঝবে?

হ্যাঁ। আছে। এখনো একজন আছে। সে তার জীবনের চরম দুঃসময়ে বহু ঝুঁকি নিয়ে তাকে সাহায্য করেছে। সে পিয়ারীলাল তাকে একবার ডাকলে হয় না? সে তো গুরুজীকে ডেকে দিতে পারবে।

তরলা এসে বলল—অত কি ভাবছেন মেমসাহেব? আসুন খেয়ে নেবেন।

—সাহেব আসুক।

—দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল এখনো ওর আসার নাম নেই কত উপোস দিয়ে বসে থাকবেন?

—তোরা খেয়ে নে। আমি আর একটু দেখে নিই।

—আচ্ছা। তরলা চলে যাচ্ছিল। কাবেরী ওকে ডেকে বলল—হ্যাঁরে তরলা তুই পিয়ারীলালকে চিনিস?

—কেন চিনবো না? নাচমহলের চাপরাশী তো?

—হ্যাঁ। ওকে একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে ডেকে দিবি?

—আচ্ছা। দারোয়ানকে বললেই ডেকে দেবে।

—বেশ। যা তুই খেয়ে নে গিয়ে। সাহেব এলে আমি দেখবো।

॥ দশ ॥

খাদে তখন ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার মোকাবিলা করতে ব্যস্ত আছেন মিঃ ব্যারাকলউ। তেরো নম্বর পূর্বা গোসাই পুরোপুরি ধ্বসে গেছে। দক্ষিণে মেন ডিপ, পশ্চিমে তেরো নম্বর লেভেলের অংশ এবং পূর্বে তেরো নম্বর লেভেলের পুরো সুড়ঙ্গ পথ শিলাস্তরের ভাঙা পাথরে জ্যাম হয়ে আছে। লোক চলাচলের কোন উপায় নেই। গোলাইয়ে যারা ছিল তাদের তো অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়ার কথা নয়। ভিতর দিকে যারা আছে তাদের উদ্ধার করাও দুঃসাধ্য। পাথর পড়েছে যেন এক বিশাল চাঁদনীর ধ্বস। চালটা গোল গম্বুজের মত দেখাচ্ছে।

মিঃ ব্যারাকলউ সেই ভাঙাচোরা স্তূপীকৃত পাথরের সামনে দাঁড়িয়ে

বললেন—মিঃ শেফার্ড, মেন লাইনের ওপর এতবড় রুফ্ ফল হল অথচ তার কোন আগাম খবর পাওনি তা বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে। তুমি বলতে পার কোন মাইনিং ইঞ্জিনীয়ার এ কথা বিশ্বাস করবে যে এই চালটা পড়ার আগে কোন শব্দ হয়নি, কাঠ খুঁটো ভাঙেনি একেবারে হঠাৎ ঘটে গেছে? তাছাড়া কেনই বা এমন হল? পিলার কেটে রবিং করে রেজিং করেছ।

মিঃ শেফার্ড নিরুত্তর। ব্যারাকলউ সাহেব বললেন, হাবু সাহেবকে ডাক।

কিন্তু হাবু সাহেব তখন দেশ ছেড়েই পালিয়ে গেছেন।

ঘটনা ভোর রাত্রের। হাবু সাহেব টালোয়ানদের পিছনে ছুটছেন খালি গাড়ি সাপ্লাই করার জন্য। হঠাৎ খাদ থেকে লোক উঠে এল সেই দুঃসংবাদ নিয়ে। তেরো নম্বর গোলাই বিলকুল ভস্ ভইল।

সংবাদ পেয়েই ওর মাথায় বজ্রাঘাত। তারপর কোনদিকে না তাকিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন অনির্দিষ্টের পথে। সাহেবরা খবর পাবার আগেই তাকে শেরগড় পরগণার চৌহদ্দি পার হয়ে যেতে হবে। না হলে ভাগ্যে তার নিদারুণ যন্ত্রণা ছাড়া আর কিছুই জুটবে না। পাপ তো তার। রবিং সেই করিয়েছে।

মিঃ ব্যারাকলউয়ের কাছে খবর পৌঁছেছিল বেলা দশটার সময়। উনি তৎক্ষণাৎ খাদে নেমে গিয়েছিলেন। অবস্থা দেখেই মাথায় হাত। কত যে মরেছে, কত যে ভিতরে আটক পড়ে আছে তার হিসেব নেই।

হাজরিবাবুর কাছ থেকে রাতপালির হাজরি খাতা নিয়ে মিহির-বাবুকে বললেন—এই হাজরি মোতাবেক যতগুলি লোক খাদে গেছে তার মধ্যে কতগুলি ফেরৎ এসেছে তার নাম ধাম সব এনে দাও।

পশ্চিম লেভেলটায় একটু ফাঁক দেখাচ্ছিল কাঁথি ও ধ্বসের মধ্যে। উনি সেখানেই টিম্বার মিস্ত্রী সাফাই কুলি লাগিয়ে দিলেন যথাসম্ভব সাফাই ও কাঠের সাপোর্ট দিয়ে একটা রাস্তা করার জন্য। যদি কেউ আহত বা জীবিত থাকে তবে উদ্ধার করা যাবে।

মিঃ ব্যারাকলউ হাজরি খাতা খাদেই আনিয়ে নিয়েছেন। একে একে নামগুলি সব মিল করছেন। তাতে দেখা গেল ভজন দাস মাইনিং সরদার, লক্ষণ মুচি পাম্প খালাসী, হরিরাম ও লটুরাম দু-ভাই টালোয়ান, লফর বাউরী, চামেলী বাউরিণী মালকাটা।

মিঃ ব্যারাকলউ বললেন—কোন চামেলী ?

মিছিরবাবু বললেন হুজুর। বিবিবাথানের চামেলী। আউর হ্যায় হুজুর সিদাবাড়ির রাসমণি, উয়ার বিটি জামাই টুরু সুমি।

—মাই গড রাসমণির হোল ফ্যামিলি ? আর কে কে আছে ?

—আউর ভি চার পাঁচটো মালকাটা হ্যায়।

আচ্ছা ! আদমী বুলাও। কমসে কম চাই ষাট আদমী। সব পাথর সাফ কর জিন্দা হো চাহে মুর্দা হো সবকোইকো উঠানে হোগা।

মিঃ হ্যামিলটনের চিঠি নিয়ে মিঃ ডিক্‌সন এলেন। উনি লিখেছেন—মিঃ ব্যারাকলউ আপনি তাড়াতাড়ি খাদ থেকে উঠে আসুন। মিঃ মরিস সেক্রেটারী ফর দ্য কোম্পানি অপেক্ষা করছেন।

মিঃ ব্যারাকলউ রেগে আগুন। চীৎকার করে বললেন—হোয়াট ? আমি এতগুলি লোককে পাথর চাপা দিয়ে সেক্রেটারীকে সেলাম করতে যাব ? নো। টেল হিম এই লোকগুলিকে উদ্ধার না করা পর্যন্ত আমি খাদ থেকে উঠব না।

মিঃ ডিকসন বললেন—স্যার। আপনি যদি রাগ না করেন তবে বলি মিঃ হ্যামিলটন চান না যে এত পরিশ্রম করে কয়েকটা মৃতদেহ উদ্ধার করা হোক। অযথা খরচ করেই বা কি লাভ ? তার চেয়ে খাদের অন্যদিকটা থেকে কিভাবে প্রোডাকশন করা যায় সেটাই ভাবতে বলছেন।

—তা তো বটেই। না হলে মিঃ ব্যারাকলউকে বুচার বলবেন কি করে ? জান বিলেতের খবরের কাগজে আমার নামে কেচ্ছা বেরিয়েছে আমি নাকি কসাই।

—ও' কে স্যার।

মিঃ ডিকসন চলে গেলেন। মিঃ ব্যারাকলউ মিছিরবাবুকে হুকুম দিলেন— খাদের একটা সুড়ঙ্গে আমার অফিস বানিয়ে দাও। টেবিল, চেয়ার, খাট, জল, খাবার ও ড্রিংকসের আয়োজন কর। যতক্ষণ পর্যন্ত সবকজনকে জীবিত অথবা মৃত উদ্ধার না করি ততক্ষণ চন্দ্র, সূর্য, তারকার মুখ আমি দেখব না। এই আমার প্রতিজ্ঞা।

আস্তে আস্তে জ্ঞান ফিরল রাসমনির। চারিদিকে নিবিড় অন্ধকার ভীষণ নৈঃশব্দ। কি যেন হয়ে গেছে। ভয়ঙ্কর কিছু। সেই কড় কড় করে মেঘ ডাকার শব্দ। তারপর বাজ পড়ল। কিন্তু কোথায় পড়ল সে তখন কোথায় ছিল?

হ্যা হ্যা মনে পড়েছে। সে তখন গোলাইয়ে ছিল। একলুস খালে গাড়ি এসেছিল। আর সব মালকাটাদের সঙ্গে সেও সেখানে গিয়েছিল নিজের ভাগের দুটো গাড়ি ঠেলে আনতে। কিন্তু মাথার উপর মেঘ ডেকে উঠল। সবাই চীৎকার করে উঠল—পালাও পালাও।

যে যেদিকে পারল দৌড়তে শুরু করল। তাদের দেখাদেখি রাসমণিও। দৌড়াল হাতের বাতিটা ঝাঁকুনি খেয়ে নিভে গেল। সে অন্ধকারেই দৌড়তে লাগল। হোচট খেয়ে পড়ল তারপর আর জ্ঞান ছিল না।

তার কি বিরাট কিছু চোটঘাট লেগেছে? কই না তো। এই তো হাত, পা, পেট, কোমর, বুক, মাথা সব ঠিক আছে। তবে তার কি হয়েছিল?

সহসা বুকফাটা চীৎকার করে উঠল—সুমি। সু-মি—টুরু-তুরা কোথায় আছিস? সু-মি—

খাদের জমাট বাধা ভারী বাতাসের মধ্যে তার ডাক এক গম্ভীর আলোড়ন তুলে গুম গুম শব্দে প্রতিধ্বনিত হল। রাসমনি আবার ডাকল আবার—আবার।

বহুদূর থেকে ভেসে এল আর একটি শব্দ তরঙ্গ।

সেই শব্দ লক্ষ করে হাতে পায়ে ভর দিয়ে হাটতে শুরু করল রাসমনি পরস্পরের কাছাকাছি পৌছবার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা অবশেষে সফল হল। সে চামেলী পাঁচ মাসের পোয়াতি। তাই তার মরদ ওকে বেশি কাজ করতে দিত না। সে নিজেই গিয়েছিল গাড়ি আনতে। চামেলী আয়তনে বসেই মেঘ ডাকা শুনেছিল। তারপর এল একদমকা হাওয়া। খুটিতে টাঙানো ছিল বাতিটা। এক ফুঁয়ে নিভে গেল। তখন থেকে সে একাই বসেছিল। কোথাও কোন সাড়াশব্দ নেই। কোন বাতি জ্বলেনি। কোন মানুষ নেই। যেন ভূতপুরী। কতযুগ পরে রাসমনির সাড়া পেল তখন মনে হল এখনো কেউ বেঁচে আছে।

হাপাতে হাপাতে বলল— কি হবেক বুন? মানুষটা যে খালি গাড়ি আনতে গেল আর ঘুরে এল নাই। কুথায় যে কি হল?

—আমার বুন, বিটি, জামাইকে খুঁজে পেছি নাই কি যে হল তাও জানি না। সেই মেঘ ডাকা আর বাজ পড়াটি শুনলাম।

একটি পুরুষ কণ্ঠসর ভেসে এল তুরা কে কথা বলছিস?

—আমি রাসমনি।

—আমি চামেলী।

—তুরা বেঁচে আছিস?

—হঁ। তুঁই কে বটিস?

—আমি পবন কোঁড়া। আমার পা দুটি পাথর ঢাকা পড়ে গেইছে। তুরা টুকচন টেনে বাহার করে দিঞে যা।

—চখে ত কিছুই দেখতে পেছি নাই একটি বাতি হলে ভাল হত।

—আমার কাছকে আয়। দিয়াশালাই জ্বেলে দ্যাখ দু-একটি বাতি খুঁজে পাবি।

শব্দ লক্ষ করে ওরা পবনের দিকে অগ্রসর হল। এক সময় ওর নাগাল পেল। দিয়াশালাই আছে। জ্বেলে দ্যাখ দু-একটি বাতি খুঁজে পাবি।

শব্দ লক্ষ করে ওরা পবনের দিকে অগ্রসর হল। এক সময় ওর নাগাল পেল। দিয়াশালাইটি নিয়ে ফস করে জ্বালল। সেই অন্ধকারের বুকে একটি দিয়াশলাই কাঠি যেন বহ্নিমান অগ্নিকুণ্ড। তার আলোতে ওরা পরস্পরের মুখ দেখল। লাইন ধারে একটি লম্ফবাতিও খুঁজে পেল। আর একটি কাঠি জ্বেলে লম্ফটি ধরাল। সেই বাতি যেন জীবনের পরম আশ্বাস।

পবন কাৎ হয়ে পড়ে আছে। ওর জানু থেকে নিচের দিকটা পাথর ঢাকা। কিন্তু ঈশ্বরের কি অপার মহিমা—একদিকে লাইন ও অন্যদিকে কতকগুলো কাঠের মাঝে যেটুকু ফাঁক তার মধ্যেই পা দুটি ঢুকে আছে। তার উপরে 'পাথর চাপা পড়েছে' কিন্তু পা ভাঙেনি। একটু চেষ্টা করতেই ওর আস্ত দেহটা বেরিয়ে এল। পবন একটা শ্বাস নিল। জীবনের শ্বাস।

বলল—আজ বিশ বছর খাদে খেটে এমন বিপদে কখনও পড়িনাই।

রাসমনি বলল—কিন্তুক কি হঞেছে কি?

—বুঝতে লেরেছিস? গোলাইটি পুরা ধ্বস্‌কে গেইছে। আওয়াজ শুনেই দৌড়তে লেগেছিলম। কিন্তুক বাতিটা নিভে যাওয়াতে লাইনে

হোঁচট খেঞে পড়ে গেলম। হুড়মুড় করে পাথর পড়ে গেল। তবে এইটা শেষ জায়গা। ইযাব পূবদিকে সব ঠিক আছে।

—তবে কি হবেক?

—ভগমান জানে। তুবা এক কাজকর। লম্ফ নিঞে খুজে দ্যাখ যেখানে যা লম্ফ পাবি তুলে এনে জড কর। আব লোকজন কাহুকে দেখলে তাকে উঠা।

বিশবছরের অভিজ্ঞ মালকাটা পবন কোড়া সেই বিরাট ধ্বসে সামনে দাঁড়িয়ে বলল—ইযাব ভিতরে যদি কেউ থাকে তবে সে বাচবে নাই চল আমরা ভিতর দিকটা দেখে আসি।

ওব চলতে খুব কষ্ট হচ্ছিল। বাসমনির কাধে ভর দিয়ে চলল চামেলা আলো দেখাল। খুঁজতে খুঁজতে আরো তিন জনকে পেল লটবাম টালে যান, শ্রীরাম মাঝি মালকাটা ও মদন ধাওড় মালকাট তিনে তিনে ছজন হল ওরা। সাত আটটি বাতিও যোগাড হল। এইবা কর্তব্য নিরূপণ।

পবন বলল -বিশবছর খাদে কাজ করে কখনত দেখি নাই যে সাহেবরা ধ্বসে পড়া পাথর সাফ করে কুনু লোককে উঠাঞেছে আমা ঈ-বারে শুখাঞে মরব। তাথেই বলছি সবাই মিলে পালি করে একটা উৎরা র ইজ সুঁদকাটি। সব সুঁদে কিছু কিছু ডিপ আর উৎরা বাই চালানো আছে। মূল সুদের মতন চালালে জরুর রাস্তা পাব।

বাঁচার আশ্বাসে ওরা উদ্দীপিত হয়ে উঠল।

॥ এগার ॥

বেঁচে থাকার অদম্য বাসনায় টুকু ও সুমি তখনও মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছে। সেই বিশাল ধ্বসের মাঝামাঝি জায়গাতেই ওরা আছে তবে অলৌকিক ভাবে একটা পকেটের মধ্যে ঢুকে গেছে। উত্তর দিকে কয়লার নিরেট পিলারের গা। মাঝে তিন ফুটের ব্যবধান। তারপর একটি চার ফুট বাই চারফুট কাঠের কগ চাল পর্যন্ত খাড়াই। কগের দু ফুট দক্ষিণে ট্রাম লাইনের উপর একসারি খালি টবগাড়ি।

একটা বিরাট পাথরের চ্যাটান তেরছা ভাবে কাঁথি ও টবের মধ্যে একটি ত্রিভুজ রচনা করেছে। কগ ভেঙে গেছে। গাড়িটা চ্যাপটা হয়ে

গেছে। কিন্তু তবুও ত্রিভুজের অতিভুজের মত সেই পাথর চ্যাটানটি নিচে একটি ফাঁক ছেড়ে দিয়েছে। তার মধ্যেই পড়ে আছে টুকু ও সুমি। তাদের পূব পশ্চিম, দক্ষিণ সব দিকেই পাথরের চাই। কাথিতে মাথা ঠোকার জন্য টুকুর মাথায় রক্ত পাত হচ্ছে। কগের কাঠ ছিটকে সুমির কোমর ভেঙে দিয়েছে। সে জাপটে ধরে আছে টুকুকে।

খাদের কাছে ওরা দুজনেই আনাড়ী। গুড় গুড় করে যখন পাথর ভাঙার শব্দ হয় তখন ওরা বুঝতেই পারেনি এটা কিসের শব্দ। লোকজন যখন ছুটে ছুটি করছে তখন ওরা বিভ্রান্ত। কগ ও কাথির মধ্যেকার জায়গাটাতে ঠায় দাঁড়িয়ে পড়েছিল। চড়াৎ শব্দে পাথর ফেটে যাবার মুহূর্তেই সুমি আর্তনাদ করে উঠেছিল—

—মাঝি। ভীষণ আতঙ্কে জাপটে ধরেছিল টুকুকে।

তারপর দুজনের মধ্যে কারোর জ্ঞান ছিল না। জ্ঞান হওয়ার পরও দেখার কোন জো ছিল না। কারণ বাতি নিভে নিবিড় অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছিল। শুধু অনুভব করেছিল তাদের চারিদিকে পাথর।

সেই যে এক চরম মুহূর্তে ওরা পরস্পরকে জাপটে ধরেছে সে বন্ধন আর মুক্ত হয়নি। সুমির মুখে হাত বুলিয়ে টুকু বলল—সুমি। তুর কষ্ট হচ্ছে?

—হুঁ। কোমরটিতে কঠিন বেদনা।

—আমার মাথাটি ফুটে গেইছে রে।

—ঈস বাবা! কত লহু বিরাঞেছে। ওর মাথায় হাত বুলিয়ে তরল রক্ত অনুভব করে সুমি। বলল—হঁ মাঝি। আমরা কখন খাদ থিকে উঠব।

—আমরা আর উঠব নাই রে। এইখেনে এমনি করে মরব

—ঈ-বাবা! মরে যাব? মা-বাপকে দেখতে পাব নাই?

—ভগমান জানে। সুমি আমাদের জীবন ফুরাঞে গেল রে কত সাধ করেছিলম ঘর যাব। মাটি কেটে জমি করব। নিজের হাতে চাষ করব। তুতে আমাতে সংসার করব। কিছুই পূরণ হল নাইরে

—বলিস না। বলিস না। আমার বুক ফেটে যেছে।

সুমি ডুকরে কেঁদে উঠল। টুকু ওকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে সান্ত্বনা দেয় সুমি, কাঁদিস না সুমি। মরি ত দুজনে এক সাথেই

মরব। বাঁচি ত এক সাথেই বাঁচব। মরণ-বাঁচন যাই হোক আমাদের ত ছাড়াছাড়ি হচ্ছে নাই।

ওর কথা শুনে সুমি আরো জোরে কেঁদে উঠল

পবন কোঁড়া সত্যিই অভিজ্ঞ ওর জ্ঞান বুদ্ধি সংযুক্ত নিয়েই চারজন পুরুষ ও দুজন মহিলাকে মৃত্যুর গহ্বর থেকে জীবনের আলোতে নিয়ে যাবার জন্য নেতৃত্ব দিচ্ছে খাদের কলকব্জা বিষয় ও জানে।

যেমন এখানে ডিপ সুঁদ চালু করে পনের বিশ ফুট চলার পরই তা বন্ধ হয়েছিল জল নিকাশের ব্যবস্থা না থাকার জন্য উল্টোদিক থেকে রাইজ সুঁদ চালিয়ে সেই ডিপের সঙ্গে মিল করে দেওয়া হয়নি। রাইজ সুঁদে গরম গ্যাস থাকার জন্য ঠিকমত চালাতে পারে নি লেভেল সুঁদ সোজা এগিয়ে গেছে চাঁদনা পর্যন্ত। বাতাস চলাচল বা লোক চলাচলের একটাই রাস্তা। সব দিকে ধ্বস। অনিবার্য কারণে বন্ধ হয়ে গেছে পথ মৃত্যু অবধারিত। তাই বাঁচতে হলে একটা সুঁদ তের নম্বর থেকে বার নম্বরে জয়েন করতেই হবে। সেজন্য তিনফুট চওড়া করে উত্তর মুখে একটি সুঁদ ওরা কাটছে। সেই সুঁদের মুখে ঝর ঝর করে জল পড়ছে। পবন কোঁড়ার উৎসাহ বাড়ছে।

রাসমণি হতাশ কণ্ঠে বলল—কি হবেক পবন? এত কষ্ট করে সুঁদ কাটতে কাটতেই ত আমরা মরে যাব।

পবন ধমকে উঠল—মরণের কথাটা মুখে আনিস না রাসমণি।

—আমার বিটি জামাইয়ের কি হল? উয়ারা যদি মরে যায় তবে আমি বেঁচে কি করব?

—উয়ারা তো গোলাইয়ের দু'ধারে পালাঞে বাঁচতেও পারে। উসব কুচু কথা মনে আনিস না। সুঁদের মুখে জল যখন দেখাঞেছে তখন জরুর ছ্যাঁদা হবেক। আর একটি ছাঁদা হলেই হল

ঠিক এই কথাটি ভাবছেন মিঃ ব্যারাকলউ তিনিও ঐ বার নম্বর থেকে তের নম্বর লেভেল জয়েন করার জন্য একটি ডিপ সুঁদ চালাচ্ছেন। তবে উভয় পক্ষের হিসেবে একটি ভুল হয়ে গেছে পবন চালাচ্ছে দু' নম্বর রাইজ। ব্যারাকলউ সাহেব চালাচ্ছেন তিন নম্বর ডিপ।

কারণ ধ্বসটা যে কতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছে তা তো উনি জানেন না। যদি দু'নম্বর পর্যন্ত হয়ে থাকে তবে সব পরিশ্রম ব্যর্থ। তাই উনি তিন নম্বর চালাচ্ছেন। একটা ষ্টীম পাম্প বসিয়ে জল মারছেন। হরদম কাজ চলছে।

ওদিকে ধ্বসের পাথর সাফ করতে করতে পশ্চিম লেভেল থেকে বের করেছেন ভজন দাস ও লক্ষ্মণ মুচিকে। দুজনেই জীবিত। হরিরামের মৃতদেহ। সেই ব্যাচারী টব গাড়ির কানায় কাটা পড়ে গেছে। ও হয়ত টব গাড়ির উপর ঝুকেছিল। ফলে ওর মাথার দিকটা টব গাড়ীর ভিতরে পড়েছে? বাকীটা বাইরে পড়েছে।

পার হয়ে গেছে তিনদিন তিনরাত্রি। ব্যারাকলউ সাহেব খাদ থেকে ওঠেন নি। একটা সুড়ঙ্গে খাটিয়া পেতে ঘণ্টা তিনচার ঘুমোন। বাদবাকী সময় শুধু কাজ আর কাজ। বোতল বোতল মদ আসে তাই খান। একদিনও স্নান করেন নি। কিন্তু প্রকৃতির আহ্বানে সাড়া দিতে হয়। তাই জলশৌচ করতে নেমেছিলেন দু'নম্বর ডিপে। নজর পড়ল জলের লেভেল। এটা কমছে কেন? পাম্পিং হচ্ছে তিন নম্বরে। তাতে দু'নম্বরে জল কমবে কেন?

এই একটি কেন প্রশ্নের উত্তর পাবার জন্য এক গলা জলে নেমে কান পেতে রইলেন। জল নড়ছে। কানের পাতায় একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে। একটু পর তার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

জল থেকে উঠেই হাকডাক সুরু করে দিলেন—এ্যই। তিন নম্বর থেকে পাম্প উঠিয়ে দু'নম্বরে বসাও। ওদিকে লোক আছে। ওরা সুঁদে গাঁইতি চালাচ্ছে।

চতুর্থ দিন সন্ধ্যায় কাবেরী প্রায় ভেঙে পড়ল।

—সাহেব কেন আসছে না তরলা? ওর কি হয়েছে? ওর তো চোট ঘাট লাগে নি? আমার মনটা এত উতলা হচ্ছে কেন?

তরলা ওকে সান্ত্বনা দেয়—তুমি এত ভেবো না মেমসাহেব। সাহেব ছেলেমানুষ নয়। এইসব যত খাদ দেখছ সব ওর হাতের তৈরি। তুমি একটু ঘুমোও?

—কি করে ঘুমোব তরলা? আজ আমার জন্যই সাহেবের এই দশা। আমিই তার যত কষ্টের কারণ।

মিঃ অ্যাডামসন এসে ঢুকলেন। তিনি বললেন—উওম্যান! আমি তোমার সাহেবের পুরো খবর নিলাম। খাদে ব্যাপারটা এমন কিছু নয়। পাথরচাপা পড়ে জনকতক কুলিকামিন মরেছে সত্য কিন্তু এমন কত ঘটনা আগে ঘটে গেছে। তারজন্য ব্যারাকলউ সাহেবের মত অতবড় মাইনিং ইঞ্জিনীয়ারের চারদিন ধরে খাদে পড়ে থাকার কোন মানে হয়না। আসলে আমি যা বুঝলাম তা হচ্ছে উনি সবাইকে এড়িয়ে থাকতে চান। নানা ঝামেলায় ওর মনটা এত উদ্বিগ্ন যে আর কোন কিছুর মোকাবিলা করতে পারছেননা। উনি ভিতরে ভিতরে ভেঙে পড়েছেন। তাই খাদের অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে আছেন বিশেষ করে মাদাম ইসাবেলাকে জবাব দেবার মত ওর কিছু নেই।

কাবেরী মরমে মরে গেল। সুখ তার জীবনে আসবার নয়। একদিন টাট্টু ঘোষকে ভালবেসেছিল বলে তাকে প্রাণ দিতে হয়েছে। আজ ব্যারাকলউ সাহেবকে ভালবেসেছে বলে তিনি একটার পর একটা বিপদেই পড়ছেন তার জীবন কি এতই বিড়ম্বিত?

বসে থাকতে ভাল লাগছে না। বাগানে একাই পায়চারি করতে লাগল। কতফুল ফুটেছে কিন্তু কারো দিকে তার নজর নেই। শুধু বুকভরা ব্যথায় গুমরে গুমরে মরছে।

এই সময় এল পিয়ারীলাল। সেলাম করে দাঁড়াল।

কাবেরী বলল—তুমি কতদিন পর এলে পিয়ারীলাল। আমার সুখ দুঃখ দেখতে কি তোমার ইচ্ছা হয় না?

—জরুর হয় মেমসাব।

—তুমি আমাকে মেমসায়েব বলো না পিয়ারীলাল।

—ঠিক বাৎ মাঈজী। লেকিন হামাকে কেন বুলায়েছেন?

—আমি এখান ছেড়ে চলে যাবো পিয়ারীলাল।

—কেনো মাঈজী। সাহাব কি চলিয়ে যাইতে বোলিয়েছে?

—না পিয়ারীলাল। উনি সে কথা বলেননি। তবে আমার জন্য তা অনেক বিড়ম্বনা। সেসব পরে বলব। তুমি আমার গুরুজীকে যেখা থেকে পারো এনে হাজির করে দাও।

—আমি জরুর চেষ্টা কোরবে মাঈজী।

কোই ভি মুসিবৎ হোলে হামাকে খবর কোরবেন। হামি ইমান বরবাদ কোরবে নাই।

পিয়ারীলাল সেলাম করে চলে গেল।

সুমির নাভিশ্বাস উঠছে। ভাঙা কোমর, কিডনী ড্যামেজড, ভীষণ ভীতি, একটি দমবন্ধ অবস্থা সে আর সইতে পারছে না। গত চারদিন ধরে খুব ধীরে ধীরে একটু একটু করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কথাবার্তা সাড়াশব্দ বন্ধ হয়ে গেছে। টুকুর বুকে তেমনি লেপটে আছে।

টুকু বুঝতে পারছে সুমির নাভিশ্বাস বইছে কিন্তু কথা বলার সাধ্য নেই। উপবাসে, রক্তক্ষরণে, ভয়ে সেও ক্রমশ একই পরিণতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

এখন তার পাঁচফুট দূরে পাথর সাফাইয়ের দল কাজ করছে। কাথির ধার বরাবর পাঁচ ছয় ফুট চওড়া একটা রাস্তা করে ফেলেছে হঠাৎ তাদের চোখে পড়ল একটি মৃতদেহ। পাথরচাপা হয়ে পড়ে আছে। প্রায় গলে গেছে। পচা দুর্গন্ধ উঠেছে। ওরা সব শাবল চাড় দিয়ে পাথর আলগা করে মৃতদেহটি বের করল। সাফাই দলেরই একজন তাকে সনাক্ত করল লফব বাউরী বলে হাজরিবাবুর খাতায় আরো একটি নাম কাটা হল।

গাঁইতি চালাতে চালাতে হঠাৎ মদন ধাঙড়ের মুখে এসে পড়ল আধ ইঞ্চি ব্যাসের একটি জলের ফোয়ারা। মুহূর্তে তাকে ভিজিয়ে দিল। জলের ধারা তাকে আশ্চর্য আনন্দের স্বাদ এনে দিল।

চীৎকার করে উঠল—জল বিরাছে জল বিরাছে।

পবন লাফিয়ে উঠল—এঁ্যা। তাই নাকি! দেখি-দেখি।

সবাই ছুটে গেল জলের ফোয়ারা দেখতে। গা ভরে মাখল সেই ফোয়ারার জল।

॥ বার ॥

পঞ্চম দিন সকালে মিঃ মরিস এসেছেন শেরগড় কোলিয়ারির অফিসে। মিঃ শেফার্ড তাঁকে অভ্যর্থনা করে বসালেন। উনি তাঁর কাছে নানা খুঁটিনাটি খবর নিতে নিতে হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলেন—মিঃ ব্যারাকলউকে তোমার কেমন লাগে?

উনি একটু ভেবে বললেন—ভালো।

—আমি তোমার কাছ থেকে আন্তরিক উত্তর আশা করি মিঃ শেফার্ড। একটু পরিষ্কার করে বল যদি ভালো লাগে তো তার কারণ; যদি মন্দ লাগে তবে তারই বা কারণ কি?

—বলতে কি উনি উপরওলা হিসেবে খুবই ভালো। মাইনিং সায়েন্সে তাঁর জ্ঞান ও দক্ষতার তুলনা হয় না। কত যে পরিশ্রম করতে পারেন তারও ধারণা করা যায় না। জানেন এই কদিন উনি নিজে হাতে পাথর সাফ করেছেন।

—মন্দটা কি করেন?

—বড়ই বেপরোয়া। কাউকে তোয়াক্কা করেন না।

—কাজের লোকদের এ চরিত্র দোষটা সর্বত্রই দেখছি

মিঃ হ্যামিলটন একটা সিল করা বড় খাম হাতে আফিসে ঢুকলেন। গুডমর্নিং পর্ব সাঙ্গ করে বললেন- মিঃ ব্যারাকলফ যখন আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেনই না তখন চিঠিটা ওর কাছে থাকছে পাঠিয়ে দেব কী?

—কি দরকার? শেরগড় কোল কোম্পানিতে ওর শেষ ভালো কাজটা শেষ করতে দিন। অন্ততঃ সৌজন্য বোধের খাতিরে।

—তাই হবে।

—কিন্তু আপনি এতটা বাড়াবাড়ি না করলেই পারতেন মিঃ হ্যামিলটন। যাইহোক উনি একজন দারুণ কাজের লোক।

—তাই কি একজন ঠক্, প্রতারক, বিশ্বাসভঙ্গকারীকে প্রশ্রয় দিতে হোত? মিঃ হ্যামিলটন অসহিষ্ণুভাবেই জবাব দিলেন

—ব্যাপারটা খুবই দুঃখের। মিঃ মরিস আর কথা বাড়ালেন না।

পবনের দলের কাজ বন্ধ হয়ে গেছে ওদের কোন একটা বাতিতে তেল নেই। একে একে সব নিভে গেছে। জলের ফোয়ারায় আশার যে নির্ঝরিণী ধারা সবাইকে স্নান করিয়ে দিয়েছিল তার শব্দ শুনেও প্রহর গুনছে। ভীষণ হতাশায় ভেঙে পড়েছে সবাই। তবু সব গাঢ় অন্ধকারে আন্দাজেই গাঁইতির চোট দিচ্ছে

রাসমণি একেবারে এলিয়ে পড়েছে। ওর পাশে শুয়ে চামেলী ধুঁকছে। কত ভাবনা তাদের মনে। যদি বেঁচেই যায় তবু কি দেখতে

পাবে আপন প্রাণের মানুষটিকে। ওঃ ভগবান এত দুঃখ কাউকে দিও না।

পুরুষদের দশা ওদের চেয়ে ভালো নয়। শুধু জল খেয়ে আর কতক্ষণ থাকা যায়? খিদেতে সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে গেছে। প্রাণের তাগিদে শক্ত কয়লার স্তরে চোট দিচ্ছে বটে তবে তাতে একটা শব্দ ছাড়া কাজ কিছু হচ্ছে না। প্রথমদিকে যেমন কাজ হচ্ছিল সেভাবে এগিয়ে গেলে তো এতক্ষণ একটা পুরো পিলার চেরাই হয়ে যেত।

ব্যারাকলউ সাহেবের উৎসাহে এখন জোয়ার এসে গেছে। সুড়ঙ্গের জল নিঃশেষ। ফোয়ারা হয়ে নিচের দিকে চলে গেছে। তার মানে একটা ছিদ্রতেও যোগাযোগ হয়েছে। চালাও। আরো আগে চালাও। ওরা ওদিক থেকে শব্দ দিচ্ছে। সেই শব্দ লক্ষ্য করে চালিয়ে যাও।

একজন সরদার এসে খবর দিল—দুটো লাশ দেখা যাচ্ছে ধ্বস সাফা-ইয়ের জায়গায়। উনি তৎক্ষণাৎ ছুটলেন। বহু আয়াসে বড় পাথরটার নিচে খুঁটা যোগান দিয়ে কাঁথির দিকের কয়লা কেটে দেখলেন মাতৃগর্ভে যেমন যমজ শিশু কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকে ঠিক তেমনি ভঙ্গিতে টুরু ও ঝুমির দুটি মৃতদেহ একে অপরকে বেষ্টন করে পড়ে আছে। টেনে বের করলেন নিজের হাতে।

বললেন—আরে! এতো টাটকা ডেডবডি। এখনও পচন শুরু হয় নি। তাহলে ওরা ঐ পকেটের মধ্যে কিছুক্ষণ আগেও বেঁচেছিল। মাইগড। আর একটু তাড়াতাড়ি কাজ হলে ওদের জীবিত উদ্ধার করতে পারতাম।

ডেডবডি দুটো ঢাকা দিয়ে রেখে আবার সেই সুড়ঙ্গে ঢুকলেন। যে লোকটি গাঁইতি চালাচ্ছিল সে বলল—একটি ফাঁক হয়েও গেছে সাহেব।

তাই নাকি! দেখি—উনি এগিয়ে গিয়ে ফাঁকের মধ্যে মুখ গলিয়ে ডাক দিলেন—এই তোরা কে কে বেঁচে আছিস?

আলোর ছটা পেয়ে সবাই সেখানে এল। অবশ দেহ টেনে আনাও দায়। পবন বলল—হুজুর আমরা আছি। পবন, সিরাম মাঝি, মদন ধাঙড়, লটু রাম, রাসমণি, চামেলি।

—তোরা একটু সবুর কর। আমি যাচ্ছি।

নিজের হাতে শাবল ধরলেন। ফাঁকটার দু'পাশে শাবল দিয়ে কেটে একজন লোক কোনরকমে পার করার মত করলেন। তারপর ইনি নিজেও সেই ফাঁকে গলে গেলেন।

পবন কোঁড়াদের কাছে তিনি তখন দেবদূত। রাসমণি ওর পা ধরে বলল—সাহেব। আমার বিটি জামাইয়ের খবর জান সাহেব?

—হ্যা। জানি। ওরা খাদেই আছে। চল-ওঠ।

—সাহেব। আমার মরদটি? চামেলী কেঁদে পড়ল।

—উযাকে উপরে পাঠিয়ে দিয়েছি।

—বেঁচে আছে ত সাহেব।

— চল না উপরে গিয়েই দেখতে পাবি।

ফাঁকটা হয়েছিল বুক সমান খাড়াইয়ে। উনি একে একে তুলে ধরলেন আর ওদিক থেকে তুলে নিল। সবাইকে উঠিয়ে নিজে উঠলেন।

রাসমণি ও চামেলী বসে পড়েছে। সাহেব হুকুম দিলেন—ওদের খাটে তুলে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যাও।

রাসমণি বলল—আমার বিটি জামাই?

—ওদেরও উপরে পাঠাচ্ছি।

পঞ্চম দিনের মধ্যরাত্রে সাতটি খাটের মিছিল নিয়ে ব্যারাকলও সাহেব উঠলেন। তারমধ্যে ছ'টি জীবিত। কিন্তু দীর্ঘ জীবনপণ সংগ্রামের পর মুক্ত বায়ুর স্পর্শে আসামাত্র ছ'জনই অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। সপ্তম খাটটিতে টুরু ও সুমির মৃতদেহ একসঙ্গে আছে।

ব্যারাকলউ সাহেব তাদের বন্ধন ছিন্ন করতে বারণ করেছেন।

বুধনা মাঝি রাসমণির খাটটির কাছে এসে দাঁড়াল। হাত দিয়ে স্পর্শ করে বলল—তুঁই তবে বেঁচে আছিস। কিন্তু বিটি জামাই?

একজন সপ্তম খাটের ঢাকা খুলে দিল। বুধনা খাটের বাজু ধরে ঝামরে পড়ল—তুরা মরে গেইছিস? হে ভগমান! সেও জ্ঞান হারাল।

মিঃ ব্যরাকলউয়ের হাত পা টলছিল। হাজবিঘরের দেওয়াল ধরে কোনরকমে নিজের টাল সামলে দাঁড়ালেন। মিঃ ট্রুম্যান এক বোতল ব্রাণ্ডি এগিয়ে দিলেন।

—থ্যাঙ্ক ইউ মিঃ ট্রুম্যান। চোঁ চোঁ করে আধবোতল খেয়ে ধাৎ ফিরে পেলেন।

মিঃ ট্রুম্যান বললেন—স্যার। আমার মনে হয় আপনার বাংলোয়

ফিরে যাওয়া উচিত। কাজ তো শেষ। ফাদাব উইলিযাম ওদের যত্ন করবেন।

—অলরাইট। আমার ঘোড়া আনতে বল।

—ঘোড়া কেন স্যার? ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে এসেছি। শরীরের এ অবস্থায় ঘোড়ায চড়তে পারবেন না।

ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দে ঘোড়ার গাড়ি চলছে। মাথাব উপর অসংখ্য তারা জ্বলছে। মিঃ ব্যাবাকলউ এলিয়ে পড়ছেন। তাঁব আর কোন ভাবনা নেই। মস্তিষ্কটা ফাঁকা হয়ে গেছে। কিছু ভাবতে পারছেন না। কি যে করেছেন তাব কোন কিছু মনে নেই। সীমাহীন ক্লান্তি। অপরিসীম উদ্বেগ। অসহ্য যন্ত্রণা। দানবীয় পরিশ্রম। সবকিছু তাকে এমন ভাবে গ্রাস করেছে যে কথা বলারও সাধ্য নেই।

মিঃ ট্রুম্যান ওকে গাড়ি থেকে নামিয়ে কোচযানের সাহায্যে পাঁজা কোলা করে তুলে বিছানায় শুইয়ে দিলেন। উনি তখন অচৈতন্য।

॥ তের ॥

শান্ত, ক্লান্ত, অচৈতন্য ব্যাবাকলউ সাহেব শুয়ে আছেন। তাঁর একপাশে দাড়িয়ে মি. ট্রুম্যান অন্যপাশে কাবেরী। দুজনেই বিমূঢ, হতভম্ব। অ.শু কর্তব্যের কুল কিনারা মাথায় ঢুকছে না।

কাবেরী বলল—চালুদাস! সাহেবের জুতো মোজা খুলে দাও গরম জল কর। এক চার। আগুন নিয়ে এসো। সাহেবকে সেঁক দিতে হবে।

মিঃ ট্রুম্যান ঘাড় নেড়ে বললেন—ইয়েস! দ্যাটস্ এ রাইট ট্রিটমেন্ট! তুমি চালিয়ে যাও আমি ফাদার উইলিয়মের খোঁজে চললাম।

উনি চলে গেলেন কাবেবী সাহেবের শুশ্রূষায় লেগে পড়ল।

সাহেবের গায়ে তখন পচা ঘামের বিশ্রী দুর্গন্ধ। জুতো মোজা খোলা মাত্র তীব্র গন্ধে গা গুলিয়ে যাবার অবস্থা। পা দুটো খ্যাস্ খ্যাস্ করছে। এমনিতেই চক্ খড়ির মত সাদা রঙ। তাই আবার পাঁচটা দিনরাত্রি ঘামে জলে ভিজে পায়ের চামড়া কুঁচকে গেছে। ওর শরীরটা দেখাচ্ছে যেন একটি রক্তশূন্য শবদেহ।

কাবেরী বিশুদ্ধ ভারতীয় প্রক্রিয়ায় নুনের থুপি করে সেঁক দিতে শুরু

করল। গায়ের জামা কাপড় খুলে দিগম্বর বানিয়ে দিল তারপর সারা গায়ে সেঁক চলল। ঘণ্টা খানেক পর সাহেবের জ্ঞান ফিরল। অবসন্ন চেতনার গভীরে এক প্রকার সুখের আমেজ। বিড় বিড় করে বললেন—মাই গড।

কাবেরী ওকে ঝাঁকি দিয়ে বলল—সাহেব!

উনি চোখ মেলে বললেন—ইয়েস!

-তোমার শরীর কেমন লাগছে সাহেব?

—নট ব্যাড।

-একটু ব্রাণ্ডি খাবে?

—দাও।

গরম দুধের সঙ্গে মিশিয়ে ব্রাণ্ডি দিল কাবেরী। উনি ছোট ছোট চুমুকে গ্লাসটা শেষ করে একটু চাঙ্গা হয়ে উঠলেন। উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেন কাবেরী ওর দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিল। কিন্তু দাঁড়াতে গিয়ে দেখলেন পা দুটো সোজা হচ্ছে না। থর থর করে কাঁপছে।

বললেন—মাই গড! পা দুটো কাঁপছে কেন?

- শুয়ে পড় সাহেব। তোমার পা দুটো ভিজে ন্যাতা হয়ে গেছে। সেঁক তাপ দিয়ে আরো সাবুদ করি।

- ঠিক বলেছো উনি শুয়ে পড়লেন!

সজ্ঞানে সেঁক তাপ নিচ্ছেন। গরম নুনের থুপিটা ছ্যাঁৎ করে চামড়ার উপর বসছে অথচ তাতে কত না আরামবোধ। আরেক দফা ব্রাণ্ডিটাও পেটে গেল এখন বেশ চন্‌মনে বোধ হচ্ছে।

বললেন- ডারলিং! তোমার সেবার তুলনা হয় না।

—দাসী বাঁদীর সেবাটুকু ছাড়া আর কিই বা দেবার আছে সাহেব। ওঠ। এবার স্নান করবে চল।

—ওঃ ইয়েস!

বাথরুমে সাহেবকে ওলট পালট করে সাবান ঘষে, তোয়ালে ঘষে যাবতীয় ঘাম, ময়লা সাফ সুতরো করে ফুরফুরে ধোলাই কাপড়ের মত বের করে নিয়ে এল। তখন ওর পেটে খিদে চন্ চন্ করছে। খেয়ে দেয়ে শোবামাত্র দু'চোখ জোড়া ঘুম। আর সাহেবের সাড় নেই।

বুধনা তখন আতান্তরে। একদিকে টুরু সুমির মৃতদেহ। অন্যদিকে

রাসমণির অর্ধ অচৈতন্য অবস্থা। মৃত্যুর বিভীষিকা, প্রগাঢ় অন্ধকার, ভীষণ ক্ষুধার মর্মান্তিক যন্ত্রণা সাগর পার হয়ে এসে পড়ল শোকের পাথারে। একটা প্রাণের কতই বা সহনশীলতা আছে? শরীরে মনে অশক্ত দুর্বল রাসমণি সিদাবাড়ীর পাথর চাতালে শুয়ে ধুঁকছে।

বুধনার বল বুদ্ধি ভরসা ফরসা হয়ে গেছে। মাঝিরা চামরু দিয়াশীকে নিয়ে এসেছে। সে কিসব শিকড় বাকড় বাটা মহুয়ার মদে মিশেল করে রাসমণিকে খেতে দিল। সে ওষুধ খেতে বড় কষ্ট। যেমন ঝাঁঝ তেমনি তেঁতো আবার পচা দুর্গন্ধে পাকস্থলী পাক দেয়। কিন্তু আশ্চর্য তার গুণ।

রাসমণি উঠে বসল. তার মাথার শিটা শিটা জট পাকানো চুল পিঠে কাঁধে মুখে ঝুলছিল লম্বা লম্বা কাঠসিমের মত। সেগুলো হাত দিয়ে সরিয়ে ঘোলাটে চোখে তাকাল। নিজের মেয়ে জামাইয়ের ভাবডেলা মৃতদেহ দেখেও অবিচল রইল।

মাঝিদিকে বলল—উয়াদিকে দামুদরে পুড়াঞে দিয়ে আয় গা।

মাঝিরা তো সেইজন্যই অপেক্ষা করছিল। তারা কালক্ষেপ না করে এক খাটিয়ায় জোড়া শবদেহ বয়ে নিয়ে চলে গেল।

বুধনা ডুকরে কেঁদে উঠল।

রাসমণি বলল—তুঁই ক্যেনে কান্‌ছিস রে মাঝি? সুমিকে ত তুঁই আজ্জাস্‌ নাই। যে আজ্জাঞেছিল সেই মাহা খালভরাকে ডেকে দেখা। উ যদি অমন করে দুষমণি না করত তবে কি বিটি জামাই খাদকে খাটতে যেত না অমন চালচাপা পড়ে মরত?

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে চুপ করল। অনেকক্ষণ পরে বলল—আমাদের ঘরটিতে বোঙা লেগেছে। চল—আমরা ঈ-খেন থেকে চলে যাব।

বিকেল বেলায় ফাদার উইলিয়াম ও মিঃ আডামসন কাবেরীকে খুব তারিফ করলেন। বললেন—সত্যিই তোমার মত মেয়ে হয় না। এত সহনশীলা বুদ্ধিমতী মেয়ে খুব কম দেখা যায়। তাছাড়া তোমার সেবার হাতটিও বড় মিষ্টি। ওহ্! ভালবাসার জন্য ভারতের মেয়েরা কি না করতে পারে? ওদের কাছে স্বার্থ তুচ্ছ, প্রাণ তুচ্ছ। সাহেবকে আমরা তোমার জন্য বলব।

যেন সাহেবকে বলে লেবার থেকে সুপারভাইজারে প্রমোশন দেওয়া করাবেন। ওঁদের সব কথাতেই মতলব। কাবেরী অত বুঝতে পারে না। ও মনে করে ওঁরা তার শুভাকাঙ্খী। তার ভালবাসার প্রশংসা করছেন।

ব্যারাকলউ সাহেব তখনো ঘুমুচ্ছেন। ফাদার উইলিয়ম বললেন—বিবি বাথানে একটা পেশেন্ট আছে। চলুন মিঃ আডামসন ওকে দেখে আসি।

চামেলী বিবি বাথানের মেয়ে। তার স্বামীর মৃতদেহ আগেই সৎকার হয়ে গেছে। ও এসে কিছু দেখতে পায় নি। জ্ঞান ফিরেছে সকালে। তখন থেকে সামনে কেঁদে যাচ্ছে। ভয়ে দিশেহারা, উপবাসে অশক্ত শরীর জলে ভিজে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। গলা ছেড়ে কাঁদবার ক্ষমতা নেই। শুধু পাঁজরগুলো কাঁপছে।

তার ঘরের দুয়ারে বাচ্চা-কাচ্চা মেয়ে পুরুষের ভিড়। চামেলীর বাচ্চা দুটো সেই ভিড়ের কোলাহলে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে। মায়ের গায়ে লেপ্টে আছে।

ফাদার উইলিয়াম এলেন মহা প্রভাবান্বিত ধর্মগুরুর মত। শোক সন্তপ্তা চামেলীর দিকে লম্বা হাত বাড়িয়ে বললেন—ডিয়ার উওম্যান! প্রভু যীশাস ক্রাইষ্টের স্মরণ নাও। তিনি তোমাকে অপার শান্তি দেবেন।

চামেলীর বুক ফাটা হাহাকারে প্রভুর নাম তলিয়ে গেল।

বিবি বাথানের তেঁতুল তলে তখন বিরাট মজলিশ। সবাই বারকুলি সাহেবের নামে গদ গদ। আহা! কি সাহেব যতক্ষণ না সব লোকগুলিকে খাদ থেকে উঠালেন ততক্ষণ চন্দ্র সূর্যের মুখ দেখলেন না। কি অটল প্রতিজ্ঞা!

কথাটা ফাদার উইলিয়মের কানে যাবামাত্র ধরে নিলেন।

বললেন—শুনুন মিঃ আডামসন! নেটিভরা কি বলছে? সত্যিই তো! মিঃ ব্যারাকলউয়ের বীরোচিত কাজের জন্য অভিনন্দন পাওয়া উচিত।

উনি বললেন—নিশ্চয়।

পরদিন সকালে মিঃ ব্যারাকলউ ষোল আনা সুস্থ। শরীরের সব ভার কেটে গেছে। উনি বাগানের লনে বসে আছেন। সহিসকে ঘোড়া তৈরি করতে বলেছেন অফিস যাবেন বলে।

কিন্তু সকাল থেকেই লোকজনের আনাগোনা। রামনগিনা গোমস্তা, মিত্তির বাবু খাজাঞ্চী, নগেন মল্লিক খাদের ইনচার্জ, অবনী পাত্র গুদাম বাবু, ইসমাইল বড় মিস্ত্রী, সাধুখাঁ হাজারিবাবু প্রমুখরা ভোর বেলাতেই সাহেবকে সেলাম ও শুভেচ্ছা দিতে এসে গেছেন। দারুণ দুর্ঘটনায় জীবিত ও মৃতদের উদ্ধারের জন্য তিনি যে দৃঢ়তা দেখিয়েছেন, যে অমানুষিক পরিশ্রম করেছেন তার জন্য তাঁরা সব অভিভূত। মা কালীর কাছে পাঁঠা মানত করেছেন সাহেবের সর্বাঙ্গীণ কুশলের জন্য।

সাহেবেব মেজাজ খুব শরীফ ছিল। বললেন আচ্ছা নগেন, তুমি তো খাদের ইন চার্জ, বলতে পারো এতবড় দুর্ঘটনা ঘটল কেন ?

নগেনবাবু বললেন—এতো জানাকথা স্যার। শেফার্ড সাহেব হুকুম দিতেন—হাবু, আমার ডবল রেজিং চাই। হাবু সাহেব খাদে গিয়ে মুন্সী, মাইনিং, মালকাটাদের পিঠে চাবুক মেরে বলতেন—ডবল রেজিং চাই। ওরা সব প্রাণের দায়ে কাঁথি কেটে, গোলাই কেটে বেজিং করেছে। এক একটা সুড়ঙ্গ বিশ বাইশ ফুট চওড়া। একদিন সবশুদ্ধ ধ্বস নামল।

উনি বললেন—রাইট ! হাবু সাহেব কোথায় ?

—ওতো পালিয়ে গেছে স্যার।

—তাতো যাবেই। ওকে পেলে আমি গুলি কবে মারতাম। ডেডবডিটা শিয়াল কুকুরকে দিয়ে খাওয়াতাম। স্কাউণ্ড্রেল !

গোমস্তা বাবু বললেন—হুজুর তো উয়াকে একবার হাবিস কোরিয়ে দিযেছিলেন। লেকিন হ্যামিলটন সাহেব বুলায়ে নিয়ে এল।

—হ্যাঁ। আমাব সঙ্গে তুষমণি করতে ওকে নিয়ে এসেছিলেন। ননসেন্স !

বাবুরা একে একে চলে গেলেন। সাহেববা একে একে আসতে শুরু করলেন। মিঃ ট্রুম্যান, মিঃ নর্টন, মিঃ শেফার্ড প্রভৃতি ম্যানেজার ও ইনজিনীয়ারবা তাঁকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে এসেছেন। ফাদার উইলিয়াম ও আডামসন তো আছেনই। কাজেই একটু হাল্কা পানীয়ের ব্যবস্থা করতে হয়েছে। সাহেবরা সব বিয়ারের বোতল খুলে একটু একটু পান করছেন।

মেন গেট দিয়ে সাদা ঘোড়ায় চড়ে বাংলোয় ঢুকলেন মিঃ মরিস।

তার পিছনে আরেকটা কালো ঘোড়ায় মিঃ হ্যামিলটন। সবাই চঞ্চল হয়ে উঠলেন। মিঃ ব্যারাকলউ এগিয়ে গিয়ে ওদেরকে অভ্যর্থনা জানাল্লেন।

সবাইকে নিয়ে বড় ড্রায়ংরুমে এলেন। তার দেওয়ালে দেওয়ালে হরিণের সিং, বাঘের মুণ্ড, শিকারী যোদ্ধার তৈলচিত্র ইত্যাদি নানা বর্ণাঢ্য ডেকরেশন। পাশের ঘরটা তার মিনি মিউজিয়াম। সেখানে নানা প্রকারের পাথর, নুড়ি, কয়লা, ফসিল ও গাছের নমুনা এবং রানীগঞ্জ কোল ফিল্ডের জিওলজিক্যাল ম্যাপ ও নানা কয়লার স্তরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

মিঃ মরিস সেসব দেখেশুনে প্রচুর প্রশংসা করে বললেন—মিঃ ব্যারাকলউ! আপনি জিনিয়াস।

কোম্পানির ফার্স্ট সেক্রেটারীব মুখ থেকে প্রশস্তি শুনে উনি গলে গেলেন। বললেন আমি ব্রিটিশ এম্পায়ারের জন্য নূতন নূতন কয়লাখনি খুলেই আনন্দ পাই স্যার। দ্য শেরগড় কোল কোম্পানির যা কিছু নিউ ভেনচিউর দেখছেন তাব পিছনে আমার প্রচেষ্টা কম নেই!

মিঃ মবিস ঘাড় নেড়ে বললেন—তা আমি জানি।

মিঃ হ্যামিলটন বললেন—মিঃ ব্যারাকলউ তাঁর নিজের কোলিয়ারি পানমোহরার জন্য যে মডেলটা তৈরি করেছেন তা ভারতীয় কয়লাখনির কাছে একেবারে আধুনিক। ওটা দেখেছেন স্যার।

—কই না তো!

এই যে স্যার। দেওয়ালে টাঙানো একটা নক্সার দিকে আঙুল বাড়িয়ে দেখালেন মিঃ ব্যারাকলউ। তারপর একটা টেবিলের উপর কাচের তৈরি মডেলটা দেখালেন।

মিঃ মরিস উচ্ছ্বসিতভাবে প্রশংসা করলেন—আঃ! বিউটিফুল আরকিটেকচার।

—আপনার প্রশংসা শুনে মনে হচ্ছে আমার পরিশ্রম সার্থক হল। কিন্তু ঈশ্বর জানেন যেমন করে মডেল তৈরি করেছি সেভাবে কোলিয়ারি করতে পারব কি না? অথবা আদৌ সে কোলিয়ারি হবে কি না?

—চান্স ওয়েটস ফর এ গুড ক্যাপটেন!

—থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।

ফাদার উইলিয়ম প্রস্তাব রাখলেন—মিঃ ব্যারাকলউয়ের বহু কৃতিত্বের সঙ্গে সাম্প্রতিক দুর্ঘটনায় উদ্ধার কার্যের জন্য তিনি যে অদম্য মনোবলের পরিচয় দিয়েছেন, ভারতবর্ষের নেটিভদের প্রাণরক্ষার জন্য প্রাণ বিপন্ন করেছেন সেজন্য তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিনন্দন জানানো উচিত মিঃ মরিস।

—নিশ্চয়। নিশ্চয়। উনি এক মহৎ উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন কাজেই তাঁকে অভিনন্দন দেওয়া আমাদের কর্তব্য।

—অনুষ্ঠানের একটা স্মারকলিপি মিঃ গ্রাণ্ডিকেও পাঠানো হবে তাঁর জ্ঞাতব্যের জন্য যে আমরা কসাইখানা খুলি নি। শ্রমিকদের প্রাণ রক্ষার জন্য কি অসম্ভবকেই না সম্ভব করেছি।

—ইয়েস। ইয়েস। সর্বসম্মতিক্রমে সে প্রস্তাব গৃহীত হল।

হতেই হবে। নিজের ঢাক তো নিজেকেই বাজাতে হবে। তার আওয়াজ যেন সাগর পারেও যায়। কিন্তু মৃতদেহে বস্তা চাপা দিয়ে কি তার দুর্গন্ধ রোধ করা যায়? নাকি সে পাপেব প্রায়শ্চিত্ত হয়?

॥ তের ॥

মিঃ গ্রাণ্ডির রিপোর্ট নিয়ে তখন দেশে-বিদেশে বিস্তর আলোচনা চলছে। মানুষের প্রাণ নিয়ে ঠিক এভাবে ছিনিমিনি খেলা বন্ধ হওয়া উচিত। কয়লা কুঠিকে আর বল্গাহারা ঘোড়ার মতো ছুটতে দেওয়া হবে না। তার জন্য কিছু আইন চাই।

বিলেতের পার্লামেণ্টে এই নিয়ে বিতর্ক হয়ে গেছে। ভারত সরকারকে আইন প্রণয়ন করার ব্যাপারে উদ্যোগী ভূমিকা নিতে বলা হয়েছে। একটা কমিটির উপর সে ভার ন্যস্ত হয়েছে। কমিটি এখন তা বিচার-বিবেচনা করে সুপারিশ তৈরি করছেন। হ্যা শেরগড় কোল কোম্পানির সাহেবরা সে খবর রাখেন। এই নিয়ে ইউরোপীয়ান ক্লাবে প্রচুর আলেচনা ও মদ্যপান হয়।

তখন যুবক-যুবতী ও প্রেমিক-প্রেমিকারা বাগানে মধুসন্ধ্যা যাপন করতে যান। যে যার মনের মানুষ অথবা মনের কাছাকাছি মানুষ, বন্ধু-বান্ধব পুঞ্জ পুঞ্জ হয়ে বসে, দাঁড়িয়ে, গান গেয়ে, নেচে, আমোদ-প্রমোদে ব্যস্ত।

প্রবীণেরা হুইস্কীর গ্লাসটি হাতের সামনে রেখে গুরুগম্ভীর আলোচনা

করেন। সেদিন মিঃ হ্যামিলটন একাই মুখ আমসী করে মদ খাচ্ছেন। মিঃ শেফার্ড এসে বললেন—গুড ইভনিং বস। আপনি একা? মিসেস নর্টন আসেন নি বুঝি?

—আর বলো কেন? ব্লাডি নর্টন আজ ভীষণ পাগলামী করেছে। যত সব বাজে দেশী মদ খেয়ে মিসেস নর্টনকে মারধর পর্যন্ত করেছে। ওর উণ্ডস্ ব্যাণ্ডেজ করতে হয়েছে।

—অথচ এই অপদার্থটাকে আপনিই প্রমোশন দিয়ে এতদূর উঠিয়েছেন, না হলে ল্যাঙ্কাশায়ারে বয়লারে রিভেট করতে করতে জান যাচ্ছিল।

—ইয়েস। লোকটার কৃতজ্ঞতাবোধ নেই।

এই সময় আরো জন কয়েক সাহেব এসে গেলেন।

জনৈক মিঃ উড বললেন—জানেন স্যার! কতকগুলো ভারতীয় ছাত্র লণ্ডন রিভিউতে কি রকম গরম গরম কথা বলেছে।

মিঃ হ্যামিলটন বললেন—জানি। নেটিভগুলো সব হাড়-হারামী। আমাদেরই দেশে গেছিস পড়াশুনা করতে। তা সব লেখাপড়া শিখে এসে ভাল ভাল চাকরি কর। তা নয়—রেনেশাঁস, রেনেশাঁস করে শোরগোল তুলেছে। আরে রেনেশাঁস তোরা করবি কি? যা করবার আমরা করছি।

—ইয়েস স্যার। ইণ্ডিয়ার রেনেশাঁসে আমরাই তো পুরোধা।

বেশ নাটকীয় ভঙ্গিতে কথাটা বললেন মিঃ শেফার্ড। মানে হুইস্কীর নেশায় পিক্-আপ নিয়েছে।

মিঃ হ্যামিলটন বললেন—না। ওরা বলে আমরা শোষক। তেমনি সব লণ্ডনের খবরের কাগজওয়ালারা। আমরা যে মুখে রক্ত উঠিয়ে সাদা চামড়া কালো করে দেশের জন্য ঐশ্বর্য ভাণ্ডার চালান করছি তার জন্য তারিফ নেই। ভারতীয় ছাত্রদের কথা ফলাও করে লিখছে।

—আসলে আমরা উদার দেশের মহান জাতি। কাউকে বঞ্চিত করতে চাই না। মিঃ উড কথাটা বলে ঘন ঘন মাথা নাড়তে লাগলেন। তাঁর মনে গভীর আত্মপ্রসাদ। কে জানে সুইট হোমের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে নাকি! মদ-টদ খেলে আত্মানুসন্ধানের ভাব-ব্যাখ্যানটি বেশ লাগসই হয়।

এই ইউরোপীয়ান ক্লাবেই মিঃ ব্যারাকলউকে অভিনন্দন জ্ঞাপনের অনুষ্ঠান আয়োজিত হল এক মদির সন্ধ্যায়। ক্লাবে সেদিন উৎসবের

রূপসজ্জা। আলো ঝলমল ড্যান্স ফ্লোরে জোড়ায় জোড়ায় সাহেব-মেমরা নাচের ঘোরে বে-শোর। শিল্পীর দল রক্ত নাচানো সুরের বন্যায় তাঁদেরকে মাতাল করে দিয়েছে।

ওদিকে মিঃ হ্যামিলটন ও মিঃ ব্যারাকলাউ দুই প্রতিদ্বন্দ্বী একসঙ্গে বসে সুরা পান করছেন। একি মাদক দ্রব্যের প্রভাব না সৌজন্যের খাতির কে জানে? তখন টিউলিপের কোমর জড়িয়ে ধরে প্রবেশ করলেন মিঃ ডিকসন। ওরা এতক্ষণ বাগানে ন্যাচারেল বিউটি দেখছিলেন। এবার ড্যান্স ফ্লোরে নাচতে এসেছেন। তা দেখে মিসেস নর্টনের চোখে যেমন সপ্রশংস দৃষ্টিপাত তেমনি রোষ কষায়িত নেত্র মিঃ ট্রুম্যানের। ওঁর মনে হচ্ছে একটা ঘুঁষিতে মিঃ ডিকসনের মুখটা থেঁতলে দিয়ে টিউলিপকে কব্জা করে নেবেন।

কিন্তু অতটা অগ্রসর হবার পূর্বেই মিঃ মরিস এসে গেলেন। তাঁকে অভ্যর্থনা করার জন্য সবারই মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। ড্যান্স ফ্লোরে একটা কিশোরী তখনো দিশেহারা প্রেমসঙ্গীত গেয়ে যাচ্ছিল—যার অর্থ- সোনালী গমের ক্ষেতে আমি একা একা ফিরি মনের মধ্যে বাসনা লুকিয়ে কখন এক সুদর্শন রাজপুত্র ঘোড়ায় চড়ে এসে আমাকে প্রেম নিবেদন করে।

—আহা! মেয়েটার প্যাশন ফেটে যাচ্ছে।

—এই তো টিনএজ। এখন অপেক্ষা করার অনেক সময় আছে।

এমনি সব মুখ টেপাটেপি মন্তব্য ভাসছে। সুবর্ণকেশী নীল নয়নীর তাতে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। এমনকি মিঃ মরিসকেও উইশ করল না।

তাতে কার কি এসে যায়? মিঃ শেফার্ড ড্যান্স ফ্লোরে উঠে ঘোষণা করলেন—আমাদের নাচ-গানের অনুষ্ঠানের এখন বিরতি।

মাননীয় অতিথিদের প্রতি বিশেষ অনুরোধ তাঁরা যেন নিজের স্থানে বসে পড়েন। এরপর শুরু হবে মিঃ ব্যারাকলউকে অভিনন্দন জ্ঞাপনের অনুষ্ঠান।

সকলেই বসে পড়লেন। নাচ-গান থামল। খুব মৃদুস্বরে আবহ সঙ্গীত বাজতে লাগল।

ড্যান্সফ্লোরে এসে বসলেন মিঃ মরিস, মিঃ ব্যারাকলউ, মিঃ হ্যামিলটন ও ফাদার উইলিয়াম। তিনি আছেন সর্ব ঘটেই। প্রসব থেকে প্রণয় অথবা প্রণয় থেকে প্রসব ইউরোপীয়ানদের সব উৎসবেই তাঁর স্থান নৈবেদ্যের কলাটির মত।

তিনি একঝুড়ি বক্তৃতা দিলেন যার সারমর্ম লর্ড যীশাস ক্রাইষ্টের প্রতি অবিচল আস্থা রাখুন। তিনি অপার শান্তি দেবেন।

মিঃ মরিস তাঁর বক্তব্যে কোম্পানির অনুগত সাহেবদের ভূয়সী প্রশংসা ও বিপুল উৎসাহ প্রদান করে মিঃ ব্যারাকলউকে দেওয়া অভিনন্দনপত্রটি নিজে পাঠ করলেন।

প্রচুর হাততালি পড়ল।

মিঃ ব্যারাকলউকে বক্তৃতা দিতে অনুরোধ করলেন মিঃ শেফার্ড।

উনি সকলকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করে বলতে শুরু করলেন—আজ আমাকে অভিনন্দন জানান হচ্ছে দুর্ঘটনার শিকার কয়েকটি শ্রমিককে উদ্ধার করার জন্য। কিন্তু ব্যাপারটার মধ্যে যতটা না আন্তরিকতা আছে তার বেশি আছে লোক দেখানোর আয়োজন। যেহেতু ভারতের কয়লা-খনিকে কসাইখানা আখ্যা দেওয়া হয়েছে সেজন্যই।

কিন্তু এখনো কি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির কোন তফাৎ হয়েছে? ভারতীয়-দের আমরা নেটিভ ছাড়া কিছু মনে করি না। তাদের জীবনের দামও দিই না। আমার একটা উদাহরণ এতবড় করে না দেখলেই হত।

আমরা লোভী। আমরা স্বার্থপর। এদেশে এসেছি ধনভাণ্ডার গড়তে। তাই সবাইকে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করতে অনুরোধ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

নেহাৎ উনি কোম্পানির ডেপুটি চীফ মাইনিং ইঞ্জিনীয়ার। বিরাট প্রভাব প্রতিপত্তি তাই ওর বক্তৃতার মধ্যে ঢিল পড়েনি। না হলে সারা হল উত্তেজনায় ফেটে পড়ছে। সাহেব মেমদের অষ্টাঙ্গ জ্বলছে। উনি বসামাত্র শুরু হল বাক্যবাণ।

—মিঃ ব্যারাকলউ কি ইংরেজ না ভারতীয়?

—আপনি কি বাঙালী মেয়ের প্রেমে পড়ে বাঙালীবাবু হয়েছেন?

—আপনার কি সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান নেই?

—ভারতে এসে আপনি নিজেই তো ধনভাণ্ডার গড়ছেন। নিজস্ব কোলিয়ারি খুলেছেন। আবার অন্যকে দোষ দিচ্ছেন।

—আপনার উচিৎ এই মুহূর্তে ফুলের মালাটা খুলে ফেলা।

—আপনার অভিনন্দনপত্রের উপর কালি ঢেলে দেওয়া উচিৎ। সে যেন চাকভাঙা ভীমরুলের প্রচণ্ড আক্রোশ। মিঃ শেফার্ড থামাতে পারছেন না। মিঃ মরিস থামাতে পারছেন না।

তখন আবার মিঃ উডের মত প্রবীণ ব্যক্তি টলটলে পায়ে ড্যান্সফ্লোরে উঠে দর্শকদের বললেন- লেডিজ এণ্ড জেণ্টস! মিঃ ব্যারাকলউ সুসভ্য ইংরেজ জাতির চরিত্র হনন করেছেন। তাঁকে তাঁর বক্তব্য উইথড্র করতে হবে। সবারই কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।

সারা হল সহর্ষে সমর্থন জানাল। সবাই বলল—আপনার বক্তব্য উইথড্র করে ক্ষমা চান মিঃ ব্যারাকলউ।

হলে হট্টগোল শুরু হয়ে গেল। ভীষণ দাপাদাপি। মিঃ শেফার্ড ছ'হাত তুলে চিৎকার করছেন—আপনারা দয়া করে চুপ করুন।

কে চুপ করবে? সবাই তো টপভুজঙ্গ। উত্তেজনার খোরাক পেয়ে টগ্‌বগ্‌ করে ফুটছে। মদের বোতল, গ্লাস, ডিস্ ভাঙার পালা শুরু হয়ে গেছে।

মিঃ মরিস ছ'হাত তুলে দাঁড়ালেন। ফাদার উইলিয়াম হলের মধ্যে ছুটোছুটি করে থামাবার চেষ্টা করছেন। বয়, বাবুর্চি, বাটলার, খানসামারা দ্রুত হাতে বোতল, গ্লাস. ডিস্ সরিয়ে নিল।

হলটা একটা শান্ত হতেই মিঃ মরিস বললেন—আপনারা দয়া করে চুপ করুন। মিঃ ব্যারাকলউ মনের দিক থেকে সুস্থ নন। সেই এক্‌সি-ডেণ্টের পর ওর মনের ভারসাম্য কিছুটা নষ্ট হয়েছে। তিনি একটু বেশি ড্রিঙ্ক করে ফেলেছেন। তাই উনি বুঝতে পারেন নি কি বলতে কি বলছেন নেশা ছুটলে বুঝতে পারবেন। তখন নিজেই অনুতপ্ত হবেন।

তাঁর কথায় হলটা শান্ত হল।

মিঃ ব্যারাকলউ তখন অপমানে আহত। তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে আজ মিঃ মরিসকে কেমন একটা মিথ্যা ব্যাখ্যা তৈরি করতে হল। মনে হচ্ছিল এক্ষুণি তার প্রতিবাদ করে বলেন—যা বলেছি সজ্ঞানে বলেছি।

কিন্তু আর কিছু বলার প্রবৃত্তি তাঁর হল না। নীরবে নতমুখে হল থেকে বেরিয়ে গেলেন। ইরফান আলী ঘোড়াগাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। সাহেব গাড়িতে চড়ামাত্র ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

বুকটা ওর ফেটে যাচ্ছে। ওঃ তার জন্য এত অপমান অপেক্ষা করেছিল। অথচ তাঁকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সম্মান জানানোর জন্য! এই তার পরিণতি! এই তাদের ইউরোপীয় সমাজ। যারা ছটো কথা সহ্য করতে পারে না। নিজের নগ্ন চরিত্রকে দেখতে পায় না। স্বার্থের কি সীমাহীন দম্ভ!

গাড়িটা সাহেব কুঠির গেটে ঢুকল। কাবেরী তখনো জেগে বসে আছে। সাহেবের মুখ দেখেই ওর বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল।

উনি এসে দাঁড়ালেন লর্ড যীশাস ক্রাইস্টের বিরাট তৈলচিত্রের সামনে· ফাদার উইলিয়াম যে বলেন—প্রভুর স্মরণ নাও। অপার শান্তি লাভ করবে।

তারই সত্যতা যাচাইয়ের জন্য বুকে ক্রশ এঁকে হাঁটু মুড়ে বসলেন। কাবেরী থ'। সাহেবকে সে জীবনে কখনো এমন ভাবে ভেঙে পড়তে দেখেনি। এক উদ্ধত পুরুষকারের ইমেজ তার মনে গেঁথে গিয়েছিল। ওর মনে হত সাহেব তার কল্পলোকের মহানায়ক। তার জীবনে পরাজয় নেই।

দিনকয়েক পর মিঃ মরিসের সঙ্গে ওর গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকার। মিঃ মরিস বেশ রয়েসয়ে সময় নিয়ে ওর বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগ নিয়ে তদন্ত করছেন।

বললেন—মিঃ ব্যাবাকলউ। আপনি কোম্পানির জন্য অনেক কিছুই করেছেন। দ্য শেরগড় কোল কোম্পানি আপনার অবদান স্মরণে রাখবে। কিন্তু এটা কি করলেন?

—কোনটার কথা বলছেন?

—এই পানমোহরার কথা।

—ওটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।

—কিন্তু দ্য শেরগড় কোল কোম্পানির নামে লীজ বন্দোবস্ত নেবার প্রস্তাবনা করে নিজের নামে করে নিলেন সেটা কি বিশ্বাসভঙ্গ নয়?

—আদৌ যদি কোম্পানির নামে লীজ বন্দোবস্ত নেবার কোন নির্দেশ মিঃ হ্যামিলটন দিতেন তবে তাই হত।

—মিঃ হ্যামিলটন আপনাকে সে নির্দেশ দেননি?

—না।

—তাহলে আপনি কোন অধিকারে কোম্পানির যন্ত্রপাতি ও লোকজন ব্যবহার করে সেখানকার ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা ও পরে কোলিয়ারি খোলার কাজ করেছেন?

—আমি আমার নিজের ক্ষমতাবলেই বহু ক্ষেত্রে ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা চালিয়েছি ও নতুন কোলিয়ারি খুলেছি। প্রথমে আমার সেই পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু জমিদার এক লপ্তে বিশ হাজার টাকা সেলামী ও বছরে

লাখ টাকা রয়্যালটি দাবি করে বসল। যা দেওয়া কোম্পানির নিয়ম বহির্ভূত। কিন্তু প্রপার্টি অন্যের হাতে চলে যাবার আশঙ্কা ছিল বলেই নিজে নিয়েছি।

—আপনি এত টাকা পেলেন কোথায়?

—আমার স্ত্রীর কাছ থেকে। ওকে তো আপনি জানেন।

—থ্যাঙ্ক ইউ মিঃ ব্যারাকলউ! পরে দরকার হলে কথা বলবো।

॥ চোদ্দ ॥

মি আডামসন গভীর হতাশায় ডুবে গেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে বসেছে। দিনে দিনে তিথি ক্ষয়। তারপর মাস ক্ষয়। এভাবে দুটো মাস কেটে গেছে। যে কাবেরীকে উচ্ছেদ করার জন্য তার ভারতে আসা সে শিকড় চালিয়ে দিয়েছে ব্যারাকলউ সাহেবের হৃদয়ে। এবার তার সন্তানটি ভূমিষ্ঠ হলেই মূল ও কাণ্ডের নিবিড় যোগাযোগক্রিয়া সম্পন্ন হবে।

এই সময়ে তাঁর কাছে খবর আসে মিসেস ব্যারাকলউ খুব রেগে গেছেন। তাঁকে অপদার্থ অকর্মণ্য বলে ফিরে যাবার নির্দেশ দিয়েছেন।

খবর পেয়েই তো ওঁর মাথার টাক ঘামতে থাকে। ফাদার উইলিয়ামের কাছে ছুটে যান পরামর্শের জন্য। উনিও আসেন মুসকিল আসান করতে। খুব মিষ্টি মিষ্টি করে কাবেরীর কানের কাছে মন্ত্রপাঠ শুরু করেন: যার সারমর্ম—ভারতীয় রমণীরা ত্যাগ ও তিতিক্ষার প্রতীক। তারা ভালবাসার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে পারে। কাবেরীর ভালবাসা স্বর্গীয়। তাকে স্বার্থ-গন্ধহীন ও কালোত্তীর্ণ করতে হলে মহৎ ত্যাগের প্রয়োজন। মিঃ ব্যারাকলউ তার জন্যই একটার পর একটা বিপদে পড়ছেন, তার সব উন্নয়ন পরিকল্পনা বানচাল হতে বসেছে, ক্লাবে ও পার্টিতে অপমানিত হচ্ছেন। ইউরোপীয়ান সমাজে একা হয়ে পড়ছেন। কোম্পানির সঙ্গে চুক্তির মেয়াদও শেষ হয়ে যাবে।

কাবেরী তাঁদের মনের কথা জানে। তার মনটাও খচ্‌খচ্‌ করে। সাহেব তার জন্য বিব্রত হোক এটা সে চায় না। কিন্তু উনি অনুমতি না দিলে সে যাবে কোথায়? বলল—সাহেব অনুমতি দিলেই আমি চলে যাব।

—উনি যে তোমার কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাঁকে সেই বন্ধন থেকে

তুমিই মুক্ত করতে পার।

বেশ। সাহেবকে বলুন। তিনি যা বলবেন আমি তাই করব।

—ধন্যবাদ ম্যাডাম। মিঃ অ্যাডামসন এখন ওকে ম্যাডাম বলেই সম্বোধন করেন। ঠ্যাকায় পড়লে কি না হয়?

মিঃ শেফার্ড ইউরোপীয়ান ক্লাবটাকে বেশ জঁাকিয়ে তুলেছেন। প্রত্যেক শনি, রবিবার কিছু না কিছু অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। সাহেব, মেমরা তাতে আকৃষ্ট হন। তার চেয়েও বড় আকর্ষণ টিন এজেড গার্লদের নাচগান, বাজনা ও বয়ফ্রেণ্ড নিয়ে আমোদ-প্রমোদ। ওদের দাঁড়াবার একটা প্লাটফর্ম।

বয়স্ক সাহেবরা নিজেদের পদমর্যাদা ও স্বভাবের কারণে হুইস্কীর গ্লাস নিয়ে যখন চুমুক দেন ও তার যাবতীয় প্রভাব নিজের মধ্যেই পরিপাক করে আনন্দলাভ করেন তখন তরুণ-তরুণীরা ডানা মেলে উড়ে বেড়ায়।

সেদিন ছিল শনিবারের সন্ধ্যা। নাচে গানে বেশ জমজমাট। তবে গরমটা খুব বেশি। হলঘরে দশটা পাঙ্খাওলা অনবরত পাখা টানছে। তবু সাহেবদের গা বেয়ে গল্ গল্ করে ঘাম ঝরছে।

বেয়ারা, বাটলার, বয়, বাবুর্চি, খানসামারা অর্ডার সাপ্লাই করতে হিমসিম খাচ্ছে। অনবরত ঘোড়া ও ঘোড়ার গাড়ি দৌড়চ্ছে সাহেবদের আনাগোনার জন্য।

ক্রমশ বাইরের দাপাদাপি কম হল তো ভিতরের দাপাদাপি আরও জমকালো হয়ে উঠল। সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমশ জমাট হয়ে উঠল।

রাত বাড়ছে। নেশাও বাড়ছে!

এখন আর কারো চোখ সাদা নয়। কারো মন ফাঁকা নয়। সবাই বিভোর। অসংলগ্ন সংলাপ, বিকৃত কণ্ঠস্বর, জড়িত ভাষা, থমথমে মুখ, ঢুলুঢুলু চাউনী, টলটলে চলন। সাহেব মেমরা পরমানন্দে মাতোয়ারা।

একটা টেবিলকে কেন্দ্র করে চারটি টিন এজেড গার্লসের সঙ্গে টিউলিপ গ্লাসের পর গ্লাস মদ গিলছে। আলোচ্য বিষয় নতুন যৌবনের মাদকতাময় অভিজ্ঞতার রসালো বিবরণ ও অশ্লীল সেক্‌সস্টোরী। সেই সঙ্গে উৎকট হাসি। অন্য তিনটি মেয়ে নিজেদের মাত্রা ঠিক রেখেছে। কিন্তু টিউ-লিপের কোন মাত্রা নেই। ওর বাপের মতই মাত্রাছাড়া মদ খেয়ে নেশায় টোর। গরমে ঘাম ঝরছে। ভিতরটা যত আনচান করছে তত ও

বাইরের পোশাক খুলে ফেলছে। অবশেষে একটি জাঙ্গিয়া ও ব্রেসারীতে ঠেকেছে। তার দিকে যত পুরুষের আবিল দৃষ্টি পড়েছে। তাতে ওর ভ্রূক্ষেপ নেই। উচ্চকণ্ঠে গালি দিচ্ছে ওর বয়ফ্রেণ্ডদের।

কাছাকাছি একটা টেবিলে মিঃ ট্রুম্যান তার বন্ধুদের সঙ্গে মদ খাচ্ছিলেন। টিউলিপের সঙ্গে কথা বলেননি। সেইজন্যই যে ও ক্ষেপে গেছে। তার অবহেলা ভুলতে মদে ডুবে গেছে তা উনি বোঝেননি। এখন ওর উন্মাদের মতো আচরণ ও তার নাম ধরে গালমন্দ শুনে বড় মমতা বোধ করলেন। আহা! বেচারী মেয়েটা আজ বড় মাতাল হয়ে গেছে। ওকে একটু শান্ত করা দরকার। যতই হোক পুরনো বান্ধবী।

নিজের চেয়ার ছেড়ে উঠে গিয়ে বললেন,—হ্যাল্লো টিউলিপ! তুমি আজ বড্ড বেশি নেশা করে ফেলেছ। চল বাড়ি পৌঁছে দিই!

টিউলিপ যেন ক্ষেপে গেল। তড়াক করে দাঁড়িয়ে তর্জনী তুলে তীব্র কণ্ঠে বলল—ব্লাডি ট্রুম্যান! ইউ আর কাওয়ার্ড!

কাওয়ার্ড শব্দটা ইংরেজদের কাছে খুব খারাপ গাল। ইংরেজ কেন যে কোন পুরুষেব কাছেই কাপুরুষ খারাপ কথা। পুরুষের পৌরুষের উপর চরম আঘাত। মিঃ ট্রুম্যান দারুণ বিস্মিত। ওদের বন্ধুরাও হতচকিত পাশাপাশি টেবিলের সাহেব মেমদের দৃষ্টি তাদের দিকে।

—মিঃ ট্রুম্যান বললেন—টিউলিপ, তুমি আমাকে কাওয়ার্ড বললে?

—হ্যাঁ, বললাম! আবার বলছি—কাওয়ার্ড! কাওয়ার্ড!!

মিঃ ট্রুম্যানের বুকটা জ্বলে গেল। কঠোরভাবে বললেন—কিন্তু কেন কাওয়ার্ড বলেছ?

—বলব না? তুমি বলেছিলে তোমার জন্যে ডুয়েল লড়ব। কোথায় তোমার ডুয়েল? যতসব ইণ্ডিয়ান ট্রাইবেল ওম্যানদের সেক্সে ডুবে গিয়ে তুমি তোমার ইউরোপীয়ান আভিজাত্য পর্যন্ত ভুলে গেছ। কাওয়ার্ড! কুলাঙ্গার! বেইমান!!

চারিদিক থেকে হাত-তালি পড়তে শুরু হল। মিঃ ট্রুম্যানে থ' হয়ে দাঁড়িয়ে। টিউলিপ ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। ঘন ঘন শ্বাস নিচ্ছে। বুকটা হাপরের মতো ওঠা-নামা করছে।

মিঃ শেফার্ড পিছন দিক থেকে এসে মিঃ ট্রুম্যানের কাঁধে হাত রাখলেন। মৃদুকণ্ঠে বললেন—টিউলিপ ইয়ং গার্ল। টু টিনী! জানি তোমার সেন্টিমেন্টে খুব লেগেছে। তবু মনে হয় ও মিথ্যা বলেনি।

টিউলিপের বন্ধুরা বলল—ইয়েস আংকল, মিঃ ট্রুম্যান একদিন শপথ করে বলেছিলেন,—তোমার জন্য আমি ডুয়েল লড়ব।

উনি বললেন—তা যদি তুমি বলেছ তবে সেকথা থেকে সরে যাওয়া উচিৎ হয়নি মিঃ ট্রুম্যান।

—আমি সরে যাইনি মাই বস। ওর মা সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে।

—তুমি রাজি আছ ?

—ইয়েস।

—এসো আমার সঙ্গে ড্যান্স ফ্লোবে দাঁড়াও। এখানে সোসাইটির মুখপাত্ররা আছেন। ইয়ং জেনারেশনের যুবক-যুবতীরা আছেন। তাদের সামনে ঘোষণা কর। টিউলিপের মা জয়ীর সম্মান দিতে নিশ্চয় রাজী হবেন।

মি ট্রুম্যান ও টিউলিপের বন্ধুবা সহর্ষে অভিনন্দন জানাল সেই প্রস্তাবকে।

মিঃ শেফার্ড ওঁকে হাত ধরে ড্যান্স ফ্লোরে নিয়ে গেলেন। মিঃ ট্রুম্যান সকলকে বাউ কবে বললেন—লেডিজ এণ্ড জেণ্টস্! মিস্ টিউলিপ নর্টনকে আমি ভালবাসি। তাব জন্য যে কোন যুবকের সঙ্গে ডুয়েল লড়তে রাজি। যদি কোন প্রতিদ্বন্দ্বী থাকেন তবে তাকে ডুয়েলে আহ্বান জানাচ্ছি।

সাবা হল হাত-তালিতে ফেটে পড়ল। চাবদিক থেকে এন্‌কোর এন্‌কোর শব্দ ধ্বনিত হল। মিঃ ট্রুম্যানের বন্ধুরা হিফ্-হিফ্ হুরবে বলে চিৎকার কবে উঠলেন। সেই সঙ্গে গলা মেলাল টিউলিপের বন্ধুবা।

একটু পব মিঃ ডিকসন উঠলেন ড্যান্স-ফ্লোরে। বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করলেন—আমি মিঃ ট্রুম্যানের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলাম।

আবার করতালি ধ্বনি। আবার সহর্ষ অভিনন্দন।

মিঃ শেফার্ড ঘোষণা করলেন—আগামী শনিবার বিকেল চাবটেয় মিঃ ট্রুম্যান ও মিঃ ডিকসনেব দ্বৈত সমর অনুষ্ঠিত হবে। সমস্ত ইউবোপীয়ানকে আমন্ত্রণ জানান হচ্ছে।

বিপুল করতালি ও হর্ষধ্বনিতে হল ফেটে পড়ল।

তখন সাহেব কোঠির বাগানে বসে একাই মদ খাচ্ছিলেন মিঃ ব্যরাকলউ। কাবেরী ওঁর কাছেই বসেছিল। রাত বাড়ছে দেখে ভিতরে গেছে। মিঃ আডামসন এসে বললেন—স্যার। যদি অনুমতি দেন তবে বিলেতে ফিরে যাব।

—আপনি কি আমার অনুমতি নিয়ে এসেছেন যে ফিরে যাবার অনুমতি চাইছেন ?

মিঃ ব্যারাকলউ যে ওকে ভালো চোখে দেখেন না তা ওঁর অজানা নয়। তবু একটা সৌজন্য। উত্তর শুনে বড় দুঃখিত হলেন। বললেন—স্যার, আমার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে গেছে। না জানি ম্যাডাম কি বলবেন ?

মিঃ ব্যারাকলউ দুঃখ প্রকাশ করে বললেন—বলুন আপনাকে কি সাহায্য করতে পারি ?

—স্যার। আপনার হাতেই তো আমার জিয়ন-কাঠি। ভেবে দেখুন শুধুমাত্র আবেগ ও সেন্টিমেণ্টের বশবর্তী হয়ে কি এতবড় কোলিয়ারি গড়ে তোলা সম্ভব ?

—সেন্টিমেণ্টটা আমার চেয়ে আপনার ম্যাডামের বেশি মনে হচ্ছে না ?

তা ঠিক। তবে তিনি আপনাকে এত ভালবাসেন যে তার মধ্যে কোন অংশীদার সহ্য করতে পারছেন না। তাঁর নারীত্ব বিপন্ন বলে মনে করছেন।

—আমিও তো আমার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের দায়ে পড়ছি।

—স্যার! উনি যদি স্বেচ্ছায় কোন পুনর্বাসন মেনে নেন তবে তো আপনার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের প্রশ্ন উঠছে না।

—কিন্তু এমন নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে যাবে কেন ?

—উনি যাবেন স্যার।

মিঃ ব্যারাকলউ চমকে উঠলেন। বললেন—সেকি! উনি যাবেন একথা আপনি কি করে জানলেন ? একটা অন্তঃসত্ত্বা হিন্দুমেয়ে কোন যুক্তিতে আশ্রয় ছেড়ে যাবে ?

—উনি সরে যেতে রাজি। আমি হলফ করে বলছি।

—ওঃ। আপনারা তাহলে ওর সরল মনে বিষ ঢুকিয়েছেন ?

—না স্যার। আমাকে ভুল বুঝবেন না। আপনার অমঙ্গল হবে এমন কাজ আমি মরে গেলেও করব না। তবু যা কিছু দোষ-ত্রুটি দেখছেন তার জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন স্যার।

সেই রাত্রে কোচোয়ান ইরফান আলি ওঁকে সীতারামপুর স্টেশনে ট্রেনে চড়িয়ে দিয়ে এল। তাঁর বুকজোড়া ব্যর্থতার দুঃখ। তবু মিঃ ব্যারাকলউয়ের প্রতি খুব একটা অপ্রসন্ন হতে পারছেন না। কারণ তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তা

ও কর্মতৎপরতা তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। ম্যাডামের কাছে সাত ঝুড়ি লাগান-ভাঙান করে তাঁব কান ভারী কববেন না বলে মনে মনে স্থিব করলেন।

॥ পনের ॥

রাসমণিব বুকে খরাব হাহাকার। সিদাবাড়ি ছাড়বার জন্য তার প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। একদিন এই ধাওড়াতে দেড়, দুশো কুলি কামিনের সরদাবনী ছিল। আজ সব হাবিয়ে ফতুব। মেয়ে জামাইয়ের মৃত্যু বুকে শেল বিঁধে দিয়েছে। এখন এখানে শুধু স্মৃতিব দংশন। ভাঙা ঘবৰাড়ি প্রেতসম ভ্রূকুটি।

একদিন ভবতপুরে মিশিববাবুব বাসায় গিয়ে হাজিব হল। ওঁর তখন বাতেব বেদনাটা চাগিয়ে উঠেছে। মদনেব বড় ছেলে জয়গোপাল তাব কোমবে তেল মালিশ কবছে। সে এখন বেশ জোয়ান হয়ে গেছে।

বাসমণি যতবাব আসে এই দৃশ্যটিই তার চোখে পড়ে। কারণ সকাল থেকেই দৌড় ঝাঁপ কবে দুপুবে বাসায় ফিবেই উনি তক্তাব উপর শুয়ে পড়েন।

রাসমণি বলল—বাবু! আমাব একটি গতি কবে'দে। সিদাবাড়িতে আর রইতে লাবছি।

উনি বললেন—কি কোববি বে বাসমণি? দুসবা কোথায় যাবি?

—যেখেনে বলবি।

—থোড়েই হামার জমিদারী আছে রে?

—তুকে বাপ বলেছি। যদি কুছু গতি করতে পাবিস ত কব। না হলে আমি গলায় দড়ি লিঞে মরব।

—নহী নহী? অমন বাৎ বলিস না। কাল বিহানে তু সাহেব কোঠীতে চলিয়ে আসিস। হামি ভি যাবো, সাহেবকে এক বাৎ পুছিয়ে লিবো।

রাসমণি সেদিনেব মত বিদায় নিল।

মনসারাম ভোরবেলাতেই সাহেব কোঠীর বাগানে ঢুকে এক কোঁচড় ফুল তুলেছে। তারপর চুপি চুপি পালিয়ে যাবার সময় চাপরাশীর হাতে

ধরা পড়ে গেছে। চাপরাশীটি নতুন। সে জানে না ওর পরিচয়! পুরনো নোকর, চাকর চাপরাশীরা ওকে করুণা করে। কিন্তু নতুন লোক কি জানবে?

সে ওকে দু'চড় দিয়ে শাসাচ্ছে—শ্যালা? তোরা বাপকা বাগিচা হ্যায়?

মনসারাম সেই বয়সেই জেনে গেছে তার জন্মদাতা পিতা কে? চড় খেয়ে তারও মাথা গরম। বল্লে বসল—জরুর। এটা আমার বাপের বাগান।

চাপরাশী তো অবাক।

কাবেরী সেই সময় বাগানের দিকে আসছিল। চাপরাশী ওকে টানতে টানতে তার কাছে নিয়ে এসে বলল—দেখিয়ে তো মেমসাব ইয়ে কালকো বাচ্চা ক্যায়সা বাৎ করতাটে।

কাবেরী সব শুনে একটু হাসল। চাপরাশীকে বলল—তুমি যাও। ও ঠিক কথাই বলেছে। চাপরাশী চলে গেল।

মনসারাম বলল—আন্টি! চাপরাশী আমাকে চড় মেরেছে।

—ও তোকে চেনে না রে! কিন্তু তুই কেন চোরের মত ঢুকেছিস?

—আমি কি জানি? মনসারামের চোখ দুটো ফ্যাল ফ্যাল করে উঠল।

মানুষ স্নেহের কাঙাল। একটু ছোঁয়া পেলেই ন্যাওটা হয়ে যায়। এই মনসারাম স্বভাবে দুরন্ত। কিন্তু কাবেরীর কাছে এলেই শান্তশিষ্ট। সে ওকে করুণা করে। রাগিনী মারা যাবার পর থেকে ও যেন সকলেরই করুণার পাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। জারজ সন্তানের যে পিতৃধনের অধিকার নেই সে বোধ ওর নেই।

কাবেরী তরলাকে ডাক দিয়ে বলল—মনসাকে খাবার দে তরলা।

খাবার লোভে ও রসুইখানার দিকে ছুটল।

বাগানের শিশুগাছে একটি মালতী লতার দোলনা। কাবেরী তাতে পা দুলিয়ে বসল। এমন সময় মিশিরজীর পেছনে রাসমণি এসে হাজির।

মিশিরজী তো সীতাদেবী, পঞ্চবটীরবন ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগে সংলাপ বলে ওর মন ভিজিয়ে দিলেন। বললেন—সাহেবের সাথে থোড়া মোলাকাৎ কোরতে আসিয়েছি।

কাবেরী রাসমণিকে চেনে। ওর দুঃখের কথাও জানে। সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দিল।

সাহেব রাসমণির সমস্যা শুনে বললেন—বছরখানেক কষ্ট করে থাক। আমার পানমোহরায় রেজিং শুরু হলেই তোকে আবার সরদারনী বানিয়ে দেবো।

রাসমণি বলল—সিদাবাড়িতে থাকলে আমি এবছরে বাঁচব নাই সাহেব। আমার লেগে যদি কুছু করবি তো অখনি কর।

মিশিরবাবু বললেন—হুজুর। উয়ারা তো বৈঠে খাবেক নাই। কুলি কামিন যো ভি কাম দিবেন কোরবে। থোড়া জায়গা দিবেন ঘর বানায়ে থাকবে।

—বেশ তবে পানমোহরায় যা।

রাসমণি বলল—হুঁ সায়েব। আমি উইখানেই চলে যাব।

মিশিরজী বললেন—হুজুব। পানমোহরায় হামার লিয়ে কুছ কোরবেন তো ?

—ঠিকাদারী করতে পারবে ?

—জরুর পারবো হুজুর। বাতের বেদনা ভুলে সোজা হয়ে সেলাম দিলেন।

—ঠিক আছে। আসবে একদিন পানমোহরায়।

প্রাপ্তির আশা বুকে নিয়ে ওরা চলে গেল।

অনেকদিন পর ব্যারাকলউ সাহেব ছয় নম্বব ইনক্লাইনে এলেন। দাঙ্গা ফৌজদারী, দুর্ঘটনা, মৃত্যু কত কী ঘটনা ঘটে গেছে এই খাদটাকে কেন্দ্র করে অথচ তার কথা যেন মনেই নেই। চম্পককুমার মারা যাবার পর সেটা যে কী করে চলছে তার খবর উনি রাখতেন না। মিশিরবাবু একদিন বলেছিলেন—ওটা এখন পিয়ারীলাল চালাচ্ছে। সেই জমিদাব-বাবুকে হিসেব নিকেশ দেয়। কাজকর্ম করায়। ঠিকাদারী বরখাস্তের নোটিশ কার্যকরী হয়নি, গিয়ে দেখলেন একটি নতুন মুখ। বেশ তাজা ঝকঝকে ছোকরা ডিপোতে দাঁড়িয়ে আছেন। উনি ঘোড়া থেকে নামতেই কাছে এসে গুডমর্ণিং করলেন। নিজের পরিচয় দিলেন—আমি চঞ্চল, মিঃ রায়ের মেজো ছেলে।

—তাই নাকি ? তুমি কখন থেকে এসেছো ?

—এই কিছুদিন হল।

তারপর কাজকর্মের খবরাখবর নিয়ে উনি বললেন—বেশ বেশ কাজ করে যাও। তা আমার সঙ্গে দেখা করনি কেন ?

চঞ্চলকুমার একটু হেসে বললেন—আপনার কাছে যেতে কেমন নার্ভাস ফিল করছিলাম স্যার। ভাবতেই পারি নি যে এত সহজভাবে কথা বলবেন।

—আই সি ! উনি হো হো করে হাসলেন। বললেন—তোমার দাদা আমাকে ভুল বুঝতো। তোমার বাবাও ভুল বুঝেছেন। কিন্তু আমি খুব সহজ সরল ভাবেই কাজ করতে চাই। ও'কে চিয়ার উ—

উনি আবার ঘোড়ায় চড়ে চলে গেলেন।

জয় গোপাল শুধু জোয়ান হয়নি বহুত চলতা পুরজাও হয়েছে। বাপের গুণ তো এক আধটু পেতে হবে। ওর বাপও তো চলতা পুরজা ছিল। তার নজরটা নিচু ছিল বলে কিছু করতে পারে নি। জয়গোপাল সেদিক দিয়ে বিশ্বস্ত। মিশিরজীর শরীর আর আগের মত নেই। প্রায়ই শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। সেজন্য তার সেবা শুশ্রূষা থেকে শুরু করে ব্যবসার কাজকর্মও দেখা শোনা করে।

কোলিয়ারিতে কুলিকামিন যোগান দেওয়া তো নিত্যদিনের কাজ। তার সঙ্গে আছে সুদের কারবার। এখন সে মুখে মুখে বলে দিতে পারে কার কাছে কত দেনা পড়ে আছে, কত সুদ, কত আসল, কবে দেবার দিন, কার কার কাছে তাগাদা পাঠাতে হবে। কাকে কাকে ধোলাই করতে হবে। কার টাকা পে কাউণ্টারে বাবুকে বলে কাটাতে হবে।

টাকা পয়সার ব্যাপারে দেশোয়ালী ভাইদের উপর মিশিরজীর বিশ্বাস কম। কিন্তু জয়গোপালের উপর ষোল আনা বিশ্বাস। সাহেবের কাছে পানমোহরায় নতুন কাজ পাওয়ার আশা পেয়ে উনি জয়গোপালের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। সেও সায় দিল যে নতুন জায়গায় ঠিকাদারী পেলে ভবিষ্যতে আরো কাজ বাড়াবার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। এ সুযোগ ছাড়া চলে না।

তাই তড়িঘড়ি সেখানে একটা আস্তানা গাড়বার ব্যবস্থা করতে দুজনেই তৎপর হয়ে উঠল।

সিদাবাড়ির সাঁওতাল পাড়ায় দুটি গরুগাড়ি দাঁড়িয়ে। তার একটি

বাসমণির নিজস্ব। অন্যটি তার কোন জাতভাইয়ের। ছেলে বুড়ো মেয়ে সবদ মিলে সেখানে একটি ছোটখাট ভিড়। রাসমণি আজ চলে যাচ্ছে।

তার ঘরের মড়কচা ভেঙে কাঁইচি, বর্গা, মুছুন, কাঠ, বাঁশ যত্ন করে একটা গাড়িতে চড়িয়েছে। অন্যটিতে একটি ঢেঁকি তার দুটি পায়া, পাথরের গড়, দুটি পাথরের দন্, শাবল, গাঁইতি, কোদাল, কুড়ুল, হাল, হালের বোঁটা, ফাল, ইস, মই, শিকল, দড়ি ইত্যাদির একটা অংশ। তাছাড়া আছে চাল, কলাই, হাঁড়ি-কুঁড়ি, থালা বাটি, বাসন, শিল নোড়া কত কী।

পনের বছরের ঘরকন্না। রীতিমত সরদারনীর কাজ করেছে। যখন যেমন প্রয়োজন হয়েছে কিনেছে। যা বিক্রি করতে গেলে হয়তো দাম পাবে না কিন্তু নিত্যদিনের সংসারে অপরিহার্য !

আরো আছে কিছু পশু পাখী। যেমন এক ঝাঁক মুরগী, দুটি কুকুর, বাচ্চা মিলিয়ে সাত আটটি শুয়োর, একটি গাই, দুটি বকন বাছুর, তিনটি ছাগল। এতসব নিয়ে যাওয়া সোজা কথা নয়! দুটি গরু গাড়িতে সব মাল ধরল না। আরেকটার দরকার।

মাহা মাঝির এখন চলতির সময়। ছাতা বড়ায় থাকে। সেও এসেছে। বলল—আমার গরুগাড়িটি লে, তবে।

রাসমণি বলল—হুঁ। সেত দিবিই। তুঁই আমাকে কুলার হাওয়া দিঞে তাড়াতে পারলেই বাঁচিস।

—ঐ ত! তুই মরে যাবি তবু দিমাক যাবেক নাই।

রাসমণি হাসল। বলল—সেইটি বুঝলি ত। আগে যদি বুঝতিস এমন করে দুষমণি না করতিস তবে বিটি জামাইয়ের মরণ দেখতে হত নাই। ঈ বারে তুই ভিটা আগুল। দেখব কত সুখে থাকিস।

বুধনা বলল—আঃ থামত। ঈ সময়ে ঝগড়া ঝাঁটি ভালো লাগেনা। যা, মাহা তোর গাড়িটি এনে দে।

মাহা একটা ছেলেকে পাঠিয়ে দিল ওর গরুগাড়িটা আনতে। কোঁচড় থেকে বিড়ি দেশলাই বের করে বুধনা ও রাসমণিকে একটি করে দিল। নিজেও একটি নিল। তিনজনে বিড়ি ধরিয়ে টানতে লাগল।

মাহা বলল—তুঁই যে তলে তলে সিদাবাড়ি ছাড়বার মতলব করেছিস এই কথাটি ত জানতাম নাই। যখন ঘরটি ভেঙে দিলি তখন জানলাম। মনে করছিস মাহার বাড়া সুখ হঞেছে। কিন্তুক তা লয়রে রাসমণি।

তুষমণি যেটি করেছি তা তুর দিমাক ভাঙতে। সেটি লেখ্য। তুইএঞই জিতে গেলি।

—তবু ভাল যে শেষকালে মনের কথাটি বললি।

—টুকতুন পাউরা খাবি রাসমণি? শেষ দিনটিতে পুরানো কথা ভুলে আয় টুকতুন পাউরা (বোতলের মদ) খাই!

মাহার কণ্ঠস্বরে মিনতি ঝরে পড়ল। এবার সেও বুঝেছে রাসমণির চলে যাওয়া মানে তাদের মাথার উপরে ছায়াদায়িনী গাছটিরও পাতা ঝরে যাওয়া। আর যাইহোক তিন চারটি সাঁওতাল পাড়ায় রাসমণির খাতির এখনো কম নেই। সে যদি পানমোহরায় গিয়ে নতুন ভাবে সরদারী পায় এবং এদেরকে ডাক দেয় তবে সব হুড় হুড় করে চলে যাবে। তাছাড়া বিপদে আপদে সেই তো দাঁড়াতো। সাহেব সুবো বাবু গোমস্তার সঙ্গে তারই খাতির।

অতঃপর যাবার দিনটা হাঁড়ি পাউরা খাইয়ে মনটাকে নরম করতে দোষ কী? বুকভরা অভিমান নিয়ে তো যাচ্ছে। তবু একটু সান্ত্বনা।

তিনটি গরুগাড়ির পিছনে জীবজন্তুর মিছিল নিয়ে লাল ধূলোর ডহরে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে বুধনা, রাসমণি ও তাদের মেজো মেয়েটি। ছোট মেয়েটি নিতান্ত শিশু। হেঁটে যেতে পারবে না বলে গরুগাড়িতে চড়িয়ে দিয়েছে।

বুধনার কাঁধে একটি বাঁক। দু-দিকে শিকায় ঝোলানো জিনিসপত্র। রাসমণির মাথায় পুঁটুলি। গরুছাগলগুলি দড়ি দিয়ে শিকলের মত বাঁধা। কুকুর দুটির প্রহরায় শুয়োরের পাল।

যুগ থেকে যুগান্তরে ওরা এমনি করেই হাঁটে। সেই চৈ চম্পা হাজারিবাগ থেকে দুমকা, গোড্ডা, দামিনী কো। হুলমালের বছর পৌঁছাল পাঞ্চেত পাহাড়ে। সেখান থেকে ডিসেরগড়ের ঘাট হয়ে সিদাবাড়ি। সুখে দুঃখে, প্রণয়ে রণে, মদে রক্তে, আদি পাপে জর্জরিত জীবনের জ্বালা মেটাতে আবার ওরা পথে নেমেছে। এবার যাবে পানমোহরা। ব্যারাকলউ সাহেবের নূতন কোলিয়ারি। সেখানে তারা নূতন করে সংসার পাতবে। আবার সরদারী পাবে। আবার সেই কুলিকামিন. হাঁড়ি পাউরা টাকা কড়ি, গয়না শাড়ি. গামছা টুকুরী, চপ পকুড়ির খোয়াব।

হে মারাং বোঙা—ওদের যাত্রাপথ শুভ কর।

॥ ষোল ॥

মিঃ ব্যারাকলউয়েব মন বড় ভারাক্রান্ত। মিঃ মরিস তার তদন্ত .শেরে চলে গেছেন। বোর্ড অফ ডাইরেক্টার্সের কাছে তার নামে দুর্নীতি ও বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগ নিয়ে তদন্তের ফলাফল পেশ কববেন।

অর্থকষ্টও দেখা দিয়েছে। মিসেস ব্যারাকলউ টাকা পাঠানো বন্ধ করে দিয়েছে। কাজেই নিতান্ত আবশ্যিক ষ্টোব ম্যাটিরিয়েল কেনা মুস্কিল হয়ে গেছে। কুলিকামিনদের ঠিকমত পেমেণ্ট দিতে পারছেন না।

আবার কাবেরীর দেহগত পরিবর্তন চোখে পড়ার মত। যা অনিবার্য তা তো ঘটবেই। দুর্ভাবনারা তো এই সময়টির জন্যই অপেক্ষা করে থাকে। সাহেবের তাই অটল গাম্ভীর্য। সবাই তটস্থ। এমনিতেই তো বাঘের মত ভয় করত এখন তাতে নূতন মাত্রা যোগ হয়েছে। তারজন্য বিবি বাথান শুদ্ধ কম্পমান।

ঢালুদাস ফিস্ ফিস্ করে ছলনাকে বলে—মনসাকে সাবধানে রাখিস্। হুট হাট সাহেব কুঠীতে ঢুকে যায়। কুন্দিন যদি সাহেবের নজরে পড়ে তবে এক লাথিতে বিবি বাথানে পাঠাঞে দিবেক।

ছলনা চাপা কণ্ঠে ঝঙ্কার দেয়—আঃ। পিশাচ একটি। রাগিনী যাই হোক্ গা। ছেলেটি ত সাহেব খালভরা আজ্ঞাঞেছে। তার এমন করবেক ক্যেনে?

—আরে অমন দেদার বেহুদা ছ্যেলা হাটালে বিটালে বেড়াচ্ছে। তাদেদিকে কি ব্যাটা বলে কোলে লিবেক রে? অমন যে রূপসী, গুণবতী কাবেরী মেমসাহেব তার মুখ শুকাঞে আমসী। কখন যে সাহেব বলে দিবেক—তুই আপনার রাস্তা ছাখ গা সেই ভয়েই খাপ্‌চি খেছে।

—ঈ বাব্বাঃ। উয়াকেও তেড়ে দিবেক নাকি?

এ যেন সেই শুকসারীর কথোপকথন। সাহেব কোঠীর গম্ভীর বাতাবরণ বিবি বাথানের নিত্য কোলাহলময়, কলহ চঞ্চল জীবনেও রেখাপাত করে।

মনসারাম অত কথা বোঝে না। তার স্বভাবেরও পরিবর্তন হয় নি। ফাঁক পেলেই ফুল চুরি করে। সেদিনও যখন দারোয়ান মালির চোখকে

ফাঁকি দিয়ে মেহেদী গাছের বেড়ার ফাঁক দিয়ে টুক্ করে ঢুকে পড়ে তখনই তা মিঃ ব্যারাকলউয়ের নজরে পড়ে যায়।

ছেলেটা কি করে তাই দেখার জন্য উনি পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন। তাঁর পরনে ড্রেসিং গাউন, মুখে চুরুট। দাঁড়িয়েছেন মনসারামের ঠিক পিছনে। পায়ের সাড়া পেয়ে ও ব্যাচারী যেমনি ঘুরেছে অমনি একেবারে সামনা সামনি। তার পরনে একটি মলিন জীর্ণ হাফ পেণ্ট। খালি গা। একমাথা কোঁকড়া সোনালী চুল। দুটি বড় বড় চোখের নীল তারা। গলায় ঝুলছে সুতোয় বাঁধা যীশাস ক্রাইষ্টের ক্রুশ বিদ্ধ ছবির একটি ফলক। তার দু'হাত ভরা ফুল। ভয়ে, বিস্ময়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে জন্মদাতা পিতার দিকে। চোখ দুটো ছল্ ছল্ করে টপ্ টপ্ অশ্রু ঝরে পড়ল হাতের ফুলগুলোর উপর। হাত দুটোও ধীরে ধীরে আল্‌গা হয়ে পড়ল। অশ্রুভেজা ফুলগুলি দুই মুঠির ফাঁক দিয়ে গলে পড়ল মিঃ ব্যারাকলউয়ের পায়ে—উপনিষদের যুগে পিতৃ বন্দনার ভঙ্গিতে।

সাহেব এতক্ষণ পরম কৌতুকে তার ভাবভঙ্গি দেখছিলেন। ফুলগুলো পড়ে যেতে দেখেই বিস্ময়সূচক শব্দ করলেন- আঃ।

মনসারাম শুনল বাঘের গর্জন। সে বিদ্যুৎ বেগে ছুটল। উনি তখন মালি, চাপরাশীকে ডাক দিয়ে বললেন – আরে আরে বাচ্চাটাকে ধর।

মালি ওর ছুটন্ত দেহটাকে গোল কীপারের বল ধরার মত করে ধরে ফেলল। টানতে টানতে কাছে নিয়ে এল। বারান্দায় দাঁড়িয়ে কাবেরী তা দেখতে পেয়ে ছুটে এল ভয়ে ও বিস্ময়ে। সাহেবের কোপে না ব্যাচারী মার খেয়ে মরে যায় তা সামাল দিতে।

সেই ছেলের লিগ্যাল ফাদার ঢালু দাস। ছেলে যে ফুল চুরি করতে এসে সাহেবের হাতেই ধরা পড়ে গেছে এই খবর পেয়ে ছুটে এসেছে।

মনসারাম ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। হাত দিয়ে চোখ কচ্‌লাচ্ছে।

সাহেব বললেন—ঢালু দাস!

ঢালু দাস তৎক্ষণাৎ মনসারামের গালে চড় বসিয়ে বলল—স্যালা বেজন্মা। চুহার কি বাচ্চা। চোরী করনে আয়া।

সাহেব গর্জন করে উঠলেন—এ্যাই চোপ! ব্লাডি ঘু ঘু-কাকে তুই চুহাড়ের বাচ্চা বলছিস? হি ইজ মাই প্রোডাক্ট। তাও জানিস না। ননসেন্স।

এবার বাপ ব্যাটা দুজনে আসামী। আয়া, মালি, সহিস, কচোয়ান ভয়ে কম্পমান।

হঠাৎ কাবেরী বলে উঠল—ক্ষমা কর সাহেব। এইটুকু মা মরা ছেলে। ওর মরা মায়ের কথা স্মরণ করে এবারের মত ওকে ছেড়ে দাও।

সাহেব বললেন—তবলা! একে স্নান করিয়ে নূতন জ্যামা প্যান্ট পরিয়ে আমার কাছে হাজির করবি। সাহেব চলে গেলেন। সবাই মুখ চাওয়া চাওয়ি করল।

সাহেবকে চিনতে ওদের দেরি আছে। অথবা তিনি নিজেই নিজেকে চিনতেন না। তার মধ্যেও যে এইসব জারজ সন্তানদের প্রতি স্নেহ মমতা আছে এটা উনিও জানতেন না। মনসারাম তার অবাক চোখের অশ্রুভেজা একমুঠো ফুল দিয়ে সেই বোধটা জাগিয়ে দিল। এখন উনি ভাবছেন—এই বিবি বাথান তাঁরই সৃষ্টি। মানুষ বড় হবার আকাঙ্ক্ষায়, যশ ও খ্যাতির লালসায় স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, দেবালয় প্রতিষ্ঠা করেন। আর উনি করেছেন বেশ্যাপল্লী। এ কি কাউর কামাক্ষ্যা হে!

এইসব ভাগ্যহীন সন্তান, হতভাগিনী রমণী, নির্যাতিত কুলি কামিন, বশংবদ চাকর বাকরের জন্য কিছু করার প্রয়োজন বোধ করলেন। কোম্পানির একটা জমিন্দারী ডিপার্টমেণ্ট আছে। তার এস্টেট ম্যানেজার মিঃ মিটার। একদা উকিল ছিলেন। কোম্পানির কোর্ট, কাছারী, জমিজমা ও বিষয় সম্পত্তির আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নিয়োজিত। মিঃ ব্যারাকলউ তাঁকে বললেন—দেখতে দেখতে অনেকগুলি আশ্রিত জুটে গেছে। আমি যখন চলে যাব তখন এদের কি হবে?

মিঃ মিটার বাঙালী কায়েত মিত্র। পেশা হিসেবে ওকালতিতে ব্যর্থ হয়ে এস্টেট ম্যানেজার। বললেন—কি আর হবে স্যার? ওরা সব পথের নুড়ি। পায়ে পায়ে গড়িয়ে যায়। আইন মোতাবেক কিছু পর্চা যদি দিয়েও দেন তবু কি তারা রাখতে পারবে? একদিন ধাওড়ার উপর ঘোড়সওয়ার মার্চ করলে রাতারাতি কে কোথায় পালাবে তার ঠিক ঠিকানা নেই।

সত্যিই তাই। ওরা সব পথের নুড়ি। একদিন ব্যারাকলউ সাহেবের পায়ে পায়ে এখানে এসে জুটেছে। উনি চলে গেলে অন্য কারো পায়ে

গড়াবে। যদি তাদের একটা শক্ত মাটিতে গাঁথা যায় তবু কি ভেসে বেড়াবে ?

বললেন—তা ঠিক। কিন্তু আমি চাই কিছু কিছু জমি ব্যবস্থা করে দেওয়া হোক। যে বসত বাটিতে বসে আছে তারও বিলি ব্যবস্থা হোক।

—কিন্তু মিঃ হ্যামিলটন যদি রাগ করেন।

—হ্যাং ইয়োর হ্যামিলটন। আজ সন্ধ্যায় পর্চার কাগজ তৈরি করে আনুন। রাসমণি যে জমিটা ভোগ করছিল সেটা তো ও ছেড়ে দিয়ে গেছে। ভালো হাঁসিল জমি। মনসারাম দাসের নামে করবেন। সব আমি সহি করে দেবো। এই কথা নিয়ে হ্যামিলটনের কাছে যাবেন না যেন।

....না স্যার। তা যাবো কেন ? আমি আপনার আণ্ডারের চাকর।

—থ্যাঙ্ক ইউ !

মিঃ মিটার চলে গেলেন। সন্ধ্যাকালে একটি আমিনবাবু সহ সাহেব কোঠীতে এসে চিনি, চামেলী, ছলনা, বঞ্চনা, ঢালু দাস, মনসারাম, ইরফান, আলী, মকবুল, হোসেন, হাঁড়িলাল, চারু মুচি প্রভৃতি তার একান্ত অনুগতদের নামে নামে পাঁচ বিঘে করে জমির বন্দোবস্ত করে দিলেন। যার যেটুকু বসতবাটি আছে তারও নকশা বানিয়ে পর্চা দিয়ে দিলেন। সাহেব সেসব কাগজে দস্তখৎ করে দিলেন।

মিঃ মিটার চলে গেলেন। কাবেরী বলল বড় ভালো কাজ করলে সাহেব। এইসব গরিব দুঃখীরা যতদিন বাঁচবে তোমার নাম নেবে।

তুমি তাহলে আমার কাজের প্রশংসা করছো ?

হ্যাঁ সাহেব!

আঃ। মাই সুইট ডারলিং! সাহেব খুশি হয়ে ওকে চুম্বন দিলেন।

।। সতের ।।

গত কয়েকদিন যাবৎ ইউরোপিয়ান সোসাইটির সংবাদ শিরোনামা ছিল মিস টিউলিপ নর্টনকে কেন্দ্র করে মিঃ ট্রুম্যান ও মিঃ ডিকসনের দ্বৈত সমর মিঃ ডিকসনের পরাজয়। চার্চে গিয়ে মিঃ ট্রুম্যান ও টিউলিপের বিবাহ মিসেস নর্টনের আশাভঙ্গ ও মিঃ ডিকসনের লজ্জায় আত্মগোপন।

মিঃ ব্যারাকলউ সে জগৎ থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন। খবর সবই আসে নিমন্ত্রণও আসে কিন্তু উনি যান না। ভাবেন তাঁর উপস্থিতিতে বুঝি ইউবে।পীয়ানদের আনন্দ স্ফূর্তিতে বাধার সৃষ্টি হবে। তাছাড়া মনটা বড় বিক্ষিপ্ত।

সেদিন ছিল ডিনাব পার্টি। মিঃ ট্রুম্যানের বাংলোতেই আয়োজন হয়েছে। মিঃ ব্যাবাকলউ যাবেন কিনা ভাবছিলেন হঠাৎ টিউলিপ ও মিঃ ট্রুম্যান এসে হাজিব। টিউলিপের ছেলেমানুষি আবদার আংকল, তোমাকে যেতেই হবে। তাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ ঠেলতে পারলেন না।

গভীর রাতে মদে টোর হয়ে ফিবলেন। কাবেরী তখন ঘুমিয়ে পড়েছিল। বড় মায়া ওব ঘুমন্ত মুখটায়। সাহেব সেদিকে তাকিয়ে কি ভাবলেন আস্তে আস্তে জামা কাপড় বাথরুমে ছেড়ে শুধু আণ্ডার ওয়ার পরে ওর সাধের সংগ্রহশালায় ঢুকলেন! আয়া খানসামা জেগে উঠেছিল। ওদেরকে চুপ করিয়ে দিলেন। শুয়ে পড়বাব আদেশ করলেন।

মোমের আলোতে চৌকো মত একটা পাথরের বুকে অঙ্কিত পাতার ছাপ দেখতে শুরু করলেন। সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে কয়লাস্তরের গঠনকালে গাছপালা ঝড়ে পড়ে নদ নদী দ্বাবা বাহিত হয়ে হ্রদ মোহানা ও জলাভূমিতে এসে পড়েছে। তাব ওপর পলি পড়েছে, বালি পড়েছে। ধরিত্রীর ক্রমাগত চাপে তাপে ও বাসায়নিক ক্রিয়ায় উদ্ভিদ পদার্থ হয়েছে কয়লা, পলি ও বালি হয়েছে পাথর। কয়লাস্তর ও পাথবের স্তরের মাঝে পাতাটি সেঁটে বসেছে। ছাপটি ফুটে উঠেছে। এরই নাম প্ল্যান্ট ফসিলস।

ভাবনার খুব গভীরে উনি ডুবে গেছেন।

মহাকালের রথচক্র দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। অপ্রতিরোধ্য তার যাত্রা। মানুষের কঙ্কাল কালক্রমে হয় ফসিল যদি তার উপযুক্ত বাতাবরণ থাকে। প্রত্নতাত্ত্বিকরা তো কত কঙ্কাল, করোটির ফসিল আবিষ্কাব করেছেন ও করছেন। কিন্তু সে তো দেহাবশেষ মাত্র।

কৃতী পুরুষরা তো চায় যে তাঁর দেহাবশেষটুকু ফসিল না হয়ে ইতিহাস হোক। কোন মহৎ কর্ম তাঁকে সে গৌরব ও প্রতিষ্ঠা দেবে?

উনি এত গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিলেন যে বুঝতেই পারেন নি কাবেরী তাঁব পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। মোমের আলোটা পুড়ে পুড়ে শেষ হচ্ছে।

কারেরী আলতো ওঁর পিঠে হাত দিয়ে বলল সাহেব! তোমার এত কষ্ট কেন সাহেব?

উনি একটা হাত বাড়িয়ে সস্নেহে ওর কোমর বেষ্টন করে বললেন তোমার ঘুম ভেঙে গেল ডার্লিং ?

—তুমি জেগে থাকলে আমি কি ঘুমাতে পারি সাহেব ?

—তুমি আমাকে কেন এত ভালবাসলে কাবেরী ?

—ভালবাসা কি একতরফা হয় সাহেব ?

—না তা হয় না। সেজন্যই আমার স্ত্রীর এত রাগ। তাঁর লাখ লাখ টাকার ব্যবসায় অংশীদার থাক কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু ভালবাসার অংশীদার সহ্য করবেন না।

—আমি জানি সাহেব। তুমি কেন এত কষ্ট পাচ্ছ তাও জানি। আমার জন্যে তোমার এতবড় কর্মযজ্ঞ পণ্ড হতে বসেছে। আমিই তোমার পথের বাধা।

মিঃ ব্যারাকলউ মোমের শিখায় একটি চুরুট ধরালেন। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন—আমি জানি ফাদার উইলিয়াম ও মিঃ আডমসন এসব বলে তোমার মগজটি শোধন করে দিয়েছেন। কিন্তু কেন তুমি জোর করে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চাও না। আমি তোমার কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তুমি তার সুযোগ নাও।

—না সাহেব। আমার ব্যক্তিগত সুখের জন্য তোমার এতবড় কর্মযজ্ঞ পণ্ড হতে দেবো না। তুমি আমাকে অনুমতি দাও সাহেব—আমি অন্য কোথাও চলে যাই। যেখানেই থাকি তোমারই মঙ্গল কামনা করব।

উনি বেশ কিছুক্ষণ টেবিলের উপর মাথা দিয়ে চুপচাপ বসে রইলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন—আমার জীবনটা কেমন ছিল জানো—যেমন একটা পাগলা ঘোড়া, কিসের যে তাড়না কে জানে ছুটে বেড়িয়েছি পাগলের মত। কখনো কর্মচঞ্চল, কখনো মদমত্ত, কখনো তীব্র রিরংসায় ব্যাকুল। তোমার সেবা, সাহায্যে ও ভালবাসায় আমি একটা নতুন জীবন পেয়েছিলাম। ধীরে ধীরে সব তাড়নার উপর কর্তৃত্ব করবার ক্ষমতা অর্জন করেছিলাম। আমার স্ত্রী তার মর্ম বুঝল না। আফশোষ!

এক দুর্দান্ত ইউরোপীয়ান সাহেব, যাঁর ঘোড়া দুরন্ত বেগে ছুটে যায় বাংলা বিহারের প্রান্তভূমিতে—অজয় দামোদরের অববাহিকায়, যার হাতের লক্ লকে চাবুক অবলীলায় বসে যায় বেয়াদব কুলিকামিন বাবু ভেইয়ার পিঠে—তিনি কত স্পষ্টভাবে নিজেকে মেলে ধরেছেন এক বারাঙ্গনা নর্তকীর

কাছে। তাঁর আর্তি ও বেদনার সেই অভিব্যক্তি দেখে কাবেরীর চোখ ফেটে জল বেরিয়ে পড়ল।

সাহেব ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—কাঁদছো কেন?

না না। কাঁদি নি তো! ও চোখ মুছল। বলল—তোমার মঙ্গলের জন্য আমি সব সইতে পারবো।

মন্মথ ঘোষের নিজস্ব একটা জগৎ আছে। উনি সারাক্ষণ সঙ্গীত সাধনা নিয়েই থাকেন। ব্যতিক্রম শুধু গঞ্জিকা সেবনে। এই একটি নেশার জন্য চাপরাশীদের সঙ্গে ওর ভাব ভালবাসা। সন্ধ্যা সকাল দু'ছিলিম না টানলে শরীরের ভার কাটে না। রাত্রে ঘুম হয় না। ভোরে পায়খানা হয় না।

চাপরাশীরাও ওকে খাতির করে। ওর গাওয়া রামধুনের সুরে পাগল হয়। উনি ঢোলকে চাঁটি মারলে বিবিবাথান হিলতে থাকে। উনি বেহালা বাজালে বিরহীর বুক ফেটে যায়। সাহেব কোঠীতে যখন কাবেরীকে রেওয়াজ করান তখন আড়ালে আবডালে দাঁড়িয়ে সব শোনে। কাবেরীর ডাকে ফিরে এসেছেন।

তিনি সেদিন সাত সকালে চাপরাশী ধাওড়ায় বসে গাঁজা টানছিলেন। হঠাৎ সাহেবের ডাক পেয়ে পিলে চমকে গেল। হন্তদন্ত হয়ে কাছে গিয়ে সেলাম করে দাঁড়ালেন। উনি বললেন—চলুন। একটা কাজে বেরুতে হবে।

ঘোড়া গাড়িতে নারকেল ছিবড়ের গদি আঁটা চেয়ারে সাহেবের পাশে কাবেরী। ইরফান আলী কচোয়ান। তার পিছনে বসে আছেন মন্মথ ঘোষ।

খোয়া ওঠা রাস্তার উপর ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দে গাড়ি চলছে। জি. টি. রোড পার হয়ে বরাকর নদের পাশে একটা ছোট টালির বাংলো। দেয়াল ঘেরা কম্পাউণ্ড। গেটের দুপাশে দুটি দেবদারু গাছ। পাতাগুলি চিক চিক করছে। মোরাম বিছানো পথে শতখানেক ফুট যাওয়ার পর বাংলোর সদর দরজা। পাশে বাঁধানো ইন্দারা। ছোট্ট ফুলের বাগান। সবুজ ঘাসে মোড়া লন।

গেটের মুখে ঘোড়াগাড়ি ঢুকতেই একজন দারোয়ান সেলাম দিল। সদর দরজায় একটি যুবতী। টালির বাংলোর ঝি কাম রাঁধুনী।

গাড়ি থেকে নেমে ভিতরে ঢুকলেন। তিনখানি বেডরুম। একটি বড় ড্রয়িংরুম। লম্বাটানা বারান্দা। রান্নাঘর স্নানঘর। পিছনে চাপরাশীদের কোয়ার্টার।

ড্রয়িংরুমে ফরাস পাতা। একখানি বেডরুম ফাঁকা একখানাতে সাধারণ চৌকি। অন্যটির পূর্বে ও দক্ষিণে জানালা। সাইজটাও বড়। সেগুণ কাঠের কারুকার্য করা ডবল বেডের পালঙ্ক। তার উপরে গদি এবং মখমলের চাদর। বড় বড় তাকিয়া। আলমারি, আয়না ও আল্‌না।

ঘুরে ঘুরে দেখতে দেখতে সাহেব বললেন—মিঃ ঘোষ! সঙ্গীত সাধনার জন্য এ পরিবেশটা কেমন?

—খুব ভালো স্যার।

বড় বেডরুমটায় পালঙ্কের উপর বসে কাবেরীকে জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার কেমন লাগছে কাবেরী?

—ভালো।

—বাড়িটা পছন্দ হয়েছে?

—হ্যাঁ।

—এটা তোমার নামে কিনেছি। নাম দিয়েছি কাবেরী কুটির।

—আমার নামে কেন?

—তোমাকে উপহার দেবো বলে। আরো আছে—সামনের ঐ দশ বিঘা জমিও তোমার। খুব ভাল ধান হয়। তরি তরকারী হয়।

—ও বাব্বাঃ।

—তোমার এখানে থাকতে কোন অসুবিধা হবে না তো?

এইবার কাবেরীর বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। এতক্ষণ ও কিছুই বোঝে নি। মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেল। জিজ্ঞাসা করল—এমন কথা বলছো কেন?

—গেটে দারোয়ান থাকবে। এই মেয়েটির নাম টুনী। খুব ভালো মেয়ে। আমি ওকে অনেকদিন আগে থেকে জানি। ঐ দারোয়ানের সঙ্গে মিল মহব্বৎ আছে। ওরা তোমার খুব অনুগত হবে।

কাবেরী স্তব্ধ হয়ে শুনছে। উনি বলে চলেছেন—কাছেই বরাকর বাজার। সামনে নদী। ঐ ছ্যাখ কল্যাণেশ্বরী পাহাড়। যখন খুশি বেড়াতে যাবে। স্বাধীনভাবে থাকবে। নিভৃতে সঙ্গীত সাধনা করবে। টাকাকড়ির দরকার হলে খাজাঞ্চীর কাছে দারোয়ান মারফৎ স্লিপ পাঠাবে।

যে কোন প্রয়োজন হলে আমাকে খবর দেবে।

শুনতে শুনতে কাবেরীর বুকটা মুচড়ে উঠল। এত কথার একটাই মানে তোমার নির্বাসনের ব্যবস্থা বুঝে নাও। অর্থাৎ যে পরিণতি সে আশঙ্কা করেছিল তাই অনিবার্য হয়ে উঠল। কিন্তু যেন হঠাৎ। সাহেব ভিতরে ভিতরে এত ব্যবস্থা করছেন। অথচ তাকে জানতে দেননি। আগে জানলে মনটাকে প্রস্তুত করতে পারত।

বলল—এতকথা আমাকে আগে বলনি কেন সাহেব? আমি তো কোনদিন অমত করি নি।

সাহেব একটু থেমে বললেন একথা বলার পর আর তোমার কাছে দাঁড়াবার মুখ আমার নেই কাবেরী।

তার মানে তুমি আমাকে জন্মের মত ছেড়ে দিল? আর কোনদিন আসবে না? কাবেরী প্রায় আর্তনাদ করে উঠল।

ডার্লিং! আমরা নিজের স্বার্থের জন্য সব কিছু করতে পারি। এমন কি বুকের ভালবাসাকে বুটের তলে মাড়িয়ে চৌপট করে দিতে পারি কাজেই আমার কাছ থেকে আর কিছু আশা কোর না।

কিন্তু সাহেব। আমার গর্ভে যে তোমার সন্তান। তার কি পিতৃ পরিচয় দেবো?

তোমার গুরুজী কি সে ভারটা বইতে পারবেন না? অন্তত তোমার মুখ চেয়ে?

একি বলছো সাহেব? তিনি আমার পিতার মত।

জমিদারের নাচমহল থেকে কাবেরী কুটির পর্যন্ত ভায়া সাহেব কোঠী তিনি তোমার জন্য যা করেছেন তার মধ্যেও কিছু প্রত্যাশা থাকতে পারে। তুমি তা ভেবে দেখবে। এই নাও চাবি। আলমাবির ভিতর দলিল পত্র আছে। তোমার জিনিসপত্র সব পাঠিয়ে দেবো। ও, কে! গুড বাই।

গট্ গট্ করে বেবিয়ে গেলেন। গেটের বাইবে অপস্রিয়মান ঘোড়ার গাড়ির দিকে তাকিয়ে রইল কাবেরী! বুকটা ব্যথায় টন্ টন্ করে উঠল। চোখ ফেটে জল এল। কত হঠাৎ সব ওলোট পালট হয়ে গেল।

সত্যি ওরা সব পারে। ভালবাসার বুকে বুটের লাথি ওরাই দিতে পারে। ওরা যে ইংরেজ। সুসভ্য জাতি। ভারতীয়দের মত ত্যাগ, তিতিক্ষা, প্রেম ভালবাসার মূল্যবোধ ওদের কাছে আহাম্মকি!

পালঙ্কের বাজুতে মাথা রেখে বুকচাপা কান্নায় কাঁপতে লাগল।

॥ আঠারো ॥

ব্যারাকলউ সাহেবের জীবনটা আবার বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছে। সময় কাটছে দুঃস্বপ্নের মধ্যে। এখন আবার চরম অর্থকষ্টে পড়েছেন। ছোটবড় মহাজন কুসীদজীবির কাছে ধার করছেন পানমোহরার কাজ চালু রাখার জন্য। শুধু চানক খোঁড়া ছাড়া বাকি সব কাজ বন্ধ করে দিয়েছেন। তবু লেবার পেমেন্ট করতে পারছেন না।

লেবারদেরও দুরবস্থার শেষ নেই। একেই তো হাজরীর টাকায় ভাত জোটে তো কাপড় জোটে না। তারপর আবার বাকি। ওরা সব বন্ধক পড়ে গেছে।

মিশিরবাবু সেখানে ঠিকাদারী করতে গিয়ে সুদের কারবাব ফেঁদে দিয়েছেন। টাকার অভাবে উন্নয়ন প্রকল্পগুলি বন্ধ। ঠিকাদারের আর কাজ কী? কিন্তু ওর কারবার বন্ধ হয়নি। অভাবটাই তো সুদের কারবারের আদর্শ বাতাবরণ। জয়গোপাল জমিয়ে বসেছে।

মালিকের অর্থকষ্ট হলে লেবারদেরও পেটের ভাত চাল হয়ে যায়। খেলাদাসীরও যৌবন বন্যায় ভাটার টান আসে। বুধনা শুয়োর বিক্রি করতে হাটে যায়। রাসমণি বনের শাক পাতা তুলে বেড়ায়। ঘোড়াগুলোর হাড় জির জির করে। মানুষের পেটেই দানা নেই তো ঘোড়ার পেটে দানা জুটবে কোথা থেকে? অথচ একদিন এই ঘোড়ার জন্য কাঠের পিপেতে করে জিন আসতো। একটু নেশা না হলে কি কদম চালে ঘোড়া ছুটতে পারে? না কি তাদের গা চিক্ চিক্ করে।

রসুইখানায় তরলা ও ঢালুদাসের মধ্যে ফিস্ ফিস্ করে কথা হয়।

তরলা বলে—অমন সোনার পিতিমাকে বিসজ্জন দিঞে কার বুকে না শেল বাজে রে ঢালু? ঐ খালভরা টেকো সাহেব আমাদের সাহেবের মগজ বিগ্ড়াঞে দিঞে গেল।

ঢালু বলে—তুঁই যাই বল তরলা—যে মেয়েটি সাহেবের ফল পেটে ধবেছে তার দুঃখের শেষ নাই।

তরলার একথা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। কিন্তু না করেও উপায় নেই। কত উদাহরণ তার চোখের সামনে—বিবি বাথানে।

ওদিকে বুকভরা জ্বালা নিয়ে সালুঞ্চী, শেরগড়, হাতনল থেকে পানমোহরা, সাতঘরিয়ায় ঘোড়া ছুটিয়ে বেড়ান ব্যারাকলউ সাহেব। ঘটনা-

চক্রে এসে পড়লেন দু'নম্বরের ডিপোতে। চঞ্চল কুমার অভ্যর্থনা করে নিয়ে এল ওর অফিসে। সেটা এক খড়ের ছাউনী ঘর। একদা চম্পক কুমারের নিরালা নিকুঞ্জ ছিল। বর্তমানে অফিস। সেখানে বয়ের কাজ করে জয়গোপালের ছোট ভাই রামগোপাল।

চোখের ইশারা পাবামাত্র সে একটা হুইস্কির বোতল খুলে দিল। গ্লাসের মধ্যে তরল পানীয় ঢালতে দেখে সাহেব একটু নড়ে চড়ে বসলেন। দু'পেগ খেয়ে মনটা ফুর ফুরে হল। বললেন—মিঃ চঞ্চল—তোমার জীবনে উন্নতি হবে।

চঞ্চল বললেন—ধন্যবাদ স্যার।

—তোমার বাবা আমার বন্ধু। আমি কখনো তার প্রতি বৈরী ভাব রাখিনি। এই খাদ ঠিকাদারী দেওয়ার সময় তাঁর সঙ্গে আমার একটা জেণ্টলম্যানস এগ্রিমেণ্ট হয়েছিল। কিন্তু দুঃখের কথা আমার প্রাপ্য উনি দেননি।

—আগেকার কথা আমি জানি না স্যার। কিন্তু আমি যখন থেকে খাদ চালাচ্ছি তখন থেকে হিসেব করে আপনাব টাকা পেমেণ্ট দিয়ে আসবো।

—ধন্যবাদ প্রিন্স! ইহ বাহ্য! সামনেই পানমোহবা। মাস কয়েক কাজ চললেই চানকে কয়লাস্তর পাবো। রেজিং হলে বছরে লাখটাকা রয়্যালটি! এ সময়ে কি সহযোগিতা করা উচিত নয়?

প্রিন্স চঞ্চল বিচলিত। বললেন—আমি বাবার সঙ্গে পবামর্শ কববো স্যার।

—ধন্যবাদ প্রিন্স। চিয়াব উ—হাত বাড়িয়ে করমর্দন কবে ঘোড়াব পিঠে সওয়ার হলেন—

দিনকয়েক পব উনি বেলা করে বিছানা ছেড়ে উঠলেন। মাথাটা জ্যাম ধরে আছে। অষ্টাঙ্গে ব্যথা। ভাবলেন—কালকার মদটা খারাপ ছিল। তারই প্রতিক্রিয়া। কিন্তু বাথরুমে জলের ছিটা লাগতে গা-টাও শির শির করে উঠল। ব্রেকফাষ্টেও তেমন রুচি নেই। তবু উনি গা কবলেন না।

অফিস গিয়ে শুনলেন হাতনল সিমে ভীষণ গ্যাস হয়ে গেছে। একটা

ব্লোয়ার দিয়ে শাঁ শাঁ করে ফায়ার ড্যাম্প গ্যাস বেরুচ্ছে। তার মোকাবিলা দরকার। না হলে কোন তুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে।

এসব ক্ষেত্রে ব্যারাকলউ সাহেবের ক্লান্তি বা শৈথিল্য নেই। তিনি তৎক্ষণাৎ হাতনলের ম্যানেজরেকে সঙ্গে নিয়ে খাদে নেমে গেলেন। গ্যাসের মোকাবিলা করতে যাবতীয় নির্দেশ দিয়ে একাই উঠে আসছেন। কিন্তু পা আর চলছে না। ভিতরটা থর থর করে কাঁপছে। ভীষণ শীতবোধ হচ্ছে। মাথাটা জ্যাম ধরে আছে। তবে কি শরীরে ব্যাধি আশ্রয় করেছে ?

ঠিক তাই। উনি বে-শোর মুসাফির। কাজ কাজ করে পাগল। সকালে ঘুমিয়ে উঠেই যা ভাবা উচিত ছিল তা এতক্ষণে ভাবছেন। যখন শরীর বইছেনা।

হলেজ রাস্তায় উঠছিলেন। এক লূস খালি গাড়ি আসছিল ঘড় ঘড় শব্দে। উনি লাইন ছেড়ে দাঁড়ালেন। কুকুরের মত হাঁপাতে লাগলেন। তবু কয়েক ধাপ উপরে উঠে একটা জাংশানে এলেন। মেন লাইন থেকে লেভেল ব্রাঞ্চ সুড়ঙ্গ। সেখানে একটা সমতল জায়গা দেখে বসে পড়লেন।

খালি গাড়িগুলো ভীষণ শব্দে ঘড় ঘড় করে পার হয়ে গেল। এবার রাশটা চালে ধপ্ ধপ্ করে বাড়ি মারছে। উনি তা বুঝতে পারছেন না। শুধু মনে হচ্ছে কানের কাছে অযুত মৃদঙ্গের লহরা চলছে। কেমন দ্রিমি দ্রিমি শব্দ। যেমন মন্মথ ঘোষ পাখোয়াজে বোল তোলেন।

আঃ। এ সময় তোমরা কেউ কাবেরীকে আমার কাছে এনে দিতে পারো। আমার ভীষণ শীত করছে। সর্বাঙ্গ কাঁপছে। ওকে বলো আমার শরীরটাকে চাপা দিয়ে যেন বসে থাকে। ওহ্, মাইগড।

উনি চিৎপাত দিয়ে শুয়ে পড়লেন ধূলো কয়লার গাদার উপর। মাথাটা ঠক্ করে মেঝেতে ঠোকা গেল। টর্চটা একদিকে ছিটকে পড়ল। সেভাবেই পড়ে রইলেন।

ঠিক তার এক পিলার উপরে একটি লেভেলে বাচ্চাকে তুধ দিচ্ছিল চামেলী। সে ব্যাচারীর স্বামী খাদের একসিডেণ্টে মারা যাবার পর বড় আতান্তরে পড়েছে। বড় ছেলে তুটো বিবি বাথানের গুগোবর মেখে মেগে চেয়ে খায়। কিন্তু সেদিন যেটির জন্ম হল তাকে কোথায় রেখে আসবে ? তাই কোলে নিয়েই খাদে নাবে। কোন সুড়ঙ্গে কাঁথার উপর

শুইয়ে মেন লাইন ঝাড়ু দেয়। ইনচারজবাবু দয়া করে ওকে সেই কাজটা দিয়েছেন।

তার চোখে পড়ল একটা জ্বলন্ত টর্চ গড়িয়ে যাচ্ছে। সাহেব সুবো ছাড়া তো টর্চ পায়না কেউ। তবে কোন সাহেবের টর্চ পড়ল। আবার একটা গোঙানীব শব্দ আসছে। ও বাচ্চাটাকে শুইয়ে দেখতে গেল।

দেখেই ওর আক্কেল গুড়ুম।

—ঈ বাব্বাঃ! ঈ-যে বারকুলি সাহেব গো! এমন করে পড়ে কেনে? এই সাহেব তাকে মরণের মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছেন। তার এই দশা! হে ভগবান! তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে বুকে হাত রাখল। হ্যাঁ—বুকটা ধড়ফড় করছে। কিন্তু জ্বরে যে গা পুড়ে যাচ্ছে।

ডাকল-—সাহেব! সাহেব!

উনি আচ্ছন্ন চেতনার মধ্যে অনুভব করলেন কেউ যেন ওর গায়ে হাত দিয়েছে। জিজ্ঞাসা করলেন—কে? কে বটিস?

—আমি সাহেব—চামেলী। বিবিবাথানের চামেলী। তুমার গায়ে এত জ্বর ক্যেনে?

—হ্যাঁ। নিচে যা ম্যানেজারকে খবর দে গিয়ে। চামেলী ছুটতে ছুটতে খবর নিয়ে গেল! সঙ্গে সঙ্গে গোটা খাদে সে খবর রটে গেল। ম্যানেজার সাহেব লোকজন নিয়ে হাজির। মিঃ ব্যারাকলউকে ষ্ট্রেচারে চড়িয়ে উপরে নিয়ে এলেন। ঐ বিশাল লাশ চারটে লোকে বইতে পারে না। তারাও কুকুরের মতন হাঁফায়।

বেদম জ্বর। হি হি করে কাঁপছেন। ভুল বকছেন। ফাদার উইলিয়াম বড় ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করাচ্ছেন। নিজে প্রায়ই আসেন। গম্ভীর মুখে বসে থাকেন। সাহেব কোঠীব কারো মুখে হাসি নেই। কি যেন ঘটে গেছে। মহা অনর্থপাত। বারকুলি সাহেবের জ্বর। যেন কোন অনৈসর্গিক ব্যাপার।

তিনদিন তিনরাত্রি পর তাঁর জ্ঞান ফিরে এল। চোখ মেলে তাকালেন। ফাদার বললেন—কেমন লাগছে মিঃ ব্যারাকলউ?

উনি ধমকের সুরে বললেন—আমি চাই আজ চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে খাদের গ্যাস পরিষ্কার হোক!

—মাইগড! এখনো তো উনি ভুল বকছেন।

তরলা বলল—সাহেব! এসময়ে কাবেরীদিকে আনা করান। ওকে দেখলেই সাহেবের প্রাণ ঠাণ্ডা হবে।

ফাদার উইলিয়ম তা চান না। যে কণ্টক উৎপাটিত হয়ে গেছে তাকে পুনরায় নিয়ে এসে স্ব-স্থানে প্রতিষ্ঠা দিলে আবার না মহীরুহে পরিণত হয়।

বললেন—কেন! কাবেরীর চেয়ে কি ভালো নার্স নেই?

তরলা কথা বাড়াল না। ও জানে সাহেবদের সঙ্গে বেশি কথা বলতে নেই।

তারপর থেকে জ্বরটা একটু একটু কমতে লাগল। ফাদার উইলিয়াম বলেছিলেন ম্যালেরিয়া! বড় পাজী রোগ। একবার ধরলে আর ছাড়তে চায় না। শরীর চুষে খোসা বানিয়ে দেয়।

সে কি আর দু'কথা! এই ক'দিনেই ব্যারাকলউ সাহেব আধখানা হয়ে গেছেন। শরীরটা বড় দুর্বল। মনটা তার চেয়েও। কি রকম যেন আত্মগ্লানিতে ভুগছেন।

জীবনপণ করে যে কোম্পানিতে চাকরি করলাম তাঁদের বরখাস্ত নোটীশ মাথার উপর ঝুলছে। যে কোনদিন ঘাড়ে এসে পড়বে। তখন কি হবে? অপমানের বোঝা মাথায় নিয়ে যেতে হবে। যারা কথায় কথায় সেলাম করে তারা দাঁত বের করে হাসবে।

এই যে বিবি বাথান! জারজ সন্তানের প্রোডাকসন ইউনিট। হরদম পথে ঘাটে কিল বিল করে বেড়ায়। তাদের কি হবে? তারা আশ্রিত। অন্যসাহেব এসে যদি ধাওড়ার উপর ঘোড়সওয়ার মার্চ করিয়ে দেয়। তার দেওয়া জমিগুলো যদি কেড়ে নেয়। তাহলে?

অথবা কাবেরী? ওর একটা মেয়ে হয়েছে। তাঁরই ঔরসে জন্ম!

ওহ্! লর্ড যীশাস ক্রাইষ্ট!

তাকে ভালোবাসব বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। সে কথার খেলাপ করে একটা বৃদ্ধের গলায় গেঁথে দিয়ে এসেছি। ছিঃ ছিঃ ছিঃ।

নিজেরই উপর ঘৃণা হয়।

মিঃ ট্রুম্যান ও টিউলিপ প্রায় প্রতিদিন ওঁকে দেখতে আসতেন। সেদিন সন্ধ্যায় টিউলিপ বলল—আংকল! আমি তোমার জন্যে লর্ড যীশাস ক্রাইষ্টের কাছে প্রার্থনা করেছিলাম। দেখো তিনি তোমার জ্বর ভালো করে দিলেন।

—ওহ্! মাই সুইট চাইল্ড। তুমি কত সুন্দর।

টিউলিপ গলে গেল। গল্ গল্ করে অনেক কথা বলল।

মিঃ ট্রুম্যান বললেন—স্যার। আপনি যদি কিছু মনে না করেন তবে একটা কথা বলি।

উনি সম্মতি সূচক ঘাড় নাড়লেন। মিঃ ট্রুম্যান বললেন—কিছুদিন থেকে লক্ষ্য করছি আপনি ভীষণ মানসিক অস্থিরতার মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন। সম্ভবতঃ তা পানমোহরাব জন্যই। তাই বলছিলাম—মিসেস ব্যারাকলউকে সব কিছু বিস্তারিত ভাবে একটা চিঠি লিখলে তিনি নিশ্চয় সাহায্যের হাত বাড়াবেন। তাছাড়া উনি যে শর্তটা আরোপ করেছিলেন তা আপনি পুরো কবে দিয়েছেন। আর তো উনি না বলতে পাববেন না। আপনি একটু কমপ্রোমাইজ করুন স্যাব। ওঁকে চিঠি লিখুন।

কি লিখবো? মাই ডার্লিং—তোমাব শর্ত মেনে নিয়ে সেই নাচগার্ল-টাকে আউট করে দিয়েছি। এবাব তুমি প্রসন্ন হও। ইয়োর মোষ্ট ওবিডিয়েন্ট হাজব্যাণ্ড – এফ. জি. ব্যারাকলউ।

মিঃ ট্রুম্যান হক্‌চকিয়ে গেলেন। আমতা আমতা করে বললেন—না স্যার। আমি তা বলছিনা স্যার।

—পুরুষের একমাত্র অবলম্বন তাব পৌরুষ। তার গ্লানি সইতে পারবো না। পানমোহরা আমি নিজেব ক্ষমতাতেই করবো। তখন উনিই আসবেন আমার কাছে।

মিঃ ট্রুম্যান ক্ষমা চেয়ে নিয়ে চলে গেলেন।

মিঃ ব্যারাকলউয়ের ভিতরটা তখন টগ্‌বগ্ করছে।

আমি কি এতই অসহায় হয়ে পড়েছি? দুয়ারে দুয়ারে আত্মসমর্পণ করে বেড়াবো? স্ত্রীর কাছে, জমিদারের কাছে, প্রতিপক্ষের কাছে?

অবশেষে যাবো মিঃ হ্যামিলটনের বাংলোয়। ওর পোষা এ্যালশে-সিয়ান কুকুর দুটোকে আদর করে চুমু খাবো। কাঁচা মাংসের প্যাকেট এগিয়ে দেবো। সরল কাঠেব গুঁড়িব মতো তাঁর মিসেসকে সঙ্গ দেবো এবং মিঃ হ্যামিলটনকে বাউ করে বলবো স্যার। আই য়্যাম ইয়োব ওবিডিয়েন্ট সারভেন্ট ব্যারাকলউ।

—নো—নো—নো!

এমন উৎকট কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলেন যে সাহেব কোঠীর বিম,

বর্গা, টালি কেঁপে উঠলো। আয়া, খানসামা, বাবুর্চিরা ছুটে এল। সবাই তটস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে—কি হয়েছে হুজুর?

॥ উনিশ ॥

দশ দিন পর উনি পথ্য করলেন। ঘোড়ায় চড়ার মত সুস্থ হতে আরো চার-পাঁচ দিন। তারপর সাহেব গেলেন পানমোহরা।

তখন সেখানে প্রায় শ্মশানের নিস্তব্ধতা। অনেক কুলি-কামিন পালিয়েছে। যারা আছে তারাও ধুঁকছে। মিশিরবাবুর নির্দেশে জয়গোপাল ওদের একবেলা খিঁচুড়ী খাইয়ে রেখেছে। কিন্তু কাজ বন্ধ হয়ে গেছে।

মিঃ বাসু ম্যানেজার ও সত্যনারায়ণ মুন্সী ধুনি জ্বেলে বসে আছে। বুধনা ও রাসমণি উপোস দিচ্ছে। ওর মেয়ে দুটি ক্ষিধেয় কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছে। সে কি দৃশ্য! দেখলে পাষাণ ফেটে জল বেরুবে।

হঠাৎ ঘোড়ার পিঠে চড়ে সাহেবকে আসতে দেখে কুলি-কামিনদের ক্ষুধায় ম্লান চোখগুলি জ্বল জ্বল করে উঠল। তারা সব কাছে এসে সেলাম করল।

মিঃ বাসু সাহেবকে গুড মর্নিং করে কাছে দাঁড়ালেন। অনাহার, উদ্বেগ ও কাজ বন্ধের বিবরণ দিলেন। সাহেবের বুক চিরে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

জয়গোপালকে ডেকে বললেন—গোমস্তাবাবুকে গিয়ে বল আমার কৃপায় ও বহু টাকা রোজগার করেছে। আজ না হয় আমি অসুবিধায় পড়েছি, কাল তো ভালো দিন আসতে পারে। তাহলে লেবারদের খোরাকী দিয়ে কাজটা চালু রাখতে তার এত ব্যথা কেন?

জয়গোপাল সেই সংবাদ নিয়ে চলে গেল। সাহেবের হাতে মোটে কুড়িটা টাকা ছিল, তাই সত্যনারায়ণকে দিয়ে লেবারদের খোরাকীর ব্যবস্থা করতে বললেন। ওঁর হাতে একটি সুইস-মেড সোনার ঘড়ি ছিল। ব্যাণ্ডটাও সোনার। সেটা হাত থেকে খুলে মিঃ বাসুকে দিয়ে বললেন—এটা নিয়ে রাণীগঞ্জে যান। লাহাবাবুর কাছে আমার নাম করে বন্ধক রেখে কিছু টাকা নিয়ে আসুন।

মিঃ বাসু বললেন—শেষে আপনার হাত থেকে ঘড়ি খুলে দিতে হল

স্যার। কিন্তু এখনো যে অনেক কাজ বাকি। কি করে হবে স্যার?

—হয়ে যাবে মিঃ বাসু। কিচ্ছু ভেবো না। আমি একজন ফাইনেন্সার দেখছি। হাতে নগদ টাকা না থাকতে পারে। বিশ হাজার বিঘা কোল প্রোপার্টি, দুই শো বিঘা জমি তো আছে। তাই বন্ধক রেখে টাকা আনব। এখন তো চালান।

—ঠিক আছে স্যার।

টুকিটাকি আরো কিছু কথাবার্তার পর মিঃ বাসু বললেন—স্যার। অনেকদিন জ্বর ভোগ করে আপনার শরীরটা দুর্বল। একটু বিশ্রাম করুন। ফরেন লিকার তো কিছু নেই। তবে দেশী মহুয়া যোগাড় হতে পারে।

—ধন্যবাদ মিঃ বাসু।

মিঃ বাসুর ইঙ্গিতে একজন লোক গেল সহদেব মুদির কাছে। সে লোকটি পানমোহরায় মদের দোকান করবার জন্য মিঃ বাসুর কাছে অনেকদিন থেকে দরবার করছে। নতুন কলিয়ারি হবে আর মদের দোকান হবে না তা কি হয়? সব কলিয়ারিতেই যেমন যেমন মদের দোকান তেমনি হবে। কিন্তু উমেদার একা সহদেব মুদি নয়। আরো আছে। তাই শ্যাম্পেলটা ভাল হওয়া চাই। সহদেব তার ভাণ্ডারের সরেস মালটি পাঠিয়ে দিল। মিঃ বাসু ছিপি খুলে গ্লাসে ঢেলে দিলেন। ব্যারাকলউ সাহেব তা পান করলেন।

বললেন—নেহাৎ খারাপ নয়। চলে যাবে।

মিঃ বাসু প্রস্তাব রাখলেন—খেলাদাসীকে ডেকে পাঠাবো স্যার।

—নো মিঃ বাসু। ধন্যবাদ।

—আপনার শরীর কি এখনো সুস্থ হয়নি স্যার?

উনি একটু হেসে বললেন—মিঃ বাসু কাঞ্চন ফেলে কাঁচ নিয়ে কারবার করতে মন চায় না। তোমার সৌজন্যের জন্য ধন্যবাদ।

সেদিন তাঁর অফিসের টেবিলে অনেকগুলি চিঠি-পত্রের মধ্যে তাঁর নামে একটি সীল করা খাম পেলেন। বিলেতের বোর্ড অফ ডাইরেক্টার্সের দপ্তর থেকে আসছে। তা দেখে মিঃ ব্যারাকলউয়ের বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। তারপরই সামলে নিলেন। খামটা পকেটে রেখে অন্যান্য চিঠি-পত্রের উপর যথাযথ নির্দেশ দিয়ে বাংলোতে চলে এলেন।

একটু গুছিয়ে বসে একটা চুরুট ধরিয়ে চিঠিটি পড়তে লাগলেন। যার সারমর্ম—দীর্ঘদিন যাবৎ অসাধারণ যোগ্যতার সঙ্গে কোম্পানির উন্নয়ন প্রকল্প রূপায়ণের জন্য ধন্যবাদ।

সম্প্রতি আপনার পানমোহরা নিয়ে বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে। আপনার দীর্ঘ চাকরি জীবনে অসংখ্য কর্মতৎপরতার কথা স্মরণ করে কোম্পানি আপনার সঙ্গে কোন অসৌজন্যমূলক ব্যবহার করতে ইচ্ছুক নন।

তাই আপনাকে অনুরোধ নিজে উদ্যোগী হয়ে আমাদের কোম্পানির সঙ্গে আপনার চুক্তিনামায় ছেদ ঘটানোর প্রস্তাব রাখুন। সেক্ষেত্রে উভয় পক্ষের সমঝোতা মোতাবেক চুক্তির অন্যান্য শর্তগুলির ছাড় দেওয়া হবে।

আপনার সিদ্ধান্ত আমাদের চীফ মাইনিং ইঞ্জিনীয়ারকে জানিয়ে তাঁর সঙ্গে রফা করে নিলে বাধিত হব।

ধন্যবাদ। স্বাক্ষর—এ. আর মরিস। সেক্রেটারী

অর্থাৎ চাকরিতে জবাব। একতরফাভাবে চুক্তি বাতিল করলে ছয় মাসের বেতন ও বিলেত যাবার ভাড়া কোম্পানিকে দিতে হবে।

মিঃ ব্যারাকলউয়ের সম্মানের বিনিময়ে কোম্পানি সেই টাকাটা বাঁচালেন।

তবুও যেন মন্দের ভাল। নিজে থেকে চাকরি ছাড়লে তাঁকেও ছয় মাসের বেতন গুণাগার দিতে হত বলেই ছাড়তে পারেননি। না হলে যেদিন বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগ নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছিল সেইদিনই ছেড়ে দিতেন। ভারতবর্ষে ব্যারাকলউ সাহেবের চাকরির অভাব নেই। তাছাড়া উনি তো আর চাকরি করবেন না।

সিদ্ধান্ত তক্ষুণি নিয়ে নিলেন। মিঃ হ্যামিলটনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন। তবে তার কুকুরকে চুমু খাওয়ার জন্য নয় চুক্তিনামায় ছেদ ঘটানোর প্রস্তাব রাখতে।

উনি সেদিন মিঃ ব্যারাকলউয়ের সঙ্গে আশ্চর্য ভালো ব্যবহার করলেন। অফিসিয়েলি তাঁর জন্য যতটা সহযোগিতা করার দরকার তা তো করলেনই হাতে ধরে অনুরোধ করলেন—আমার বাংলোয় আসুন মিঃ ব্যারাকলউ। আজ আমরা দুজনে খোলাখুলি মনে স্বাস্থ্য পান করি।

উনি সে অনুরোধ এড়াতে পারলেন না। দুজনে খোস গল্প করতে করতে হুইস্কি খেলেন, ডিনার সারলেন। তারপর নিজের বাংলোয়

ফিরলেন। দৃশ্য দেখে তো শেরগড় কোল কোম্পানির সাহেব সুবো, বাবু-ভেইয়া কুলিকামিনের চক্ষু চড়কগাছ।

সবাই জানল মিঃ ব্যারাকলউ তাঁর নিজস্ব কোলিয়ারি পানমোহরায় সর্বশক্তি নিয়োগ করার জন্য চাকরি ছাড়লেন। এবার বাংলো ছাড়ার পালা। এতো আর বুধনা বাসমণির সংসার নয় যে গোরু গাড়িতে মালপত্র চড়িয়ে জীবজন্তু নিয়ে মিছিল করে চলে যাবে। এ হচ্ছে ব্যারাকলউ সাহেব। যাঁর বাংলোর আয়তন একখানা গ্রামের সমান।

পানমোহরায় ওঁর যে বাংলোটা তৈরি হচ্ছে তার সিকিভাগ কাজ হয় নি। কলিয়ারিতে রেজিং ও কয়লা বিক্রি করে টাকাকড়ির আমদানি না হলে ঐ ঢাউস বাংলোয় কাজ হবে না। সেজন্য একটা টেম্পোরারি খড়ের ছাউনি বাংলো তৈরি করিয়ে নিয়েছেন। ছয়টি কামরা। একটি বড় বারান্দা। স্নানঘর, রান্নাঘর। আস্তাবল ও সারভেন্টস কোয়ার্টারস। তারমধ্যে অত আসবাবপত্র আঁটবে না।

আবলুস, সেগুন, মেহগনি এইসব দামী দামী কাঠের অসংখ্য চেয়ার, টেবিল, আলমারি, খাট, পালঙ্ক। কমপক্ষে একশজন খাবার মত ডাইনিং টেবিল, চেয়ার ও বাসনপত্র। ঘর সাজাবার কত কী সৌখিন জিনিসপত্র। দামী দামী আয়না, কার্পেট ও অয়েল পেইন্টিং। সব নিজস্ব। কোম্পানির দেওয়া নিজস্ব ফার্নিচারস আর কতটুকু! একটা ফ্যামিলির ব্যবহারের মতই তো!

এতসব মালপত্র নিয়ে কি করবেন তাই নিয়েই দিনকয়েকের ভাবনা। গুদামবাবুকে দিয়ে সেসবের একটা ফর্দ ও প্রত্যেকটির আনুমানিক মূল্য লিখে পঞ্চাশ শতাংশ ছাড় দিয়ে বিক্রি করার নোটিশ দিয়ে দিলেন। গুদামবাবু তালেবর ব্যক্তি। সাহেবের মতলব বুঝতে পেরে দামগুলোকে কিছু কম করে লিখেছিলেন। তার উপরে পঞ্চাশ শতাংশ ছাড় পেয়ে নিজের শালার নামে সব কিনে নিলেন! আসানসোলে ওঁর একটা ফার্নিচারের দোকান ছিল ঐ শালার নামেই। ওসব ভার্নিস করে নূতন বলে ডবল দামে বিক্রি করবেন। অর্থাৎ বাণিজ্যটা ভালই হল।

সাহেব ওঁর একান্ত আবশ্যক কয়েকটি ফার্নিচার, খুব সাধের কয়েকটি জিনিসপত্র, অস্ত্রশস্ত্র ও সংগ্রহশালাটি পুরোপুরি পানমোহরায় পাঠিয়ে দিলেন। তবুও নেই নেই করে সবকিছুর বিলিব্যবস্থা করতে একমাস সময় লাগল।

এবার উনি নিজে অনেকটা ফ্রি। দায় ধাক্কা একদিককার চুকে গেছে। হাতে কিছু টাকাও এসেছে। দীর্ঘদিনের উদ্বেগের অবসান।

কিন্তু যারা এত দন সুখে দুঃখে, স্নেহে ও শাসনে তাঁর সর্বব্যাপী ছায়ায় বাস করছিল তাদের তখন বুক ফেটে যাচ্ছে। ইতস্ততঃ দাঁড়িয়ে আছে। চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে।

উনি তাদের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন। সহিসের বাচ্চা, কচোয়ানের বেগম, বিবিবাথানের বিবিজান, খাদের কুলিকামিন, অফিসের বাবু, সরদার, চাপরাশি, কটা চামড়ার সাহেব, উদোম আতুল ছেলেমেয়েরা ওকে ঘিরে দাঁড়াল। উনি তাঁদের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। আন্তরিকভাবে করমর্দন করলেন একে একে সবারই সঙ্গে তারপর তাঁর প্রিয় কালো ঘোড়াটির কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন।

বললেন—তোমাদের অনেক গালমন্দ করেছি, মেরেছি, শাসন করেছি বিনিময়ে তোমরা আমাকে দিয়েছো সেবা, কাজ ও বশ্যতা। আমি তোমাদের কাছে কৃতজ্ঞ। লর্ড যীশাস ক্রাইস্টের কাছে প্রার্থনা করি যেন অত্যাচাব, নির্যাতনের দীর্ঘ অমাবজনী পার হয়ে তোমাদের জীবনে নূতন সূর্যের উদয় হয়। চিয়ার ইউ মাই ফ্রেণ্ডস এণ্ড লেডিজ। গুড বাই।

হাত তুলে বিদায় জানালেন।

লাফ দিয়ে ঘোড়ায় চড়ামাত্র তাঁকে কোন সমর অধিনায়কের মত মনে হল। এক দূরন্ত ঘোড়সওয়ারকে পিঠে নিয়ে ঘোড়া ছুটে চলল—যুগ থেকে যুগান্তরের দিকে।

॥ কুড়ি ॥

তারপরই কালের হাওয়ার দিক পরিবর্তন সূচিত হল। শুভ সূচনাব প্রথম অঙ্কে ফাইনেনসারের সঙ্গে কথাবার্তার অগ্রগতি।

কলকাতার বড় বাজারে বিখ্যাত গোবিন্দ দাস জেঠমালানীর অফিস। চটকল, কয়লাকুঠি ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে তাঁদের কোটি কোটি টাকার লগ্নী। হাওড়ায় বিরাট গোডাউন। নানারকম নূতন ও পুরাতন যন্ত্রপাতি ও স্ক্র্যাপের ঢালাও কারবার। তাঁদের ম্যানেজারও বিলেত ফেরৎ ইঞ্জিনীয়ার। নাম মিঃ চিরঞ্জীলাল ডায়াস।

কথা প্রসঙ্গে তিনি বললেন আপনি তো শুধু মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারই নন

একজন ডিজাইনারও। আসুন না আমাদের গোডাউনে। আশা করি অনেক কিছু পেয়ে যাবেন। অন্ততঃ দুটো ল্যাঙ্কাশায়ার বয়লার উইথ ফুল ফিটিংস দিতে পারি।

তাই নাকি।

হ্যাঁ। একটা চটকলের জন্য আনা হয়েছিল। কিন্তু বিলেত থেকে আসতে আসতেই কোম্পানি লাটে উঠল। শরিকী সংঘর্ষে যা হয় আর কি! ওদের বহু টাকা ফাইনান্স করেছিলাম। তাই যন্ত্রপাতি সব আটক করেছি। আপনার যদি কাজে লাগে দিতে পারব।

আর কি দিতে পারবেন?

—গারডার. চ্যানেল. ইস্পাতের চাদর, রেল, ষ্টীম পাম্প।

—ষ্টীম ইঞ্জিন।

—আমাদের গো-ডাউনে না হলেও যোগাড় করে দিতে পারব।

—কি করে?

—একটা কোল কোম্পানির বহু মাল আটক হয়ে আছে। সেগুলো আমাদের সিস্টার কনসার্নের ফাইনান্স। মাল খিদিরপুর ডকে আছে।

মিঃ ব্যারাকলউ তারপরদিন থেকে হাওড়া গো-ডাউন, খিদিরপুর ডক, ও অন্যান্য কয়েকটা কোম্পানির গো-ডাউন থেকে অনেকগুলি মালের তালিকা তৈরি করলেন। এবার চিন্তা ভাবনা।

চ্যানেল, গারডার, জয়েস্ট, ইস্পাতের চাদর ইত্যাদি দিয়ে হেডগীয়ার প্লাটফর্ম, ডুলি তৈরি করে নিতে পারবেন। বয়লার দুটি আছে। ইটের চিমনি বানিয়ে চালু করতে পারবেন। একখানা রুবী কোম্পানির ষ্টীম ইঞ্জিন আছে তবে তার বেড প্লেটের ডিজাইন বদল করতে হবে। ড্রাম ফিট করাতে হবে। হেডগীয়ারের পুলিচাকা পাওয়া যাচ্ছে না। দু'রীল নতুন রোপ অবশ্য পাওয়া গেছে। খুচরো বহুকিছুর দরকার। তার কিছু পাওয়া যাবে কিছু যোগাড় করতে হবে।

খুঁজতে খুঁজতে মেসার্স মার্টিন কোম্পানির চীফ ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে আলাপ হল। কুলটিতে তাঁদের ব্লাস্ট ফার্নেস, কোকিং প্ল্যাণ্ট ও কাষ্টিংয়ের ফাউনড্রী। তিনি আশ্বাস দিলেন ডিজাইন দিলে মাল ঢালাই করে দিতে পারবেন। তা হেড গীয়ারগুলির চাকাই হোক বা ওয়াইণ্ডিং ইঞ্জিনের ড্রাম হোক। ছোট বড় যা দরকার।

মিঃ ব্যারাকলউ আগে জানতেন না খোঁজ খবর ঠিকমত করতে পারলে

ভাবতেব বাজারেও মাল পাওয়া যায। সব যে মনেব মত বা পবিকল্পনা-মত হবে তা নয় তবে কাজে লাগাতে পাবলে মন্দ হবে না।

তাঁব কাবিগবি বিদ্যাবুদ্ধি, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা সমকালীন যুগেব উদাহবণস্বরূপ। সুতবাং যা পেয়েছেন তাতেই একটি কলিযাবি ফিট কবে দেবেন। ওঁব আত্মবিশ্বাস দৃঢ হযে উঠল।

গোবিন্দ দাস জেঠমালানীব সঙ্গে পানমোহবা কোল কোম্পানিব পক্ষে ম্যানেজিং ডাইবেক্টাব মিঃ এফ জে ব্যাবাকলট এক চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন। যাঁব শর্তাবলীব মধ্যে দশ বছবেব জন্য পানমোহবা কলিযাবি বন্ধক থাকবে। হালসন পর্যন্ত সুদেব টাকা পবিশোধ না হলে দশ বছব পব ফাইনেন্সাব কলিযাবিব দখল নেবেন। সুদেব হাব বার্ষিক সাডে ছয শতাংশ।

প্লান্টস ও মেশিনাবী নগদে অথবা কিস্তিতে কেনাব জন্য যত টাকাব দবকাব তা ফাইনেন্সাব দেবেন। নগদ বিশ হাজাব টাকা দেবেন ইনস্টলেশন, লেবাব পেমেন্ট, স্টোবস ও আনুষঙ্গিক খবচেব জন্য। তাছাড়াও প্রয়োজন হলে তিনি আবো টাকা নিতে পাবেন তবে তা স্বল্পমেযাদে শোধ দিতে হবে। আব মিঃ ব্যাবাকলউ ইচ্ছা কবলে সুদে মূলে সমস্ত টাকা পবিশোধ কবে যে কোনদিন বন্ধকী কলিযাবি ছাড়িযে নিতে পাববেন।

শর্ত কডা। সুদেব হাবও চডা। কিন্তু এই কোম্পানি যেভাবে সহাযতা কবেছেন এবং কববাব প্রতিশ্রুতি দিযেছেন তাতে মিঃ ব্যাবাকলউ কিছুটা বাধিত। তিনি চুক্তিতে সহি কবলেন।

এবাব তগ্‌দীবেব খেলা। বিশ বাঁও পানিতে ডুবে গেছেন। পাতাল থেকে মুক্তো যদি তুলতে পাবেন তবেই জিতলেন না হলে হাবিয়ে যাবেন। তাব জন্য থেমে থাকবে না কর্মের উদ্যোগ।

পানমোহবায় হৈ হৈ ব্যাপাব। বাসমণি আবাব সবদাবনী। টাকা নিযে চলে গেছে জামা, পাকুড়িয়া, হাট পালাজুড়ি! নূতন কুলিকামিন চাই। মিঃ বাসু ছুটে বেড়াচ্ছেন দক্ষ কামার মিস্ত্রী, ফিটাব মিস্ত্রী, রাজ মিস্ত্রী ও ছুতোর মিস্ত্রীব জন্য। একদল শক্ত সমর্থ আনপোড় কুলিকে ট্রেনিং দিয়ে ভারী ভাবী মাল ওঠানামা ও টেন্‌ডেলের কাজ করার জন্য

তৈরি করেছেন। মিঃ ব্যাবাকলউ দিনে ষোল সতের ঘণ্টা কাজ করছেন। সে এক অমানুষিক পরিশ্রম। ব্রেকফাস্ট সেরে বেরোন। কলিয়ারিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লাঞ্চ সারেন। রাত্রি দশটায় বাংলোতে ফিরে ডিনার। তারপর চিঠিপত্র, বিল ভাউচার ইত্যাদি কাগজ কলমের কাজ সারতে ঘণ্টা দুই তো বটেই। কোনদিন বা ভোররাত হয়ে যায়।

যাবতীয় মেশিনারী ইনস্টলেশন, কাষ্টিংয়ের ডিজাইন ও ফাউণ্ডেশনের নকশা নিজে করেন। মিঃ বাসু নন কোয়ালিফায়েড দেহাতী ম্যানেজার প্ল্যান ইলিভেশনের ব্যাপারটা বোঝেন না। তাই কখনো কখনো মডেল তৈরি করে দিতে হয়।

প্রায় রোজই দু'এক ওয়াগন করে মাল আসে। সেসব স্টেশন থেকে কলিয়ারি পর্যন্ত প্রায় আট মাইল রাস্তা বয়ে আনা মহা সমস্যা। সেজন্য একটা বিশ ফুট লম্বা আট চাকার আট ঘোড়ায় টানার গাড়ি তৈরি করিয়েছেন। সেটা খুব কাজে লাগছে।

তিনি নিজে যেমন কাজের মধ্যে ডুবে আছেন তেমনি পানমোহনবাবু প্রত্যেকটি লোক আশ্চর্য প্রেরণাবলে দিবারাত্র কাজ করছে। দেখতে দেখতে এক নম্বর চানকের হেড গীয়ার খাড়া হয়ে গেল।

এই কর্মকাণ্ডের দিকে তীক্ষ্ণ লক্ষ্য ছিল চঞ্চল কুমারের। তিনি কয়েকবার এসে দেখেও গেছেন। কার্তিকবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা কাকু, সাহেব যে এত এত টাকা খরচ করছেন তারপর যদি মামলায় হেরে যান তাহলে?

উনি বললেন—খেপেছো বাবাজী। সাহেবদের রাজত্বে সাহেবরা কখনো মামলায় হারে? দেওয়ানী আদালতের মামলা একবার ঝুলে গেলে দশ বছর। ততদিনে দামোদরের পলি পড়ে মামলার নথি পচে যাবে।

—তাহলে মামলা করলেন কেন?

—তোমার দাদার জিদ বজায় রাখতে। উনি প্রোপার্টিটা হ্যামিলটন সাহেবকে বন্দোবস্ত দেবার জন্য মনস্থ করেছিলেন। কিন্তু তার আগেই জমিদারবাবু বারকুলি সাহেবকে লীজ দিয়ে দিয়েছেন।

—বাবা তাহলে মামলা করতে রাজী হলেন কেন?

—তার একটা অন্য কারণ আছে বাবাজী। তুমি আমাদের ছেলের মত। সেকথা তোমার কাছে বলতে পারব না।

উনি না বললেও চঞ্চলকুমার তা জানেন। ওঁর যুক্তিতে একটা গণিকা শ্রেণীর নর্তকীর জন্য এত ঝামেলা সায় দেয় না।

কার্তিকবাবু পরামর্শ দেন—বাবাজী। তুমি তো খুব বুদ্ধিমান ছেলে! সবাই তোমার তারিফ করে। তা তোমার বাবাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজি করাও। সাহেবের সঙ্গে মিটমাট হয়ে গেলে আগামী বছর থেকেই লাখ টাকা রয়্যালটি। একি চাট্টিখানি কথা! কোন কোম্পানি এত টাকা দেবে না।

এই টোপটি চঞ্চলকুমার কেন ওর বাপও গিলতে রাজী।

সময় বড় বলবান।

একদা যা ছিল প্রেষ্টিজ ইস্যু এখন তা আফশোস! কোথাকার কোন কাবেরী দাসী তার যৌবনের কি কিস্মৎ? যেমন রাধাগোবিন্দবাবুর কাছে তেমনি বারকুলি সাহেবের কাছে। ওরা সব এঁটো-পাতা। মানুষে যেমন খাবারটি খেয়ে ঠোঙাটি ফেলে দেয় তেমনি তার যৌবনের ফয়দা তুলে নিয়ে ফেলে দাও। একি যুগিয়ে রাখার জিনিষ নাকি?

প্রবীণ জমিদার সে কথাটি ভাল বোঝেন। তবু যে কেন এত কাণ্ড তাই এখন ভেবে পান না। আসলে রাগই চণ্ডাল। জমিদারী রক্তে রাগের বড় প্রাদুর্ভাব। একে দমন না করতে পারলে ব্যবসায় বড় ক্ষতি।

বাপের কাছে গ্রীণ সিগন্যাল পেয়ে ব্যারাকলউ সাহেবকে নিমন্ত্রণ করলেন নাচমহলে পানাহার করতে। উনি তৎক্ষণাৎ রাজী।

বহুদিন পর কালো ঘোড়ার সওয়ার হয়ে উনি টগ্‌বগ করে ঢুকে গেলেন নাচ-মহলের গেটে। দারোয়ানরা সেলাম দিল। চারটি সুসজ্জিত নর্তকী মুঘল আমলের কায়দায় কুর্নিশ করল। স্বয়ং জমিদারবাবু এগিয়ে এসে জ্ঞাপন করলেন শুভ সন্ধ্যা। পরস্পরের হাত বন্ধুত্বের পুনর্নবীকরণের আশ্বাস নিয়ে মিলে গেল।

সেই আগেকার মতো ঠাট-ঠমক। মেঝের উপর নতুন কার্পেট, বড় বড় ঝালর দেওয়া তাকিয়া। রঙীন পানপাত্র। ফেনায়িত যৌবনা-কামিনী। সারেঙ্গিয়ার হাতে মিঠে সুর। তবলচির আঙুলে লহরার বুলি।

নর্তকীদের তুজন পুরনো, তুজন নতুন।

সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন—এই মেয়ে তুটি নতুন বুঝি ?

—জী হাঁ। মেয়ে তুটি কুর্নিশ করল।

—তোমাদের আরেকজন বান্ধবী কোথায় ?

—ওঃ! মধুমিতার কথা বলছো সাহেব ? চন্দনা ভুরু নাচিয়ে বলল।

—হ্যাঁ হ্যাঁ। নামটা তো ঠিক মনে নেই।

—ওর কথা বলো না সাহেব। সে মুখপুড়ি বিষ খেয়ে মরেছে।

—সে কি ?

—হ্যাঁ। ওর কি হয়েছিল জান সাহেব—ও মনে করত বহু পূর্বজন্মে ও শ্রীরাধিকা ছিল। শ্যামের বাঁশী শুনতে পেত। ভাবত অশুচি দেহ নিয়ে তার কাছে পৌঁছনো যাবে না। তাই আফিম খেয়ে মরেছিল।

—আই সী।

জমিদারবাবু বললেন—ওসব মরা-হাজার কাহিনী ছেড়ে গান ধর। বেশ একটা যুৎসই গজল ধরবি। আপনি তো জানেন সাহেব, গজল বিউটিফুল লাভ সং।

সাহেব ঘাড় নেড়ে জানালেন—হ্যাঁ হ্যাঁ জানি।

চন্দনা রেশমী বাঈকে চোখ-ঠেরে বলল সাহেবের রূপ দেখে ভুলিস না। মন দিয়ে গান করিস। গজলের সুর সাহেবের প্রাণের ভিতর ঢুকে আছে।

—তুমি কি করে জানলে ?

—আরে কাবেরী যে গজল গাওনের বুলবুলি। সে তো এখান থেকে পালিয়ে সাহেবের কুঠিতে উঠেছিল।

ওদের ফিস্‌ফিস্ আলাপেব মাঝেই সারেঙ্গিয়া সুর তুলে দিল। রেশমী বাঈ আবার একদফা কুর্নিশ করে গান ধরল।

কিন্তু কোন কিছুই ব্যারাকলউ সাহেবকে স্পর্শ কবল না। উনি বললেন—মিঃ রায় কাজের কথাটা সেরে নিলে হত না।

ওঁর তখন মেজাজ শরীফ। বললেন—আরে সাহেব! কাজ আবার কি ? এতদিন পর এসেছেন আমোদ-স্ফূর্তি করুন। বলুন কোন মেয়েটিকে আপনার পছন্দ ?

—ধন্যবাদ মিঃ রায়। কিন্তু আমার বুকে যে তুর্ভাবনার পাথর চেপে আছে।

—হাওয়ায় উড়িয়ে দিন। এ্যাই ঠিক করে নাচ। সাহেবের পছন্দ হচ্ছে না।

চন্দনা বলল—ওমা! তাই নাকি? সাহেবের মন যে কাবেরীতে ভিজেছে। আমাদিকে ভালো লাগবে কেন?

ব্যারাকলউ সাহেব ব্যস্ত হয়ে বললেন—নো নো ডিয়ার উওম্যান। আমি সেকথা বলিনি। তোমাদের নাচ-গান খুব ভাল।

ওরা কুর্নিশ করল।

জমিদারবাবুর মনে দোলায়িত আনন্দ ধারা। সুর তরঙ্গের চঞ্চল অভিঘাতে, নৃত্যপরা যুবতীর চরণ বিক্ষেপে, তরল পানীয়ের রঙীন বর্ণ বিন্যাসে তাঁর কাছে সবই মনোরম। বললেন—সাহেব আপনি এত মনমরা হয়ে আছেন?

উনি বললেন—মিঃ রায়। আলাপ পরিচয়ের গণ্ডী পার হয়ে এই নাচমহলেই ব্যবসায়িক উদ্যোগ চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু ভাগ্য আমাকে বারবার দুর্বিপাকে ফেলে দিয়েছে। বন্ধু-বিচ্ছেদ, স্ত্রী-বিচ্ছেদ, এমন কি যে মেয়েটির জন্য এত দুর্ভাগ্য তাব সঙ্গেও বিচ্ছেদ হয়ে গেল। শেবগড কোল কোম্পানীর চাকরি গেল। পানমোহরায় এসে দেনায় ডুবে গেলাম। এখন আমি নিঃসঙ্গ। একাই লড়ে যাচ্ছি ভাগ্যের সঙ্গে। তবে আমি জিতব। এ সময়ে আসুন মিঃ রায় অতীতের তিক্ত অধ্যায়-গুলি ভুলে গিয়ে আমার সঙ্গে সহযোগিতা করুন।

সাহেব নিজেকে এমনভাবে মেলে ধরলেন যে, জমিদারবাবুর হাতটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে মিঃ ব্যারাকলউয়ের হাতে গ্রন্থিবদ্ধ হল সুদৃঢ় মৈত্রীব সংকল্পে।

॥ একুশ ॥

স্থান পানমোহরার খড়ের বাংলো। সময় ফাল্গুন সন্ধ্যা।

দূরে দক্ষিণ পশ্চিম আকাশে নিবিড় নীলিমার বুকে ঘন নীল ট্রাপি-জিয়মের মত পঞ্চকোট পাহাড়। তার গলায় আলোর মালা। দেদীপ্যমান দাবানলের নৃত্য চঞ্চল অগ্নিবলয়। কি অপূর্ব সৌন্দর্য! যেন এক উৎসবের রূপসজ্জা।

প্রতি বৎসব বসন্তকালে সেই পাহাড়ী বনে আগুন লাগিয়ে দেওয়া

হয়। পুড়ে যায় শুকনো পাতা, লতাগুল্ম। তারপর নূতন পাতার সম্ভারে ভরে যায় বনাঞ্চল। মিঃ ব্যারাকলউ বছর বছর এই একই দৃশ্য দেখে অভ্যস্ত। পানমোহরায় এটা তার প্রথম বসন্ত। গত বছর কোন এক অপরাহ্ণের টালমাটাল বাতাসের মধ্যে ওর ঘোড়া ছুটে এসেছিল। তারপর সময় কেটেছে জলের মত। পলকে পলকে বয়ে গেছে দিবা রাত্রির প্রবাহ। নৈসর্গিক দৃশ্যাবলীর দিকে চোখ মেলে তাকাবার অবসর হয় নি। কিন্তু আজ সেই ফাল্গুনের আগুনে যেন নূতন মাত্রা যোগ হয়েছে তেমনি ভাবে তাকিয়ে আছেন। টেবিলের উপর সাজানো আছে পানমোহরার মডেল।

হঠাৎ শুনলেন বাইরে ঘোড়া গাড়ি দাঁড়াবার শব্দ। বামাকণ্ঠের অস্পষ্ট ধ্বনি। তারপর মোরামের উপর অনেকগুলি পায়ের মচ্ মচ্ শব্দ। উনি চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালেন। ঝাপসা আলোতে দেখলেন চাঁদের দেশ থেকে বাতাসে ভর দিয়ে আসছে তিনটি সাদা পরী। তাদের পিছনে চাঁদের মতো টাকওলা মিঃ আডমসন।

সাহেবের চোখের পাতা স্থির। নাভিকুণ্ডলী থেকে উঠে আসছে কুলু কুলু ঢেউ। একসঙ্গে তিনটি পরী আছড়ে পড়লেন তাঁর উপড়ে। আবেগময় প্রিয় সম্ভাষণ! চুম্বনে আলিঙ্গনে থর থর কম্পমান!

দু'হাতে দুটি মেয়েকে জড়িয়ে ধরে—মাই সিসিল—মাই এলিজা – মাই সুইট হার্ট—তোরা কত বড় হয়ে গেছিস। সাহেবের দুচোখে বিগলিত আনন্দধারা। নীরব প্রকৃতি মুগ্ধ বিস্ময়ে স্বামী স্ত্রী, পিতা ও কন্যার এই মর্মস্পর্শী মিলন দৃশ্য দেখে আনন্দিত।

সাহেব ঘন ঘন ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিচ্ছেন। হাসছেন-কাঁদছেন কত কি বলছেন!

আবেগ ও উচ্ছ্বাসের প্রাথমিক ধাক্কাটা কাটার পর সবাই ড্রয়িং রুমে বসেছেন। সাহেব কোঠীর মত পালে পালে চাকর বাকর নেই। একা মনু পাল চাকর কাম বাবুর্চি। সত্যনারায়ণ এল তার সঙ্গে জুড়ি দিতে। সাহেব খেলাদাসীকেও ডাকালেন মেয়েদের হাই হেফাজত করতে।

মিসেস ব্যারাকলউ বললেন ডিয়ার। তোমার সাহেব কোঠীর এত এত লোকজন কোথায় গেল? দুয়ারে একটি দারোয়ান ঘরে একটি চাকর ব্যস্!

আই য়্যাম এলোন ডারলিং। ভীষণ একা।

ওহ্! এই খড়ের ঘর, মাটির মেঝে। চারিদিককার নিস্তব্ধতা ভেঙে ঠাঁই ঠাঁই হাতুড়ি পেটার শব্দ। তোমাকে এমন অবস্থায় দেখব ভাবতে পারি নি।

আমার কোন কষ্ট হয় না ডারলিং। কাজের মধ্যে ডুবে থাকি। নিজের সুখ-দুঃখ বুঝিই না। এসো। তোমরা খুব ক্লান্ত হয়ে এসেছো। স্নান সেরে নাও।

খেলাদাসী একে একে সিসিল ও এলিজাকে স্নান করিয়ে দিয়েছে। ওরা হাল্কা পোশাক পরে ফুর ফুর করে বেড়াচ্ছে। ওদের চোখে সবই নূতন। সবই সুন্দর। মেমসাহেবও স্নান করে হাল্কা মেক-আপ নিলেন।

দু'খানা ঘোড়ার গাড়ি বোঝাই প্যাকিং বাক্সে নানা রকমারি জিনিসপত্র কাপড়-চোপড়। উপহার সামগ্রী। প্রসাধন দ্রব্য। টিনজাত খাবাব। বিলাতী মদ ও আবো কত কি! মিঃ আডমনস সব হিসেব কবে গাড়ি থেকে নামিয়ে রাখলেন। দুজন কুলি হিমসিম খেয়ে গেল।

কভার পাল্টে নূতন করে ডিনার টেবিল পাতা হল। চীনা মাটির বাসন। ফুলদানীতে টাটকা ফুলের স্তবক। মাথার উপর ঝাড়লণ্ঠন। একজন কুলি পাঙখা টানতে লাগল।

খেতে খেতে সিসিল ও এলিজার মুখে খই ফুটছে। জাহাজে সমুদ্র-ভ্রমণ, ভারতীয় রেল গাড়ির কু ঝিক্ ঝিক্ এবং ঘোড়াগাড়ির টাল মাটাল খাওয়া পথ পরিক্রমার ক্যাঁচোর ,ক্যাঁচ মিউজিক নিয়ে বিস্তব রসিকতা। ওদের দারুণ মজা লেগেছে। সেসব বর্ণনা করতে করতে খোশ মেজাজে খোশ গল্পে ডিনাব সমাপ্ত হল।

শোবার জন্য মিঃ অ্যাডামসনেব আলাদা ঘর। সিসিল ও এলিজার জন্য সাহেবের পাশের ঘরেই দুটি পালঙ্কে দুজনের বিছানা। ঘরময় টাটকা ফুলের সুগন্ধ। ওরা টুপ টাপ শোবামাত্র ঝুপ ঝাপ ঘুম নেমে এলো চোখে।

মিঃ ব্যারাকলউয়ের বিশাল শয্যায় নূতন মখমলের চাদর। বড় বড় তাকিয়া। ফুলে ফুলে ছয়লাপ। মৃদু সুগন্ধে ঘর ভরে আছে। পাঙখাওলা আস্তে আস্তে বশি টানছে বাইরে দেওয়ালে ঠেস্ দিয়ে বসে।

মিঃ ব্যারাকলউ বললেন—ডার্লিং! তুমি এমন হঠাৎ কার এলে যে!

উনি চোখ নাচিয়ে বললেন—কেন? তোমার কিছু অসুবিধার সৃষ্টি করেছি নাকি?

—না না। যদি খবর পেতাম তবে বন্দর থেকে তোমাকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসতাম। আমার বন্ধু-বান্ধবরাও সঙ্গে থাকতো। তোমার এত কষ্ট হতো না।

—তা ঠিক। তবে আমি তোমাকে চমকে দিতে চেয়েছিলাম।

—তা অবশ্য চমকে গেছি। এ ভেরী প্লিজেন্ট সারপ্রাইজ।

দুজনেই হাসলেন। মেমসাহেব বললেন—তোমার সেই নাচগার্ল হিরোয়িনটিকে কোথায় রেখেছো?

—ওকে দিয়ে কি করবে?

—দেখবো।

—কি দেখবে?

—ওর রূপেব গরব।

—মাইগড! একটা অসহায় হিন্দু মেয়ের প্রতি জেলাস ফিল করছো ডার্লিং?

—তা করবো না? ভালোবাসায় ভাগাভাগি কোন মেয়েই সহ্য করতে পারে না।

তা তোমাকে সহ্য করতে হবে না ডার্লিং। তাকে বিদায় করে দিয়েছি।

—তাই নাকি? ওরে দুষ্টু! আমাকে জানাওনি যে।

মিঃ ব্যারাকলউ হাসলেন। বললেন—জানালে কি তুমি আসতে? ওখান থেকেই ফরমান জারি করতে। ঐ টেকো সেক্রেটাবিটা সাত ঝুড়ি লাগান-ভাঙান করেছে বলেই তো এসেছো। তাই না?

—ওহ্ নটিম্যান! ক্রুয়েল, হার্টলেস; ষ্টোন লাইক বুচার—তুমি আমাকে হান্ড্রেড পারসেণ্ট ভালবাসবে না কেন? আমি তোমাকে—

যেন সুইমিং পুলে ডাইভ দিচ্ছেন। তেমনি করে ওঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। উনিও তাঁকে লুফে নিলেন নিপুণ গোলকিপারের মত। দুজনেই সমান কুশলী। ক্রীড়াব মধ্যে ব্রীড়া নেই। আছে শুধু জয়ের উল্লাস। গোল দিয়েও সুখ গোল খেয়েও সুখ। সে যেন মরণ সমান। একমাত্র লক্ষ্য—টু বিচ্ ছা গোল।

সকালে ঘুমিয়ে উঠলেন তরতাজা তরুণ তরুণীর মত। প্রাতঃকৃত্যাদির পর চা টোষ্ট খেয়ে তৈরি। মেয়েদের পরনে টাইট শার্ট সাদা ফুলপ্যান্ট

মাথায় টুপি, পায়ে জুতো। সাহেবের কোমরে চওড়া বেল্ট। মাথায় টুপি। যেন কোন মিলিটারি জেনারেল।

পানমোহরার সহিস রমজান শেখ চারটি ঘোড়াকে ডেকরেট করে দাঁড়িয়ে। ওঁরা টপাটপ লাফ দিয়ে ঘোড়ায় চড়লেন। সবার আগে সাহেব তারপর মেমসাহেব। তারপর মিস্ ছুটি।

সেদিন সালুঞ্চী, শেরগড়, হাটনল, পানমোহরা, সাতঘরিয়া, দেওলটির সাহেব সুবো, বাবু ভাইয়া চাপরাশী, কুলি কামিন, চাষা ভুষো, বৌ-ঝিরা অবাক নয়নে তাকিয়ে দেখল চারটি ঘোড়ার যৌবন দৃপ্ত মিছিল। কখনো তুল্‌কি চালে, কখনো কদম চালে ঘোড়া ছুটছে টগ্‌বগ্ করে। কি দেখবে? ঘোড়া না ঘোড়সওয়ার? ব্যারাকলউ সাহেব ও তাঁর স্ত্রী কন্যারা যেন রূপকথার কুশীলব। মনোহারী ভঙ্গীতে ঘোড়া ছুটিয়ে প্রমোদ ভ্রমণ সেরে পানমোহরায় ফিরলেন।

মিঃ বাসুর তত্ত্বাবধানে ততক্ষণে লাঞ্চ রেডি। নানারকমের ফল ফুলুরীর সঙ্গে ফরবাসের রুটি, টিনে প্যাক করা ভেড়ার মাংস, এঁড়ে বাছুরের ঠ্যাং, কাটুলী মুরগীর কারি এবং স্কটল্যাণ্ডের নিখাদ হুইস্কি। এক একজনের একসের করে খাবাব। ঘোড়া ছুটিয়ে কি কম খিদে লাগে নাকি!

সন্ধ্যায় ত্থা শেরগড় কোল কোম্পানির ইউরোপিয়ান ক্লাবে ডিনার পার্টি।

মিঃ শেফার্ড নিজে এসে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গেলেন। এসব আভিজাত্যের গৌরব। প্রিয় মিলন। প্রচলিত ফ্যাশান। পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হবার মাধ্যম। তারপর থেকে প্রায়ই সন্ধ্যায় ওঁদের নিমন্ত্রণ হয় কোন না কোন সাহেবের বাংলোতে। নিজেরাও পাল্টা নিমন্ত্রণ করেন। এলাহি খানা-পিনার বন্দোবস্ত। বহুত হাসি খুশি হৈ-হুল্লোড়।

প্রতি রবিবারে চার্চে যান। প্রার্থনা করেন।

দিন বয়ে যায় হু হু করে। একদিন জমিদারের নাচমহলে নিমন্ত্রণ হল। সেখানে নাচুনীদের নাচ গান সহবৎ দেখে মেমসাহেবের চোখে ঘোর লেগে গেল। ওহো! এই তাহলে সাহেবের মেজাজ বিগড়াবার কারণ।

একদিন মিঃ ব্যারাকলউকে বললেন—ডিয়ার। আমি তোমার নাচগার্ল

হিরোইন প্রসঙ্গে কিছু বলতে গেলেই তুমি যেন অসন্তুষ্ট হও। কিন্তু আমার তো কিছু কৌতুহল আছে ?

—ওঃ। সিওর।

—ওর নাচগান কেমন ?

—আজ পর্যন্ত যতগুলো অনুষ্ঠানে নাচগান .শুনলে তাদের সবারই উপরে।

—তাই নাকি ?

—ও যদি মঞ্চে ভায়োলিন নিয়ে দাঁড়ায় তো মনে হবে অ্যান ইমেজ অফ গডেস।

—সত্যি ?

—ও যদি গান করে তবে সেই গানের সুরে ও মুর্চ্ছনায় তুমি ভেসে যাবে। ওর নাচের এক একটি মুদ্রা মনের ভিতরে স্থির চিত্রের মত অঙ্কিত হয়ে থাকবে।

—মাইগড! সো মারভেলাস ?

—হ্যাঁ।

—হার গ্ল্যামার এণ্ড বিউটি ?

—এ চার্ম উইথ ফুল অ্যাপীল অফ সিমপলিসিটি !

—আই সি! ডিয়ার। আমার সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দেবে না ?

—আমার সঙ্গে ওর এখন সংস্রব নেই। একটা অন্তঃসত্তা অসহায় মেয়েকে নির্বাসন দিয়ে এসেছি। তাকে সেখানে পৌঁছে দিয়ে বিফোর হার সেন্টিমেণ্টাল আউট ব্রেক আমি বেরিয়ে পড়েছি। শেষ মুহূর্তে তার চোখের তারায় যে করুণ বিষণ্ণ আর্তি ফুটে উঠেছিল তা দেখলে তোমারও চোখ ফেটে জল বেরোত।

মিষ্টারের কথায় মিসেসেরই সেন্টিমেণ্টাল আউট ব্রেক হয়ে গেল। প্রায় ফোঁপানো কণ্ঠস্বরে বললেন—ইউ ক্রুয়েল, হার্টলেসম্যান। তুমি ভালবাসার অযোগ্য। তোমাকে যে ভালোবেসেছে সেই পুড়ে পুড়ে শেষ হয়ে গেছে। তোমার কাছে মেয়েদের সেন্টিমেন্টের কোন দাম নেই। তুমি চাও শুধু সেকস্। আমি তোমাকে ডিভোর্স করব।

উনি স্ত্রীর চরিত্রের এই দিক্‌টা জানেন। রাগলে ওঁর মাথার ঠিক থাকে না। তখন আবোল তাবোল বকেন। ওঁর হাতে চুমু খেয়ে

বললেন—মাই ডার্লিং! সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে বছরের পর বছর বিরহ যন্ত্রণা ভোগ করেও যা পারনি তা কি এখন আমার কাছে এসে পারবে ?

—পারব না তো! সেইজন্যই তো তোমার উপর এত রাগ হয়। তোমার জীবনে এত কাণ্ড ঘটে গেছে। যাকে কেন্দ্র করে চরম সঙ্কটে পড়েও মত বদলাও নি। তাকেই আবার নিজে থেকে নিঃশব্দে বিদায় করে দিয়েছ। খাদের ভিতর প্রাণ বিপন্ন করে পাঁচদিন ধরে রেসকু অপারেশন চালিয়েছ। জ্বর গায়ে খাদে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েছ। রোগে ভুগেছ—অনিদ্রায় দুর্ভাবনায় রাত জেগেছ। চাকরিতে বরখাস্ত দিয়েছ। ফাইনেনসারকে প্রোপার্টি দিয়েছ। কিন্তু আমাকে একটা কথাও জানাও নি। কেন ? কেন ? কেন ?

সাহেব খুব বিচলিত হয়ে পড়লেন। ওর ভেঙে পড়া দেহটা নিজের বুকে ধরে বললেন—রাগ করোনা ডার্লিং। আমার নিজস্ব কিছু ইজম্ আছে। আমি জানি আমার দুর্ভাগ্যের দায় আমাকেই বইতে হবে। তাই বয়েছি। কাউকে বিব্রত করতে চাই নি। করিও নি। আমি সঙ্কট কাটিয়ে উঠেছি। জমিদারের সঙ্গে সেটেলমেণ্ট হয়ে গেছে। আর দশফুটের মধ্যে পানমোহরা চানকে ফাস্ট কোলসিম পেয়ে যাব। বছর খানেকের মধ্যে চেহারা পাল্টে যাবে।

মিসেস ব্যারাকলউ উত্তেজনা কাটিয়ে একটা চেয়ারে বসলেন। নিজের হাতেই গ্লাসে হুইস্কি ঢাললেন। জল মিশিয়ে সাহেবের দিকে একটা গ্লাস বাড়িয়ে দিয়ে বললেন—আই উইশ ইয়োর সাকসেস!

থ্যাঙ্ক ইউ ডার্লিং। চিয়ারস!

কয়েক চুমুক খাওয়ার পর মিসেস বললেন—তোমার এই বিরা কর্মকাণ্ডের শরিক তো আমি হতে পারলাম না। বরং বাধার স্থা করলাম। তোমাকে দুঃখ কষ্ট দিলাম। এসবের জন্য আমার কি মন পু যাচ্ছে না ?

—তুমি সত্যিই নোব্‌ল হার্টেড উওম্যান। তোমার সেন্টিমে আঘাত করার জন্য আমি দুঃখিত। ওটা সাময়িক ভুল বোঝাবুঝি। তু এসেছ এইটাই আমার কাছে বিরাট। ডার্লিং—আর মন খারাপ ক না। প্লিজ এসো—আমাকে কিস কর।

মিসেস ওর গ্লাসটা টেবিলের ওপর রেখে মিস্টারের গালে একটা রোমহর্ষক চুম্বন দিলেন।

।। বাইশ ।।

মিঃ ব্যারাকলউয়ের অভ্রান্ত হিসেব। ঠিক দশফুটের মধ্যে কয়লা পাওয়া গেল। ছয়শো সাত ফুট ছ'ইঞ্চি পরে বারুদ আওয়াজ করার জন্য শাবল দিয়ে যে গর্ত হয় সেগুলো শক্ত পাথরের স্তর পেরিয়ে নরম কয়লাতে হয়েছে।

বুধনা শাবল দিয়ে গর্ত করছিল। শক্ত পাথরের নরম স্তর এবং শাবলের গা বেয়ে জলের সঙ্গে বেরিয়ে এল ঈষৎ তৈলাক্ত কালো কয়লার কুচি। সে চিৎকার করে উঠল—বাসমণি। নড়ে হিজুমে। কয়লা হিজ্‌কানা। (রাসমণি। এদিকে আয়। কয়লা আসছে।)

রাসমণির কুলিকামিনরা বালতিতে পাথর বোঝাই করছিল। তারা ওকে ডেকে দিল। সবাই মিলে হুমড়ি খেয়ে পড়ল কয়লা দেখতে।

চৌদ্দটি হোল হল। বারুদ আওয়াজের সময় সব লোক উপরে উঠে গেল। জন দুই আওয়াজের পরই নেমে গেল। তখন চানকের ভিতর ধোঁয়া থিক্ থিক্ করছে। চোখে কিছু দেখা যায় না। নাকে লাগছে ব্লাষ্টিং ফিউমসের তীব্র গন্ধ।

অন্যান্য দিন বারুদ আওয়াজ করে সব খাবার ছুটি করে। চোঙের মুখে বাতাস ঢুকিয়ে ধোঁয়া সাফ করা হয়। সেদিন কারো তর সইল না। নাক চোখ বুজে ভাঙা চোরা পাথর কয়লা যা পেল তাই বালতিতে বোঝাই করে উপরে এলে। জলে কাদায় পাথরে মাখামাখি কালো কালো কয়লার টুকরো দেখে সব আনন্দে আত্মহারা।

মিঃ বাসুর ভিতরটা আনন্দে গুড় গুড় করে উঠল। সত্যনারায়ণ দৌড়াল সাহেবকে খবর দিতে। কুলি কামিনদের মধ্যে আনন্দের ঢেউ পড়ে গেল। কাউকে কিছু বলতে হল না। আওয়াজ করা সব কয়লা বালতিতে করে উপরে ওঠানো হল। তারপর আবার শাবল দিয়ে গর্ত শুরু হল। এবার শুধুই কয়লা।

সাহেব তখন বাইরে গেছেন। মেমসাহেব শুনে এত খুশি যে সত্যনারায়ণকে কন্‌গ্র্যাচুলেশনস্ দিয়ে হ্যাণ্ডশেক করে ফেললেন। ওর আবার

ধারণা ছিল মেমসাহেবের শরীর মোম দিয়ে তৈরি কিন্তু তুলোর মত নরম। অথচ হ্যাণ্ডশেকটা যখন হল ওর মনে হল। একটা কাঠ! এত শক্ত মেমসাহেবের হাত।

আহা! খেলাদাসীর হাতগুলো কত নরম!

বার্তা ছুটে গেল দিকে দিকে। খবর পেয়ে সাহেব যখন এলেন তখন চানক মুখে রীতিমত ভিড় জমে গেছে। সাহেব দেখে শুনে বললেন— হ্যাঁ! ঠিক জায়গাতেই পৌঁছেছে। এটা ষোল ফুটের সিম্।

মিঃ বাসু বললেন—স্যার আজ তো অবেলা। কালকেই মা-কালীর পুজো দিতে হবে। তাছাড়া কাল শনিবারও হচ্ছে।

—ওঃ ইয়েস মিঃ বাসু। গডেস্ কালী মাদারকে আমি খুব রিগার্ড করি।

সব কলিয়ারিতেই মা কালীর স্থান মাথার উপরে। তিনি মহাশক্তি। পুজা বিধি ঘোর তামসিক। পাঁঠা বলি অবশ্যম্ভাবী।

খুশির একটা আলাদা মাদকতা। সাফল্যের সংবাদে মানুষের দিল দরিয়ার মত দরাজ। ব্যারাকলউ সাহেব যতই রাশভারী লোক হন— কুলি, কামিন, মিস্ত্রী, বাবুদের দাবি আটকে রাখবার ক্ষমতা ওর নেই। হুকুম দিলেন—চালাও ফুর্তি! পাঁঠার মাংস, গরম খিঁচুড়ি, ফট্‌কা মদ। যে যত পারো—খাও দাও—নাচো কুদো। কোই পরোয়া নেহী হ্যায়। সব খরচ কোম্পানির।

খবর পেয়ে ছুটে এসেছেন মিছির বাবু ও তাঁর দলবল। আবার বিবি বাথানের চিনি, চামেলী, বেলা, মালতীরাও হাজির। চারু, মুচি, ঢালু দাস, হাঁড়ি লাল বাবুর্চি, চিনি নাচুনি ছাড়া কি পরব জমে? ওরা সব শেফার্ড সাহেবের কাছে ছুটি নিয়ে পানমোহরায় কালী পুজোর রং জমাতে এসেছে।

পুজোর পর খাওয়া দাওয়া শুরু হয়েছে বেলা তিনটে থেকে। সন্ধ্যা পর্যন্ত চলছেই। খিঁচুড়ি মাংসের কি যে সুগন্ধ! লোক আসছে কাতারে কাতারে; সাহেবের দরাজ দিল—দিয়ে দাও। যে আসছে তাকেই দাও।

সন্ধ্যা বেলায় পানমোহরা কাদা হয়ে গেল। একদিকে বিবি-বাথান পার্টির ভাদু ঝুমুর, খিস্তি খেউড়, রং তামাশা। অন্যদিকে সাঁওতাল নাচ।

সেদিন রাসমণির কি নাচ! তেমনি বুধনার মাদল সঙ্গত। রক্তে

মাতন লেগে যায়। দলে বারো চৌদ্দটি মেয়ে। সব আঁটো সাঁটো গড়ন। তৈলাক্ত মুখে চিকন পিচ্ছলতা। পুরুষ বাজনদার সাত আটটি। কিন্তু নাচটি বড় পরিপাটি।

মেয়েরা সব একের বগলের ফাঁকে অন্যের বাহু পরিয়ে হাতে হাত ভাঁজ করে মালার মত দাঁড়িয়ে। সামনে পুরুষ বাজনদারদের হাতে মাদল, লাগরা, বাঁশী, করতাল। বেজে যাচ্ছে বাজনা।

বাঁশীতে—পেঁ রূ-রূ। রূ-রূ।

লাগড়ায়—হুডু ডুডুং হুডু ডুডুং—

ঝাঁপির করতাল ঝাঁই ঝপক্। ঝপক্ ঝপক্।

ঝাপসা আঁধারে মেয়েদের তন্বী দেহ বল্লরী এঁকে বেঁকে কুহক বিস্তার করে চলেছে। সেই নাচের ছন্দে, তালে লয়ে সিসিল এলিজার পায়েও নাচ লেগে গেছে।

ওদের চোখ তখন তখন ঢুলু ঢুলু। পেটের ভিতর স্ফটিক স্বচ্ছ জিনের মোহিনী মায়া। সারা গায়ে মাতন লাগা ঢেউ।

মেমসাহেবের হাত ধরে সিসিল বলল—মাম্মী! ওদের সঙ্গে নাচব।

এলিজা বলল—আমিও নাচব।

উনি বললেন—আমিই বা বাদ থাকি কেন?

সাহেব বললেন—ইয়েস!

সাহেব মেমসাহেব সব তখন টপ ভূজঙ্গ।

সাহেব রাসমণিকে ডেকে বললেন—এদের তিনজনকে তোদের সঙ্গে নে।

রাসমণি এক গাল হাসল। মেমসাহেব মাঝে দু'পাশে দুই মেয়ে। সারির মাঝখানে তিনজনকে রেখে বগলের ফাঁক দিয়ে হাতের ভাঁজ দিয়ে দাঁড়াল যেন এক গুচ্ছ কৃষ্ণকলির মালায় তিনটে শ্বেতপদ্মের লকেট।

শুরু হল নাচ গান—

পাঁছুতা পাহাড়ে আগুন লেগেছে
দামুদরের কিনারে বান এসেছে
সাহেবের চানকে কয়লা লেগেছে
যতসব কুলি কামিন নাচতে নেমেছে—

টানা টানা সুরের সেই মাদকতায় সাহেবও বাজনদারদের সঙ্গে মালক্ মেরে বেড়াচ্ছেন। ওঁর হাতে একগুচ্ছ ময়ূর পাখা।

সমে এসে বুধনা তেহাই ঠুকল—ছিরিক ! ছিরিক !

মাঝিদের সঙ্গে সাহেবও মুখে শব্দ করলেন—হুরর ! হুরর !!

সে এক আশ্চর্য যুথনৃত্য। যেখানে শ্রমিক মালিক সব একাকার।

দেখতে দেখতে এসে গেল বৈশাখেব আগুন ঝরা বেলা। সারাদিন হা হা করে লু বয়। হাওয়ার চোটে ধুলোবালি উড়ে এসে গায়ে ছ্যাঁকা দেয়। মেমদের গা রোদে পুড়ে ঝামা হয়।

চামড়াব উপব ফোস্কা পড়ে। ভিজে তোয়ালে ঢাকা দিয়ে পাঙখার নিচে বসে থাকেন। ঠাণ্ডা বায়াব খান। সন্ধ্যা হলে বাইবে বেরোন। তখনো বাতাসে আগুনেব হল্‌কা। বাঢ়ভূমিব গ্রাম্মেব জ্বালা ওঁরা তো জানতেন না।

তখন মিঃ ব্যারাকলউ তাঁব পানমোহরায় একটা অনুষ্ঠান করার কথা ভাবছেন। সেটা ভারতীয় কয়লা খনির উপব সেমিনারেব মত যেন হয়। নামী নামী মাইনিং ইন্‌জিনিয়াব ও কয়লা শিল্পেব সঙ্গে যুক্ত শিল্পপতিদেব নিমন্ত্রণ করবেন। মিঃ গ্রাণ্ডি এখন ভারতবর্ষেই আছেন। নূতন আইন কানুন রচনাব কাজ করছেন। তিনিই সম্ভবত মুখ্য পবিদর্শক হবেন। তাঁকে নিমন্ত্রণ করে এনে সভাপতি করবেন। কাবণ উনিই একদিন তাঁকে বুচার বলেছিলেন। দেখিয়ে দেবেন যে মিঃ ব্যারাকলউ বুচার নন। তাঁর নূতন কলিয়ারির সাজ সজ্জা দেখাবেন। সেখানে এখনো একটিও অ্যাকসিডেণ্ট হয়নি। মিসেস ব্যাবাকলউয়েব সঙ্গে এ নিয়ে পরামর্শ করতে উনি তো তৎক্ষণাৎ বাজি।

উৎসাহে বললেন—ইয়েস ডিয়ার। এটা একটা কাজের মত কাজ।

তারপর প্রস্তুতি শুরু হল।

মেমসাহেব বৃটিশ মহিলা। সাহেব যে কত মেয়েব সঙ্গে লট্‌ঘটি করেছেন কত যে জারজ সন্তানেব জন্ম দিয়েছেন তাব একটা মোটামুটি তালিকাও প্রস্তুত করে ফেলেছেন। কিন্তু তাকে সবচেয়ে বেশী পীড়া দিচ্ছে কাবেরী। সে এখন দূরে সরে গেছে। তবু যেন তার ছায়া সাহেবেব বুকে চেপে বসে আছে এমন একটা ধারণা এখনো তার মন থেকে মোছে নি।

সাহেব ওকে দেখতে দিচ্ছেন না কেন ?

এই প্রশ্নটা তাঁব কৌতুহলকে অদম্য করে তুলছে। একদিন বললেন,

চলো ডিয়ার। তোমার হিরোইনের সঙ্গে আলাপ করে আসি।

সাহেব আবার গম্ভীর। বললেন—ছ্যাখো, ওঁর কাছে দাঁড়াবার মুখ আমার নেই। ব্যাচারি বড়ই দুঃখী। কেন বৃথা ওর ব্যাথার জগতে নূতন করে আঘাত দিতে বলছ?

—তবে কি ওর সঙ্গে আলাপ হবে না? মেমসাহেবের কণ্ঠে অভিমান।

সাহেব না বুঝতে পেরে বললেন—বেশ। মিঃ বাসুকে সঙ্গে নিয়ে যাও। উনি ওর বাড়িটাও চেনেন। দোভাষীর কাজটাও করতে পারবেন।

—বাঃ। নিজের বাড়িতে পেয়ে যদি অসম্মানজনক কথা বলে তবে আমি কি করে সহ্য করবো?

--মাইগড! ও সে মেয়েই নয়। গেলেই পরিচয় পাবে। নিজের চোখে দেখে নেওয়া ভালো।

সাহেব যেন একটু বিরক্ত।

কাবেরীর কুটিরের সামনে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ। চারিদিকে ফুটফুটে জ্যোৎস্না। কামিনী গাছটায় একরাশ সাদা ফুল। তারই গন্ধে বাতাস আমোদিত। সেই প্রাঙ্গণে শতরঞ্চি পেতে নিবিড় সাধনায় নিমগ্ন ও। গুরু মন্মথ ঘোষ উজাড় করে দিচ্ছেন সঙ্গীতের ধারা। তানপুরা নিয়ে তাঁর সেই রেওয়াজ চলে কাক ডাকা ভোরে, সন্ধ্যার অবকাশে।

হঠাৎ একটা ঘোড়ার গাড়ি এসে দাঁড়াল গেটে। দারোয়ান সেলাম দিয়ে গেট খুলে দিল। গাড়ি এসে থামল বারান্দার কাছে। কচোয়ান নামল। কাবেরীকে সেলাম দিয়ে বলল—মেমসাহেব এসেছেন মাঈজী।

—কোন মেম সাহেব? ভাবাবিষ্ট দুটি চোখ মেলে সে তাকাল।

—বারকুলি সাহেবের মেম।

বুকটা ওর ধড়াস্ করে উঠল। কত কি অজানা আশঙ্কায় সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল। উদ্বিগ্ন মুখে ঘোড়া গাড়ির কাছে এসে বাঈজীর ঢঙে কুর্নিশ করল—সেলাম মেমসাহেব!

উনি কাবেরীর দিকে হাতটা বাড়িয়ে বললেন—তোমার সঙ্গে আলাপ করতে এলাম।

কাবেরী ওঁর হাতটা দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বলল—আমি ধন্য হলাম।

মিঃ বাসু পরিচয় পর্ব শেষ করিয়ে দিয়ে বললেন—ম্যাডাম! উনি

ভেরি সুইট সিংগার। আপনি বললে নিশ্চয়ই গান শোনাবেন।

কাবেরী ঝর ঝর করে হাসল। বলল—শোনাব মেমসাহেব। আপনার মত সম্মানিতা শ্রোতা পেলে আমি সারারাত গান শোনাতে পারি।

— থ্যাঙ্ক ইউ কাবেরী।

কাবেরীর ছোট্ট সংসারের দারোয়ান ঝি মেমসাহেবকে সেলাম দিয়ে গেল। মন্মথ ঘোষ জোড় হাত করে দাঁড়িয়ে। শতরঞ্চির পাশে একটি ছোট দড়ির খাটুলিতে নকশাকাটা কাঁথার উপর কাবেরীর মেয়েটি ঘুমোচ্ছে। ফুলো ফুলো গাল। চকখড়ির মত সাদা রঙ। একমাথা সোনালী চুল। মুখের ছাঁচটি সিসিলের মত। মেমসাহেব ওর দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন।

কাবেরী বলল—এটি আমার মেয়ে।

—তা বুঝেছি। কি নাম রেখেছো ?

—সরিতা।

—এ ষ্ট্রিম অফ ওয়াটার। মিঃ বাসু নামের মানে বুঝিয়ে দিলেন।

—ভেরী সুইট নেম।

মেমসাহেব ওর মুখে চুমু খেলেন। আদর করলেন। এটা স্বামীরই সন্তান। কিন্তু সেজন্য কোন অসূয়া ভাব এল না। বরং স্নেহবোধ করলেন।

বললেন, তোমার বাগানে যে একটি এত সুন্দর ফুল ফুটেছে তা সাহেব দেখেননি ?

—না মেমসাহেব ! কাবেরী মাথা নিচু করল !

—ওহ্ ! মানুষটা কত নিষ্ঠুর ! নিজের ঔরসজাত সন্তানকে দেখবার ইচ্ছে হয় না। এমন মানুষকে ভালোবাসো কেন ?

কাবেরী ভীষণ বিচলিত হয়ে পড়ল। স্বভাব সিদ্ধ ভঙ্গিতে কুর্নিশ করে বলল—আমি বাঈজী মেমসাহেব। যখন যে আধারে থাকি সেই আকারই ধারণ করি।

—সেটা তোমার পরিচয়। বাট দিস্ ডটার ?

—অমৃতের সন্তান।

—ওহ্ ! এই যদি জীবনদর্শন হয় তবে কি আমরা মুর্খের স্বর্গে বাস করছি ?

মিঃ বাসু ওদের সংলাপের মধ্যে দোভাষীর কাজ করছিলেন। মন্তব্য করলেন—ম্যাডাম! ইণ্ডিয়ান উওম্যানরা অভিযোগ করতে জানে না।

তারপর টুকিটাকি কথাবার্তা। একটু গান বাজনাও হলো। কিন্তু জমল না। কেমন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকল। অথচ কাবেরীর কণ্ঠমাধুর্য তর্কাতীত মধুর।

এবার বিদায় নেবার পালা। মেমসাহেব কাবেরীকে জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার সংসার চলে কি করে?

—আপনাদের কোম্পানি থেকে ঝি ও দারোয়ান বেতন পায়। গুরুজীর জনকয়েক শিষ্য শিষ্যা আছেন। তাঁদেরকে গান শিখিয়ে কিছু রোজগার করেন। আমিও মাঝে মধ্যে দু'একটা আসরে মুজরো করার বায়না পাই। ওতেই চলে যায় মেমসাহেব।

—সাহেব কিছু দেন না?

—উনি খাজাঞ্চী বাবুকে বলে দিয়েছেন—আমি টাকাকড়ি চাইলেই যেন দেওয়া হয়। কিন্তু আমার চাইতে লজ্জা করে। তাছাড়া উনি আমাকে স্বাধীনভাবে জীবন কাটাতে বলেছেন। তাহলে জীবিকাটাও তো স্বাধীন হওয়া দরকার।

এইসব প্রশ্নোত্তরে উনি কাবেরীর চরিত্রকে উন্মোচন করার চেষ্টা করছেন। হঠাৎ বলে বসলেন—তুমি কি সাহেবের কাছে যেতে চাও?

—কেন আর ওকে বিড়ম্বিত করতে যাব মেমসাহেব? উনি আমার জন্য অনেক করেছেন। অভিশপ্ত জীবনের শাপমোচন করেছেন। স্বাধীনভাবে বাঁচবার পথ দিয়েছেন। এর বেশি চাইলে যে ধর্মের দুয়ারে অপরাধী হব মেমসাহেব।

—ধন্যবাদ কাবেরী! আজ তোমার হৃদয়ের যে পরিচয় পেলাম তা আমার মনে থাকবে। আমি লর্ড যীশাস ক্রাইষ্টের কাছে তোমার ও সরিতার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করব।

—আপনি মহিয়সী রমণী। এক ভাগ্যহীনাকে ধন্য করে গেলেন। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।

মেমসাহেবকে গাড়িতে চড়িয়ে দিয়ে কুর্নিশ করল। উনিও গুডবাই বলে হাত নাড়লেন।

॥ তেইশ ॥

পানমোহরার সেদিন নূতন রূপসজ্জা।

একদা ছিল ঘুসিক চুনের ডাঙ্গা। স্থানীয় জনসাধারণের জন্য গড় লায়েক পতিত গোচারণ ভূমি। তার উপরে সারিবদ্ধ খড়, খোলা ও টালির ঘর। সাহেব বাংলোর চারিদিকে মেহেদি গাছের বেড়ায় কচি কচি পাতা। বাংলোর দেওয়াল উঠছে। একই সারিতে বেশ খানিকটা ব্যবধান রেখে আরো দুটো বাংলো তৈরি হচ্ছে ম্যানেজার ও ইঞ্জিনীয়ারের জন্য। একসারি বাবু কোয়ার্টারে টালি চড়ানো হয়েছে। একটা পুকুর কাটাই হচ্ছে। চারিদিকে নূতন মাটির বাঁধ।

একদা চাষীদের জীবন ধারণের কৃষিভূমি সাতনলি মহালের ধান দেখলে প্রাণ জুড়িয়ে যেত। আজ সেখানে খাড়া হয়েছে পাশাপাশি একজোড়া হেড্ গিয়ার। বয়লার ফার্ণেসে গন্‌গনে আগুন। আকাশ-চুম্বী ইটের তৈরি চিমনি দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। আকাশের প্রেক্ষাপটে কালো ধোঁয়ার মেঘ। হস্ হস্ করে ষ্টীম ইঞ্জিন চলছে। বন্ বন্ করে পুলিচাকা ঘুরছে।

চানক খোঁড়াইয়ের পাথর দিয়ে তৈরি হয়েছে রাস্তা কয়লার ডিপো, ট্রাম লাইনের এমব্যাঙ্কমেণ্ট। সামনেই অফিস, গুমটি, বাতিঘর। ঢাউস একখানা ফ্যান ঘুরছে খাদে বায়ু চলাচলের জন্য। তার ইভাসী চিমনিতে এক্সজস্ট বাতাস।

রুখু ডাঙ্গা, শ্যামল ধানক্ষেতের পুরো প্রোফাইল বদল হয়ে একটা শিল্প প্রতিষ্ঠানের আকার নিয়েছে। তবুও ডিপোর উপর দাঁড়ালে দেখা যায় আঁকা বাঁকা চঞ্চলা জোড়ের দু'পাশে নয়নাভিরাম তাল-বীথির দৃশ্য। দক্ষিণে অনেকটা দূরে দামোদরের ধূ-ধূ বালুকারাশি। তারপরই জিলা মানভূমের শ্যামল দিগন্ত। ধূসর আকাশের প্রেক্ষাপটে পঞ্চকোট পাহাড়ের নীল রূপরেখা।

অফিসের সামনে একটি চৌকো মত সমতলক্ষেত্র। তার উপরে সামিয়ানা টাঙিয়ে অনুষ্ঠানের আয়োজন। সিসিল ও এলিজা নিজের হাতে ফুল দিয়ে মঞ্চ সাজিয়েছে। মিঃ শেফার্ড একজন শো ম্যান। তিনি আছেন অতিথি আপ্যায়নের জন্য। অতিথিরা একে একে এসে পড়েছেন।

মিঃ বাসু কলিয়ারির কোন কাজ শুরু করার আগে মা কালীর পায়ে ফুল বেলপাতা না দিয়ে থাকতে পারেন না। তাই তিনি সকালেই পুজো সেরে চানক, হেড গিয়ার, ইঞ্জিন সব কিছুতে সিঁদুর লেপে দিয়েছেন। সাহেবদেরও তাতে খুব আস্থা। মাদার কালী খাদের গডেস-এ ধারণা তাদের মনেও বদ্ধমূল।

সমকালীন যুগের এক ঐতিহাসিক সম্মেলন। যাতে অংশগ্রহণ করেছিলেন বিখ্যাত বিখ্যাত মাইনিং ইঞ্জিনীয়ার ও শিল্পপতিগণ। মিঃ জেমস গ্রাণ্ডি ইনস্‌পেক্টার অফ হার ম্যাজেস্টি ছিলেন সভাপতি।

অভ্যর্থনা, উপবেশন, মাল্যদান প্রভৃতির পর মিঃ শেফার্ড ঘোষণা করলেন—মিঃ ব্যারাকলউ এক মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। আপনাদের ঐকান্তিক সহযোগিতায় তা সফল হোক এই কামনা করি। এখন আমি উদ্যোক্তা মিঃ ব্যারাকলউকে উদ্বোধনী ভাষণের জন্য অনুরোধ করছি।

উনি শুরু করলেন—সম্মানিত অতিথিগণ,

আপনারা আজ আমার আহ্বানে সাড়া দিয়ে এই অনুষ্ঠানকে সফল করার জন্য যে ঐকান্তিক সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছেন সেজন্য আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি।

১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে যখন মিঃ সামার ও মিঃ হিটলী ভারতে প্রথম কয়লাখনি পত্তন করেন তখন কেউ কয়লার ব্যবহার জানত না। বাজারে সে কয়লা বিক্রিও হয়নি। কিন্তু চল্লিশ বছর পর ১৮১৪ সালে মিঃ জোনস এসে চিনাকুড়ি, দামুলিয়া ও নারায়ণকুড়িতে কয়লাকুঠি খোলেন। তারপর থেকে অগ্রগতির ধারা অব্যাহত আছে।

ভারতে শিল্প বিপ্লবের চাকা ঘুরছে। আমরা তার জীবনীশক্তির যোগান দিচ্ছি। কয়লা ভারতের আদি শক্তি। তার থেকে উৎপন্ন হয় তাপ। তাপ থেকে বাষ্প। ঘোরে প্রাইম মুভার।

মানুষ ক্রমশ কৃষি নির্ভর জীবনযাত্রা থেকে শিল্পের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। আগে কয়েকজন দুঃসাহসী ইউরোপিয়ান ছাড়া কেউ কয়লা শিল্পে টাকা লগ্নী করতে চাইতেন না। সুখের কথা এখন এদেশীয় জমিদার ও শিল্প-পতিরা উৎসাহিত হচ্ছেন।

বর্তমান সময়টা কয়লা শিল্পের একটা ক্রান্তিকাল। একদিকে যেমন জনস্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও দুর্ঘটনা রোধের জন্য বৃটিশ সরকারের প্রয়াসে

আইন-কানুন রচনার কাজ চলেছে অন্যদিকে তেমনি শিল্প প্রসার, আধুনিকীকরণ ও যন্ত্রপাতির ব্যবহার নিয়ে বিভিন্ন কোম্পানিতে পরীক্ষা, নিরীক্ষা ও প্রয়োগের কাজ চলছে।

এরপর আসবে বিদ্যুৎ। তার ব্যবহার কৌশল আয়ত্তে এসে গেলেই ঘটে যাবে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। যেমনটি একবার ঘটেছিল বাষ্পীয় ইন্‌জিন চালু হবার পর।

শ্রমিকদের ক্ষেত্রে আগে যেমন সাঁওতাল, বাউরী, কোল, ভীল, মুণ্ডা প্রভৃতি আদিবাসী উপজাতি নিয়ে আমাদের কাজ করতে হত যাদের হর-হামেশা কামাই,মরশুমি পাখীর মত আসা যাওয়া, পরবের নামে উদ্দাম নৃত্য ও প্রয়োজনের তুলনায় সংখ্যাতেও কম—তাদের সঙ্গে পশ্চিমের বিহার, উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ প্রভৃতি স্থান থেকে শ্রমিক আমদানি শুরু হয়েছে। আশা করি স্থানীয় শ্রমিকদের পাশাপাশি তাদের স্থান দিলে শিল্পের ভালো হবে। উৎপাদন সারা বছর সমান থাকবে।

পরিশেষে আমি মাননীয় অতিথিদের অভিনন্দন জানিয়ে বর্তমানে ভারতবর্ষে খনি শিল্পের সমস্যা ও তার সমাধান নিয়ে আলোচনা করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। ধন্যবাদ।

সহর্ষ হাত তালিতে তার বক্তব্যকে স্বাগত জানান হল।

এরপর বক্তৃতা করলেন মিঃ উড, মিঃ মার্টিন, মিঃ টারলটন প্রমুখ বিশিষ্ট অতিথিগণ।

সভাপতির ভাষণে মিঃ গ্রাণ্ডি ভারতীয় কয়লা খনিতে আইন কানুন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে গভীরভাবে আলোচনা করলেন। সকলকে ধন্যবাদ দিলেন এবং ঘোষণা করলেন মিঃ ব্যারাকলউয়ের ইচ্ছা—পান-মোহরার এই দুটি চানককে তাঁর স্ত্রীর নামে "ইসাবেলা পিট" নামকরণ করা হবে।

চট্ চট্ হাত তালি পড়ল।

মিসেস ব্যারাকলউ তার আগে ঘুণাক্ষরেও জানতেন না যে তাঁর নামে পিট হবে। ভারতের বুকে গাঁথা থাকবে তার নাম শিল্প বিপ্লবের অন্যতম শরিক হিসেবে। তাঁর চোখদুটি আনন্দে ছল্ ছল্ করে উঠল।

সিসিল ও এলিজা তাঁদের মাকে ঘন ঘন চুম্বন করল।

তারপর তাঁর উপরে অভিনন্দনের ঝড় বয়ে গেল। উনি একের পর এক অতিথির দিকে হাত বাড়িয়ে করমর্দন ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে

চলেছেন। ভাবতেও পারেননি তাঁর জন্য ভারতের মাটিতে এত সম্মান অপেক্ষা করেছিল। অভিভূত হয়ে পড়লেন।

সান্ধ্য বাসরে নৃত্য ও সঙ্গীতের অনুষ্ঠান। সেই সঙ্গে ডিনার পার্টি। দারুণ জমজমাট ব্যাপার। নাচে গানে পাশ্চাত্য মিউজিকে অনুষ্ঠান মঞ্চ ক্ষণে ক্ষণে ঝলসে উঠছিল। হাই পাওয়ার পেট্রোম্যাক্স লাইটের ছটায় চারিদিক আলো ঝলমল। শ্রান্ত, ক্লান্ত, নেশায় অবসন্ন, বিবশ অতিথিরা সব একে একে চলে গেলেন। শিল্পীরা যন্ত্রপাতি গুটিয়ে সাজঘরে ঘুমিয়ে পড়লেন। পেট্রোম্যাক্স লাইট নিভে গেল। তখন ভোররাত।

মঞ্চ ফাঁকা। চারিদিক নিস্তব্ধ। পশ্চিম আকাশে অস্ত যাচ্ছে চাঁদ। পূব আকাশে ফুটে উঠেছে সূর্যোদয়ের বর্ণ বিন্যাস। দু' একটি পাখ পাখালি ডাকছে। ভোরের মিহি বাতাস ঝির ঝির করে বইছে।

মিঃ ও মিসেস ব্যারাকলউ মুখোমুখি দুটি চেয়ারে মঞ্চের উপর বসে। সিসিল ও এলিজা গান গাইতে গাইতে মঞ্চের উপরই ঘুমিয়ে পড়েছে। মিঃ ব্যারাকলউ তাদের দিকে সস্নেহ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। ওদের মুখে স্বর্গীয় চন্দ্রপ্রভা।

মৃদু হেসে বললেন—মাই সুইট চাইল্ড! বড় বেশি নেশা করে ফেলেছে।

—ভীষণ খাটুনিও হয়েছে ওদের। সারাদিন ছুটোছুটির পর এতো নাচ গান। আর কি নেচেছে দুজনে—কোন প্রফেশন্যাল ডান্সার এত পরিশ্রম করতে পারবে না।

—তা ঠিক।

উনি চুপ করলেন। মিসেস বললেন—তাহলে তোমার প্রোগ্রাম পাকা তো?

—হ্যাঁ—হ্যাঁ। মাস খানেকের মধ্যে পানমোহরার সব মেশিন চালু হয়ে যাবে। উৎপাদন শুরু হবে। তারপর আমরা যাত্রা করব। এবার মাস ছয়েক হোমে থাকব।

—ওঃ। সত্যি বলছ ডিয়ার?

—হ্যাঁ—হ্যাঁ। নিশ্চয়।

সাফল্যের কি মধুর আস্বাদন! মিঃ ব্যারাকলউ আজ সফল পুরুষ। চার বছর আগে এই পানমোহরা নিয়ে স্বপ্ন রচনা করেছিলেন। তারপর কত

সুখ দুঃখ, আশা নিরাশা, শ্রম ও স্বেদের বিনিময়ে সাফল্যের দুয়ারে পৌঁছলেন। ম্যানেজার থেকে মালিকের প্রমোশন পেলেন।

তার মুখে রক্তিম উষার হিরণ্যবর্ণের উজ্জ্বল হাসি !

দুর্বার গতিতে ছুটে চলেছে মহাকালের ঘোড়া। দেশ, কাল পাত্রের গণ্ডী অতিক্রম করে—যুগ থেকে যুগান্তরে তার বিরামহীন যাত্রা। ঘোড়ার ক্ষুরের দাগে দাগে কত জন্ম মৃত্যুর খতিয়ান। কত জাতির উত্থান ও পতন। কত সভ্যতার সৃষ্টি ও বিলুপ্তি।

আজ যে সভ্যতার আদি শক্তি কয়লার তাপ—তার পাপ পুণ্য ও কর্মের উদ্যোগ নিয়েই সেকালের ক্রান্তি। সেই ক্রান্তিকাল অতিক্রম করে যায় প্রবল পুরুষকার। তার দর্পিত বুটের তলায় মাড়িয়ে যায় যতকিছু দুঃখ অভিমান।

—ঃ৮ঃ—